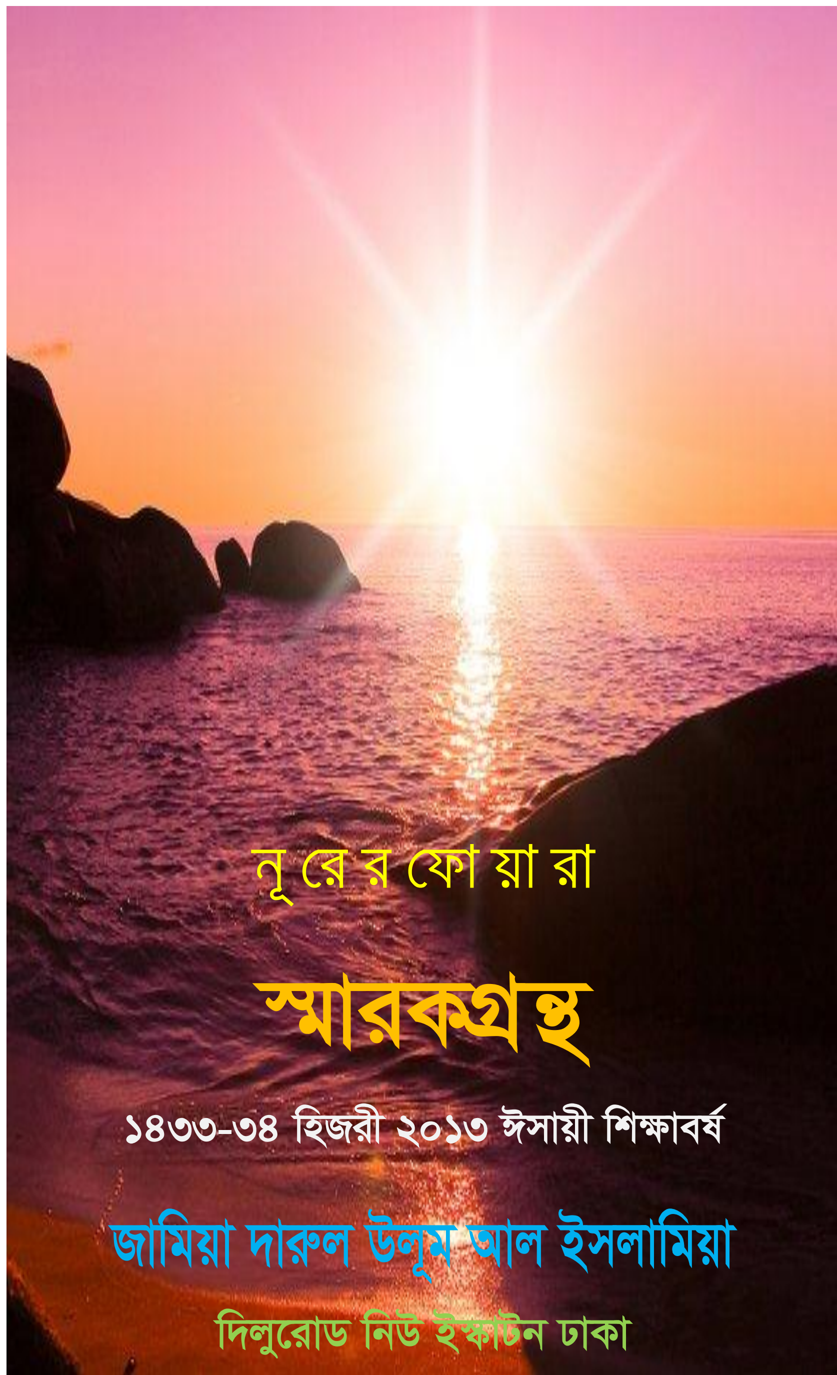

নূ রে র ফো য়া রা
স্মারকগ্রন্থ
১৪৩৩-৩৪ হিজরী ২০১৩ ঈসায়ী শিক্ষাবর্ষ
জামিয়া দারুল উলূম আল ইসলামিয়া
দিলুরোড নিউ ইস্কাটন ঢাকা

নূরের ফোয়ারা

স্মারকগ্রন্থ ১৪৩৩-৩৪ হিজরী ২০১৩ ঈসায়ী শিক্ষাবর্ষ

প্রকাশনা	জামিয়া দারুল উলূম আল ইসলামিয়া দিলুরোড নিউ ইস্কাটন ঢাকা-১০০০
উপদেষ্টা	মাওলানা আবু সাবের আব্দুল্লাহ মাওলানা মুহাম্মাদ যাইনুল আবিদীন
তত্ত্বাবধায়ক	মুফতী সালাহ উদ্দিন
সম্পাদনা	মাওলানা মাসউদুর রহমান মাওলানা আবু বকর মাওলানা আবু সায়েম মাওলানা মোস্তাকিম আলম
প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা	শৈলী প্রিন্টার্স
প্রকাশকাল	মে ২০১৩ ঈসাব্দ, রজব ১৪৩৪ হিজরী, জ্যৈষ্ঠ ১৪২০ বঙ্গাব্দ
শব্দবিন্যাস	কম্পিউটার বিভাগ, জামিয়া দারুল উলূম আল ইসলামিয়া দিলুরোড নিউ ইস্কাটন ঢাকা-১০০০
সহযোগিতা	জামিয়ার ছাত্রবৃন্দ

শুভেচ্ছা মূল্য : তিনশত টাকা মাত্র

মোবাইল: ০১৯২২১০৩৫৪৫ । ইমেইল: jamiadiluroad@gmail.com





সূচীপত্র

বাংলাদেশ কওমী মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ এর সভাপতি, দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী চট্টগ্রাম এর মুহতামিম ও শাইখুল হাদীস

আল্লামা শাহ্ আহমদ শফী দামাত বারাকাতুহুম এর

দুআ ও বাণী

আলহামদুলিল্লাহ, আমি শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি যে, ঢাকার প্রাণকেন্দ্র রমনা নিউ ইস্কাটনের দিলুরোড এলাকায় জামিয়া দারুল উলূম আল ইসলামিয়া নামে একটি দ্বীনের মারকায গড়ে উঠেছে। হোটেল সোনার গাঁ এর সন্নিকটে এবং সম্প্রতি চালু হওয়া হাতিরঝিল প্রকল্পের কোল ঘেঁষে গড়ে ওঠা মাদরাসাটির গুরুত্ব যে কত বেশী তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এ এলাকায় জাগতিক বিবেচনায় প্রসিদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ অনেক বড় বড় প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সে সব প্রতিষ্ঠানের মাঝে গড়ে ওঠা এ মারকাযটি যেন লতাগুল্মের মাঝে বেড়ে ওঠা একটি সুমিষ্ট ফলবৃক্ষ, কাঁটাঘেরা বনে জেগে উঠা এক সুবাসী ফলের বাগান। যে বাগানের মালী হচ্ছেন হক্বের ঝাণ্ডাবাহী নববী আদর্শে আদর্শবান একদল নিষ্ঠাবান উলামায়ে কেরাম।

আমি আরও খুশি হয়েছি যখন জানতে পেরেছি যে, মাদরাসাটি ২০০৪ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এ বছর সর্বোচ্চ শ্রেণী দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত উত্তীর্ণ হয়েছে। এ শ্রেণী চালু করার শুকরিয়া স্বরূপ তারা এ বছরই প্রথম 'নূরের ফোয়ারা' নামে একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করতে যাচ্ছে। যাতে স্থান পেয়েছে দেশের খ্যাতিমান আলেম-উলামা ও ইসলামী গবেষকদের গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ-নিবন্ধ। স্মারকগ্রন্থটি আলেম-উলামা, তালিবে ইলম ও জনসাধারণ সকলের জন্যই উপকারী হবে বলে আমার বিশ্বাস। পাশাপাশি এমন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে একটি দ্বীনী মারকায প্রতিষ্ঠা ও তার সার্বিক সহযোগিতার জন্য এলাকাবাসী ও ধর্মপ্রাণ সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মুবারকবাদ। আল্লাহ তায়ালা সকলকে তার উত্তম বিনিময় দান করুন। আমীন।

বাংলাদেশ কওমী মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ এর সহ-সভাপতি, জামিয়ার শাইখুল হাদীস

আল্লামা নূর হুসাইন কাসেমী দামাত বারাকাতুহুম এর

দুআ ও বাণী

আলহামদুলিল্লাহ, শুনে অত্যন্ত খুশি হলাম যে, জামিয়া দারুল উলূম আল ইসলামিয়ার পক্ষ থেকে দেশের শীর্ষস্থানীয় আলেম ও কলামিস্টদের লেখা নিয়ে 'নূরের ফোয়ারা' নামে একটি বার্ষিক স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করা হচ্ছে। জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে এ ধরনের উদ্যোগ নিশ্চয় প্রশংসার দাবি রাখে। এ জামিয়ায় এ বছরই দাওরায়ে হাদীস (তাকমীল) ক্লাস চালু করা হয়েছে।

তাকমীল ফারেগদের প্রতি আমার বিশেষ নসিহত হল, তোমরা দেশ ও জাতির কল্যাণে নিবেদিত প্রাণ হয়ে কাজ করে যাবে। ফেতনা ফাসাদের এ সময়ে তোমরা যে আদর্শিক শিক্ষা অর্জন করেছ তা প্রচার করার জন্য ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নিতে হবে। বাতিলকে বাতিল হিসাবে চিনে হককে হকের পূর্ণমর্যাদা দিতে হবে। বাতিল কোন দল বা গোষ্ঠী যেন প্রলোভনের বিনিময়ে তোমাদেরকে গ্রাস করতে না পারে সে বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখবে। পৃথিবীর যেখানেই থাকো না কেন আল্লাহর হুকুম ও নবী সা. এর আদর্শকে সবকিছুর উর্ধ্বে তুলে ধরার চেষ্টা করবে। হকের পতাকা তলে নিজেকে আবদ্ধ রাখবে। নিজেদের মধ্যে ব্যক্তিগত ও ফরয়ী বিষয়ে মতভেদ থাকা সত্ত্বেও হক ও হক্কানিয়্যাতের বিষয়ে পরস্পর মিলেমিশে থাকবে। ঐক্যবদ্ধ শক্তি গড়ে তুলে আকাবির ও আসলাফের নির্দেশিত পথে বাতিলের মোকাবেলা করবে। জীবন যাপনের সকল ক্ষেত্রে গুনাহ বর্জন করে চলবে। শেষ রাতে আল্লাহর রহমতের দুয়ারে কড়া নাড়বে। বিগত দিনের কার্যাবলীর ভুলের ক্ষমা ও আগামী দিনের সকল কার্যক্রম সুশৃঙ্খলভাবে পূর্ণ করার লক্ষ্যে শেষ রাতে আল্লাহর দরবারে রোনাজারীর অভ্যাস গড়ে তুলবে। একজন কামেল বুজুর্গের সংশ্রবে থেকে কিছুদিন মুজাহাদা করত নিজের মধ্যকার বাতেনী রোগ চিহ্নিত করে তা থেকে পরিত্রাণ লাভ করবে। জীবনের প্রতিটি নকল ও হরকতের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে মনে রাখবে যে, আল্লাহ আমাকে দেখছেন- যদিও দেখার মত যোগ্য চোখ না থাকার কারণে আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি না। তাই আল্লাহকে দেখতে পাই এমন যোগ্য চোখ অর্জনে নিজেকে প্রস্তুত করবে। আল্লাহ সকলকে এর উপর আমল করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

জামিয়া দারুল উলূম আল ইসলামিয়া দিলুরোড মাদরাসার স্বনামধন্য মুহতামিম

মুফতী সালাহ্ উদ্দিন দা.বা. এর

দুআ ও বাণী

ইসলাম শান্তির ধর্ম। ইসলামী শিক্ষা মানুষকে ইহকালীন ও পরকালীন শান্তি ও মুক্তির দিক নির্দেশনা দান করে। ইসলামী শিক্ষাই পারে জাতিকে একটি পূর্ণাঙ্গ ও আদর্শ সমাজ উপহার দিতে। যে যাই বলুক, মূলত আমাদের দেশের কওমী মাদরাসাগুলো এ দায়িত্বই সুচারুরূপে আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে।

আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের জামিয়া দারুল উলূম আল ইসলামিয়াও সে দায়িত্ব পালনে মেহনত ও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। জামিয়ায় শিক্ষারত ছাত্রদের আমরা আদর্শ ও যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করত নিরলস সাধনা অব্যাহত রেখেছি। আদর্শ সমাজ গঠনে জনসাধারণসহ দেশের সকল মানুষকে শামিল করতে আমরা এই প্রথম একটি জাতীয় উদ্যোগ নিয়েছি। দেশের শীর্ষ পর্যায়ের আলেম ও গবেষকদের লেখা সম্বলিত 'নূরের ফোয়ারা' নামে একটি বার্ষিক স্মারকগ্রন্থ আমাদের এ জামিয়া থেকে প্রকাশ পেতে যাচ্ছে। এ সংবাদটি আমাকে সীমাহীন আনন্দ দিচ্ছে। আনন্দের এ মুহূর্তে জামিয়ার শিক্ষকদেরকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই, যারা জামিয়াকে উন্নতির শীর্ষস্থানে পৌঁছানোর জন্য নিষ্ঠার সাথে মেহনত করে যাচ্ছেন। কৃতজ্ঞতা জানাই এলাকার সর্বস্তরের প্রতিটি মানুষকে যারা সার্বিক সহযোগিতার অমলিন চাদরে জামিয়াকে আজ অবধি আমাদের জড়িয়ে রেখেছেন।

আমার হৃদয়ের স্পন্দন প্রাণপ্রিয় ছাত্রদেরকেও স্মরণ করছি। যারা অদম্য স্পৃহা ও কঠোর অধ্যবসায়ের মাধ্যমে জামিয়ার লেখাপড়া থেকে শুরু করে উন্নতির প্রতিটি অঙ্গনে অসামান্য ভূমিকা রেখে জামিয়ার সুনাম প্রচারে সহায়তা করছে। ছাত্রভাইদের প্রতি আমার হৃদয়ের আকুতি তোমরা দ্বীনের যথাযথ শিক্ষা লাভ করে দেশ ও জাতি গড়ার মহৎ কাজে আত্মনিয়োগ করবে। দেশ ও জাতিকে গড়তে হলে সবার আগে নিজেকে যোগ্য হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। তাই ইলমী সাধনার পাশাপাশি আমলী মুজাহাদার প্রতিও নিষ্ঠার সাথে মনোনিবেশ করতে হবে। শয়তানি, ধোঁকা ও নোংরা সংস্কৃতি এবং বাতিলের অশুভ থাবা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। দেশ ও জাতিকে এ বিষয়ে সচেতন করতে হবে। যে জামিয়া তোমার আদর্শ জীবন গড়ায় কিছুটা হলেও অবদান রেখেছে প্রিয় সেই জামিয়াকে তোমাদের মকবুল দোয়ার মধ্যে শামিল রাখবে। পরিশেষে এ স্মারকগ্রন্থটি ছাত্র, শিক্ষক, আলেম ওলামা, জনসাধারণ সকলের জীবনে প্রভূত কল্যাণ বয়ে আনুক। বুক ভরা এই আশা ব্যক্ত করে সকলের কাছে দোয়া কামনা করছি। আমীন।

সম্পাদকীয়

'পড়ুন আপনার প্রভুর নামে' মন্ত্রের ভেতর দিয়ে আবির্ভাব যে ইসলাম ধর্মের। তার ইতিহাস জুড়ে আলো ছড়াবে পাঠশালার বিপুল প্রদীপ– এই তো স্বাভাবিক। আলহামদুলিল্লাহ ! আমাদের আত্মার শ্রেষ্ঠ আত্মীয় হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনার মসজিদের পবিত্র প্রাঙ্গণে সর্বপ্রথম আদর্শিক পাঠশালার যে বীজ বুনেছিলেন– এই উম্মত অফুরন্ত ত্যাগ আর অসীম ভালোবাসায় আজ অবধি জিইয়ে রেখেছে পাঠশালার সে পবিত্র বৃক্ষটি। ঘামে-রক্তে, গভীর রাতের তপ্ত অশ্রু সিঞ্চনে সে বৃক্ষ এখনো সজীব এবং বিস্তীর্ণ শীতল ছায়াময়। পাক মদীনা থেকে অবহেলিত অভাবী আফ্রিকা পর্যন্ত সমুজ্জ্বল এই বৃক্ষের সারি। ইউরোপ আমেরিকা আর ভারত পাকিস্তান বাংলাদেশ– সর্বত্রই এর ছায়া জননীর শীতল আঁচল। এই আঁচল-তলে শয়নে সমবেত উম্মাহর আদর্শ দুলালদল !

মুসলিম উম্মাহ বিশ্বাস করে– মানব জাতির স্বতন্ত্রবিকাশ, আবেগ দর্শন ও মননের সরল চর্চা ও লালন এবং 'মানুষ' হিসাবে মানুষের উন্নতি– নবীজি প্রতিষ্ঠিত এই পাঠশালাকে উপেক্ষা করে সম্ভব নয়। সম্ভব নয় বলেই এই আদর্শ জনগোষ্ঠী পৃথিবীর যেখানেই বসতি পেতেছে সেখানেই গড়ে তুলেছে নয়ন শীতলকরা মসজিদ আর আত্মা আলোড়িত পাঠশালা। এ দেশের হাজার হাজার মাদরাসা এবং আমাদের জামিয়া দারুল উলূম আল ইসলামিয়া দিলুরোড– সেই একই স্বর্ণসূত্রে গ্রথিত। ২০০৪ সালে এর শুভসূচনা। এখন ২০১৩ সাল। প্রতিষ্ঠার নবম বছরে দাওরায়ে হাদীস ! কী ভাষায় শুকরিয়া জানাব মহান করুণাময় রাব্বুল আলামীনের ! শুধু এইটুকু বলব– হে আল্লাহ ! তোমার হাবীবের হাতে রোপিত বিশ্বময় এই সবুজ শান্ত শান্তিসমাহিত পাঠশালাগুলোর সাথে আমাদের পাঠশালাটিও কবুল করে নাও। কবুল করে নাও এর প্রতিষ্ঠায় নির্মাণে অগ্রযাত্রার সঙ্গী-বন্ধুগণকে।

দাওরায়ে হাদীস– হাদীসের ক্লাস। মাদরাসাশিক্ষার এক মর্যাদাপূর্ণ স্তর। এই স্তর অতিক্রম করে সমাজজীবনে পদার্পণ করতে যাচ্ছে একদল তরুণ। আল্লাহর দ্বীন-ই তাদের চর্চা ও অনুশীলনের প্রধান বিষয় হোক– এই প্রত্যাশায় স্মারক এই 'নূরের ফোয়ারা'। সরলবাক্যে স্বীকার করছি– এই স্মারকগ্রন্থে যেমন খ্যাতিমান বরেণ্যদের লেখা আছে তেমনি আছে উদীয়মান তরুণদের লেখা। আর পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে আমাদের অযোগ্যতার ছাপ। তারপরও গুণীজনদের উদার স্বভাব আমাদের সাহস যুগিয়েছে এই স্মারক সম্পাদনায়। সকল সুন্দর আল্লাহর পক্ষ থেকে আর ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় আমাদের। আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করছি। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি তাঁদের যারা অসামান্য ব্যস্ততার মধ্যেও আমাদের লেখা দিয়ে, কথা দিয়ে, দোয়া দিয়ে কৃতার্থ করেছেন। আল্লাহ দয়াময় আমাদের সবাইকে কবুল করুন। আমীন।

উস্তাযুল আসাতিযা বিশিষ্ট ইসলামী শিক্ষাবিদ

শাইখুল হাদীস হযরত আল্লামা কাজী মুতাসিম বিল্লাহ দামাত বারাকাতুহুম এর

বিশেষ নসিহত

সম্মানিত উলামায়ে কেরাম !

১. আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াত তথা উলামায়ে দেওবন্দ এর আকীদা ও মাসলাক-মাশরাবের উপর অটল থাকবেন।

২. জীবনের সকল ক্ষেত্রে সুন্নতের অনুসরণ করবেন।

৩. তাআল্লুক মাআল্লাহ হাসিল করার জন্য একজন হক্কানী ও মুত্তাবিয়ে সুন্নত আহলে দিল বুযুর্গের সাথে ইসলাহী সম্পর্ক রাখবেন।

৪. নিজেকে আজীবন প্রকৃত তালিবে ইলম মনে করে ইলমী তারাক্কীর জন্য কুতুববীনীতে মশগুল থাকবেন।

৫. আখলাকে হাসানা দ্বারা নিজেকে সজ্জিত রাখবেন। মন্দ আখলাক বিশেষত নিজেকে বড় মনে করা, অন্যের দোষ দেখা, অপরের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করা এবং পরদোষ চর্চা থেকে নিজেকে রক্ষা করবেন।

৬. একজন আলেমে দ্বীন হিসাবে যুগের চাহিদা ও প্রয়োজন উপলব্ধি করে দ্বীনের সহীহ ব্যাখ্যা উম্মতের সামনে তুলে ধরবেন।

৭. দ্বীনকে সমুন্নত রাখার উদ্দেশ্যে মুজাহাদা ফী সাবীলিল্লাহের অভ্যাস গড়ে তুলবেন।

৮. খৃষ্টান মিশনারি, ইসলাম বিরোধী এনজিও , কাদিয়ানী, শিয়া, লামাযহাবী, বেদআতী ও মওদূদী মতবাদের গুমরাহী সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করে উম্মতকে সঠিক পথের দিশা দিবেন।

৯. নিজ নিজ এলাকায় মসজিদ ও মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করবেন এবং জনগণকে মসজিদ-মাদরাসামুখী করার চেষ্টা করবেন।

১০. ছাত্রদের শিক্ষার মান উন্নয়নের পাশাপাশি তাদের আমল-আখলাক গঠনের প্রতি বিশেষ নজর রাখবেন।

১১. মাদরাসার তালিবে ইলম ও মাদরাসার মাল-আসবাবকে কওম ও মিল্লাতের আমানত মনে করে এর যথাযথ হেফাজত করবেন।

১২. মুসলিম জনসাধারণকে হক্কানী পীর-মাশায়েখ এবং দাওয়াত ও তাবলীগের সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য সচেষ্ট থাকবেন।

১৩. তালিমী মুরুব্বী ও শায়েখের পরামর্শ অনুযায়ী সব কাজ আঞ্জাম দিবেন।

নেয়ামতের শুকরিয়া ও চোখের হেফাজত

শাইখুল হাদীস আল্লামা আব্দুল হাই পাহাড়পুরী দামাত বারাকাতুহুম

﴿ مَّا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴾

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে শাস্তি দিয়ে কী করবেন যদি তোমরা শুকরিয়া আদায় কর এবং ঈমান আন। আল্লাহ তায়ালা কৃতজ্ঞ ও সর্বজ্ঞ। [সূরা নিসাঃ ১৪৭]

আমার পীর ও মুরশিদ হযরত হাফেজ্জী হুজুর রহ. আমাকে প্রশ্ন করলেন শুকর এবং সবর এই দুইটির মধ্যে আল্লাহর কাছে চেয়ে নেওয়ার জিনিস কোনটি? আমি বললাম হুজুর, আপনি বলেন, আমরা উপস্থিত যারা আছি শুনব। হুজুর বললেন, সবর চাওয়ার জিনিস নয়, শুকর হল চাওয়ার জিনিস। আমাদেরকে আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে হবে এবং বিপদ হলে সবর করতে হবে। তবে সবর চেয়ে নেওয়ার জিনিস নয়। কারণ সবর চাওয়ার অর্থ মুসিবত চাওয়া। আর শুকর চাওয়ার অর্থ নেয়ামত চাওয়া। তাই আল্লাহর কাছে নেয়ামত চাইব।

আল্লাহ আমাদেরকে চাওয়া ছাড়াই যে নেয়ামত দিচ্ছেন সেগুলোর শুকরই তো আমরা আদায় করি না। তারপরও নেয়ামত চাওয়ার জিনিস। কারণ আল্লাহর নেয়ামতের কোন শেষ নেই। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, তোমরা আল্লাহর নেয়ামত গণনা করে শেষ করতে পারবে না। [সূরা ইবরাহিম : ৩৪]

একটি হচ্ছে অর্জন অপরটি হচ্ছে বর্জন। দ্বীনের জন্য দুটিই অপরিহার্য। বর্জনের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে চোখের হেফাজত। আমাদেরকে চোখের হেফাজত করতে হবে। চোখ যে কত বড় নেয়ামত তা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন, আল্লাহ তায়ালা চোখের খিয়ানত ও অন্তরের গোপন বিষয় সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। [সূরা গাফির : ১৯]

যেই চোখ দিয়ে আমরা কুরআন পড়ি, হাদীস পড়ি সেই চোখ দিয়ে খিয়ানত করি কিভাবে? তাই আমরা প্রতিজ্ঞা করি আমরা চোখের খিয়ানত করব না।

আমার ওয়ালিদ সাহেব রহ. এর কথা। একদিনও তাকে প্রয়োজন ছাড়া কোন দিকে দৃষ্টি দিতে দেখিনি। সবসময় নিচের দিকে তাকিয়ে হাঁটতেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে জান্নাতবাসী করুন। হযরত হাফেজ্জী হুজুর রহ. মাগরিবের পর আওয়াবীন পড়তেন। আওয়াবীনে তিন পারা কুরআন তেলাওয়াত করতেন। আর শেষ রাতে তাহাজ্জুদে উঠতেন। তাহাজ্জুদেও তিন পারা কুরআন তেলাওয়াত

করতেন। এছাড়াও বিভিন্ন সময় মুখস্থ কুরআন পাঠ করতেন। তবে যখন ঘরে থাকতেন তখন দেখে দেখে তেলাওয়াত করতেন। কারণ, কুরআন পড়ার এক সওয়াব আর দেখে পড়ার ভিন্ন সওয়াব।

হযরত হাফেজ্জী হুজুর রহ. ১৯৭৫ ইং সালে হজ্বে যাওয়ার কয়েক দিন আগে আমাকে হুজুরের কামরায় ডাকলেন। আমি উপস্থিত হলাম। হুজুর আমাকে প্রশ্ন করলেন, মৌলভী আব্দুল হাই, আপনার কি আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট আছে? আমি বললাম, উমর আলী সাহেবের ভাতিজা আমাকে বলেছে, 'আমার কাছে পাসপোর্ট করার ভাল ব্যবস্থা আছে। আপনি যদি পাসপোর্ট করেন তাহলে আমাকে বলবেন।' আমি বললাম, 'আমার তো টাকা পয়সা নেই। আমি পাসপোর্টের খরচ কিভাবে দিব।' তিনি বললেন, 'টাকা পয়সা যা লাগে আমিই খরচ করব, পরে আপনার যখন সামর্থ্য হবে দিয়ে দিবেন।' তার মাধ্যমে আমার পাসপোর্ট প্রায় হয়ে গিয়েছে।

হুজুর বললেন আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি এ জন্য যে, দশ ব্যক্তির হজে থাকাসহ যাবতীয় খরচের ব্যবস্থা আমার হাতে এসেছে। দশ জনের মধ্যে নয়জন আমরা ঠিক হয়েছি। শুধু দশম ব্যক্তি বাকী। আমার ইচ্ছা হল আপনার যদি আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট থাকে আপনাকে আমি নেব। আমি খুব খুশি হলাম এবং বললাম, পাসপোর্ট তো ছিল না, তবে হয়ে গেছে।

হুজুর বললেন, একটি কথা, বুখারী শরীফ প্রথম ১৫ পারা যখন আমি পড়িয়েছি তখন শেষ ১৫ পারা পড়াইনি। আবার শেষ ১৫ পারা যখন পড়িয়েছি তখন প্রথম ১৫ পারা পড়াইনি। আমার মনের একটি আগ্রহ, একজন ছাত্র হলেও আমার জীবনে তাকে আমি ৩০ পারা বুখারী শরীফ পড়াব। তাই আপনি যদি আমার সাথে যান তাহলে এই শর্তে যেতে হবে যে, বুখারী শরীফ ৩০ পারা আমার কাছে পড়বেন। আমি খুশিতে বাগেবাগ হয়ে গেলাম। আমি বললাম, আমি এই নেয়ামতের শুকরিয়া কিভাবে আদায় করব। আপনি বুখারী শরীফ পড়াবেন, আমি পড়ব। কোথায় পড়ব? মক্কা-মদিনায়। আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলাম এবং বললাম, আমি আপনার সাথে যাব এবং পূর্ণ বুখারী শরীফ ৩০ পারা আপনার নিকট পড়ব। অবশেষে হুজুরের সাথে আমি হজ্বের সফরে গেলাম। হুজুর আমাকে প্রথম মক্কায় পড়ানো শুরু করলেন। মক্কায় ১৫ পারা শেষ করলেন। তার পর চলে গেলেন মদীনায়। সেখানে গিয়ে বাকী ১৫ পারা শেষ করলেন। এভাবে মক্কা ও মদীনায় পূর্ণ বুখারী শেষ করলেন।

কাবা শরীফের পাশেই একটি জায়গার নাম উম্মে হানী। যেটি মূলত হযরত উম্মে হানী রা. এর ঘর ছিল। যে ঘরে রাসূল সা. মক্কা বিজয়ের সময় প্রবেশ করে

নামাজ আদায় করেছিলেন। হাফেজ্জী হুজুর রহ. যখনই হজে যেতেন, তখন এখানেই ইবাদত করতেন। তাই হুজুর আমাকে এখানেই বুখারীর দরস দান করেন।

একদিনের ঘটনা। একদিন এশার নামাজের পর হুজুর আমাকে বললেন, মৌলভী আব্দুল হাই, আমি এখন বাসায় যাব না, তুমি বাসায় চলে যাও। আমি বললাম হুজুর কেন যাবেন না?। হুজুর বললেন, আমি কিছু সময়ের জন্য মাদরাসায়ে সউলতিয়ায় যাব। সেখানে আমার এক মুহতারাম উস্তাদ আসবেন। শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা জাকারিয়া রহ.। আমি বললাম, হুজুর আমাকে আপনি এই সৌভাগ্য অর্জন করতে দিবেন না। আমাকে ফেলে যাবেন বাসায়। আর আপনি হযরতের সাথে দেখা করতে যাবেন। আমি আমার জীবনে হযরতকে দেখিনি। আমিও আপনার সাথে যাব। হযরত আমাকে তাঁর সাথে নিয়ে গেলেন। মকতবের একজন ছাত্র উস্তাদের সামনে যেভাবে বসেন, ঠিক সেভাবে হুজুর শাইখুল হাদীস সাহেবের সামনে বসলেন। উস্তাদের সামনে কেমন আদব ও সম্মান রক্ষা করতে হয় তা সেদিন দেখার মত বিষয় ছিল। হুজুর নিজেকে মিটিয়ে দিলেন। এই নেয়ামত আজ আর অবশিষ্ট নেই, চলে গেছেন। আল্লাহ তায়ালা হযরতের কবরকে জান্নাতের বাগিচা বানিয়ে দিন। আমীন।

আপনাদের মাদরাসার অবস্থা শুনলাম। অনেক ভাল লাগল। দাওরায়ে হাদীসের দরস এখানে শুরু হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা এই দরস কিয়ামত পর্যন্ত জারী রাখুন। আমীন।

[জামিয়া দারুল উলূম আল ইসলামিয়া দিলুরোড নিই ইস্কাটন ঢাকা- এর প্রাঙ্গণে ২২.০১.২০১৩ ইং তারিখে আসাতিযা ও তালিবে ইলমদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বয়ান]

মাতৃভাষা চর্চায় কওমী মাদরাসা

মাওলানা আব্দুল জাব্বার জাহানাবাদী

জামিয়া দারুল উলূম আল ইসলামিয়া দিলুরোড ঢাকা থেকে 'নূরের ফোয়ারা' নামে একটি স্মারকগ্রন্থ বের করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। খবরটি জেনে খুশি হলাম। আমি এ মাদরাসায় একাধিক বার গিয়েছি। মাদরাসার সার্বিক অবস্থা আমাকে আনন্দ দিয়েছে। বিশেষকরে ছাত্রদের ইলমী ও আমলী পরিবেশ খুবই সন্তোষজনক। অধিকাংশ তরুণ আলেমদের মেহনতে একটি ব্যতিক্রম প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। আরবী সাহিত্যের প্রতি বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। মাতৃভাষা বাংলা চর্চায় উস্তাদদের নিবিড় পরিচর্যা ও ছাত্রদের উদ্যমী নিরলস সাধনা অবশ্যই প্রশংসার দাবী রাখে।

যেহেতু কুরআন হাদীসে মাতৃভাষার প্রতি সমধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। আমাদের দেশের রাষ্ট্রভাষা ও মাতৃভাষা বাংলা। আমাদের কালচারাল ভাষাও বাংলা ভাষা। যদিও মর্যাদার দিক দিয়ে কুরআনের ভাষার মর্যাদা এক নম্বরে এবং অন্য ভাষার মর্যাদা দুই নম্বরে। কিন্তু প্রয়োজনের দিক দিয়ে মাতৃভাষার গুরুত্ব অনেক বেশী।

অতএব, প্রয়োজনের দিক দিয়ে বাংলা ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। আমরা চব্বিশ ঘণ্টাই বাঙলা ভাষায় তথা মাতৃভাষায় কথা বলি। চিঠিপত্র আদান প্রদান করি। পত্রিকার বিবৃতি দেই।

এ দেশে দীর্ঘ সাতশত বছর রাষ্ট্রভাষা ছিল ফারসী। এ সময়ে মুসলমান শাসকরা বাংলা ভাষার উৎকর্ষ সাধনে যথেষ্ট সহায়তা করেছেন। অনুদান দিয়েছেন। ফলে, হিন্দু-মুসলমান সকলে মাতৃভাষা বাংলা চর্চায় ব্রতী হন। তখন বাংলার সাহিত্য ছিল পদ্য সাহিত্য তথা পুঁথি সাহিত্য। এ সাহিত্যের চর্চা ছিল ব্যাপক। তখন পুঁথি সাহিত্য ছাপাও হত।

কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, কওমী উলামায়ে কেরাম উর্দু মিডিয়ামে পড়াশুনা করেছেন। তখন বাংলা ভাষার প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে অনেক দূরে সরে গিয়েছেন। তবে আনন্দের বিষয় যে, কওমী উলামায়ে কেরাম এখন মাতৃভাষার প্রতি যথেষ্ট সজাগ ও সতর্ক হয়েছেন। বেফাক মাতৃভাষা বাংলার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে। ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত বাংলা ভাষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তবে শীঘ্রই ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য বাধ্যতামূলক করা হবে।

যা হোক, আমার আরয হলো- কুরআনে কারীমের সর্বপ্রথম ওহী হল 'ইকরা' ও 'আল্লামা বিল কলম'। এক কথায় বলা যায় , 'পড়, জ্ঞান আহরণ কর এবং জ্ঞান সংরক্ষণ ও বিতরণে কলম ধর'। কলম দ্বীন হিফাজতের ও প্রচারের জন্য সবচেয়ে মজবুত ও গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার।

আলেম হচ্ছেন দ্বীনের সৈনিক ও কলম হচ্ছে তার হাতিয়ার। সেমতে কওমী মাদরাসার প্রতিজন শিক্ষক ও ছাত্রকে ক্ষুরধার লেখনীর অধিকারী হতে হবে। মাদরাসা কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে যথাযথ ভূমিকা রাখতে হবে। সবশেষে মাদরাসা কর্তৃপক্ষ এবং ছাত্র-শিক্ষক সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

লেখক: মহাসচিব, বাংলাদেশ কওমী মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড 'বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ'।

সাক্ষাৎকার

ইসলামী রাষ্ট্র ও রাজনীতি

হযরত মাওলানা কাজী মু'তাসিম বিল্লাহ দা. বা.

আবু সাবেরঃ আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ

কাজী সাহেবঃ ওয়ালাইকুমুস সালাম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আবু সাবেরঃ আজ আমরা হুজুরের খেদমতে হাজির হয়েছি বিশেষ কিছু প্রশ্নের সমাধান জানার জন্য। বর্তমান প্রেক্ষাপটে তা জানা এবং অন্যদেরকে জানানো একান্ত জরুরী। আশা করি হুজুর আমাদের আর্জি পূরণ করবেন।

কাজী সাহেবঃ এখন শরীরও ভালো না। দুনিয়াতে থেকেও আছি কবরে। তবু ইলমের আমানত আপনজনদের হাওয়ালা করার নিয়তে কিছু বলার চেষ্টা করবো, ইনশাআল্লাহ।

আবু সাবেরঃ আল্লাহ তায়ালা আমাদের মজলিসকে কবুল করুন, উম্মতের জন্য ফায়দামন্দ বানান। আমীন।

হুজুরের কাছে আমাদের প্রথম জানতে চাওয়া হলো, ইসলাম পূর্ণাঙ্গ দ্বীন-একথার মতলব কী?

কাজী সাহেবঃ জিন্দেগীর সকল স্তরে যদি কেউ ইসলামের বিধান অনুসরণ করতে চায়, তাহলে সে ইসলামের বিধান উপস্থিত পাবে। ইসলামের প্রশস্ততা এতই ব্যাপক। এই হলো ইসলাম পূর্ণাঙ্গ দ্বীন হওয়ার অর্থ।

আবু সাবেরঃ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র সকল স্তরেই সে ইসলামের বিধান উপস্থিত পাবে?

কাজী সাহেবঃ হাঁ, শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ. এভাবে বলেছেন, তাহযীবে আখলাক, তাদবীরে মানযিল, সিয়াসতে মুদুন ইত্যাদি।

আবু সাবেরঃ ইসলাম একটি অসাম্প্রদায়িক ধর্ম-একথার তাৎপর্য সম্পর্কে একটু বলুন।

কাজী সাহেবঃ ধর্মের নামে কারো উপর অপঘাত করার সুযোগ নেই। লা-ইকরাহা ফিদ্দীন। ইসলাম গ্রহণে জবরদস্তি নেই।

আবু সাবেরঃ জিহাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমাদের কিছু বলুন।

কাজী সাহেবঃ লি তাকূনা কালিমাতুল্লাহি হিয়াল উলইয়া। যেন আল্লাহর কালিমা বুলন্দ হয়। রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব যেন হয় ইসলামের, আল্লাহর দ্বীনের।

আবু সাবেরঃ সত্য ধর্ম হিসেবে ইসলামের বিজয় ও কর্তৃত্বের গুরুত্ব কতটুকু?

কাজী সাহেবঃ অবশ্যই মাতলুব। অবশ্যই কাম্য।

আনোয়ার শাহঃ জিহাদ ও যুদ্ধের মাঝে পার্থক্য-রেখা টানা যায় কিভাবে?

কাজী সাহেবঃ জিহাদ হলো দাওয়াত ও তাবলীগের চূড়ান্ত রূপ। আর যুদ্ধ নিছক স্বার্থগত আধিপত্য বিস্তারের একটি প্রক্রিয়া।

আনোয়ার শাহঃ বর্তমানে যে জিহাদকে সন্ত্রাস বলা হচ্ছে?

কাজী সাহেবঃ এটা একদম গলত কথা। অবশ্য যারা জিহাদ করার দাবী করছে, তারা ইসলামের নীতি অনুসরণ করছে কি না তা ভাবার বিষয়। যেমন জিহাদের জন্য আমীর প্রয়োজন। 'কুওয়াতে কাহেরা' প্রয়োজন। অনেক ক্ষেত্রে এগুলি থাকে না। ফলে বিচ্ছিন্ন শক্তি প্রয়োগ ব্যর্থ হয় এবং বিশৃঙ্খলার রূপ পরিগ্রহ করে। সমস্যা আরও প্রকট হয়।

আবু সাবেরঃ ইসলামী খেলাফত বা ইসলামী সিয়াসত ও কাযা-এগুলো ইসলামী শরীয়তের অংশ, এ ব্যাপারে আপনার মতামত বলুন?

কাজী সাহেবঃ অবশ্যই এগুলো শরীয়তের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এতে কোনো সন্দেহ নেই।

আবু সাবেরঃ তাহলে এখন খেলাফত ও কাযা প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের দ্বীনী ফরীজা কী? ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা, খেলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়াহ কায়েমের চেষ্টা করা, ইসলামের আইন ও বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা, যেন আমাদের আদালতগুলো ইসলাম অনুসারে চলে, তার জন্য সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্টা করা সকলের দায়িত্ব বলে মনে করেন কি?

কাজী সাহেবঃ মাওলানা মাহমুদ মাদানী মাদ্দা যিল্লুহুল আলীর সাথে এক হিন্দু পণ্ডিতের বিতর্ক হয়েছিল। হিন্দু পণ্ডিত প্রশ্ন করলো, তোমরা যখন সংখ্যালঘু থাক, তখন সেক্যুলারিজমের খুব বড় প্রবক্তা হয়ে যাও। দুর্বল অবস্থায় এই মতবাদের পক্ষ নাও। কিন্তু তোমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলে ইসলামী খেলাফতের দাবী তোলো, কারণ কী? উত্তরে মাওলানা জিহাদ কাকে বলে বুঝাতে গিয়ে বললেন, আমি যে জিনিসকে হক মনে করছি সেটার দাওয়াত ও তাবলীগ আমি করে যাবো। আল্লাহও আমাকে এর হুকুম করেছেন। আমরা এর দাওয়াতকে উম্মতের খায়েরখাহী মনে করি এবং প্রতিবেশী ভাই ও বোনকে তাতে শরিক করে নেওয়া কল্যাণকর বলে বিশ্বাস করি। এখন এই করতে গেলে কেউ যদি আমার গলা টিপে

ধরে, তাহলে আমিও শক্তি প্রয়োগ করে ঐ হাত সরিয়ে দিতে বাধ্য হবো। এমনি আমি কারো উপর হস্ত উত্তলন করতে চাই না। আমি শান্তিপূর্ণভাবে দাওয়াতে ইসলামের কাজ করতে চাই। তুমি এসে আমার গলা টিপে ধরবে, তাহলে আমি শক্তি প্রয়োগ করে ঐ হাত সরিয়ে দিবো। সরাতে গিয়ে তোমার হাত ভাঙলে ভাঙ্গুক, থাকলে থাকুক। এটা এক প্রকার জিহাদ। এভাবে দাওয়াতের মাধ্যমে যদি মুসলমান মেজরিটি হয়ে যায়, তাহলে তো বর্তমান যুগের গণতন্ত্র অনুসারেই ইসলামের পক্ষে ভোট এসে যাবে। তখন স্বাভাবিকভাবে ইসলামের আইন ও কাযা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। এভাবে আমরা খেলাফতের দাবি তুলে থাকি।

আবু সাবেরঃ আমাদের বাংলাদেশে তো মুসলিম মেজরিটি আছে। কাজেই আমাদের জন্য, আমাদের উলামায়ে কেরাম ও সাধারণ মুসলমানদের জন্য একথা বলা বা চেষ্টা করা একান্ত কর্তব্য যে, এদেশে আমরা খেলাফত কায়েম করতে চাই। আইন যেন ইসলামের কাযা অনুসারে হয় এজন্য আমরা আওয়াজ তুলতে চাই। আপনি বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে এটাকে শরঈ দায়িত্ব বলে মনে করেন কি?

কাজী সাহেবঃ আসল সমস্যাটা হলো মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী দলটি বিভিন্নভাবে এই মতের প্রসার ঘটিয়ে ফেলেছে যে, বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা হয়েছে ধর্মনিরপেক্ষ চেতনার উপর। সেক্যুলারিজমের উপর।

আবু সাবেরঃ স্বাধীনতা সংগ্রাম তো হয়েছে জুলুমের বিরুদ্ধে। জালিমের বিরুদ্ধে। মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য। তখন ওরা জালিম ছিল। আমরা মাজলুম ছিলাম।

আনোয়ার শাহঃ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বলতে আমরা বুঝি যে, দেশটা পরাধীনতা থেকে স্বাধীন হোক। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা এজন্য লড়েছেন যে, এদেশে একটি শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা কায়েম হবে। এটাইতো ছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। কারণ, মুক্তিযুদ্ধের কোনো শ্লোগানেই ধর্মনিরপেক্ষতার কথা ছিল না। এটা এসেছে স্বাধীনতার পর এবং তা রাশিয়ার প্রভাবে এসেছে। মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ও আওয়ামী লীগ উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য, সাবেক প্রধানমন্ত্রী মিজানুর রহমান চৌধুরী বলেছেন, বামপন্থীরা শেখ সাহেবের উপর সওয়ার হয়ে আমাদের উপর ধর্মনিরপেক্ষতা চাপিয়ে দিয়েছে। তারা বুঝিয়েছে, রাশিয়ার সমর্থন না থাকলে আমাদের দেশ স্বাধীন হওয়া কঠিন ছিল। এজন্য ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা এবং ধর্মহীন রাশিয়ার শক্তিশালী সমর্থনের কারণে যেহেতু দেশ স্বাধীন হয়েছে, তাই রুশপন্থী বামেরা ধর্মনিরপেক্ষতা আমদানি করতে পেরেছে। এবং তারা শেখ সাহেবকে মানিয়ে নিতেও সমর্থ হয়েছে। এ কারণে ঐ সময় আলেমগণ এর এক প্রতিবাদ করেছিলেন। তাছাড়া যে ছয়দফা দাবীর প্রেক্ষিতে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে তাতেও ধর্মনিরপেক্ষতার কথা নেই।

আহমদ মায়মূনঃ সংবিধান তৈরি হয়েছে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর। সেখানেই এই বিষয়টা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আবু সাবেরঃ পাকিস্তানের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী মুফতী মাহমুদ রহিমাহুল্লাহু বলেছেন, বাঙ্গালী মাজলুম হ্যায়। তার এই কথার মাঝেই মুক্তিযুদ্ধের কার্যকারণ নিহিত আছে। আমাদের যুদ্ধ ছিল জুলুমমুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য। ধর্মহীনতার জন্য নয়। তাছাড়া আওয়ামী লীগের সত্তরের নির্বাচনী ইশতেহারে ইসলাম বিরোধী কোন আইন করা হবে না - এ ধারাটির কারণেই তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করেছিল। আর ইসলামের পক্ষের এ জনমত উপেক্ষা করার কারণে একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল।

কাজী সাহেবঃ হাঁ, এরকমই হওয়ার কথা।

আবু সাবেরঃ সে যাই হোক এই দেশের মেজরিটি হলো মুসলমান। কাজেই মুসলিম মেজরিটির দেশে এখন ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার দাবি করা এবং খেলাফতের জন্য চেষ্টা করা অসঙ্গত হবে না। এটা যে আমাদের ঈমানী দায়িত্ব সেতো আপনি আগেই বলেছেন। এখন সেটা কীভাবে হবে, সে সম্পর্কে বলুন।

কাজী সাহেবঃ সেটা দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে হবে।

আবু সাবেরঃ দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে তো নামায-রোযাই শুধু হবে। প্রচলিত দাওয়াতে তো দ্বীন প্রতিষ্ঠার সামগ্রিক রূপরেখা নেই। প্রচলিত পন্থায় পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের দাওয়াত দেওয়াও হয় না।

কাজী সাহেবঃ কেন? শুধু নামায ও রোযার হবে কেন? দাওয়াত পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের হবে। সবটার দাওয়াত দিতে হবে। যাদের দাওয়াত অতটুকুতে সীমাবদ্ধ এবং ঐভাবেই যারা দাওয়াতের কাজ করে তারাই তাবলীগী, অন্যরা নয়, এটা কে বললো? অবশ্য এতটুকু যারা করছে তারাও কম করছে না। এটাও আমাদের কাজ। আমরা একে খাটো করে দেখতে চাই না।

আবু সাবেরঃ তার মানে হুজুর কি বুঝাতে চাচ্ছেন যে, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য জনমত গঠন করা, ইসলামের পক্ষে ভোট চাওয়া এটাও এক প্রকার দাওয়াত? এই যে বিভিন্ন ইসলামী সংগঠন দাওয়াতী সপ্তাহ পালন করে। কর্মী সংগ্রহ করে। জনগণকে ইসলামী খেলাফতের গুরুত্ব বোঝানোর চেষ্টা করে। ইসলামী রাষ্ট্র এবং কাযা প্রতিষ্ঠার এই দাওয়াতকে হুজুর তাহলে আমাদের জন্য ফরীজা বলে মনে করেন?

কাজী সাহেবঃ হ্যাঁ, তাই। তবে বাংলাদেশে দাওয়াতরতদের অনেকের কর্মধারা আমার পছন্দ নয়।

আবু সাবেরঃ সে থাক। আপনি তো বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার আগে জমিয়তের ব্যানারে এই দাওয়াতের অগ্রপথিক ছিলেন। মুফতী মাহমুদ রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে আপনি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছেন। তৎকালীন সরকারকে আপনারা প্রেশার দিয়েছেন। কিন্তু বাংলাদেশ হওয়ার পর দাওয়াতের এই ময়দানে আপনি কাজ করা এক রকম ছেড়েই দিয়েছেন। আপনি কি বাংলাদেশ হওয়ার আগের ও পরের অবস্থার মাঝে কোনো পার্থক্য অনুভব করেন?

কাজী সাহেবঃ হ্যাঁ, এখন আপনি যাদের জন্য করবেন, যাদের নিয়ে করবেন। সেই অভাগারাই সেটা চায় না। আফসোস এখানে!

আবু সাবেরঃ চায় না তো না জানার কারণে। আগের চেয়ে এখন মানুষের মাঝে দ্বীনী চেতনা কমে যাচ্ছে বলে।

কাজী সাহেবঃ মুসলমানদেরকে ‘চাওয়াইতে’ হবে। একজন মসুলমানকে আমি বলবো না যে, তুমি ইসলামী আইন-কানুনের অনুসরণ করো, তা কি করে হয়!

আবু সাবেরঃ হ্যাঁ, ঠিকই।

কাজী সাহেবঃ কিন্তু এই না যে, এটা করতে গিয়ে মারামারি-হানাহানি করতে হবে। গণবিচ্ছিন্নভাবে কেউ দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে।

আবু সাবেরঃ না না, তা না। দায়িত্ব হলো শান্তিপূর্ণভাবে গণমুখী উপায়ে খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করা। এটা আমাদের দ্বীনী দায়িত্ব ও ফরীজা।

কাজী সাহেবঃ আমার একটা অস্পষ্টতা আছে। খেলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়াহ প্রতিষ্ঠা করা আমাদের দায়িত্ব। এতো বুঝলাম। কিন্তু উমাইয়াদের যুগ থেকে এই পর্যন্ত যত আলেম-উলামা গত হয়েছেন, তারা কি এই ফরীজা থেকে গাফেল ছিলেন? তাদেরকে তো এই ফরীজা আদায়ে তেমন হরকত করতে দেখা যায়নি!

আবু সাবেরঃ তখন তো হুজুর ইসলামী কাযা প্রতিষ্ঠিতই ছিলো। কোনো কোনো খলীফা তার ব্যক্তি জীবনে ফাসেক ছিলেন। খামখেয়ালি করতেন। কিন্তু তার আইন ও আদালত চলতো ইসলাম অনুসারে এবং তখন ইসলামেরই প্রতিপত্তি ও গালাবা ছিল। এমনকি মুঘলদের আদালতও ইসলামী আইনের অনুসারী ছিল। ফলে দেখা যায় মুঘল ভারতে হাদীস চর্চার চেয়ে ফিকহ চর্চাকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হতো। কারণ ফিকহ চর্চা করলে প্রশাসনে ও বিচার বিভাগে চাকরী হতো। বিচারক হওয়া যেত।

আনোয়ার শাহঃ রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য ইসলাম যে নেযাম দান করেছে সেটা ইনসাফপূর্ণ ও ন্যায়ভিত্তিক। এগুলো প্রতিষ্ঠা করা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব।

এই দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে হলে আমাদের প্রথম কর্তব্য হবে একজন আমীর নির্বাচন করা। একটি শুরা গঠন করা। ঐ আমীরের নেতৃত্বে শুরার কর্মসূচি অনুসারে কাজ করা।

কাজী সাহেবঃ আমীর হতে হবে। বাকি আমীরুল মু'মিনীন বানাতে গেলে বর্তমানে সেটা আবার রাষ্ট্রদ্রোহ মূলক আচরণ হয়ে যায় কি না তা ভাবার বিষয়।

আবু সাবেরঃ মোটকথা, দীর্ঘ আলোচনা থেকে আমাদের সামনে স্পষ্ট হলো যে, এদেশেও খেলাফত ও কাযা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা আমাদের দ্বীনী ফরীজা। সকলেরই শরঈ দায়িত্ব।

কাজী সাহেবঃ কিন্তু দরজাবন্দী আছে; স্তর বিন্যাস আছে। ইবাদতের স্তর সবার উপরে। বাকি, কাজ করে যেতে হবে।

আবু সাবেরঃ একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে যাচ্ছি। মুসলিম সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগরিষ্ঠ সব দেশেই বর্তমানে একটি শব্দ নিয়ে দারুণ বিতর্ক হতে দেখা যায়। সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতা। কেউ এর অর্থ করেন অসাম্প্রদায়িকতা বলে। আর যারা রাখঢাক না করে বলে ফেলেন, তারা বলেন রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ধর্মীয় আইনের স্থান নেই। আইন ও আদালতে ধর্মীয় আইন হবে না। ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার। সাধারণ রাজনৈতিক নেতারাও এ ধরনের শ্লোগান দিয়ে থাকে। প্রতিবেশী ভারত ধর্মনিরপেক্ষ নামে পরিচিত। আমাদের দেশেরও কয়েকটি রাজনৈতিক দল এ মতে বিশ্বাসী। তারা কি অসাম্প্রদায়িকতা বোঝায়, না রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ধর্মীয় আইনের অনুপস্থিতি বোঝায়? এ সম্পর্কে কিছু বলুন।

কাজী সাহেবঃ ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থটা ভারত থেকে নেওয়া যেতে পারে। ওখানে ধর্ম নিরপেক্ষতার আদর্শ অতটা ঘোলাটে নয়।

আবু সাবেরঃ তার মানে হুজুরের মতে ধর্মনিরপেক্ষতার মূল অর্থ এবং আমলী অর্থ এটা যে, রাষ্ট্র বিশেষ কোনো ধর্মের আইন অনুসরণ করবে না। ধর্মীয় আইনগুলি রাষ্ট্রীয় পরিমণ্ডলে স্থান পাবে না, তাইতো?

কাজী সাহেবঃ হ্যাঁ, তাই। আর আমি এই অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতার কায়েল নই। একজন মুসলমান ধর্মনিরপেক্ষতার কায়েল (প্রবক্তা) হয় কি করে, তা আমার বুঝে আসে না।

আবু সাবেরঃ মুসলমান তো তার ধর্মের পক্ষে হবে। এটা তার ঈমান। ধর্মনিরপেক্ষ মানে কোনো ধর্মের পক্ষে নয়। তা কি করে হয়। প্রত্যেক মুসলমান চব্বিশ ঘণ্টার জিন্দেগীতে ধর্ম অনুসরণ করতে বাধ্য। তার ব্যক্তি জীবন ইসলামের পক্ষে। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনও ইসলামের পক্ষে। সুতরাং মুসলমানদের জন্য

ধর্মনিরপেক্ষ হওয়ার সুযোগ নেই। ধর্মনিরপেক্ষতা ইসলামের সাথে এবং ঈমানের সাথে সাংঘর্ষিক।

কাজী সাহেবঃ হ্যাঁ, শেষোক্ত অর্থে সাংঘর্ষিক, সন্দেহ করার অবকাশ নেই। এটা একদম স্পষ্ট।

আবু সাবেরঃ কিন্তু আপনি যে বলেছেন, ভারতে নীতিগতভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শটা পরিস্ফুট। এর দ্বারা কি আপনি সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম বাংলাদেশেও ধর্মনিরপেক্ষতা অনুসরণযোগ্য বলে বোঝাতে চেয়েছেন। সংখ্যালঘু অমুসলিম রাষ্ট্রে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম রাষ্ট্রে কি ধর্মনিরপেক্ষতা একই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার্য, না ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে?

কাজী সাহেবঃ না। একই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার্য হতে পারে না। ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতা না মানলে রামরাজ্য কায়েম হবে। শিরক ও মূর্তিপূজার আধিপত্য হবে। তার চেয়ে ধর্মনিরপেক্ষতা অনেকটা সহনীয়। কিন্তু আমাদের দেশের প্রেক্ষাপট ভিন্ন। এখানে ধর্মনিরপেক্ষতা মেনে নেওয়ার প্রশ্নই আসে না।

আবু সাবেরঃ শাইখুল ইসলাম মাদানী রহিমাহুল্লাহ–এর রাজনৈতিক দর্শন কী ছিল? কেউ কেউ বলতে চান, হযরত মাদানী ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। এ ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কী?

কাজী সাহেবঃ আস্তাগফিরুল্লাহ। হযরত শাইখুল ইসলাম মাদানী কাদ্দাসাল্লাহু সিররাহু কক্ষনো ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী ছিলেন না।

আবু সাবেরঃ খেলাফত ও সিয়াসতের সঠিক ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি আর মওদুদী মতবাদের মাঝে পার্থক্য কী?

কাজী সাহেবঃ অনেক পার্থক্য। মাওলানা মওদুদী সাহেব মনে করেন ইসলাম এসেছে মূলত খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য। কিন্তু কুরআন হাদীস অনুযায়ী আমাদের আসলাফ যা বুঝিয়েছেন তা হলো, ইসলাম এসেছে যেন দুনিয়াতে আল্লাহ পাকের হুকুম আহকাম পালিত হয়। সুতরাং স্তরে স্তরে যখন রাষ্ট্রীয় হুকুম আসবে সেটাও পালিত হবে। মাওলানা মওদুদী সাহেবের কথা নিলে দ্বীনের তরতীব ও স্তরবিন্যাস উলট পালট হয়ে যাবে।

আবু সাবেরঃ তার মানে মাওলানা মওদুদী সাহেব বলতে চাচ্ছেন, নবীগণের আগমনের মূল উদ্দেশ্য হুকুমত প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু কুরআন হাদীস থেকে যা বোঝা যায় তা হলো হুকুমত নবীগণের প্রথম ও মূল উদ্দেশ্য নয়। এটা দ্বীন প্রতিষ্ঠার যরীআহ বা মাধ্যম।

আনোয়ার শাহঃ এইভাবে বলা যায় যে, নবীগণের আগমনের উদ্দেশ্য আশরাফুল মাখলুকাতকে আল্লাহর সাথে জুড়ে দেওয়া। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। একটি হলো সিয়াসত, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে খেলাফত। এটা পূর্ণতার শেষ স্তর। কিন্তু দ্বীনের প্রধান স্তর নয়।

আবু সাবেরঃ মাওলানা মওদুদী সাহেবের দাবীটা হলো, সিয়াসত মূল মাকছাদ। কিন্তু আমাদের আকাবীরগণের তাবীর হলো, এটা যরীআহ। তবে সব যরীআহ সমান নয়। সিয়াসত যরীআহ হলেও ফরজিয়ত ও গুরুত্বের বিবেচনায় অতি উচ্চ মর্যাদার দাবী রাখে।

আব্দুস সালামঃ হুজুরের কাছে আমার একটা প্রশ্ন। মওদুদীবাদে বিশ্বাসীদেরকে আমরা মুলহিদ বলবো না গোমরাহ বলবো।

কাজী সাহেবঃ গোমরাহ বলবো। আমাদের আসলাফ মুতাযিলা ও খাওয়ারেজকেও মুলহিদ বলেননি, গোমরাহ বলেছেন।

আবু সাবেরঃ হুজুর! আপনি তো দীর্ঘদিন রাজনীতি করেছেন। আপনার অভিজ্ঞতা থেকে কিছু বলুন। কিছু স্মৃতি ও অবদান বর্ণনা করুন।

কাজী সাহেবঃ আমি কোনো অবদান রাখিনি। 'আমি একটা মানুষ পেঁচাও একটি পাখি'।

আবু সাবেরঃ এখন বিনয় অবলম্বন করলে ইতিহাসের একটি অংশ হারিয়ে যাবে। উম্মতের প্রয়োজনে কিছু কথা আজ বলতেই হবে।

কাজী সাহেবঃ আমার একটা অভিজ্ঞতা, মওদুদীবাদীরা নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে হেন কাজ নেই, যা করতে পারে না। আমার চাক্ষুষ ও বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, মাওলানা মওদুদী একবারই বাংলাদেশে এসেছেন এবং ঢাকার পল্টনে ভাষণ দিয়েছেন। সেখানে তৎকালীন ন্যাপ ও সমমনারা হামলা করেছিলো। পরে জামায়াতীরা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সম্বলিত ব্যানার নিজেরা পদদলিত করে দোষ চাপিয়েছিল হামলাকারীদের উপর। এর কোনো দরকার ছিলো?

আনোয়ার শাহঃ সর্বশেষ, হুকুমতে এলাহিয়া প্রতিষ্ঠার জন্য আপনি আপনার শাগরেদ ও মুহিব্বীনদের উদ্দেশ্যে কিছু বলুন।

কাজী সাহেবঃ আমি উপদেশ দেওয়ার মতো কেউ নই। তবু বলছি, তালীম, তাবলীগ, তাসনীফ ও তাসাওউফ এগুলো মৌলিক কাজ। এগুলি গুরুত্বের সাথে করো। রাজনীতিও পারলে করো। খানকাহী আমলকে নেসাব বানাও।

আনোয়ার শাহ: অর্থাৎ দ্বীনের সকল শো'বায় কাজ করতে হবে। কোনো শো'বাকে অবহেলা করা যাবে না।

কাজী সাহেব: খবরদার! কেউ কাউকে তুচ্ছ করবে না। তাবলীগীরা আমাদেরকে বেকার ভাববে না। আমরা তাদেরকে জাহেল বলে দূরে ঠেলে দিবো না। পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে। পারলে একে অন্যকে সহযোগিতাও করতে হবে।

আবু সাবের: সবার পক্ষ থেকে হুজুরকে জাযাকাল্লাহ। অনেক সময় নিয়েছি। অনেক কষ্ট দিয়েছি।

কাজী সাহেব: আল্লাহ তায়ালা সবার খায়ের করুন। আমীন।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ
মাওলানা আবু সাবের আব্দুল্লাহ
১৬/৩/২০১৩ ঈ. বাদ আসর

অনুলিখন
মাহমুদ হাসান মাসরুর

উপস্থিতি

মাওলানা আনোয়ার শাহ

মাওলানা আহমদ মায়মূন

মাওলানা মুফতী আব্দুস সালাম

মাওলানা মুফতী হাফীযুদ্দীন

বিতর নামায আদায়ের পদ্ধতি : একটি প্রশ্নের উত্তর

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

প্রশ্ন: কোন কোন মসজিদের খতীবকে এ কথা বলতে শুনা যায় যে, বিতর নামাযের একাধিক পদ্ধতি হাদীসের কিতাবে রয়েছে, তবে হানাফীরা যেভাবে বিতর পড়ে, অর্থাৎ দুই বৈঠক ও এক সালামে তিন রাকাত- এই পদ্ধতি হাদীস শরীফে নেই। তাদের বক্তব্য হল, বিতর যদি তিন রাকাতই পড়তে হয় তাহলে দ্বিতীয় রাকাতে বসা যাবে না। অন্যথায় তা মাগরিবের নামাযের সাদৃশ্য হয়ে যাবে। আর হাদীস শরীফে বিতরকে মাগরিবের সাদৃশ্য বানাতে নিষেধ করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, দুই বৈঠক ও এক সালামে কি বিতর পড়া হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়? যদি না থাকে তাহলে আমরা কিসের ভিত্তিতে এভাবে বিতর নামায আদায় করছি?

উত্তর: আলহামদুলিল্লাহ, ওয়া সালামুন আলা ইবাদিহিল্লাযি নাসতাফা, আম্মা বাদ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণত তাহাজ্জুদের পর বিতর নামায পড়তেন। এটি ছিল নবীজীর সাধারণ অভ্যাস। বয়স ও পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন অবস্থার কারণে তাহাজ্জুদের রাকাতসংখ্যা কম-বেশি হত। কিন্তু বিতর সর্বদা তিন রাকাতই পড়তেন। এক রাকাত বিতর পড়া নবীজী থেকে প্রমাণিত নয়। যে সব রেওয়ায়াতে পাঁচ, সাত বা নয় রাকাতের কথা এসেছে, তাতেও বিতর তিন রাকাতই। বর্ণনাকারী আগে-পরের রাকাত মিলিয়ে সমষ্টিকেও বিতর শব্দে ব্যক্ত করেছেন। হাদীসের রেওয়ায়াতসমূহে ব্যাপকভাবে বিতর ও তাহাজ্জুদের সমষ্টিকেও বিতর বলা হয়েছে। এটি একটি উপস্থাপনাগত বিষয়।

নবীজী বিতর তিন রাকাত পড়তেন। এটিই তাঁর অনুসৃত পন্থা। নিম্নের হাদীসসমূহ থেকে বিষয়টি সুপ্রমাণিত। আবু সালামা ইবনে আব্দুর রহমান থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত আয়েশা রা. কে জিজ্ঞাসা করেন যে, রমযানে নবীজীর নামায কেমন হত? তিনি উত্তরে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানে এবং রমযানের বাইরে এগার রাকাতের বেশি পড়তেন না। প্রথমে চার রাকাত পড়তেন, যার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করো না! এরপর আরও চার রাকাত পড়তেন, যার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা তো বলাই বাহুল্য! এরপর তিন রাকাত (বিতর) পড়তেন। [সহীহ বুখারী ১/১৫৪, হাদীস ১১৪৭; সহীহ মুসলিম ১/২৫৪, হাদীস ৭৩৮; সুনানে নাসায়ী ১/২৪৮, হাদীস ১৬৯৭; সুনানে আবু দাউদ ১/১৮৯, হাদীস ১৩৩৫; মুসনাদে আহমদ ৬/৩৬, হাদীস ২৪০৭৩]

সাদ ইবনে হিশাম রহ. বলেন, হযরত আয়েশা রা. তাকে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতরের দুই রাকাতে সালাম ফেরাতেন না। [সুনানে নাসায়ী ১/২৪৮; হাদীস ১৬৯৮; মুয়াত্তা মুহাম্মাদ ১৫১ (বাবুস সালাম ফিল বিতর) মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ৪/৪৯৪, হাদীস ৬৯১২; সুনানে দারাকুতনী ২/৩২, হাদীস ১৫৬৫; সুনানে কুবরা বাইহাকী ৩/৩১]

এই হাদীসটি ইমাম হাকেম আবু আব্দুল্লাহ রহ.ও মুস্তাদরাক আলাস সহীহাইন কিতাবে বর্ণনা করেছেন। তার আরবী পাঠ এই

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسلم في الركعتين الأوليين من الوتر.

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতরের প্রথম দুই রাকাতে সালাম ফেরাতেন না। ইমাম হাকেম রহ. তা বর্ণনা করার পর বলেন,

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.

অর্থাৎ হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের শর্ত মোতাবেক সহীহ। ইমাম শামসুদ্দীন যাহাবী রহ. তালখীসুল মুস্তাদরাক-এ হাকেম রহ.-এর সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছেন। [মুস্তাদরাক আলাস সহীহাইন ১/৩০৪, হাদীস ১১৮০]

এই হাদীস দ্বারা একদিকে যেমন প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাধারণ নিয়মে তিন রাকাত বিতর আদায় করতেন তেমনি একথাও প্রমাণিত হয় যে, তিন রাকাতের দ্বিতীয় রাকাতে তাশাহহুদের জন্য বসতেন, কিন্তু সালাম ফেরাতেন না। সালাম ফেরাতেন সবশেষে তৃতীয় রাকাতে। যদি দ্বিতীয় রাকাতে বৈঠক করার নিয়ম না থাকত তাহলে সালাম করার বা না করার প্রসঙ্গই আসত না। কেননা সালাম তো ফেরানো হয়ে থাকে।

ইমাম ইবনে হাযম যাহেরী রহ.ও মুহাল্লা কিতাবে বিতরের বিভিন্ন পদ্ধতির মাঝে আলোচিত পদ্ধতিটিও উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, বিতর তিন রাকাত পড়া হবে। দ্বিতীয় রাকাতে বসবে এবং (তাশাহহুদ পড়ে) সালাম ফেরানো ছাড়াই দাঁড়িয়ে যাবে। তৃতীয় রাকাত পড়ে বসবে, তাশাহহুদ পড়বে এবং সালাম ফেরাবে, যেভাবে মাগরিবের নামায পড়া হয়। এটিই ইমান আবু হানীফা রহ.-এর মত। এর দলিল হচ্ছে, সাদ ইবনে হিশাম রহ.-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীস, যাতে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রা. বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতরের দুই রাকাতে সালাম ফেরাতেন না। [মুহাল্লা ইবনে হাযম ২/৮৯]

সাদ ইবনে হিশাম রহ.-এর রেওয়ায়াতটি আরও একটি সনদে বর্ণিত হয়েছে, যার আরবী পাঠ নিম্নরূপ,

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন রাকাত বিতর পড়তেন এবং শুধু সর্বশেষ রাকাতে সালাম ফেরাতেন। হাকেম রহ. এই রেওয়ায়াতের পর লেখেন, আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা.ও এভাবে বিতর পড়তেন এবং তাঁর সূত্রে মদীনাবাসীগণ তা গ্রহণ করেছেন। [মুস্তাদরাক আলাস সহীহাইন ১/৩০৪, হাদীস ১১৮১]

(৩) আব্দুল্লাহ ইবনে আবী কাইস বলেন,

قلت لعائشة : بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر؟ قالت: كان يوتر بأربع وثلاث، وست وثلاث، وثمان وثلاث، وعشر وثلاث، ولم يكن يوتر بأنقص من سبع، ولا بأكثر من ثلاث عشرة .

অর্থাৎ আমি হযরত আয়েশা রা. এর কাছে জিজ্ঞাসা করলাম যে, নবীজী বিতরে কত রাকাত পড়তেন? উত্তরে তিনি বলেন, চার এবং তিন, ছয় এবং তিন, আট এবং তিন, দশ এবং তিন। তিনি বিতরে সাত রাকাতের কম এবং তের রাকাতের অধিক পড়তেন না। [সুনানে আবু দাউদ ১/১৯৩, হাদীস ১৩৫৭ (১৩৬২); তহাবী শরীফ ১/১৩৯; মুসনাদে আহমদ ৬/১৪৯, হাদীস ২৫১৫৯]

চিন্তা করে দেখুন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদ নামায কখনো চার রাকাত, কখনো ছয় রাকাত, কখনো আট রাকাত, কখনো দশ রাকাত পড়তেন; কিন্তু মূল বিতর সর্বদা তিন রাকাতই হত। ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী রহ. ফাতহুল বারী ৩/২৬ كتاب التهجد، باب كيف صلاة الليل এ লেখেন,

هذا أصح ما وقفت عليه من ذلك، وبه يجمع بين ما اختلف عن عائشة في ذلك. والله أعلم

আমার জানামতে এটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সর্বাধিক সহীহ রেওয়ায়াত। এ বিষয়ে হযরত আয়েশা রা. বর্ণিত হাদীসের বর্ণনাকারীদের মাঝে যে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় এর দ্বারা সে সবের মাঝে সমন্বয় করা সম্ভব।

(৪) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাহাজ্জুদ ও বিতর প্রত্যক্ষ করার জন্য হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এক রাতে তাঁর খালা উম্মুল মুমিনীন হযরত মাইমূনা রা.-এর ঘরে অবস্থান করেন। তিনি যা যা প্রত্যক্ষ করেছেন বর্ণনা করেছেন। তাঁর শাগরেদরা সে বিবরণ বিভিন্ন শব্দে বর্ণনা করেছেন। আমি এখানে সুনানে নাসায়ী ও অন্যান্য হাদীসের কিতাব থেকে একটি রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করছি, মুহাম্মাদ ইবনে আলী তার পিতা থেকে, তিনি তার পিতা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস

রা. থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে শয্যা থেকে উঠলেন, এরপর মিসওয়াক করলেন, এরপর দুই রাকাত পড়লেন, এরপর শুয়ে গেলেন। তারপর পুনরায় শয্যা ত্যাগ করলেন, মিসওয়াক করলেন, অযু করলেন এবং দুই রাকাত পড়লেন; এভাবে ছয় রাকাত পূর্ণ করলেন। এরপর তিন রাকাত বিতর পড়লেন। এরপর দুই রাকাত পড়েন। [সুনানে নাসায়ী ১/২৪৯, হাদীস ১৭০৪; মুসনাদে আহমাদ ১/৩৫০, হাদীস ৩২৭১; তহাবী শরীফ ১/২০১-২০২]

(৫) প্রসিদ্ধ তাবেয়ী ইমাম সাঈদ ইবনে জুবাইর, যিনি ইবনে আব্বাস রা.-এর বিশিষ্ট শাগরেদ, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন-

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث، ويقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكفرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন রাকাত বিতর পড়তেন, প্রথম রাকাতে সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আলা, দ্বিতীয় রাকাতে কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন এবং তৃতীয় রাকাতে কুল হুয়াল্লাহু আহাদ পড়তেন। [সুনানে দারেমী ১/৩১১, হাদীস ১৫৯৭; জামে তিরমিযী ১/৬১, হাদীস ৪৬২; সুনানে নাসায়ী ১/২৪৯; হাদীস ১৭০২; তহাবী শরীফ ১/২০১, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ৪/৫১২, হাদীস ৬৯৫১ ইমাম নববী রহ. আলখুলাসা কিতাবে উক্ত হাদীসের সনদকে সহীহ বলেছেন। -নাসবুর রায়াহ, জামালুদ্দীন যাইলায়ী ২/১১৯]

বিতরের তিন রাকাতে উপরোক্ত তিন সূরা, এক এক রাকাতে এক এক সূরা, পড়া সম্পর্কে একাধিক সাহাবী থেকে রেওয়ায়াত বিদ্যমান রয়েছে। প্রতিটি রেওয়ায়াত প্রমাণ করে যে, বিতরের নামায তিন রাকাত। মোটকথা, বিতরের নামায তিন রাকাত হওয়ার বিষয়ে হাদীস ও সুন্নাহর বহু প্রমাণ রয়েছে এবং অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ীর আমলও তাই ছিল। এখানে আরেকটি হাদীস উল্লেখ করছি,

عن ثابت قال: قال أنس: يا أبا محمد خذ عني فإني أخذت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله، ولن تأخذ عن أحد أوثق مني، قال: ثم صلى بي العشاء، ثم صلى سب ركعات يسلم بين الركعتين، ثم أوتر بثلاث يسلم في آخرهن (الروياني وابن عساكر، ورجاله ثقات، كما في كنز العمال)

প্রসিদ্ধ তাবেয়ী সাবেত বুনানী রহ. বলেন, আমাকে হযরত আনাস ইবনে মালেক রহ. বলেছেন, হে আবু মুহাম্মাদ! (সাবেত রা.-এর কুনিয়াত-উপনাম) আমার কাছ

থেকে শিখে নাও। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে গ্রহণ করেছি। আর তিনি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন থেকে নিয়েছেন। তুমি শেখার জন্য আমার চেয়ে অধিক নির্ভরযোগ্য কাউকে পাবে না। একথা বলে তিনি আমাকে নিয়ে ইশার নামায আদায় করেন। এরপর ছয় রাকাত পড়েন, তা এভাবে যে, প্রতি দুই রাকাতে সালাম ফেরান। এরপর তিন রাকাত বিতর পড়েন

এবং সবশেষে সালাম ফেরান। -মুসনাদে রুয়ানী, তারীখে ইবনে আসাকির; ইমাম সুয়ূতী রহ. বলেন, এই হাদীসের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য [কানযুল উম্মাল ৮/৬৬-৬৭, হাদীস ২১৯০২ আলবিতরু মিন কিতাবিস সালাত, কিসমুল আফআল]

জরুরি জ্ঞাতব্য

বিতর নামাযের ব্যাপারে আজকাল এক ব্যাপক অবহেলা এই পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, একে এমন এক নামায মনে করা হয় যার আগে কোন নফল নামায নেই, যেমন মাগরিবের নামায; এর আগে নফল নামায মাসনূন নয়; অথচ বিতরের ব্যাপারে শরীয়তের কাম্য এই যে, তা কিছু নফল নামায পড়ার পর আদায় করা। সবচেয়ে ভাল এই যে, যার শেষ রাতে তাহাজ্জুদের জন্য জাগার নিশ্চয়তা রয়েছে, সে তাহাজ্জুদের পরে বিতর পড়বে। যদি বিতর রাতের শুরু ভাগে ইশার পর পড়া হয় তবুও উত্তম এই যে, দুই-চার রাকাত নফল নামায পড়ার পর বিতর আদায় করবে। মাগরিবের মত আগে কোন নফল ছাড়া শুধু তিন রাকাত বিতর পড়া পছন্দনীয় নয়। হাদীস শরীফে আছে,

لا توتروا بثلاث تشبهوا بصلاة المغرب ولكن أوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة ركعة أو أكثر من ذلك .

তোমরা শুধু তিন রাকাত বিতর পড়ো না, এতে মাগরিবের সাদৃশ্যপূর্ণ করে ফেলবে; বরং পাঁচ, সাত, নয়, এগার বা এরও অধিক রাকাতে বিতর পড়ো। [মুস্তাদরাকে হাকেম ১/৩০৪, হাদীস ১১৭৮; সুনানে কুবরা বাইহাকী ৩/৩১, ৩২]

মোটকথা, বিতরের আগে কিছু নফল অবশ্যই পড় দুই, চার, ছয়, আট- যত রাকাত সম্ভব হয় পড়ে নাও। ৩ নং-এর অধীনে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রা. এর হাদীস উল্লেখিত হয়েছে, যাতে তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার এবং তিন, ছয় এবং তিন, আট এবং তিন, দশ এবং তিন-বিভিন্ন সংখ্যায় রাতের নামায আদায় করতেন। উল্লেখিত হাদীসে ওই নির্দেশনাই এসেছে যে, শুধু তিন রাকাত বিতর পড়ো না, আগে কিছু নফল অবশ্যই পড়। তবে বিতর সর্বাবস্থায় তিন রাকাতই।

উক্ত হাদীসের সাথে একথার কোন সম্পর্ক নেই যে, তিন রাকাত এক বৈঠকেই পড়তে হবে, তাহলেই শুধু তা মাগরিবের সাদৃশ্য থেকে বেঁচে যাবে। তাই তিন রাকাত পড়তে হলে তা এক বৈঠকেই পড়তে হবে। স্মরণ রাখতে হবে, মাগরিবের সাদৃশ্য থেকে বাঁচার পদ্ধতি হাদীসে সুস্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে যে, তিন রাকাত বিতরের আগে নফল পড়ে নাও। হাদীসের ব্যাখ্যা ছেড়ে নিজের পক্ষ থেকে বিতরের নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করা বিভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।

শরীয়তে সকল নামাযের মূলকথা এই যে, প্রতি দুই রাকাতে বৈঠক হবে এবং তাশাহহুদ পড়া হবে। হযরত আয়েশা রা. থেকে সহীহ মুসলিম ১/১৯৪, হাদীস নং ৪৯৮-এ একটি দীর্ঘ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক ব্যাপক বাণী উদ্বৃত রয়েছে। তাতে তিনি ইরশাদ করেন,

وفي كل ركعتين التحية

প্রতি দুই রাকাতে তাশাহহুদ রয়েছে। একই হুকুম একাধিক সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত রয়েছে। শরীয়তের ব্যাপক শিক্ষা পরিহার করে কোন রেওয়ায়াতের মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে একথা বলা যে, তিন রাকাত বিতর পড়লে শুধু এক বৈঠকেই পড়া-এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এটা

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

এর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তায়ালা উম্মতকে উক্ত অনিষ্ট থেকে হেফাজত আমাদেরকে করুন। আমীন।

লেখক: আমিনুত তালীম, মারকাযুদ দাওয়াহ আল ইসলামিয়া ঢাকা
[সৌজন্যে: মাসিক 'আল-কাউসার']

ইসলামের অনন্য বৈশিষ্ট্য ও ধর্মনিরপেক্ষতা

মাওলানা আবু সাবের আব্দুল্লাহ

মানবজীবনে ধর্মের প্রভাব প্রাকৃতিকভাবে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত। যত বড় ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রই হোক, সেখানে কোন না কোনো পর্যায়ে ধর্মের প্রভাব আপনি অবশ্যই লক্ষ্য করবেন। কারণ, আদি কাল থেকে প্রায় সকল মানুষ ধর্মের বলয়ে বাস করে আসছে। এটা মানুষের অন্তর্নিহিত স্বভাবের অংশ এবং সৃষ্টিগত কারণেই মানুষ স্রষ্টামুখী। সুতরাং তাদের রাষ্ট্র সম্পূর্ণরূপে ধর্মের বলয় ছেড়ে বের হয়ে যাবে এটা হয় না। মানুষের প্রয়োজনে সৃষ্ট একটি কল্যাণরাষ্ট্র এই মনুষ্য প্রকৃতিকে উপেক্ষা করতে পারে না। ধর্ম নিরপেক্ষতার শাব্দিক অর্থ যাই হোক, যারা এই মতবাদে বিশ্বাস করে, আচরণগতভাবে তারা অন্তহীন স্ববিরোধিতায় লিপ্ত হয়।

ধর্মনিরক্ষতাবাদীরা বলে থাকেন, একটি রাষ্ট্রে একাধিক ধর্মাবলম্বী বসবাস করে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটি ধর্ম অপর ধর্মের প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হয়। তাছাড়া রাষ্ট্রের মূল দায়িত্ব তথা শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা, উন্নতি ও সমৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির পথে ধর্ম প্রধান প্রতিবন্ধক। সুতরাং রাষ্ট্রের সার্বজনীনতা ও উন্নতি নিশ্চিত করতে এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিল রক্ষা করতে ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে দূরে রাখতে হবে। তারা মনে করে, এটা অপরাপর ধর্মের মতো ইসলামের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আসলে তাদের এই বক্তব্য যথার্থ নয়। অন্যান্য ধর্মের ক্ষেত্রে এই বক্তব্য চললেও ইসলামের ক্ষেত্রে তা মোটেও প্রযোজ্য নয়। ইসলাম ছাড়া কোন ধর্ম তো পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হওয়ার দাবিই করেনি। ইসলামই শুধু এই দাবি করে এবং তার এই দাবি ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত, হাজার বছরের রাষ্ট্রীয় অভিজ্ঞতায় প্রতিষ্ঠিত। পুরো মানব জাতির শান্তি উন্নতি এবং আন্তর্জাতিক কর্মধারার সঙ্গে প্রয়োজনীয় মিল রক্ষা করার ব্যাপারে ইসলামের সুস্পষ্ট নীতিমালা রয়েছে।

মোটকথা জীবনের সব কিছু যা ধারণ করে তাই যদি ধর্ম হয়, তবে এই সংজ্ঞায় একমাত্র ইসলামই উত্তীর্ণ। রাষ্ট্র যদি জীবনের অংশ হয় তবে অবশ্যই তা জীবন-ধর্ম ইসলামেরও অংশ। রাষ্ট্র থেকে ইসলামকে ইসলাম থেকে রাষ্ট্রকে বাদ দেওয়ার কোন সুযোগ নেই। কারণ, ইসলাম পূর্ণাঙ্গ দ্বীন। বিশ্বজনীন ধর্ম। আল্লাহ তায়ালার মনোনীত, চির উন্নত বিজয়ী ধর্ম। অপরাপর ধর্মের মাঝে এগুলি ইসলামের অনন্য বৈশিষ্ট্য। এ-বৈশিষ্ট্যগুলো যথাযথ অনুধাবন করতে না পারার কারণে অনেকে ইসলামকে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্মের ন্যায় কিছু আচার-অনুষ্ঠান সর্বস্ব ধর্ম মনে করে। সমাজ, রাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি এবং আইন ও বিচার

ইত্যাদি বিষয়ে ইসলামকে অকার্যকর মনে করে এবং এই সকল ক্ষেত্রে ধর্মীয় অনুশাসনকে সাম্প্রদায়িকতা মনে করে। তাই শুরুতে আমরা ইসলামের কিছু বৈশিষ্ট্যের উপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাতের চেষ্টা করব। যাতে ইসলামের পূর্ণাঙ্গতা ও সার্বজনীনতা আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়। অতঃপর ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা করব।

১. ইসলাম পূর্ণাঙ্গ দ্বীন

ইসলাম আল্লাহর মনোনীত পূর্ণাঙ্গ দ্বীন। আকীদা, ইবাদত, সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি এবং শিক্ষাসহ মানব জীবনের সবকিছু এই ধর্মের ব্যাপকতার আওতাভুক্ত। ইসলাম ব্যক্তিজীবনে সীমাবদ্ধ নয়। কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

﴿ ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗا ﴾

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। তোমাদের উপর আমার নেয়ামত পরিপূর্ণ করলাম। এবং তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে ইসলামকে (চিরকালের জন্য) পছন্দ করে নিলাম। [সূরা মায়েদা : ৩]

আরো ইরশাদ হয়েছে,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسِّلۡمِ كَآفَّةٗ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٞ ﴾

হে মুমিনগণ ইসলামে সম্পূর্ণরূপে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চিত জেন, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। [বাকারা : ২০৮]

সুতরাং কুরআন-সুন্নাহয় মানব জীবনের সকল বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা এবং বিধিবিধান রয়েছে। ফিকহ শাস্ত্রে খুঁটিনাটি সব কিছুর বিস্তারিত আলোচনা আছে। এর কিছু মান্য করা, কিছুকে অস্বীকার করা কুফরী। কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

﴿ أَفَتُؤۡمِنُونَ بِبَعۡضِ ٱلۡكِتَٰبِ وَتَكۡفُرُونَ بِبَعۡضٖۚ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفۡعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمۡ إِلَّا خِزۡيٞ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۖ وَيَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِّ ٱلۡعَذَابِۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعۡمَلُونَ ﴾

তবে তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশে ঈমান রাখ এবং কিছু অংশ অস্বীকার কর? তাহলে বল, যারা এরূপ করে তাদের শাস্তি এছাড়া আর কী হতে পারে যে, পার্থিব জীবনে তাদের জন্য থাকবে লাঞ্ছনা। আর কিয়ামতের দিন তাদেরকে নিয়ে যাওয়া

হবে কঠিনতর আযাবের দিকে? তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ সে সম্পর্কে উদাসীন নন। [বাকারা : ৮৫]

ইসলাম-পূর্ব আসমানী ধর্মগুলো সারা পৃথিবীর জন্য এবং সব যুগের জন্য ছিলো না। তাই বর্তমান প্রেক্ষাপটে সেগুলোতে জীবনের সকল বিষয়ের সমাধান নেই এবং সেগুলো পূর্ণাঙ্গ নয়। কিন্তু ইসলাম এর ব্যতিক্রম।

২. ইসলাম আল্লাহর মনোনীত একমাত্র দ্বীন

ইসলাম আল্লাহর মনোনীত সর্বশেষ দ্বীন। মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তি একমাত্র এ ধর্মের মাঝে নিহিত। এরশাদ হয়েছে,

﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلۡإِسۡلَٰمُ ﴾

নিশ্চয় আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন কেবল ইসলাম। [আলে ইমরান : ১৯]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

﴿ وَمَن يَبۡتَغِ غَيۡرَ ٱلۡإِسۡلَٰمِ دِينٗا فَلَن يُقۡبَلَ مِنۡهُ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ﴾

যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনও দ্বীন অবলম্বন করতে চাবে, তার থেকে সে দ্বীন কবুল করা হবে না এবং আখিরাতে যারা মহা ক্ষতিগ্রস্ত, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। [আলে ইমরান : ৮৫]

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে,

عن جابر عن النبى صلى الله عليه و سلم قال وفيه، « فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، مَا حَلَّ لَهُ إِلا أَنْ يَتَّبِعَنِي ». رواه احمد فى مسنده برقم: ١٤٧٣٦ و البيهقى فى شعب الايمان برقم: ١٧٦

যদি মুসা আ. জীবিত থাকতেন তাহলে তাঁকেও আমার অনুসরণ করতে হত। [মুসনাদে আহমদ, হাদীস, ১৪৭৩৬ শুআবুল ঈমান, বায়হাকী, হাদীস ১৭৬]

৩. ইসলাম বিশ্বজনীন ধর্ম, সকল মানুষের ধর্ম

আল্লাহ পাক বলেন,

﴿ شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُدٗى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٖ مِّنَ ٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَانِ ﴾

রমযান মাস, যে মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে, বিশ্বমানবের জন্য যা আদ্যোপান্ত হেদায়াত এবং এমন সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী সম্বলিত, যা সঠিক পথ দেখায় এবং সত্য ও মিথ্যার মধ্যে চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেয়। [বাকারা : ১৮৫]

আরো ইরশাদ হয়েছে,

﴿ قُلۡ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيۡكُمۡ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُۥ مُلۡكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ ﴾

(হে রাসূল! তাদেরকে) বল, হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের প্রতি সেই আল্লাহর প্রেরিত রাসূল, যার আয়ত্তে আসমানসমূহ ও পৃথিবীর রাজত্ব। [আরাফ:১৫৮]

আরো ইরশাদ হয়েছে,

﴿ وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ﴾

হে নবী! আমি তোমাকে জগতসমূহের জন্য কেবল রহমত করেই পাঠিয়েছি। [আম্বিয়া : ১০৭]

আরো ইরশাদ হয়েছে,

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَآءَتۡكُم مَّوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَشِفَآءٞ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٞ لِّلۡمُؤۡمِنِينَ ﴾

হে মানুষ! তোমাদের কাছে এমন জিনিস এসেছে যা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক উপদেশ, অন্তরের রোগ-ব্যাধির উপশম এবং মুমিনের পক্ষে হেদায়াত ও রহমত। [ইউনুস : ৫৭]

ইসলাম মানবধর্ম। জাতি-ধর্ম বংশ-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের প্রতি ন্যায় বিচার, সহমর্মিতা, সৌজন্যমূলক আচরণ, জীবের প্রতি দয়া এই ধর্মের অন্যতম শিক্ষা। কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ﴾

হে মুসলিমগণ! নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করেছেন যে, তোমরা আমানতসমূহ তার হকদারকে আদায় করে দিবে এবং যখন মানুষের মধ্যে বিচার করবে, তখন ইনসাফের সাথে বিচার করবে। নিশ্চিত জেন, আল্লাহ তোমাদেরকে যে বিষয়ে উপদেশ দেন তা অতি উৎকৃষ্ট হয়ে থাকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শুনেন, সবকিছু দেখেন। [নিসা : ৫৮]

আরো ইরশাদ হয়েছে,

﴿ إِنَّآ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِتَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُۚ وَلَا تَكُن لِّلۡخَآئِنِينَ خَصِيمٗا ﴾

নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি সত্য সম্বলিত কিতাব নাযিল করেছি, যাতে আল্লাহ তোমাকে যে উপলব্ধি দিয়েছেন সে অনুযায়ী মানুষের মধ্যে মীমাংসা করতে পার। আর তুমি খেয়ানতকারীদের পক্ষ অবলম্বন করো না। [নিসাঃ ১০৫]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ أَوِ ٱلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَۚ إِن يَكُنۡ غَنِيًّا أَوۡ فَقِيرٗا فَٱللَّهُ أَوۡلَىٰ بِهِمَاۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلۡهَوَىٰٓ أَن تَعۡدِلُواْۚ وَإِن تَلۡوُۥٓاْ أَوۡ تُعۡرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ﴾

হে মুমিনগণ! তোমরা ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারী হয়ে যাও। আল্লাহর সাক্ষীরূপে-যদিও তা তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে কিংবা পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনের বিরুদ্ধে হয়। সে ব্যক্তি (যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার আদেশ করা হচ্ছে) যদি ধনী বা গরীব হয় তবে আল্লাহ উভয় প্রকার লোকের ব্যাপারে তোমার চেয়ে বেশি কল্যাণকামী। সুতরাং এমন খেয়ালখুশির অনুসরণ করবে না, যা তোমাদের ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় বাধা হয়। তোমরা যদি পেঁচাও অর্থাৎ (মিথ্যা সাক্ষ্য দাও) অথবা (সঠিক সাক্ষ্য দেওয়া থেকে) পাশ কাটিয়ে যাও। তবে জেনে রেখো, আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। [নিসা : ১৩৫]

আরো ইরশাদ হয়েছে,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْۚ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ﴾

হে মুমিনগণ! তোমরা এমন হয়ে যাও যে, সর্বদা আল্লাহর (আদেশসমূহ পালনের) জন্য প্রস্তুত থাকবে এবং ইনসাফের সাথে সাক্ষ্যদানকারী হবে এবং কোন সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদেরকে ইনসাফ পরিত্যাগে প্ররোচিত না করে। ইনসাফ অবলম্বন করো। এ পন্থাই তাকওয়ার বেশী নিকটবর্তী এবং আল্লাহকে ভয় করে চলো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজ সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত। [মায়েদা : ৮]

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে,

عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : «مَنْ لَا يَرْحَمِ النَّاسَ، لا يَرْحَمْهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ». اخرجه مسلم فى صحيحه، كتاب الفضائل، باب رحمته صلى الله عليه و سلم الصبيان.

হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, যারা মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ তাদের প্রতি দয়া করেন না। [সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ফাযাইল, হাদীস ৬১৭২]

আরো ইরশাদ হয়েছে,

عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ». رواه الترمذى فى جامعه، أبواب البر و الصلة، باب ما جاء رحمة المسلمين.

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, (জীবের প্রতি) দয়াকারীর উপর দয়াময় আল্লাহ দয়া করেন। জমিনে বসবাসকারী মাখলুকের প্রতি দয়া কর, আসমানওয়ালা তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। [জামে তিরমিযী, হাদীস ১৯২৪]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الْخَلْقُ عِيَالُ اللهِ، فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَى عِيَالِهِ ». رواه البيهقى فى شعب الايمان برقم: ٧٠٤٨ باب طاعة أولى الأمر فصل نصيحة الولاة.

রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর পরিবার। আল্লাহর কাছে প্রিয় সেই যে তাঁর পরিবারের প্রতি দয়া করে। [শুআবুল ঈমান, বায়হাকী, হাদীস : ৭৪৪৮]

ইসলাম আল্লাহর মনোনীত একমাত্র সত্য ধর্ম । এই ধর্ম সকলকে দরদের সাথে সত্যের পথে অহ্বান করে। ইহকালীন ও পরকালীন নাজাতের পথে ডাকে। কিন্তু কাউকে বাধ্য করে না। সকলের ধর্মীয় স্বাধীনতা স্বীকার করে।

ইরশাদ হয়েছে,

﴿ لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ فَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَاۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

দ্বীন গ্রহণের বিষয়ে কোন জবরদস্তি নেই। হেদায়াতের পথ গোমরাহি থেকে পৃথকরূপে স্পষ্ট হয়ে গেছে। এর পর যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলো সে এক মজবুত হাতল আঁকড়ে ধরল, যা ভেঙ্গে যাওয়ার কোন আশংকা নেই। আল্লাহ সব কিছু শুনেন ও সবকিছু জানেন। [সূরা বাকারাঃ ২৫৬]

ইসলাম গ্রহণে কাউকে বাধ্য করা যাবে না। তবে যিনি স্বেচ্ছায় সত্য ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তিনি আল্লাহ তায়ালার হুকুম আহকাম পালনে বাধ্য থাকবেন। ক্ষমতানুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে বাধ্যও করবে। বনী ইসরাইল হযরত মুসা আলাইহিস সালামের প্রতি ঈমান আনার পর যখন তাওরাতের হুকুম আহকাম পালনে বাহানা করে, তখন তাদের উপর পাহাড় তুলে ধরা হয়। ইরশাদ হয়েছে,

﴿ وَإِذۡ أَخَذۡنَا مِيثَٰقَكُمۡ وَرَفَعۡنَا فَوۡقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآ ءَاتَيۡنَٰكُم بِقُوَّةٖ وَٱذۡكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ﴾

এবং সেই সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন আমি তোমাদের থেকে (তাওরাতের অনুসরণ সম্পর্কে) প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম এবং তূর পাহাড়কে তোমাদের উপর উত্তোলন করে ধরেছিলাম। (আরও বলেছিলাম যে) আমি তোমাদেরকে যা (যে কিতাব) দিয়েছি তা শক্ত করে ধর এবং তাতে যা কিছু লেখা আছে তা স্মরণ রাখ, যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার। [বাকারা : ৬৩]

হাদীস শরীফে ইরশাদ হচ্ছে,

عن أبى سعيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ». أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان.

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কোনও গোনাহের কাজ দেখবে শক্তি থাকলে হাত দ্বারা (বল প্রয়োগ করে) তা বন্ধ করে দিবে। এ শক্তি না থাকলে মুখ দ্বারা বন্ধ করার চেষ্টা করবে। এ শক্তিও না থাকলে অন্তর দ্বারা ঘৃণা করবে। [সহীহ মুসলিম, হাদীস : ৭৮]

আরো ইরশাদ হয়েছে,

عن عبد الله عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ». أخرجه أبو داود فى سننه، كتاب الصلوة، باب متى يومر الغلام بالصلوة

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, শিশুর বয়স যখন সাত বছর হয় তাদেরকে নামাযের আদেশ কর, দশ বছর হলে (প্রয়োজনে) প্রহার (হালকা শাসন) কর এবং তাদের শোয়ার বিছানা পৃথক করে দাও। [সুনানে আবু দাউদ ৪৯৬]

মুরতাদ সম্পর্কে ইসলামী আদালতকে রাসূল সা. নির্দেশ দিয়ে বলেছেন,

عن ابن عباس مرفوعا، «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ». أخرجه البخارى فى صحيحه، كتاب استتابة المعاندين و المرتدين، باب حكم المرتد و المرتدة.

হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, যে মুসলমান দ্বীন ত্যাগ করল তাকে মৃত্যুদণ্ড দাও। [সহীহ বুখারী, হাদীস : ৬৭২২] ইসলাম কোনও অমুসলিমকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করে না। তবে একমাত্র বিজয়ী ধর্ম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত থাকতে চায়।

৪. বিজয়ী ধর্ম ইসলাম

ইসলাম আল্লাহ-মনোনীত সত্য ধর্ম। সেহেতু বিজয়ী ধর্ম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত থাকা তার একান্ত কাম্য। সত্যের হাতে পৃথিবীর নেতৃত্ব থাকবে এটাই স্বাভাবিক। সুতরাং অন্যায় অবিচার দূর করা, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা, শান্তি স্থাপন এবং খোদাদ্রোহী কুফরী শক্তির দাপট চূর্ণ করে একমাত্র সত্য ধর্ম ইসলামের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা জিহাদের লক্ষ্য।

কুফরী শক্তির দাপট ইসলাম বিরোধী মানবরচিত আইনের কর্তৃত্ব যাবতীয় অশান্তির মূল। হক গ্রহণের পথে বড় বাধা। সাধারণত মানুষ বিজয়ী শক্তি দ্বারা প্রভাবিত হয়। বিজয়ী শক্তির সামনে নতজানু থাকে। চেতনায়-অবচেতনে তাদের অন্ধ অনুসরণ করে চলে। এবং এটাকে গর্বের বিষয় মনে করে। আজকে বিশ্বব্যাপী ইহুদী-নাসারাদের দাপটের প্রেক্ষাপটে মুসলিম জাতির প্রতি চোখ বুলালেই তো বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে যায়। এমতাবস্থায় হকের দাওয়াত যথাযথ

কার্যকর হয় না। হককে বোঝা ও মানা অধিকাংশের পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই জিহাদের মাধ্যমে কুফরী শক্তিকে পদানত করে ইসলামকে বিজয়ী করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

﴿ قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلۡحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعۡطُواْ ٱلۡجِزۡيَةَ عَن يَدٖ وَهُمۡ صَٰغِرُونَ ﴾

কিতাবীদের মধ্যে যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে না এবং পরকালেও না এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা কিছু হারাম করেছেন তাকে হারাম মনে করে না এবং সত্য দ্বীনকে নিজের দ্বীন বলে স্বীকার করে না তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর। যাবৎ না তারা অধীন হয়ে জিযিয়া আদায় করে। [সূরা তাওবা: ২৯] অর্থাৎ তারা ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনতা মেনে নেওয়ার পর ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করবে।

আরো ইরশাদ হয়েছে,

﴿ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَرۡسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلۡهُدَىٰ وَدِينِ ٱلۡحَقِّ لِيُظۡهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوۡ كَرِهَ ٱلۡمُشۡرِكُونَ ﴾

আল্লাহ তো হিদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ নিজ রাসূলকে প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি সব দ্বীনের উপর তাকে জয়যুক্ত করেন। মুশরিকগণ এটাকে যতই অপ্রীতিকর মনে করুক। [তাওবা : ৩৩]

হাদীস শরীফে জিহাদের পরিচয় ও লক্ষ্য সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন,

«مَنْ قَاتَلَ، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ العُلْيَا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ». أخرجه البخاری فی صحیحه، کتاب العلم، باب من سأل و هو قائم عالما جالسا

রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি যুদ্ধ করল এ লক্ষ্যে, যাতে আল্লাহর দ্বীন বিজয়ী হয় সেই আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করল। [সহীহ বুখারী হাদীসঃ ১২৩]

আরো ইরশাদ হয়েছে,

«الإِسْلاَمُ يَعْلُو وَلاَ يُعْلَى». أخرجه البخاری تعلیقا فی صحیحه کتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبی فمات، هل یصلی علیه الخ و أخرجه البیهقی فی السنن الکبری موصولا و مرفوعا بسند حسن ٢٠٥/٦ باب من صار مسلما بإسلام أبويه أو أحدها.

রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, ইসলাম বিজয়ী দ্বীন পরাজিত নয়। [সহীহ বুখারী হাদীস : ১৩৫৩; সুনানে কুবরা, বায়হাকী ৬/২০৫]

হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ রহ. তাঁর এক মকতুব- এ (চিঠিতে) লিখেছেন :

از آنجاکہ دعوت لسان بدون انضمام جہاد سیف وسنان کامل وتام نمی گردد، لہذا امام ہادیان ورئیس داعیان یعنی سید ولد عدنان علیہ الصلاۃ والسلام آخر کار بقتال کفار مامور گردیدند وظہور شعائر دین متین وعلو اعلام شرع متین از اقامت ایں رکن رکین صورت بست۔

অর্থাৎ যেহেতু মৌখিক দাওয়াত অস্ত্রের জিহাদ ছাড়া পূর্ণাঙ্গরূপ লাভ করে না, তাই সকল দায়ীর ইমাম মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সা. শেষ পর্যায়ে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য আদিষ্ট হয়েছেন। শাআয়েরে দ্বীনের মর্যাদা, শরীয়তের বিজয় ও উন্নতি জিহাদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। [সীরাতে সাইয়েদ আহমদ শহীদ]

অতএব শান্তি স্থাপন এবং ন্যায় ও সত্যকে বিজয়ী রাখার লক্ষ্যে সামর্থ্য অনুযায়ী জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করা মুসলমানদের উপর ফরয। যা পালন করা প্রথমত মুসলিম শাসক ও প্রশাসনের কাজ।

ধর্মনিরপেক্ষতা

ধর্মনিরপেক্ষতা অর্থ যদি কেউ করেন ধর্মের ব্যাপারে ব্যক্তি স্বাধীনতা, কাউকে কোনো ধর্মমত গ্রহণে বাধ্য না করা, তাহলে এ অর্থের সাথে ইসলামের কোনো সংঘাত নেই। কারণ ইসলাম জোরপূর্বক কাউকে ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করে না। ইসলামী রাষ্ট্রে প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীদের নিজ নিজ ধর্ম-কর্ম পালন করার অধিকার রয়েছে। ইসলাম জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য ন্যায় বিচার ও সমান নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করে। এখানে অন্যায় পক্ষপাতিত্বের কোন স্থান নেই।

পরিভাষায় ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ, সমাজ, রাষ্ট্র, আইন ও বিচার এবং শিক্ষাকে ধর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা ধর্মকে ব্যক্তিগত জীবনে সীমাবদ্ধ রাখেন। তাদের শ্লোগান হলো, ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার। অর্থাৎ সামাজিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক অঙ্গন থেকে ধর্মকে নির্বাসিত করাই তাদের লক্ষ্য। ধর্মের কর্তৃত্ব ও ধর্মীয় আইনকে অস্বীকার করাই ধর্মনিরপেক্ষতা। এ অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক কুফরী মতবাদ। কারণ ইসলাম পূর্ণাঙ্গ ধর্ম। সমাজ, রাষ্ট্র, রাজনীতি শিক্ষা সবই ইসলামের ব্যাপকতার আওতাভুক্ত। ইসলাম মানব জীবনের সব ক্ষেত্রে এবং সব কিছুর জন্য আদর্শ। এমন কিছু নেই যার আদর্শ ইসলামে অনুপস্থিত। এবং একজন মুসলমান স্ব স্ব ক্ষেত্রে সে সকল আদর্শ অনুসরণে বাধ্য এবং সেগুলিকে সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে আদিষ্ট।

অন্যান্য ধর্মে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য তেমন কোন বিধি বিধান নেই। তাই তারা ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলে। কিন্তু ইসলাম মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য শাশ্বত আদর্শ দান করেছে এবং তা স্বয়ং সর্বজ্ঞ আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে প্রেরিত, মানব প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল ও ভারসাম্যপূর্ণ আদর্শ। তাই ইসলামে ধর্মনিরপেক্ষতার কোন অবকাশ নেই। কোন মুসলমান আদর্শ হিসাবে ধর্মনিরপেক্ষতাকে গ্রহণ করতে পারে না। এখানে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর সেনানী শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা সাইয়েদ হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. এর কয়েকটি বাণী প্রণিধান যোগ্য। তিনি লেখেন,

اسلام نے کسی صورت میں بھی غلامی پر قناعت نہیں کی، بہت سے نصوص سے دلالۃ اور صراحۃ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کا تقاضا حکومت اور سربلندی ہے، قرآن میں فرمایا گیا **هو الذي ارسل رسوله الخ** جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے : **الإسلام يعلو ولا يعلى.**

অর্থাৎ ইসলাম কোন অবস্থায় অধীন হয়ে থাকাকে পছন্দ করেনি। কুরআন হাদীসের বহু দলিল থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, হুকুমত ও বিজয় ইসলামের একান্ত কাম্য। কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে, (অর্থ) আল্লাহই তো হিদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ নিজ রাসূলকে প্রেরণ করেছেন যাতে তিনি সব দ্বীনের উপর তাকে জয়যুক্ত করেন। [মাকতুবাতে শাইখুল ইসলাম :২/১০৯]

যে সব অমুসলিম দেশে সাংবিধানিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষতা চাপিয়ে দেওয়া হয় সেসব দেশের মুসলমানদের করণীয় কী? এ সম্পর্কিত একটি প্রশ্ন এবং হযরত মাদানী রহ.- এর উত্তর এই,

سوال: کیا مسلمانوں کو غیر اسلامی آئین پر قانع ہو جانا درست ہے؟

মুসলমানদের জন্য অনৈসলামিক আইনের উপর সন্তুষ্ট থাকা জায়েয কি?

بلا شبہ اسلامی قوانین ہی دنیا کے لئے امن وسلامتی کے ضامن ہیں مشترکہ حکومت میں ان. قوانین کی حاکمیت مطلقہ قائم نہ ہوگی نہ حدود شرعیہ جاری ہوں گی، لیکن یہ خود مسلمانوں کا علمی و عملی فریضہ ہے کہ وہ دوسری قوموں سے اسلامی قوانین کی یہ حیثیت تسلیم کرالیں أهون البليتين آخری منزل مقصود نہیں ہو سکتی.

অর্থাৎ নিঃসন্দেহে ইসলামী আইনই বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার একমাত্র গ্যারান্টি। সেক্যুলার রাষ্ট্রে এ আইনের সর্বোচ্চ ক্ষমতা ও শাসন কায়েম হবে না। এবং শরীয়তের হুদুদ দণ্ডবিধি জারি হবে না। তবে এটা স্বয়ং মুসলমানদের দায়িত্ব যে, তারা তাত্ত্বিক আলোচনা এবং নিজেদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ইসলামী আইনের শ্রেষ্ঠত্ব

তুলে ধরবে। যাতে অন্যান্য জাতি তা মেনে নিতে বাধ্য হয়। আর أهون البليتين দুই বিপদের মাঝে ছোট বিপদ মেনে নেওয়ার নীতি (অর্থাৎ বড় বিপদ থেকে রক্ষা পেয়ে শান্ত হওয়ার নীতি) আখেরী মানজিল বা চূড়ান্ত লক্ষ্য হতে পারে না। [মাকতুবাতে শায়খুল ইসলাম : ২/১১২]

হযরত মাদানী রহ. এখানে দুই বিপদ বলে, রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করাকে বড় বিপদ বলেছেন। আর রাষ্ট্রের নীতি ধর্মনিরপেক্ষ হওয়াকে মুসলমানদের জন্য তুলনামূলক ছোট বিপদ বলেছেন। অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে ধর্ম অনুসরণের সুযোগ থাকে। এটা স্বীকৃত বিষয়। কিন্তু হিন্দুদের ধর্মরাজ্যে এ সুযোগটুকু স্বীকৃত হওয়ার কোনো নিশ্চয়তা নেই। তাছাড়া রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে শিরক ও মূর্তি পূজার আধিপত্যের চেয়ে ধর্মনিরপেক্ষতা কিছুটা সহনীয়। তাই রামরাজ্যের চেয়ে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রনীতি সে দেশে মুসলমানদের জন্য অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। যদিও এর কোনোটিই দ্বীন নয়; বরং তাগুতী নেযাম।

আর এটা আখেরী মানজিল হতে পারে না বলে মুসলমানদের শক্তি সঞ্চয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এবং তিনি একথা বলেছেন অমুসলিম দেশের প্রেক্ষিতে। কোনও মুসলিম দেশে যদি এমন পরিস্থিতি হয় সেখানে সামর্থ্য অনুযায়ী নাহি আনিল মুনকার বা অসৎ কাজ, চিন্তা ও দর্শন প্রতিহত করা মুসলমানদের দায়িত্ব।

অতএব ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করার অর্থ হবে ইসলামী খেলাফত ব্যবস্থা, ইসলামের আইন ও বিচার ব্যবস্থা এবং ইসলামী জিহাদসহ দ্বীনের বিরাট অংশকে অস্বীকার করা, যা কোন মুমিন মেনে নিতে পারে না।

লেখক: শাইখুল হাদীস, জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ ঢাকা

সত্যের জয় হবেই

শাইখুল হাদীস মুফতী শফিকুল ইসলাম

সত্য-মিথ্যা ও বিশ্বাস-অবিশ্বাসের লড়াই কিয়ামত অবধি চলবেই। একদিকে নফস ও শয়তানের প্ররোচনা, অপরদিকে নবী-রাসূল ও তাঁদের ওয়ারিশগণের সঠিক হেদায়াত ও নির্দেশনা। এ উভয় পক্ষের সমাবেশ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজেই ঘটিয়েছেন। উভয় পক্ষ যেহেতু কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী, তাই নির্দ্বিধায় বলা যায়, এ লড়াই কিয়ামত পর্যন্তের জন্য চিরন্তন। তবে এ লড়াইয়ের উদ্দেশ্য কী? কীইবা তার ফলাফল? উত্তর, তিনি আমাদের পরীক্ষা করতে চেয়েছেন। তাই এ লড়াই একটি পরীক্ষা এবং এ পৃথিবী একটি পরীক্ষাস্থল। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "যিনি (আল্লাহ তায়ালা) জীবন ও মরণ সৃষ্টি করেছেন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য, (দেখতে চেয়েছেন,) তোমাদের কে উত্তম কাজ করে।" [সূরা মুলক: ২]

তাহলে কেন তিনি শয়তান ও নফসকে প্ররোচনা দেওয়ার সুযোগ দিয়েছেন এবং আমাদেরকে তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণের শক্তি প্রদান করেছেন? এর উত্তরও স্পষ্ট, 'এটি পরীক্ষাস্থল'। পরীক্ষার হলে পরীক্ষার্থীর জন্য ভুল-নির্ভুল উভয়টি লেখার অবকাশ থাকে। কিন্তু সফলতা নির্ণয় হয় সঠিক উত্তরের ভিত্তিতেই।

তেমনি এ পরীক্ষায় সত্যের ঝাণ্ডাবাহী দলের জন্য রয়েছে চির শান্তির জান্নাত, এবং সেটিই চূড়ান্ত সফলতা। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, "যাকে দোযখ থেকে দূরে রাখা হল এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হলে সে-ই সফল।" [সূরা আলে-ইমরান: ১৮৫]

পক্ষান্তরে প্রতিপক্ষের জন্য রয়েছে জাহান্নামের উত্তপ্ত অগ্নি। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "আর যারা আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাসী তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম। আর কত নিকৃষ্ট ঠিকানাই না জাহান্নাম।" [সূরা মুলক: ৬]

এ পরীক্ষার ব্যবস্থাপক মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আরেকটি চিরসত্য ঘোষণাও মহাগ্রন্থ আল কুরআনে বিদ্যমান আছে। সেটি হচ্ছে, 'বিজয় সূচিত হবে আল্লাহর দলের হাতেই।' [সূরা মায়িদা: ৫৬] তাই সাময়িক বিজয়ের রূপ বাতিলের পক্ষে মনে হলেও, চূড়ান্ত বিজয় কিন্তু সত্যেরই হবে।

কাজেই আপনাকে এখনই সিদ্ধান্ত নিতে হবে, আপনি কোন দলের হয়ে লড়াইয়ের ময়দানে অবতীর্ণ হবেন। আর আল্লাহর ঘোষণা অনুযায়ী এ বিশ্বাস নিয়ে অবতীর্ণ হবেন যে, এ লড়াই শেষ হবার নয়। এ লড়াই চলছে, চলবে এবং বিজয় হবে সত্যের।

লেখক: শাইখুল হাদীস, জামিআতু ইবরাহীম সাইনবোর্ড ডেমড়া ঢাকা।

আমরা দ্বীনের খাদেম : এটিই আমাদের গৌরব

মাওলানা নোমান আহমদ

মানুষ মানুষ হয় মনুষ্যত্বের গুণে। নৈতিকতার সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ জীবনেই মানুষ পায় পূর্ণতা। আর ইসলাম হল মানোত্তীর্ণ নৈতিকতা ও কালোত্তীর্ণ মানবিকতার একমাত্র সূতিকাগার। তাই বর্তমানে নৈতিক বিপর্যয়ে অধঃপতিত বিশ্বের মুক্তির জন্য ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষার আশ্রয় নেয়ার বিকল্প কিছু নেই। সার্বিক বিবেচনায় সঙ্গত ও প্রমাণিত এ মহা সত্যটিকে সামনে রেখেই মানব মুক্তির রাহবার তৈরির ঐতিহ্যবাহী কারখানা দারুল উলূম দেওবন্দ ভারতের আদলে ঢাকার দিলুরোডে যাত্রা শুরু করে জামিয়া দারুল উলূম আল-ইসলামিয়া।

আল্লাহ তায়ালার অশেষ শুকরিয়া। ২০০৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এ জামিয়া। লিল্লাহিয়্যাত ও খুলুসিয়্যাতের বরকতে ধীরে ধীরে ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি বর্তমান পর্যায়ে পৌঁছেছে। দেশ বিদেশে এর সুনাম-সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। বিশ্ববিখ্যাত দারুল উলূম দেওবন্দের অনুসরণে এর তালীম-তরবিয়তসহ যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। কিছু নিষ্ঠাবান উলামায়ে কেরাম ও এলাকাবাসীর আন্তরিক সহযোগিতায় অতি অল্প সময়ে এটি দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত উন্নীত হয়। এ বছরই প্রথম দাওরায়ে হাদীস চালু হয়। যোগ্য শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা হাদীসের ক্লাস চালু হয়। আকাঈদ, ইবাদাত, মুআমালাত, সামাজিকতা ও নৈতিকতার উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখে চলছে এ জামিয়া। ভবিষ্যতেও এ জামিয়া বৃহত্তর পরিসরে উম্মতের খেদমত আঞ্জাম দানে বদ্ধপরিকর।

প্রিয় ছাত্র ভাইদের প্রতি অনুরোধ, এখান থেকে ফারিগ হয়ে দাওয়াত, তালীম, তাযকিয়া তথা দ্বীনের সবগুলো শাখায় কাজ করার জন্য তোমাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। উম্মতের এ ক্রান্তিলগ্নে তাদের প্রতি দরদ নিয়ে কাজ করতে হবে। খুলুসিয়্যাতের সাথে এ দ্বীনকে বিজয়ী করার কাজে লেগে যেতে হবে। এ পথে আমাদের কোন ব্যর্থতা নেই; বরং সফলতা আমাদের পদচুম্বন করবেই। আল্লাহর নবীর দ্বীনের খাদেম হিসাবে লেগে থাকতে পারা আমাদের গৌরবের বিষয়। দ্বীন ও দ্বীনের কাজ অনেক মূল্যবান। দুনিয়ার কোন লোভ যেন আমাদেরকে দ্বীন থেকে বিচ্যুত করতে না পারে। আল্লাহ আমাদেরকে দ্বীনের যোগ্য খাদেম হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

লেখক: মুহাদ্দিস, জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া মুহাম্মদপুর ঢাকা।

ইসলামী আইনের বৈশিষ্ট্য

আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ ইয়াহইয়া

সাধারণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা আইনের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহের কথা উল্লেখ করে থাকেন-

১. আইন সর্বজনীনঃ অর্থাৎ জীবনের সকল ক্ষেত্রকে নিয়ন্ত্রণের জন্য আইনের প্রয়োজন রয়েছে। মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে সাধারণ নাগরিক থেকে নিয়ে রাষ্ট্রপ্রধান পর্যন্ত এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও আইনের প্রয়োজন রয়েছে।

২. আইন মানুষের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করেঃ অর্থাৎ আইন ব্যক্তি মানুষের ও সংঘবদ্ধ মানুষের তথা সংস্থার বাহ্যিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। তবে আইন লঙ্ঘন করলে সম্ভাব্য শাস্তির ভয়ে আইন-নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করতে করতে অনেক ক্ষেত্রে মানুষের মনের গতিও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

৩. আইন সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্তৃত্বের দ্বারা স্বীকৃতঃ রাষ্ট্রের স্বীকৃতি ও জনগণের সম্মতি আইনকে অর্থবহ করে।

৪. আইন সকলের উপর সমভাবে প্রযোজ্যঃ অর্থাৎ রাজা, প্রজা, ধনী, নির্ধন নির্বিশেষে সকলেই আইনের দৃষ্টিতে সমান।

৫. সকলের জন্য আইন অবশ্য পালনীয়ঃ আইন পালনের ক্ষেত্রে কোন মহল বা শ্রেণীর শৈথিল্য সমাজে বিপর্যয় ডেকে আনে।

ইসলামী আইনের বৈশিষ্ট্যগুলো উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যের কাছাকাছি হলেও তা একটু ভিন্নধর্মী। তাই ইসলামী আইনের বৈশিষ্ট্যসমূহ সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহ নিম্নে তুলে ধরা হল।

১. ইসলামী আইন সর্ব প্রকার দোষত্রুটি মুক্ত

আধুনিক রাষ্ট্র-বিজ্ঞানীদের দাবী অনুসারে আইন হল মানুষের প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতা থেকে উৎসারিত কতিপয় নিয়ম-নীতি যা মেনে চলার জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে সকলকে বাধ্য করা হয়।

মানুষের মেধা ও বুদ্ধি, প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতা সবসময়ই সীমাবদ্ধ, একদেশদর্শী ও পক্ষপাত দোষে দুষ্ট হয়ে থাকে। মানুষ লোভ ও ক্রোধের উর্ধ্বে নয়। তাই কোন বিষয়ের প্রতি লোভ কোন প্রভাবশালীকে আইন প্রণয়নে আগ্রহী করতে পারে।

আবার কারো প্রতি ক্রোধও কোন ক্ষমতাসীনকে আইন প্রণয়নে উৎসাহী করে তুলতে পারে। তাছাড়া মানুষের চিন্তা-চেতনা, মেজাজ ও রুচি ভিন্ন ভিন্ন। ফলে একজন যা ভাল মনে করবে, অন্যজন তা ভাল মনে নাও করতে পারে। ফলে সমাজের কল্যাণ চিন্তায় একজন কর্তৃক প্রবর্তিত আইন অন্যজনের নিকট কল্যাণকর মনে নাও হতে পারে। অতএব আইন প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই এমন হতে হবে যে, তারা এসব মানবীয় দুর্বলতার ঊর্ধ্বে অবস্থান করবেন। তাদের প্রজ্ঞা হবে সর্বোপরি ও ত্রুটিহীন, যাদের অভিজ্ঞতা এককাল বা একদেশদর্শীতার সীমাবদ্ধতার দায়ে দুষ্ট হবে না। কিন্তু মানুষের জন্য এইসব যোগ্যতা অর্জন করা এবং উল্লিখিত ত্রুটিসমূহের সম্পূর্ণ ঊর্ধ্বে ওঠা সম্ভব নয়। তাই মানুষের জন্য সামগ্রিকভাবে ত্রুটিমুক্ত আইন প্রণয়ন করাও সম্ভব নয়। এ কারণেই দেখা যায় যে, মানব রচিত আইনগুলো সদা পরিবর্তনশীল। এক সরকার যে আইন প্রবর্তন করে যায়, তা অন্য সরকার এসে পরিবর্তন করে ফেলে।

কিন্তু ইসলামী আইনের প্রবর্তক হলেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা। যিনি যাবতীয় মানবীয় সীমাবদ্ধতার উর্ধে, যিনি সকল জ্ঞান ও প্রজ্ঞার উৎস, যিনি অগ্র-পশ্চাৎ সব কিছু সম্পর্কে অবগত, যিনি সর্বকালে সর্বত্র বিরাজিত; সময়ের প্রশ্নে যার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সবই সমান, যিনি সব ধরণের মানবীয় দুর্বলতার উর্ধে, কোন বস্তু বা বিষয় তাঁকে প্রলোভিত করে না, আবার কারো প্রতি ক্রোধ বা বিদ্বেষের বশবর্তী হয়েও তিনি কিছু করেন না। অতএব মহান আল্লাহ তায়ালা মানুষের কল্যাণ ও রাহনুমায়ীর জন্য প্রত্যক্ষ ওয়াহী বা পরোক্ষ ওয়াহী তথা নবী সা. এর মাধ্যমে যে আইন প্রবর্তন করেছেন তা সর্বপ্রকার দোষত্রুটি মুক্ত হওয়াই স্বাভাবিক। আল্লাহ ও তদীয় রাসূল প্রণীত আইনে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দৈন্যতারও কোনরূপ আশঙ্কা নেই। কেননা আল্লাহ হলেন সর্বশ্রোতা ও সর্বোপরি জ্ঞানী।

অতএব আল্লাহ ও তদীয় রাসূল কর্তৃক প্রবর্তিত আইনগুলো সর্বোচ্চ মাত্রায় ত্রুটিমুক্ত হবে একথা বলাই বাহুল্য। ইসলামী আইন তাই সকলের জন্য সর্বোচ্চ মাত্রায় জুলুম ও শোষণের সম্ভাবনা মুক্ত। এককাল ও একদেশদর্শীতার যে ত্রুটি সাধারণ আইনে থাকা সম্ভব তাও ইসলামী আইনে নেই।

২. ইসলামী আইন মানুষের বাহ্যিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণের সাথে সাথে মানুষকে আত্মিকভাবেও পরিশুদ্ধ করে তোলে।

ইসলামী আইন ধর্মানুসারীদের নিকট একদিকে যেমন রাষ্ট্রীয় আইন হিসেবে গণ্য হয়, অনুরূপভাবে তা ঐশী বিধান বা নির্দেশরূপেও গণ্য হয়। রাষ্ট্রীয় আইনকে মানুষ ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করে। কেননা সেগুলো রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে মানুষের

উপর আরোপিত। কিন্তু ধর্ম মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ ও প্রেরণা দ্বারা গৃহীত। তাই ধর্মের বিধি-বিধান মেনে চলাকে মানুষ আন্তরিকভাবেই নিজের জন্য কল্যাণকর মনে করে। আর ধর্মীয় বিধান ফাঁকি দেয়াকে মানুষ নিজেকে ফাঁকি দেয়ারই নামান্তর বলে মনে করে। এ কারণে ইসলামী আইনকে ধর্মীয় বিধান হিসেবে মেনে নিয়ে তা পালনের জন্য মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই উৎসাহিত হয়। আর কখনও আইনের খেলাফ কিছু হয়ে গেলে মানুষ নিজেই আন্তরিকভাবে অনুশোচনায় দগ্ধ হয়। এই অনুশোচনাবোধ কখনো কখনো এত তীব্র হয় যে, আদালত তার অপরাধ ক্ষমা করে দিলেও সে নিজেকে নিজে ক্ষমা করতে পারে না।

ধর্মীয় অনুভূতিকে জাগ্রত করতে পারলে ইসলামী বিধান প্রতিটি নাগরিককে এহেন অনুশোচনার আগুনে দগ্ধ করে আধ্যাত্মিকভাবে পরিশুদ্ধ করে তুলতে সক্ষম। আর আইনের ব্যাপারে যখন মানুষের মাঝে এহেন অনুভূতি কাজ করবে তখনই আইন গতি পাবে; তখন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, পুলিশ, গোয়েন্দা কোন কিছু ছাড়াই মানুষ আপসেআপ নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করবে। আর প্রত্যেক মানুষের অন্তরাত্মা তার কর্মের আদালতরূপে ভূমিকা পালন করবে। মানুষ আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার বিশ্বাসের ফলে বাহ্যিক ও আত্মিক উভয় দিক থেকে নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করবে। কেউ না দেখলেও আল্লাহ্ দেখছেন এই চেতনা তাকে যাবতীয় পাপকর্ম থেকে বিরত রাখবে। এই জগতে কারো কাছে জবাবদিহির মুখোমুখি না হলেও কাল কিয়ামতে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে এই বিশ্বাস তাকে অন্যায় ও জুলুম থেকে বিরত রাখবে। নাগরিকদের একটি শান্তিপূর্ণ পরিবেশ কায়েম করা সম্ভব হবে। অন্যথায় আইনের দ্বারা কাউকেই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে না। আইন হয়ে দাঁড়াবে শুভঙ্করের ফাঁকি। আর আত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জনের এহেন পর্যায় পযর্ন্ত মানুষকে পৌঁছানো ইসলামী আইনের পক্ষেই সম্ভব। মানব রচিত কোন আইনের দ্বারা এ সুফল পর্যন্ত পৌঁছা কিছুতেই সম্ভব না।

৩. ইসলামী আইনে আইন মেনে চলার অনুপ্রেরণাদায়ক শক্তি বিদ্যমান রয়েছে

আইনের কথা বলতে গেলেই আমাদের সামনে ভাল ও মন্দের, ন্যায় ও অন্যায়ের একটি পার্থক্য রেখা থাকা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ভাল-মন্দের পার্থক্য রেখা যদি কোন মানুষ কর্তৃক নির্ধারিত হয় তাহলে তা মেনে চলার ব্যাপারে মানুষ নিজের মাঝে কোন স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা অনুভব করে না। কেননা একজন মানুষ যখন বিশ্বাস করে যে, ভাল ও মন্দের পার্থক্যসীমা আমারই মত একজন মানুষ কর্তৃক নির্দেশিত, তখন কোনরূপ সমস্যায় ফেঁসে যাওয়ার ভয় না থাকলে, জেল-

হাজতের ভয়, পুলিশ হয়রানীর আশঙ্কা না থাকলে এবং সমাজের মানুষ কর্তৃক গণধোলাই খাওয়ার ভয় না থাকলে মানুষ তা অনায়াসে লঙ্ঘন করতে পারে। তাই এ সকল বাধার চোখকে ফাঁকি দিতে পারলে; কিংবা যেখানে এ ধরনের কেউ নেই সেখানে অপরাধ সংঘটিত করতে কেউ কখনও কুণ্ঠাবোধ করে না। আর এই যদি অবস্থা হয় তাহলে প্রতিটি মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তার পিছনে ২৪ ঘণ্টা গোয়েন্দা নিয়োগ করে রাখতে হবে। তবে ২৪ ঘণ্টার জন্য গোয়েন্দা নিয়োগ করেও কাউকে নিয়ন্ত্রণ করা কেবল তখনই সম্ভব হবে যখন খোদ গোয়েন্দা ঘুষ খেয়ে দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করবে না কিংবা কাজে ফাঁকি দিবে না বলে নিশ্চিত হওয়া যাবে। আর এ কাজটি যে কত কঠিন তা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই বুঝতে সক্ষম।

আর আত্মিকভাবে সংশোধন না করে শুধুমাত্র বাহ্যিকভাবে সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করা হলে সমাজ দণ্ডের ভয়ে হয়ত খানিকটা নিয়ন্ত্রিত থাকতে পারে। কিন্তু কার্যত মানুষ আত্মিকগুণশূন্য হয়ে পড়বে। অথচ আত্মিকভাবে মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না হলে যে কোন আইনের শাসন ব্যর্থ হতে বাধ্য । এজন্য সকল ঐশী দ্বীনে মানুষের আত্মিক উৎকর্ষের প্রতি সমধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আত্মাকে বাহ্যিক শাসন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না। আত্মাকে নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতি হল মানুষকে আত্মিক গুণসমৃদ্ধ করে তোলা এবং তার আগ্রহ, অনুপ্রেরণা, উৎসাহ এবং উদ্দীপনাকে অনুপ্রাণিত করা; যাতে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সে আইন মেনে চলে।

সামাজিক বিধি-বিধান ও আইনের শাসন মানার প্রতি মানবাত্মাকে অনুপ্রাণিত করতে হলে এক মহৎ লক্ষ্যের প্রতি তাকে অনুপ্রাণিত করতে হবে, যে লক্ষ্যে সফলতা অর্জনের জন্য সে স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই অগ্রসর হতে সচেষ্ট হয়। আর সে লক্ষ্যের আলোকেই নির্ধারণ করতে হবে ভাল-মন্দ এবং ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য রেখা। এতে ভাল-মন্দ এবং ন্যায়-অন্যায়ের ব্যবধান রেখা যেমন অর্থবহ হয়ে উঠবে তেমনি মানুষ তার কাঙ্ক্ষিত সাফল্যের পথে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে যা কিছু মন্দ, যা কিছু অন্যায়, যা কিছু আইনবিরোধী বলে সে মনে করবে তা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সে বর্জন করে চলবে। কেবল এই একটিমাত্র প্রক্রিয়ায় মানুষকে আত্মিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব, অন্য কোন পন্থায় নয়।

গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্মেরই অন্তরতম দর্শন হিসেবে এই বিশ্বাসকে তুলে ধরা হয়েছে যে, এই জগতের অস্তিত্ব এবং এতে ঘটমান সকল ঘটনার পিছনে একজন সজ্ঞান সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী স্রষ্টার হাত সচল রয়েছে। সেই স্রষ্টার ইচ্ছার অনুকূলে নিয়ন্ত্রিত হয় সবকিছু। সেই সত্তার সাথে মানুষের অন্তরাত্মার ঘনিষ্ঠ আত্মিক সম্পর্ক রয়েছে। মানুষের কর্মের প্রভাবে

সেই সম্পর্কে হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। ভাল কাজ করলে সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়, মন্দ কাজ করলে সম্পর্ক হ্রাস পায়। আর স্রষ্টার পরম সন্তুষ্টিকে নির্ধারণ করা হয়েছে মানুষের জীবনের পরম অভীষ্ট লক্ষ্য হিসেবে। সেই সত্ত্বার সন্তুষ্টি লাভের উপায় হল পরিশুদ্ধ ও আইনানুগ জীবন-যাপন করা এবং স্রষ্টার ইচ্ছার অনুকূলে জীবনকে উৎসর্গ করা। সে আলোকেই নির্ধারিত হয়েছে ভাল ও মন্দের পার্থক্য সীমা। অন্যকথায় ধর্মে যে ঐশী সত্ত্বাকে স্রষ্টা মনে করা হয়, ভাল-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য নির্ণয়ে তার ইচ্ছাই চূড়ান্ত এবং ভাল-মন্দের মানদণ্ডও তৎকর্তৃক নির্ধারিত।

এই বিশ্বাসের আলোকে মানুষের জীবনের সফলতা, তার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ এবং তার নৈতিক চিন্তা ও নৈতিক ধারণার উৎস হিসেবে গণ্য হয়েছে স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাসের ভিত্তিতে। এজন্যই স্রষ্টার ইচ্ছার অনুকূলে কাজ করে মানুষ আত্মিকভাবে পরিতৃপ্তি বোধ করে। আর স্রষ্টার আদেশ-নিষেধ তথা আইন-কানুন সে মেনে চলে সফলতা লাভের প্রত্যাশায়, স্বতঃস্ফূর্ত অনুপ্রেরণায়।

এটাই সেই সঞ্জীবনী শক্তি যা কোনরূপ পাহারাদারি ছাড়াও, গোয়েন্দা কিংবা পুলিশী হয়রানীর সম্ভাবনা, গণধোলাই খাওয়ার কোনরূপ আশঙ্কা যেখানে নেই সেখানেও মানুষকে আইন মেনে চলতে বাধ্য করে। আইন মেনে চলাকে তখন মানুষ নিজের জন্য বোঝা মনে করে না এবং এটাকে নিজের জন্য পরম সৌভাগ্য বলে গণ্য করে। স্রষ্টার বিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়ে উঠা জীবনের পরিক্রমা এবং স্রষ্টার প্রতি মানব মনের এই ভক্তি ও অনুরাগ এটা মানুষের আত্মার চিরন্তন বিশ্বাসকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। এই বিশ্বাস সর্বকালের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আচরণের মাঝে সামঞ্জস্য বিধানের ক্ষেত্রে সঠিক নিয়ামক হিসেবেও কাজ করে। এটা মানুষের এমন মজ্জাগত বিষয়রূপে চেতনার জগতে বিরাজিত যে, এটা মানবাত্মার সহজাত প্রবৃত্তির বিকল্পহীন এক দাবী। এ কারণেই মানুষ ঐশ্বরিক সন্তুষ্টির অনুকূলে আচরণ করে তৃপ্তিবোধ করে। এমনকি যে চরম নাস্তিক হিসেবে জীবন কাটায় সেও মৃত্যুর আগে ঐশ্বরিক বিধানের অনুকূলে ক্ষণিক মুহূর্ত অতিবাহিত করে নিজের অবাধ্যতার জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করত স্রষ্টার অনুগ্রহ লাভ করতে চায়। তার মৃত্যু যেন ধর্মীয় বিধান মতে হয় এবং তার শেষকৃত্য যেন ধর্মীয় বিধি ও আচার মুতাবেক হয় এই ওসিয়ত করে তবেই মৃত্যুবরণ করে। এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস ও ঐশী বিধানের প্রতি আনুগত্য এটা আদিকালে সহজ সরল বিশ্বাসের ফল নয়; যা অধিকতর আলোকপ্রাপ্ত যুগের মানুষ পশ্চাতে ফেলে এগিয়ে যেতে পারে। বরং এটা মানব আত্মার মজ্জাগত চিরন্তন এক অনুভূতি। তাই বলতে হয় যে, সুনিয়ন্ত্রিত কোন সামাজিক পরিবেশ পৃথিবীতে গড়ে তুলতে হলে একমাত্র ইসলামী বিধানের দ্বারাই সম্ভব । কেননা ইসলামী বিধানে ঐশী চেতনাবোধ ও আত্মাকে নিয়ন্ত্রণ করার সুনিপুণ কর্মপন্থা বিদ্যমান

আছে এবং অন্তরকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মেনে চলার অনুপ্রেরণাদায়ক শক্তি বিদ্যমান রয়েছে। যা অন্য কোন মানব রচিত বিধানে নেই ।

এ কারণেই কুরআনে কারীমে যেখানেই কোন আইনের কথা আলোচনা করা হয়েছে; তার পরেই 'আল্লাহকে ভয় কর' বলে তাকওয়ার পতি উদাত্ত আহ্বান জানানো হয়েছে। কেননা আইন মেনে চলার বিষয়টি তাকওয়া ও আল্লাহর ভয়ের উপর ভিত্তিশীল। আর তাকওয়াই একমাত্র নিয়ামক-যা মানুষকে আত্মিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

৪. ইসলামী আইন পরিবর্তনের সম্ভাবনামুক্ত ক্ষেত্রে চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয় কিন্তু ক্রমবিকাশমান ক্ষেত্রসমূহ পরিবর্তনশীল

ইসলাম এক চিরন্তন ধর্ম। সর্বকালে মানুষের জন্য মহান আল্লাহ তায়ালা এ ধর্মকেই মনোনীত করেছেন। এ কারণেই এর নীতিগত চিরন্তন বিষয়সমূহকে 'নস' দ্বারা বিধিবদ্ধ, আইনের দ্বারা সুসংহত করে দেয়া হয়েছে। যে সকল ক্ষেত্র সর্বকালে একইরূপে বিদ্যমান থাকে এবং যে সকল ক্ষেত্রে পরিবর্তনের কোনই সম্ভাবনা নেই সে সকল ক্ষেত্রের সকল খুঁটিনাটি বিষয় নস জাতীয় আইন তথা বিধিবদ্ধ অপরিবর্তনীয় আইন দ্বারা এমনভাবে সুসংহত করে দেয়া হয়েছে যে, সে সব বিষয়ের কর্মপন্থা ও কর্মপ্রণালীর কোন একটি দিকও নস জাতীয় বিধানের আওতামুক্ত রাখা হয়নি। এ ক্ষেত্রে মানুষের চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণার মোটেই অবকাশ রাখা হয় নি। সাধারণত ইবাদত সংক্রান্ত বিষয়ে এবং অপরাধ সংক্রান্ত যেসব বিষয় সর্বকালে একইরূপ থাকে, যেমন চুরি যিনা ইত্যাদি ক্ষেত্রের বিধান নস দ্বারা সুসংহত করে দেয়া হয়েছে। এগুলো পরিবর্তন কিংবা সংস্কার করার অধিকার কোন মানুষের নেই। এ সকল বিধান সম্পর্কেই আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে সে বিষয়ে কোন ভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার কোন অধিকার তাদের থাকবে না। [আহযাব: ৩৬]

কিন্তু যেসব বিষয় সদা পরিবর্তনশীল, সে সব বিষয়ে ইসলাম চুলচেরা বিধান প্রবর্তনের পথ অবলম্বন করেনি। এধরণের ক্ষেত্রে মৌলিক দিক-নির্দেশনার মাধ্যমে 'করণীয় ও বর্জনীয়' এর চৌহদ্দি নির্ধারণ করে দিয়েছে। এ সকল ক্ষেত্রে আইনের এখতিয়ারে পড়ে এ ধরনের সকল সম্ভাব্য অবস্থার আইন তৈরির বিষয়টি কুরআন সুন্নাহর দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ইজতিহাদ তথা চিন্তা গবেষণার মাধ্যমে গৃহীত অনুসিদ্ধান্তের উপর ভিত্তিশীল রাখা হয়েছে। আর ইজতিহাদ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের এ

দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে কুরআন সুন্নাহর বিশেষজ্ঞ (أولي الأمر) ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ তথা أصحاب الحل والعقد এর উপর। সেই সীমানাও চৌহদ্দির মাঝে থেকে মানুষ যে কর্মপন্থা ও কর্মপ্রণালীই উদ্ভাবন করুক; যদি তা সেই মৌলিক নীতিসমূহের পরিপন্থী না হয় তাহলে তাই শরীয়তসম্মত বিধান (তথা ঐশী অনুমোদনপ্রাপ্ত বিধান) বলে গণ্য হবে।

যেহেতু মানুষের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা ক্রমপরিবর্তনশীল; তাই এ ধরনের ক্ষেত্রের জন্য নস জাতীয় অনমনীয় ও অপরিবর্তনীয় আইন ক্রমঃউন্নয়নের পথে মারাত্মক বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। এ কারণে ইসলাম এ সকল ক্ষেত্রের জন্য নস দ্বারা বিধিবদ্ধ পুঙ্খানুপুঙ্খ আইন প্রণয়ন না করে বরং মৌলিক দিক-নির্দেশনার মাধ্যমে কর্তব্য-অকর্তব্যের চৌহদ্দি নির্ধারণ করে দিয়েছে। বস্তুত যে চৌহদ্দির মাঝে থেকে মানুষের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বিকাশ ও চূড়ান্ত উন্নতি অর্জন করা সম্ভব এবং হওয়া উচিত; খুঁটি পুতে আইনের সেই চৌহদ্দি নির্ধারণ করে দিয়ে এ সকল ক্ষেত্রের খুঁটিনাটি বিধান প্রবর্তনের ও প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি কুরআন সুন্নাহর বিশেষজ্ঞ ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের ইজতিহাদী রায়ের উপর ছেড়ে রাখা হয়েছে। এভাবে ইসলামী আইন একই সাথে অপরিবর্তনীয় ও পরিবর্তনশীল উভয় বৈশিষ্ট্যকে আত্মস্থ করে নিয়েছে। ইজতিহাদের মাধ্যমে বিধান প্রবর্তনের পথ খোলা রাখার ফলে আর্থ-সামাজিক ময়দানে কর্মকৌশল ও কর্মপন্থা নির্ধারণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট ব্যাপকতা সৃষ্টি হয়েছে। ফলে সময়ের দাবী, অবস্থানগত অবস্থা ও মানুষের সামাজিক বিকাশের স্তরের নিরিখে দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ ইজতিহাদের মাধ্যমে যথোপযুক্ত বিধি-বিধান ও কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে পারেন। একারণেই ইসলামী আদর্শ ও বিধি-বিধান রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের ভিত্তি হওয়ার জন্য অধিক উপযুক্ত। ইসলামপূর্ব ধর্মসমূহে যে সীমাবদ্ধতা ছিল, ইজতিহাদের বৈধতার মাধ্যমে ইসলাম সেই সীমাবদ্ধতাকে খতম করে দিয়েছে।

৫. ইসলামী আইন সর্বজনীন, সর্বকালীন ও সামগ্রিক

যে কারণে মানুষের জন্য মহান আল্লাহ তায়ালা যে হিদায়াত তৎকালীন নবীর মাধ্যমে প্রেরণ করেছেন, সেটিকে সেই কালে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের অনুকূল এবং তাদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রয়োজন পূরণের পর্যাপ্ত উপাদান সমৃদ্ধ করেই প্রেরণ করেছেন।

ইসলামকে আল্লাহ তায়ালা কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের জন্য একমাত্র আদর্শ হিসেবে মনোনীত করেছেন। এ কারণে কিয়ামত পর্যন্ত বিকাশমান পৃথিবীর মানুষের

হিদায়াত অর্জনের প্রয়োজনীয় উপাদান সমৃদ্ধ করেই একে প্রেরণ করেছেন। জীবনের কোন দিকই এর হিদায়াতের গণ্ডি বহির্ভূত থাকেনি। যে কোন যুগের মানুষ জীবন সমস্যার যে কোন দিক সম্পর্কে হিদায়াত লাভ করতে চাইলে ইসলামী আদর্শে সে সম্পর্কে অবশ্যই দিক নির্দেশনা পাবে। যেহেতু সর্বকালে মানুষের হিদায়াতের আকর হিসেবে আল-কুরআনকে অবতীর্ণ করা হয়েছে, এ কারণে আল-কুরআনের আয়াতসমূহের গঠন প্রণালীতে এমন অভিনব কলাকৌশল অবলম্বন করা হয়েছে যে, একটি আয়াত থেকে একেক কালের মানুষ একেক ধরনের প্রয়োজন পূরণের ক্ষেত্রে দিক-নির্দেশনা লাভ করে। অর্থাৎ কুরআন ও হাদীসের শব্দ প্রয়োগ ও বাক্য বিন্যাসে এতটাই ব্যাপকতা রাখা হয়েছে যে, ক্রমবিকাশমান পৃথিবীর প্রতি যুগের মানুষ তাদের প্রয়োজন পূরণের প্রয়োজনীয় হিদায়াত ও দিক-নির্দেশনা কুরআন ও সুন্নাহ থেকে পেতে পারে। তদুপরি ইজতিহাদী বিধানের অবকাশ রেখে যুগোপযোগী কর্মপন্থা ও কর্মকৌশল উদ্ভাবনের পথও ইসলামী আদর্শে খোলা রাখা হয়েছে। এই ব্যাপকতার ও সামগ্রিকতার জন্য আরেকটি দিক হল এই যে, ইসলাম জীবনের কোন একটি মাত্র দিক নিয়ে অগ্রসর হয়নি। বরং জীবনের সকল ক্ষেত্রের জন্যই ইসলাম বিধি-বিধান প্রদান করেছে। ইসলাম আল্লাহর সঙ্গে মানুষের শুধু আধ্যাত্মিক সম্পর্ক নিরূপণ, আর সেই সম্পর্কের উন্নতির জন্য কতিপয় আচার-অনুষ্ঠান প্রবর্তনের মাঝ দিয়েই আপন পরিমণ্ডলকে সীমিত করেনি। বরং আল্লাহ ও মানুষের মধ্যকার এই সম্পর্কের ভিত্তিতে মানুষের ব্যক্তিগত, নৈতিক, পারিবারিক, সামাজিক জীবনের আচার-আচরণের ধরণ কিরূপ হবে তারও একটি চৌহদ্দি নির্ধারণ করে দিয়েছে এবং এ জন্য সুনির্দিষ্ট কতিপয় কর্ম-পরিকল্পনাও প্রদান করেছে। ইসলাম মনে করে মানুষের জীবনের সামগ্রিক দিকই- তা ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক গণ্ডি হোক না কেন- আল্লাহর ইচ্ছার অনুকূলে পরিচালিত হবে। তাই সকল ক্ষেত্রেই মানুষকে আল্লাহর বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে। মানুষের জীবনের যে ক্ষেত্র যতটুকু সেই বিধি-বিধান থেকে বিচ্যুত হবে, মানুষ সেই ক্ষেত্রে সেই পরিমাণ ব্যর্থ হতে বাধ্য। জীবনের কোন বিষয়ে আল্লাহর বিধান কি, তা কুরআন-সুন্নাহয় বিবৃত হয়েছে। তার কতিপয় আল-কুরআনে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে, আর কতিপয় বর্ণিত আছে অস্পষ্টভাবে। অনুরূপভাবে আল্লাহর বিধানের কতিপয় রাসূল সা. এর হাদীসে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে, আর কতিপয় আছে অস্পষ্টভাবে।

যুগসমস্যার প্রেক্ষিতে জ্ঞানীজনরা কুরআন ও হাদীসে উল্লিখিত ঐসব অস্পষ্ট বিধানসমূহ খুঁজে বের করেন এবং যুগসমস্যার সমাধান পেশ করেন। মানুষের জীবন সমস্যার এমন কোন দিক পাওয়া যাবে না, যে সম্পর্কে কুরআন সুন্নাহয়

কোন দিক-নির্দেশনা নেই। বিশেষ করে মানুষের জীবনে যেসব ঘটনা ঘটতে পারে, এর প্রায় সবগুলোরই প্রতি বাস্তবায়ন রাসূল সা.-এর ২৩ বৎসর কর্মবহুল জীবনে ঘটেছে। এ কারণে সুলায়মান নদভী রহ. রাসূল সা.-এর পূর্ণাঙ্গতার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন- 'এমন এক ব্যক্তিজীবন যা সকল শ্রেণীর মানুষের যাবতীয় অবস্থার প্রেক্ষিতে সৃষ্ট বিভিন্ন হালাতের জীবন্ত নমুনা হতে পারে এবং মানুষের সর্ব প্রকার শুদ্ধ আবেগ, অভিপ্রায় ও উন্নত নৈতিক চরিত্রের সমাহারে সমৃদ্ধ হতে পারে তা কেবল মুহাম্মদ সা. এর পবিত্র জীবনাদর্শই হতে পারে।'

বিধান প্রয়োগের প্রশ্নে এই যে সার্বজনীনতা তার আওতা থেকে কেবল তারাই অব্যাহতি পাবে, যাদেরকে বিধানদাতা কোন বিশেষ অক্ষমতার জন্য বিধানের অবশ্য অনুসরণীয়তা থেকে অব্যাহিত দিয়েছেন। যেমন রমযান মাস আসলে রোযা রাখতে হবে। তবে অপ্রাপ্ত বয়স্ক, ঋতুবর্তী নারী, নেফাসাক্রান্ত নারী, মুসাফির, অসুস্থতা ও বার্ধক্যজনিত অক্ষম ব্যক্তিরা এই বিধানের আওতা থেকে অব্যাহতি প্রাপ্ত।

বিধানের এই সামগ্রিকতা থেকে শরীয়তের বিধানদাতা কর্তৃক কাউকে যদি কোন বিশেষ রেয়ায়েত করা হয়, তাহলে সেটা কেবল তার জন্যই প্রযোজ্য হবে; অন্যের বেলায় নয়। যেমন শরীয়তের যে কোন বিষয় আইনগতভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য কমপক্ষে দুইজন সাক্ষীর প্রয়োজন। কিন্তু আবু বুরদার উট দ্বারা কুরবানী করা বৈধ হওয়ার ঘটনায় খুযায়মার একার সাক্ষীকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে।

৬. ইসলামী আইন দুনিয়া ও আখিরাতব্যাপী পরিব্যাপ্ত

ইসলামী আইন কেবলমাত্র মানুষের ইহজাগতিক সফলতা ও কল্যাণের পথ নির্দেশ করেই ক্ষান্ত হয় না; বরং ইহজাগতিক পরিমণ্ডল অতিক্রম করে মৃত্যুর পরবর্তী জীবন ও জগতের কল্যাণ ও সফলতার পথও নির্দেশ করে। বরং ইসলামী আইনের আলোকে মানুষের ইহজাগতিক সফলতার ভিত্তি হল পরজগতের মুক্তি ও নাজাতের উপর। তাই এমন কোন পার্থিব সফলতা, যা পরকালীন নাজাতের অনুকূল নয়; তা কোন সফলতা বলেই গণ্য হয় না। ইসলামের সকল আইন পরজগতের বিশ্বাসের উপর ভিত্তিশীল। আর পরজগত হল অনন্ত অসীম। দুনিয়ার জীবন খুবই ক্ষণস্থায়ী। তাই পরজীবনের সফলতার জন্য মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আইনানুগ জীবন যাপন করে। ইসলামী আইনের উপর পরজগতের বিশ্বাসের গভীর প্রভাব রয়েছে। বিজ্ঞ ফিকাহবিদরা বলেছেন যে, আইনের কাছে জবাবদিহিতার দু'টি দিক রয়েছে। যথা পার্থিব ও পরকালীন দিক। দুটি দিকেরই

স্বতন্ত্র জবাবদিহিতার কথাও তাঁরা বলেছেন। তাই অপরাধী অপরাধ করার পর তাকে পার্থিব জগতের শাস্তি দেয়া হলে সে নির্দোষ হয়ে যায় না, বরং পরকালের প্রশ্নে জবাবদিহিতার দায়িত্ব তার থেকেই যায়। ফিকহে হানাফীর এ প্রবাদ সর্বজনবিদিত যে, 'আলহুদূদু সাতিরাতুন' অর্থাৎ শাস্তি অপরাধীর অপরাধকে ঢেকে দেয়, তবে তাকে নিরপরাধ করে দেয় না। এ সম্পর্কে আল-কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ প্রণিধানযোগ্য,

﴿ إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾

যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং ভূ-পৃষ্ঠে ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায় তাদের শাস্তি এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে, অথবা শূলবিদ্ধ করা হবে, অথবা বিপরীত দিক হতে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে, অথবা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। দুনিয়ায় এটাই তাদের লাঞ্ছনা, আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। [সূরা মায়েদা: ৩৩]

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلۡفَٰحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ﴾

যারা মুমিনদের মাঝে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে। [সূরা নূর: ১৯]

﴿ وَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذۡكَرَ فِيهَا ٱسۡمُهُۥ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَآۚ أُوْلَٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمۡ أَن يَدۡخُلُوهَآ إِلَّا خَآئِفِينَۚ لَهُمۡ فِي ٱلدُّنۡيَا خِزۡيٞ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٞ ﴾

যে আল্লাহর মসজিদসমূহে তাঁর নাম স্মরণ করতে বাঁধা প্রদান করে, সেগুলোর বিনাশ সাধনে প্রয়াসী হয়, তা থেকে বড় জালেম কে হতে পারে? অথচ ভয়বিহ্বল না হয়ে তাদের জন্য মসজিদে প্রবেশ করা সঙ্গত ছিল না। পৃথিবীতে তাদের জন্য লাঞ্ছনা ভোগ ও পরকালে তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে। [সূরা বাকারা: ১১৪]

এইসব আয়াত থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, অপরাধীর শাস্তি একবার পৃথিবীতে আর একবার আখিরাতেও হবে। এ কারণে যখন কোন একজন মানুষ এ বিশ্বাস নিয়ে বেড়ে উঠে তখন সে অপরাধের ব্যাপারে অধিক সতর্ক জীবন যাপন করে।

৭. ইসলামী আইন মানুষকে সর্বোচ্চ পর্যায়ের সফলতার পথ নির্দেশ করে। এতদসঙ্গে মানুষের নৈতিক মানকেও উন্নতি করে

কোন বিষয় আপাতদৃষ্টিতে লাভজনক ও কল্যাণকর মনে হলেও সুদূর- প্রসারী ফলাফলের বিচারে তা হয়ত অকল্যাণকর বলে প্রমাণিত হবে। আবার আপাতদৃষ্টিতে যা অকল্যাণকর মনে হয় তা পরিণামের বিচারে হয়ত অকল্যাণকর না হয়ে কল্যাণকর বলে প্রমাণিত হবে। মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে-

﴿ وَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَهُوَ خَيۡرٞ لَّكُمۡۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّواْ شَيۡـٔٗا وَهُوَ شَرّٞ لَّكُمۡۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ﴾

হয়ত তোমরা কোন বিষয়কে অপছন্দ করবে, অথচ সেটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, আবার হতে পারে তোমরা কোন বিষয়কে ভাল মনে করবে অথচ তা হবে তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। [সূরা বাকারাঃ ২১৬]

যেহেতু ইসলামী আইন মহান আল্লাহ তায়ালা ও তদীয় রাসূল কর্তৃক প্রবর্তিত, অতএব তা সর্বোচ্চ মাত্রায় কল্যাণকর হবে নিঃসন্দেহে। তবে আপাতদৃষ্টিতে হয়ত কারো কাছে তা তেমন কল্যাণকর মনে নাও হতে পারে।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, "অবাধ ব্যক্তি-মালিকানা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য কল্যাণকর। না সমাজতন্ত্র অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য কল্যাণকর" এই বিতর্কের মাঝে দাড়িয়ে যখন ইসলাম বিধি-নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তি মালিকানার কথা বলে, তখন পুঁজিবাদীদের দৃষ্টিতে ইসলামী দর্শন কল্যাণকর মনে হয় না। সমাজতন্ত্রীদের কাছেও তা কল্যাণকর মনে হয় না। কিন্তু তিক্ত অভিজ্ঞতার পথ মাড়ানো পর পুঁজিবাদীরা তাদের দর্শন সংশোধন করে সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তি মালিকানাকেই আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছে। আবার সমাজতন্ত্রীরা তাদের দর্শন পরিবর্তন করে সীমিত ক্ষেত্রে ব্যক্তিমালিকানার স্বীকৃতি দেয়ার দর্শনে বিশ্বাসী হয়েছে।

সারকথা এই যে, উভয় দল অভিজ্ঞতার পথ মাড়ানোর পর সলজ্জভাবে একথাই স্বীকার করে নিয়েছে যে, ইসলামী আদর্শই শাশ্বত ও কল্যাণকর। তাই সকল উচ্চাঙ্গের চিন্তাবিদরা দ্ব্যর্থহীনভাবে একথার স্বীকৃতি দিয়েছেন যে, কেবল ইসলামই এমন এক আদর্শ, যা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াহীন সর্বোচ্চ কল্যাণের পথ নির্দেশ করে। মানুষের ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন ও আন্তর্জাতিক জীবন সম্পর্কে ইসলাম যে হিদায়াত পেশ করেছে, তার পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের মাধ্যমেই পৃথিবীতে স্বর্গীয় শান্তির পরিবেশ গড়ে তোলা সম্ভব। অধ্যাপক বার্নাড শ তাই বলেছিলেন যে, আজকের অশান্ত পৃথিবীর পরিবেশকে পরিবর্তন করার জন্য মুহাম্মদ সা.-এর ন্যায় একজন নেতার বড় প্রয়োজন। অর্থাৎ

তাঁর আনীত আদর্শ ও নৈতিক শিক্ষাই পারে আজকের অস্থির পৃথিবীকে সুশান্ত করতে।

সাহাবায়ে কিরাম এই আদর্শের বাস্তবায়ন করেই পৃথিবীতে সর্বকালীন সর্বোৎকৃষ্ট উন্নত সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। আর এ ক্ষেত্রে ইসলামের নৈতিক শিক্ষাই মূল নিয়ামক হিসেবে কাজ করে থাকে।

ইসলাম আইনকে সংশ্লিষ্ট করে দিয়েছে নৈতিকতার সাথে। আর নৈতিকতাকে জড়িয়ে দিয়েছে ঈমানের সাথে তথা পরকালীন নাজাতের সাথে। ফলে যে অধিক আইনানুগ জীবন-যাপন করবে, সে নৈতিকতায় তত অগ্রগামী বলে গণ্য হবে। আর যার নৈতিক জীবন যত উন্নত হবে তার পরজীবনের নাজাতের সম্ভাবনা তত অধিক থাকবে। ফলে একজন মানুষ আইনানুগ জীবন যাপন করে পরকালীন মুক্তির উজ্জ্বল সম্ভাবনায় পরিতৃপ্তি বোধ করে। এই তৃপ্তিবোধ তাকে আরো অধিক মাত্রায় আইনানুগ জীবন যাপন করতে এবং নৈতিক পরিশুদ্ধি অর্জন করতে উৎসাহিত করে। এভাবে ক্রমান্বয়ে একজন মানুষ সর্বোচ্চ নৈতিক মানসম্পন্ন মানুষে পরিণত হয়। এ ধরনের নৈতিক মানসম্পন্ন মানুষের দ্বারাই আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন সম্ভব।

৮. ইসলামী আইন জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্যই কল্যাণকর

ইসলামী আইন যে কেবলমাত্র মুসলমানদের জন্যই কল্যাণকর তাই নয়; বরং জাগতিক প্রশ্নে তা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্যই কল্যাণের বার্তাবাহক।

পরকালের নাজাতের প্রশ্নকে বাদ দিয়ে শুধু ইহজাগতিক শান্তি-শৃঙ্খলা, জানমালের নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা, সামাজিক অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতা ইত্যাদির প্রশ্নে বিবেচনা করা হয়, তাহলে ইসলামী আইনে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের জন্য সর্বোচ্চ সুযোগ রয়েছে। বলতে গেলে ইসলামী রাষ্ট্রদর্শনে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের জান-মাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার ক্ষেত্রে যে অবাধ সুযোগ রাখা হয়েছে তার নজির খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

একটি ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী যে কোন অমুসলিম নাগরিক সামান্য জিযিয়া করের বিনিময়ে কিংবা রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে রাষ্ট্রের পক্ষে যুদ্ধে অংশ গ্রহণের অঙ্গীকারের মাধ্যমে একজন মুসলমানের ন্যায় অধিকার নিয়ে বসবাস করতে পারে এবং ইসলামী রাষ্ট্রের যাবতীয় সুফল ভোগ করতে পারে। ধর্মীয় পূর্ণ স্বাধীনতা ও জানমালের পূর্ণ নিরাপত্তা সহকারে তারা ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করতে পারে এবং সকল প্রকার নাগরিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারে। বরং একজন

অমুসলিমের প্রতি সদাচার ও সহমর্মিতার উন্নত বিধান ইসলাম দিয়েছে, পৃথিবীর যে কোন ধর্ম কিংবা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র সে পর্যায়ের সুযোগ-সুবিধা দিতে অক্ষম। এমনকি কোন মুসলমান যদি কোন অমুসলিম জিম্মিকে মানসিকভাবে কষ্ট দেয় কিংবা গালিগালাজ করে তাহলে তাকে অপরাধী বলে গণ্য করা হয় এবং তাকে শাস্তি দেয়া হয়। দুররে মুখতার গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে,

إن شتم مسلم ذميا فقال يا يهودي أومجوسي أو كافر يأثم، مقتضاه أنه يأثم لارتكابه الاثم.

যদি কোন মুসলমান কোন জিম্মি তথা কর দিয়ে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিককে গালি দেয় তাহলে তাকে শাস্তি প্রদান করা হবে। যেমন কোন মুসলমান যদি কোন অমুসলিম নাগরিককে, হে ইয়াহুদী অথবা হে মজুসী কিংবা ওহে কাফের বলে সম্বোধন করে তাহলে সে অপরাধী বলে গণ্য হবে। এর অর্থ হল, সে অন্যায় করেছে তাই অপরাধী বলে গণ্য হয়েছে। [আদ্দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতারসহ: ৪/৭৬]

৯. ইসলামী রাষ্ট্রে আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান

এটি সাধারণ রাষ্ট্রীয় আইনের শ্লোগান হলেও বাস্তবে তা প্রতিফলিত হতে দেখা যায় না। কিন্তু ইসলামী আইনে এটি কেবলমাত্র শ্লোগান নয় বরং এর বাস্তব প্রয়োগ রয়েছে। খুলাফায়ে রাশেদীন তাদের কর্মময় জীবনে এ বিষয়টি চূড়ান্তভাবে বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন। জেরুজালেমের পথে হযরত উমর রা. ও তার গোলাম পালাক্রমে উটের পিঠে আরোহণ করে গোলাম ও মালিকের সাম্যের নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। মিহি আটার রুটি দেখে খলীফা উমর এই প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে, আমার দেশের সকল নাগরিক এরূপ মিহি আটার রুটি খেতে পারে তো? অর্থনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে রাজা প্রজার সাম্যের নজির করেছেন। গাছের নিচে পাহারাহীন নিদ্রামগ্ন হয়ে নিরাপত্তা প্রশ্নেও শাসিতের সাম্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। অর্ধপৃথিবীর শাসকের সামনে দাঁড়িয়ে 'আমরা চাদর একটি করে পেয়েছি, আপনি দুটি কোথায় পেলেন'?-এক বেদুঈনকে এই প্রশ্ন করার অধিকার দিয়ে বাক স্বাধীনতার প্রশ্নে সকলের সমান অধিকারের অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। নিজের ছেলের অপরাধ প্রমাণিত হলে নিজে তার শাস্তি কার্যকর করে আইনের প্রশ্নে সকলেই সমান এর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

ইমাম আবু ইউসুফ তাঁর কিতাবুল খারাজে উল্লেখ করেছেন যে, হযরত উমর রা. খলীফা নিযুক্ত হওয়ার পর জনগণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক ভাষণে বলেছিলেন, 'হে লোকসকল, তোমাদের ধন-সম্পদে আমার অধিকার ঠিক ততটুকু একজন এতিমের সম্পদে তার অভিভাবকের যতটুকু অধিকার থাকে। যদি আমি ধনী হই

তাহলে আমি বায়তুলমাল থেকে কিছুই গ্রহণ করব না। কিন্তু আমি যদি গরীব হই তাহলে প্রয়োজন মাফিক ইনসাফের ভিত্তিতে কেবল আমার খোরাকী গ্রহণ করতে পারব।

তোমাদের কিছু অধিকার আমার দায়িত্বে রয়েছে- সেগুলোর ব্যাপারে তোমরা আমার কাছ থেকে অবশ্যই কৈফিয়ত তলব করবে। যথাঃ

১. রাজস্ব ও ট্যাক্স বাবত আদায়কৃত অর্থ যেন বায়তুলমালে অহেতুক জমা করে না রাখি।
২. আমার হাত দ্বারা এ সব সম্পদ যেন অহেতুক কাজে ব্যয় না হয়।
৩. তোমাদের জন্য মাসিক ও বার্ষিক ভাতার পরিমাণ যেন আমি যথাসম্ভব বর্ধিত করি।
৪. রাষ্ট্রের সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব যেন আমি যথাযথভাবে পালন করি।
৫. অহেতুক যেন তোমাদেরকে কোন বিপদের মুখে ঠেলে না দেই।

তাবাকাতে ইবনে সা'দে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত আবু বকর রা. খলীফা নিযুক্ত হওয়ার পর জনগণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে বলেছিলেন যে- হে লোকসকল, আমাকে তোমাদের শাসক মনোনীত করা হয়েছে। অথচ আমি তোমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নই। আমি যদি ভাল কাজ করি তাহলে তোমরা আমাকে সাহায্য-সহযোগিতা করবে। আর আমি যদি মন্দ কিংবা বক্র পথে চলি তাহলে তোমরা আমাকে সোজা পথে চলতে বাধ্য করবে। সততাই প্রকৃত আমানতদারী আর মিথ্যাই খিয়ানত। আমার কাছ থেকে অধিকার আদায়ের প্রশ্নে তোমাদের মাঝে যে সবচেয়ে বেশী দুর্বল সে আমার নিকট সবচেয়ে শক্তিধর বলে গণ্য হবে। আর অধিকার হননকারীর কাছ থেকে অধিকার ফিরিয়ে আনার প্রশ্নে তোমাদের মাঝে যে সবচেয়ে বেশী শক্তিধর সে আমার নিকট সবচেয়ে বেশী দুর্বল বলে গণ্য হবে। জেনে রেখো, যে জাতি জিহাদ পরিত্যাগ করে সে জাতিকে আল্লাহ হেয় ও লাঞ্ছিত করেন। আর যে জাতির মাঝে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা বিস্তার লাভ করে, সে জাতির উপর আল্লাহ ব্যাপক দুর্যোগ চাপিয়ে দেন। যতক্ষণ আমি আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের আনুগত্য করি ততক্ষণ তোমরাও আমার আনুগত্য করে চলবে। আর যদি আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করি তাহলে আমার আনুগত্য করা তোমাদের জন্য অপরিহার্য নয়'।

এ ভাষণ দু'টোর মাঝ দিয়ে রাজা ও প্রজার সাম্যের যে সুর অনুরণিত হয়েছে তা পাঠক মাত্রই অনুধাবন করতে সক্ষম।

সারকথা এই যে, ইসলামী আইনে শ্বেতাঙ্গ, কৃষ্ণাঙ্গ , আমীর, গরীব, রাজা-প্রজা সকলেই সমান। কেবলমাত্র আইন যাদেরকে অব্যাহতি দিয়েছে শুধু তারাই আইনের আওতা বহির্ভূত থাকতে পারে, অন্য কেউ নয়।

১০. ইসলামী আইনে রাষ্ট্র ঐশী বিধানের আওতায় আইন প্রয়োগকারী রূপে ক্ষমতাপ্রাপ্ত। ধর্মের প্রতি আনুগত্যের স্বীকৃতির মাধ্যমে আইন জনগণ কর্তৃক সমর্থিত

সাধারণভাবে রাষ্ট্রকে মনে করা হয় সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রাষ্ট্রের হাতে অর্পিত। রাষ্ট্রের পক্ষে ক্ষমতাসীন সরকার আইন প্রণয়ন করেন। সরকার ইচ্ছা করলে আইন পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় সংবিধানও পরিবর্তন করতে পারেন। ফলে রাষ্ট্রীয় আইন সাধারণভাবে দলীয় প্রভাব থেকে মুক্ত হয় না। একদল অন্য দলকে আইনের মাধ্যমে হয়রানী ও নির্যাতন করে থকে এবং স্বৈরশাসন কায়েম করে। একনায়কতন্ত্রী শাসনে যেমন স্বৈরচারিতার সুযোগ রয়েছে তেমনি দলীয় শাসনের মাধ্যমেও স্বৈরতন্ত্র গড়ে উঠতে পারে। যা আজকাল খোলা চোখেই প্রত্যক্ষ করা যায়।

কিন্তু ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে রাষ্ট্র ঐশী বিধান মেনে চলার শর্তে সর্বোচ্চ ক্ষমতা লাভ করে। তাই নস নির্ধারিত কোন বিধি-বিধান পরিবর্তন করার অধিকারের থাকে না। আবার সরকার কিংবা আইন পরিষদ ইচ্ছা করলেই যাচ্ছে তাই বিধান তৈরি করতে পারে না। প্রয়োজনে বিধান তৈরির অধিকার রাষ্ট্র ও সরকারের থাকে বটে; তবে তা নস নির্ধারিত চৌহদ্দির মাঝে থেকে করতে হয়। নস নির্ধারিত চৌহদ্দি অতিক্রম করলে তা আপনা থেকেই বাতিল বলে সাব্যস্ত হয়। আবার যে কোন আইনের জন্য পূর্ব দৃষ্টান্ত থাকা অপরিহার্য হয়ে থাকে।

একারণেই ইসলামী রাষ্ট্রে ও সরকার কর্তৃক প্রণীত আইনের মাধ্যমে অন্য দলকে উৎপীড়ন ও নির্যাতন করার কোন সুযোগ থাকে না। আইনের মাধ্যমে স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠারও কোন পথ খোলা থাকে না। তবে পাশ্চাত্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা যে জোর গলায় বলে থাকেন যে, ইসলামী আইনে জনগণের সম্মতির কোন সুযোগ থাকে না একথা মোটেও সত্য নয়। কেননা ইসলামী রাষ্ট্রেও জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে মজলিসে শুরা আইন প্রণয়ন করে বা আইনের অনুমোদন দিয়ে থাকে। অতএব মজলিসে শূরার স্বীকৃতির মাধ্যমে জনগণ মজলিসে শূরা কর্তৃক প্রণীত আইনের প্রতিও তাদের সমর্থন জ্ঞাপন করে থাকেন। তাছাড়া ইসলামের রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে স্বীকার করে নেয়ার মাঝ দিয়ে কুরআন সুন্নাহর আলোকে প্রণীত আইনের প্রতি জনগণের সাধারণ স্বীকৃতি ও সমর্থন আদায় হয়েই যায়।

সারকথাই এই যে, ইসলামী রাষ্ট্রে রাষ্ট্র, রাষ্ট্রপ্রধান, আইন পরিষদ কেউই আইন প্রণয়নের প্রশ্নে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা লাভ করেন না। ফলে যথেচ্ছা আইন প্রণয়ন করে অন্যকে হয়রানি ও নির্যাতন করা কিংবা স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠা করার কোন সুযোগ ইসলামী রাষ্ট্রে থাকে না। এখানে সবাই আল্লাহর আইনের অধীন।

লেখক: মুহাদ্দিস, জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ ঢাকা।

আকাবিরে দেওবন্দের বৈশিষ্ট্য

মাওলানা ড. মুশতাক আহমদ

আমাদের বুর্জুগানে দ্বীনের মৌলিক তিনটি গুণ ছিল। এক. আহলে ইলম। দুই. মুজাহিদ। তিন. আহলে দিল। আহলে ইলম কতটুকু ছিলেন ? এ বিষয়ে আমার কাছে হাজারও দলিল রয়েছে। তবে আমি এ সম্পর্কে লম্বা আলোচনা করবো না। শুধু নগদ একটা রিপোর্ট শুনাব। আমাদের ওস্তাদ হযরত মাওলানা সাইয়িদ আরশাদ আল-মাদানীর দাওয়াতে কিছুদিন আগে মদীনা ইউনিভার্সিটির কয়েকজন প্রফেসর ও সৌদি রাজপ্রতিনিধি দেওবন্দে তাশরীফ আনেন। দারুল উলূম দেওবন্দ সম্পর্কে আগত মেহমানদের অনেক কিছু অজানা ছিল। আসার পর তাদের বিস্তৃতভাবে সব কিছু ঘুরে দেখানো হল। তাঁরা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন যে, এতো কিতাব ! এতো রিজাল ! এতো মাদারেস ! এতো খিদমাত ! যেটা কি না এই এক প্রতিষ্ঠান কায়েম করার মাধ্যমে হয়েছে। সর্বশেষ তাঁরা যে রিপোর্ট করেছেন সেটা ইন্টারনেটেও এসেছে। সেখানে বলা হয়েছে, এটা তো এমন প্রতিষ্ঠান যা এমন খিদমাত আঞ্জাম দিয়েছে যা মদিনা ইউনিভার্সিটি তো দূরের কথা, স্বয়ং মিসরের জামিয়া আজহারও দিতে পারেনি। সারা মুসলিম জাহানের মধ্যে এতো বড় খিদমাত আমাদের বুজুর্গরা আঞ্জাম দিয়েছেন একটি হিন্দুপ্রধান দেশের মধ্যে থেকে।

দুই. তাঁরা ছিলেন মুজাহিদ। আমাদের আহলে দেওবন্দের জন্মই হল জিহাদের উপর। আমার মনে পড়ছে পাকিস্তানের হযরত মাওলানা হক নেওয়াজ রহ. এর বয়ানের একটা অংশ। তিনি বলছিলেন, বাতিল যখন নমরুদের আকারে আসল, হক তখন ইবরাহীম আ. এর আকারে আসল। বাতিল যখন ফেরাউনের আকারে আসল, হক তখন মুসা আ. এর আকারে আসল। এভাবে অগ্রসর হয়ে তিনি বলেন, বাতিল যখন কিসরা ও কায়সারের আকারে আসল, হক তখন মুহাম্মদ সা. এর আকারে আসল। বাতিল যখন যাকাত অস্বীকারকারীর আকারে আসল, হক তখন আবু বকর রা. এর আকারে আসল। এভাবে আরো অগ্রসর হয়ে বললেন, বাতিল যখন ইংরেজের আকারে আসল, হক তখন শাহ আব্দুল আজীজের আকারে আসল। বাতিল যখন বিভিন্ন ফিতনার আকারে আসল, হক তখন উলামায়ে দেওবন্দ আকারে আসল। এখানে উলামায়ে দেওবন্দের আরো একটি ঐতিহাসিক পরিচিতি পাচ্ছি। তা হল এদের জন্মটাই হলো সকল ফেতনা ফ্যাসাদকে নির্মূল ও নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে হক ও হক্কানিয়াতের পতাকা বুলন্দ করার লক্ষ্যে। যেন এ জন্যই তাদেরকে জন্ম দেয়া হয়েছে। এর পিছনে কিছু দলিল তো চাই। দলিল

হল, রূহানিয়াতের লাইনের দলিল। মেহনত করেছেন শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ. । তিনি হিন্দুস্তানকে দারুল হরব ফতোয়া দিলেন। এখন যুদ্ধ পরিচালনার জন্য একজন সাইয়িদ খান্দানের লোক প্রয়োজন। কারণ হাদীসে এসেছে “আল আইম্মাতু মিন কুরাইশিন।” অর্থাৎ যুদ্ধের নেতা কুরাইশী কেউ হবেন। তো সাইয়িদ খানদানের লোক কোথায় পাওয়া যায়। পেয়ে গেলেন সাইয়িদ আহমদ বেরলবী রহ. কে। তখন তিনি টুংকের নবাবের অধীনে একজন সাধারণ সৈনিক হিসাবে চাকুরী করতেন। তাঁকে খবর দেয়া হল। তিনি আসলেন। শাহ সাহেব তাঁকে বাইয়াত করলেন, খিলাফত দিলেন এবং নিজের আত্মীয় স্বজনকে বললেন, তোমরা সকলে সাইয়িদ সাহেবের হাতে বাইয়াত হয়ে যাও। এরপর সাইয়িদ সাহেবকে বললেন, এখন তুমি ঘর থেকে বের হয়ে যাও যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহর ফায়সালা আসে। এর মধ্যে হয় তোমার মৃত্যু হবে অথবা হিন্দুস্তান স্বাধীন হয়ে যাবে। দুটোর একটি অবশ্যই হবে।

সাইয়িদ সাহেব রহ. ঘর থেকে বের হলেন। মেহনত করলেন। বালাকোটের যুদ্ধ হল। বালাকোটের শেষ যুদ্ধ যেদিন ঘটল সেদিনের কথা। ধরুন সকাল ১০ টায় যুদ্ধ শুরু হবে। সকাল ৮ টার দিকে সাইয়িদ সাহেব রহ. তাঁর সাথী-সঙ্গীদের তৈরি করছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি উঁচু গলায় বললেন, মিয়াজী নূর মুহাম্মদ ঝানঝানবী কোথায়? দাঁড়িয়ে যাও। তিনি দাঁড়ালেন। বললেন, সামনে আসো।

তিনি সামনে আসলেন। বললেন, তুমি এখনই হিন্দুস্তান চলে যাও। আদেশ শুনে তিনি কাঁদতে আরম্ভ করলেন। বললেন, হযরত আমি শহীদ হওয়ার জন্য এসেছি। সাইয়িদ সাহেব বললেন, তুমি হিন্দুস্তান চলে যাও। তিনি বললেন, ঠিক আছে যা হুকুম তাই। তিনি সামানা-পত্র নিয়ে হিন্দুস্তানের দিকে রওয়ানা করলেন। তখন তাঁর চোখ দিয়ে পানি ঝরছে। আর বলছেন, আমি তো ফিরে যাওয়ার জন্য এই হাজার মাইল দূরে অবস্থিত ইয়াগিস্থান এলাকায় আসিনি।

দুদিন পর পদযাত্রীদের থেকে খবর নিলেন। বললেন, আমাকে তো হযরত যুদ্ধের ময়দান থেকে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন কিন্তু পরে যুদ্ধের ফলাফল কি হল ? তারা বলল, ‘সেদিন ১০ টার দিকে যুদ্ধ শুরু হলো। ১২ টার আগেই পুরো কাফেলা শহীদ হয়ে গেল।’ উত্তর শুনে তিনি খুব কাঁদতে থাকলেন। আর বলতে থাকলেন, আমাকে কেন মাহরূম করা হলো। রাতে স্বপ্নে দেখলেন, সাইয়িদ সাহেব রহ. এসেছেন। তিনি সাইয়িদ সাহেব রহ. এর পা জড়িয়ে ধরলেন আর বললেন, হযরত আপনি আমাকে কেন মাহরূম করলেন? সাইয়িদ সাহেব রহ. বললেন, আমি মাহরূম করিনি, আমি হুকুম পালন করেছি মাত্র। আমাকে বলা হয়েছে তোমাকে হিন্দুস্তান ফেরত পাঠাতে। কেন তোমাকে ফেরত পাঠানোর হুকুম দেওয়া

হয়েছে, তাও আমি জানি না। এটি তাকবীনের ফায়সালা। হয়তো রহস্য ছিল যে, পুরো কাফেলা আজ এখানে খতম হয়ে যাবে কিন্তু এ আওয়াজকে ধরে রাখার জন্য আগুনের একটা স্ফুলিঙ্গ কোথাও আমানত রাখতে হবে। যাতে সেখান থেকে এটা আবার নতুন করে আরেক দাবানল সৃষ্টি করতে পারে। আমার উপর এক জিম্মাদারী ছিল সেটা তোমার উপর অর্পণ করা হয়েছে। হযরত ঝানঝানবী রহ. বললেন, হযরত আমার দ্বারা সে কাজ কেমন করে সম্ভব? সাইয়িদ সাহেব বললেন, তুমি বহনকারী মাত্র। সময় মত দায়িত্বশীল আসবে। তোমার কাছ থেকে তা বুঝে নিবে। হযরত নূর মুহাম্মদ ঝানঝানবী রহ. বেচারা ছোট আলেম। মকতবের সামান্য ক্বারী সাহেব ছিলেন মাত্র। হিন্দুস্তানে ফিরে অপেক্ষার প্রহর গুণতে লাগলেন, কখন সেই সময় আসবে আর আমার থেকে জিম্বাদারী বুঝে নিবে।

অপরদিকে আমাদের বুজুর্গ সকল আঁকাবিরে দেওবন্দের যিনি মূল হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ.। তিনি প্রথম বাইয়াত হলেন নকশবন্দিয়া তরিকায় হযরত শায়খ নাসির উদ্দিন নকশবন্দী রহ. এর হাতে ইজাজত প্রাপ্তও হলেন। বেশ কিছুদিন পর হঠাৎ দিলের ভিতর ভিন্ন এক জযবা সৃষ্টি হল। চিশতিয়া খান্দানের নূর হাসিল করার জযবা। এমন জযবা যে নিজকে নিবৃত করা সম্ভব হচ্ছে না। এখন কার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন এ সম্পর্কে ইস্তেখারা করলেন। স্বপ্নে দেখলেন, চারজন মানুষ। প্রথমজন হলেন রাসূল সা., দ্বিতীয়জন হলেন হাজী সাহেবের দাদা, তৃতীয়জন হলেন সাইয়িদ আহমদ শহীদ বেরলবী রহ. এবং চতুর্থজন হলেন এমন একজন লোক যাকে তিনি চিনেন না। স্বপ্নের পূর্ণ ঘটনা হযরত গাঙ্গুহীর ইরশাদুল মূল্‌ক গ্রন্থের ভূমিকায় হযরত শায়খ যাকারিয়া রহ. বিস্তারিতভাবে রেফারেন্সসহ লিখেছেন। স্বপ্নে হযরত হাজী সাহেব রহ. দেখলেন যে, তাঁর দাদা সাইয়িদ সাহেবের কানে কানে বলছেন, নাতির শখ হয়েছে চিশতিয়া খান্দানের বারাকাত হাসিল করার। আল্লাহর হাবীব সা. এখানে হাজির। আপনি একটু পরামর্শ ও ফয়সালার ব্যবস্থা করে দিন। তখন সাইয়িদ সাহেব রহ. আল্লাহর হাবীবের সা. কানে কানে কি যেন বললেন। আল্লাহর হাবীব সা. হাজী সাহেব রহ. কে ডাকলেন। হাজী সাহেব রহ. আসলেন। আল্লাহর হাবীব হাজী সাহেবের হাত ঐ অপরিচিত ব্যক্তির হাতে তুলে দিয়ে বললেন, একেও তোমার সাথে নিয়ে নাও। এ কথা বলেই স্বপ্ন শেষ হয়ে গেল।

ইস্তেখারার পর হযরত হাজী সাহেব পাগলের মত হয়ে গেলেন। তাঁর হাত এমন ব্যক্তির হাতে তুলে দেয়া হলো যাকে তিনি চিনেন না। আর তুলে দিয়েছেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সা.। এখন যেখানেই যান ঐ লোককে তালাশ করেন। এভাবে তালাশ করতে করতে ছয় মাস অতিবাহিত হয়ে গেল তবুও তিনি কোন সন্ধান পেলেন

না। আর এ ছয় মাসে তিনি কাষ্ঠ হয়ে গেলেন। দিন যত যায় তাঁর কষ্ট তত বাড়তে থাকে। এটাও আল্লাহ তায়ালার এক কারিশমা যে, আল্লাহকে পেতে হলে যেমন মেহনত করে পেতে হয় তেমনি আল্লাহর মাহবুব বান্দাদেরকে পেতে হলে মেহনত করে পেতে হয়। বিনা তালাশে তাঁদের পাওয়া যায় না। তারা নিজেদেরকে ফেরি করেন না। প্রচারপত্র বিলি করেন না। তবে সন্ধানীরা তাদের খুঁজে নিয়ে আসে। কারণ আল্লাহ যেভাবে নিজেকে আড়াল করে রাখেন, সেরূপ তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকেও আড়াল করে রাখেন। যাই হোক ছয় মাস পর তাঁর এক উস্তাদের সাথে দেখা হল। নাম কালান্দার। তিনি উস্তাদের কাছে নিজের হাল ও অবস্থা ব্যক্ত করলেন। উস্তাদ বললেন, দেখ ইউপি এর লোহারিতে একজন বুজুর্গ আছেন। সেখানে গিয়ে দেখতে পার তাঁর চেহারার সাথে মিলে কিনা।

হাজী সাহেব উন্মুখ হয়ে আছেন কোন ঠিকানা পাওয়া যায় কি না। তিনি লোহারির দিকে ছুটলেন। যেতে যেতে আসরের নামাজ শেষ হয়ে গেল। মুসল্লীরা সব মসজিদ থেকে বের হয়ে গেলেন। শুধু ইমাম সাহেব বসে আছেন। হাজী সাহেব দূর থেকে তাঁকে দেখেই চোখ ছানাবড়া। আরে ! এই তো সেই বুজুর্গ যার হাতে আমাকে উঠিয়ে দেয়া হয়েছে। তিনি নিজেকে আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেন না। তিনি একটা দৌড় দিলেন। দৌড় দিয়ে তাঁর পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে আরম্ভ করলেন। আর এই বুজুর্গই হলেন হযরত নূর মুহাম্মদ ঝানঝানবী রহ. যার কথা আমি পূর্বে বলে এসেছিলাম। হযরত নূর মুহাম্মদ ঝানঝানবী রহ. খুব আদরের সাথে হাজী সাহেবের পিঠের উপর হাত রাখলেন। আর পিতৃত্বের মমত্ব নিয়ে বললেন, বেটা ! ছয় মাস পূর্বে নিজের দেখা স্বপ্নের উপর তোমার আজো এতোখানি আস্থা ! হাজী সাহেব রহ. বলেন, এটা ছিল হযরত ঝানঝানবীর প্রথম কারামত যা আমার সামনে ঘটেছিল। কেননা স্বপ্ন তো দেখেছি আমি, তাও ছয় মাস পূর্বে। কিন্তু এ স্বপ্নের খবর তিনি জানলেন কিভাবে! শুরু হলো চিশতিয়া খান্দানের সবক। উস্তাদ শাগিরদ ঘনিষ্ঠ হতে থাকলেন। যখন হাজী সাহেব বেশ ঘনিষ্ঠ হলেন তখন বলেই ফেললেন, হযরত ! স্বপ্ন তো দেখেছি আমি। কিন্তু আপনি এ খবর পেলেন কিভাবে ? তখন নূর মুহাম্মদ ঝানঝানবী একটা চিৎকার দিলেন। এরপর বললেন, তুমি আমাকে তালাশ করেছ মাত্র ছয় মাস। আর আমি তোমাকে তালাশ করেছি আজ বিশ বছর। কারণ আমাকে বলে দেয়া হয়েছে সময় মত লোক আসবে দায়িত্ব বুঝে নিবে। ছয় মাস আগে একটু ইংগিত পেলাম যে, আমার অপেক্ষার রজনী শেষ হবে। আমার কাঙ্ক্ষিত মানুষ আমার কাছে শীঘ্রই আসছেন। যাই হোক হাজী সাহেব রহ. তাঁর কাছে ছয় মাস থাকলেন। ততদিন চিশতিয়া তরীকার নূর হাসিল করে নিলেন। ছয় মাসের মাথায় হঠাৎ করে একদিন নূর মুহাম্মদ ঝানঝানবী রহ. ইন্তেকাল করলেন। হাজী সাহেবের মাথায় যেন

আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। তিনি এই দুঃখ সহ্য করতে পারলেন না। লোকালয় ছেড়ে বনে বনে ঘুরতে লাগলেন। এভাবে দিন অতিবাহিত হতে লাগল। দশম দিন তিনি মুরাকাবায় বসলেন। সেখানে হুজুর সা. এর যিয়ারত লাভ করলেন। তখন আল্লাহর রাসূল সা. তাঁকে ধমকের সুরে বললেন, ইমদাদ ! তোমার যদি এখানে সহ্য না হয় তাহলে আমার কাছে চলে আসো।

তখন হাজী সাহেবের পকেটে পথখরচ বলতে ছিল মাত্র আট আনা পয়সা। এটা নিয়েই তিনি মক্কা মদীনার দিকে রওয়ানা করলেন। যাই হোক সেখানে পৌঁছলেন। থাকছেন। খুব ভালো লাগছে। কিছুদিন পর মুওয়াজাহা শরীফে মুরাকাবায় বসলেন। এমন সময় রাসূল সা. এর সাথে দীদার হলো। আরজী পেশ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এখানে থাকতে চাই। রাসূল সা. বললেন, না, তুমি এখন হিন্দুস্তান চলে যাও। সেখানে অনেক কাজ বাকি আছে। তোমাকে পুনরায় আবার এখানে আসতে হবে। মনটা খারাপ হয়ে গেল। তখন রাসূল সা. বললেন, তোমাকে তো তৈরি করা হচ্ছে সেখানে কিছু কাজ করার জন্য। তখন মনটা শান্ত হয়ে গেল যে, সেখানে আমি বিশেষ কোন দায়িত্ব পালন করার জন্য যাচ্ছি। পুনরায় আবার এখানে আসবো। তিনি হিন্দুস্তান চলে আসলেন। তখন হিন্দুস্তানে ইংরেজ শাসন। মুসলমানদেরকে রাজত্ব থেকে হটিয়ে ইংরেজ চালিয়ে যাচ্ছে শোষণ-অত্যাচার। পরিস্থিতি দেখে তিনি চিন্তায় পড়ে গেলেন। কি করা যায় ? ডাকলেন তখনকার বড় বড় আলেম উলামাদেরকে। পরামর্শ হল হিন্দুস্তানের যে হাল চলছে এ মুহূর্তে আমাদের কী করণীয়? আমরা কি ইংরেজের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে পারি? তারা বললেন, হযরত ! আমাদের কাছে প্রয়োজনীয় যুদ্ধ সরঞ্জাম নেই। আর এ অবস্থায় যুদ্ধ করা আত্মহত্যার শামিল। কাজেই এ মুহূর্তে জিহাদ ফরজ নয়। হাজী সাহেব রহ. এর মন ভরল না। তিনি বললেন, দেওবন্দ থেকে কাসেম এবং রশিদ কে ডাকো। তাদেরকে ডাকা হলো । তখন আবার মাসআলা উঠলো এ মুহূর্তে আমাদের কী করণীয় ? দুই বুজুর্গ বললেন, আমাদের উপর জিহাদ করা ফরজ। তিনি বললেন, আলহামদুলিল্লাহ। কথা উঠলো, আমাদের হাতে তো অস্ত্র নেই। তারা বললেন, আমাদের কি এতটুকু পরিমাণ অস্ত্র নেই যতটুকু পরিমাণ আল্লাহ তায়ালা আহলে বদরকে দিয়েছিলেন। হাজী সাহেব রহ. বললেন, আলহামদুলিল্লাহ! মোটকথা, জিহাদের ফায়সালা হয়ে গেল। ১৮৫৭ সালে শামেলির যুদ্ধ হলো। হাজী সাহেব রহ. ছিলেন আমিরুল মুমিনীন, কাসেম নানুতবী রহ. ছিলেন সিপাহসালার , আর রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. ছিলেন কাজিউল কুজাত (প্রধান বিচারপতি)। যুদ্ধে হিন্দুস্তান বিজিত হয়ে গিয়েছে তা নয়, তবে হকের আওয়াজ তুলে ধরা হয়েছে। দীর্ঘ কালের জন্য যেন আরেক বীজ বপন করা হয়েছে। ইংরেজদেরও টনক নড়ে উঠেছে।

এক পর্যায়ে হাজী সাহেব রহ. হিজরত করতে বাধ্য হলেন। হযরত নানুতবী রহ. তিনদিন আত্মগোপন করে থাকার সুন্নত আদায় করলেন। হযরত গাঙ্গুহী রহ. ছয় মাস জেলে ছিলেন। এগুলো অনেক লম্বা কাহিনী। প্রতিশোধ হিসাবে ইংরেজরা গাছের ডালে আলেম উলামাদেরকে ফাঁসিতে ঝুলাল। তাও অনেক লম্বা কাহিনী। পরিস্থিতি এতো জটিল হয়ে গেল যে, শেষ রাতে উঠে দুআর মধ্যে আল্লাহর কাছে মনের আকুতি জানিয়ে শব্দগুলো বলার মত হিম্মত হত না- চতুর্দিকে এরূপ গোয়েন্দা লাগানো ছিল। বর্তমানেও এরূপ। আমাদেরও শব্দগুলো বলার হিম্মত হয় না। আগে বুঝিনি, এখন বুঝে আসছে যে, দুআ করতে গেলেও হিম্মতের প্রয়োজন হয়। পরিস্থিতি যখন আরো জটিল হয়ে গেল তখন এ আওয়াজকে কিভাবে জিন্দা রাখা হবে এ নিয়ে সকলে পেরেশান হয়ে গেলেন। আল্লাহ তায়ালা কাসেম নানুতবী রহ. ও রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. কে ইলহাম দান করলেন যে, এ জিহাদ আন্দোলনকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য। এ জযবাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য ১৮৬৬ সালে দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা করা হলো।

দারুল উলূম দেওবন্দকে যে বানানো হবে তার আসবাব কি ছিল? আসবাব কিছুই ছিল না। তাহলে হবে কিভাবে? যেন আল্লাহ পাক সাফ জানিয়ে দিলেন, নুসরত বলতে কিছুই পাবে না তোমরা। একটা গাছ আছে সেখানে বসতে পার। ছাত্র বেশি দেওয়া যাবে না। শিক্ষকও বেশি দেওয়া যাবে না। একজন দেওয়া যাবে। এভাবে ছোট একটা ডালিম গাছের নিচে এক শিক্ষক এক ছাত্র দিয়ে দারুল উলূম দেওবন্দের পদযাত্রা শুরু হলো। এর মাধ্যমে আল্লাহ পাক প্রমাণ করেছেন যে, যেটাকে আল্লাহ পাক বানান, সেটা গাছতলা থেকে সারা দুনিয়াকে আলোকিত করতে পারে। আর যেটাকে আল্লাহ পাক বানান না, সেটা একটা মহা কিছু হওয়ার পরও তার ফল হয় শূন্য। অনেক ভাই বলেন যে, আমাদের বুজুর্গরা যুদ্ধ-জিহাদ থেকে বিমুখ ছিলেন। তাদের খেদমতে এ আলোচনাটি হাদিয়া স্বরূপ জবাব। আমাদের জন্মই হলো জিহাদের উপর। দেওবন্দ মাদরাসাকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে হক ও হক্কানিয়াতের আওয়াজকে টিকিয়ে রাখার জন্য। আর কতকাল সামনে আল্লাহ পাকের এ প্লান-প্রোগাম তা জানি না। কিন্তু বর্তমানে আপনারা সকলে মিলে এসব মাদরাসাগুলোকে সরকারী করার যে পাঁয়তারা করছেন এতে করে মনে হচ্ছে, যে সময়ের জন্য আল্লাহ তায়ালা প্লান-প্রোগ্রাম করেছেন তা হয়তো শেষ হয়ে আসছে। খোদার কসম করে বলছি, সব মাদরাসা যদি সরকারী মঞ্জুরি পেয়ে যায় তাহলে এসব মাদরাসা আর কওমী মাদরাসা থাকবে না। এটা আমার ব্যক্তিগত মতামত। আমি কারো সাথে ঝগড়া করতে চাচ্ছি না। হযরত নানুতবী রহ. উসূলে হাসতেগানার মধ্যে বলেছেন, এ মাদরাসা কোন সরকার কিংবা কোন একক ব্যক্তির সহযোগিতায় পরিচালিত হবে না। এটা সাধারণ

মুসলমানদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাঁদার উপর পরিচালিত হবে। এরূপ ক্ষুদ্র চাঁদা যা আদায় করে চাঁদাদাতা নিজেকে গর্বিত মনে করবে। তাহলে অন্যদের কোন প্রভাব মাদরাসার উপর পড়বে না। মাদরাসাওয়ালা আযাদীর সাথে দ্বীনের খিদমত করে যেতে পারবে।

যাই হোক, এরপর থেকে যত যুদ্ধ, যত আন্দোলন, যত খিদমত হল সব এই একটি স্থান থেকেই শুরু হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা এ দারুল উলূম দেওবন্দকে এভাবেই কবুল করেছেন। আমাদের আহলে দেওবন্দের জন্মই হলো জিহাদের উপর। সকল ফেতনা ফ্যাসাদকে প্রতিহত করে হক ও হক্কানিয়াতের পতাকাকে বুলন্দ করাই হলো আমাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। আমাদের কাজ করতে হবে, শক্তি অর্জন করতে হবে। এগুলো কিভাবে সম্ভব? আল্লামা ইকবাল বলেন, "মুসাল্লা হ্যায় হামারে তাখতে শাহী, খোদা কী ইয়াদ হ্যায় তাক্বাত হামারী।" অর্থঃ জায়নামাজ হলো আমাদের সিংহাসন, আল্লাহর যিকির হলো আমাদের অস্ত্র। যত শক্তি, অস্ত্র ও সামর্থ্য লাগবে সব আল্লাহ্ পাকের সাথে সম্পর্ক বানিয়ে নিতে হবে। কারণ হকপন্থীরা এভাবেই দ্বীনের কাজ করেছেন। যেহেতু এখন একটি পরিস্থিতি চলছে তাই মাঝখানের একটি বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করলাম। মোটকথা, আমাদের বুজুর্গানে দ্বীনের মৌলিক, প্রধান, অন্যতম ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তিনটি বৈশিষ্ট্য ছিল ১. তাঁরা আহলে ইলম ছিলেন, ২. মুজাহিদ ছিলেন, ৩. আহলে দিল ছিলেন। এই তিন বৈশিষ্ট্যের উপর আমরা নিজেদেরকে যদি প্রতিষ্ঠিত করতে পারি তাহলে আমরা তাঁদের যোগ্য উত্তরসূরি। অন্যথায় তাঁদের উত্তরসূরি হিসাবে পরিচয় দেওয়া আমাদের ঠিক হবে না। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে বুঝার তাওফিক দান করুন। আমীন।

লেখক: শাইখুল হাদীস, জামিয়া ইসলামিয়া তেজগাঁও ঢাকা

প্রয়োজন আত্মার সাথে আত্মার সম্পর্ক

শাইখুল হাদীস মুফতী কামরুজ্জামান

নৈতিকতার প্রশ্নে আমরা আজ ব্যক্তি পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত চরম অবক্ষয়ের শিকার। দেশের সকল অঙ্গনই আজ এ অবক্ষয়ে বিপর্যস্ত। যা আমাদের জাতীয় উন্নতি-অগ্রগতি ও ব্যক্তি মানসিকতার উৎকর্ষ সাধনে প্রধান প্রতিবন্ধক। এ অধঃপতনের গতি রোধ করে জাতিকে মানবীয় সকল গুণে উন্নীত করা কিভাবে সম্ভব? ইমাম মালেক ইবনে আনাস রহ. তার এক ঐতিহাসিক উক্তিতে আমাদের তা বাতলে দিয়েছেন। তিনি মুসলিম জাতিকে সম্বোধন করে বলেছেন, 'এ জাতির পূর্ববর্তীগণ যে পদ্ধতিতে সংশোধন হয়েছিল, সে পদ্ধতি ছাড়া পরবর্তীগণ কখনো সংশোধন হতে পারবে না।' আর পূর্ববর্তীগণ হচ্ছেন সাহাবায়ে কেরাম। [আশ-শিফা: ২:২০৫]

তাই সাহাবায়ে কেরাম যে পদ্ধতিতে এ জগতের স্বর্ণমানবে রূপান্তরিত হয়েছিলেন, ঠিক সে পথেই আমাদের এগুতে হবে। এ ছাড়া অন্য কোন পথে এ জাতির কল্যাণ ও মুক্তি সম্ভব নয়। এটিই বাস্তব ও চূড়ান্ত সত্য।

নৈতিকতা ও মানবিক গুণাবলীর বিবেচনায় সাহাবায়ে কেরামের আদর্শ ও চরিত্রের বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, 'কেউ যদি অনুকরণীয় আদর্শ হিসাবে কাউকে গ্রহণ করতে চায়, তাহলে সে যেন মৃতদের কারো অনুকরণ করে। কারণ জীবিত কোন ব্যক্তিই ফিতনা থেকে নিরাপদ নয়। আর মৃত ব্যক্তিবর্গ হচ্ছেন রাসূল সা. এর সাহাবায়ে কেরাম। তাঁরা এ উম্মতের সর্বোৎকৃষ্ট দল, আত্মিক সততা ও শুদ্ধতায় উত্তীর্ণ, সুগভীর জ্ঞানের অধিকারী এবং লৌকিকতাপূর্ণ চরিত্রের কদর্যমুক্ত। তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা তার প্রিয় রাসূল সা. এর সাহচর্য এবং তার আনিত দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য নির্বাচন করেছেন। অতএব, তোমরা তাদের মর্যাদা সম্পর্কে জেনে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ কর এবং তাদের আখলাক-চরিত্র, কৃষ্টি-কালচার যথাসাধ্য আঁকড়ে ধর। কেননা, তারাই ছিলেন সঠিক আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত।' [মিশকাত, হাদীসঃ ১৯৩]

সাহাবায়ে কেরাম যেভাবে কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি রাসূল সা. এর সাহচর্য লাভের মাধ্যমে আত্মার যাবতীয় ব্যাধি থেকে মুক্ত হয়ে পুরোপুরি শুদ্ধ ও পবিত্র হয়েছিলেন, ঠিক সেভাবেই গভীর ইসলামী জ্ঞানার্জনের সাথে সাথে নবীর অনুপস্থিতিতে নবীর ওয়ারিশগণের সাহচর্য গ্রহণ করা আমাদের একান্ত কর্তব্য।

বিশেষকরে আমরা যারা আলেম, যাদের কাঁধে একটি জাতির সঠিক পথপ্রদর্শন ও দিক নির্দেশনার গুরু দায়িত্ব অর্পিত, তাদেরকে অবশ্যই এ বিষয়ে মনোনিবেশ করতে হবে। এ জন্যই আমাদের আঁকাবির-আসলাফ তথা পূর্বসূরিগণ শিক্ষা জীবন থেকেই আত্মশুদ্ধির প্রতি মনোযোগী থাকতেন এবং শিক্ষাজীবন শেষ হওয়ার পর বিভিন্ন পীর-মাশায়েখের সোহবত লাভ করে দ্বীনী খেদমতে আত্মনিয়োগ করতেন।

কাজেই ইলম অর্জনের চেষ্টা-সাধনা ও অধ্যবসায়ের পাশাপাশি আমাদেরকেও আত্মশুদ্ধির প্রতি মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। জনৈক বুযুর্গ কত বাস্তবই না বলেছেন- 'ইলম আয সীনা ব সীনা, না ব পসীনা' অর্থাৎ 'ইলম অর্জনে শুধু সাধনাই যথেষ্ট নয়; বরং প্রয়োজন আত্মার সাথে আত্মার সম্পর্ক।' আল্লাহ তায়ালা আত্মশুদ্ধি চর্চার মাধ্যমে আত্মার পবিত্রতা অর্জন করে নিজেদেরকে ইলম ধারণের উপযোগী করে প্রস্তুত করার তাওফিক দিন। আমীন।

লেখক: শাইখুল হাদীস, জামিয়া ইসলামিয়া হালীমিয়া মধুপুর সিরাজদিখান মুন্সিগঞ্জ

ডা. জাকির নায়েকের ভ্রান্তির তথ্যচিত্র

মুফতী মিযানুর রহমান সাঈদ

﴿ هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِى ٱلْأُمِّيِّـۧنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا۟ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴾

অর্থ: তিনিই উম্মীদের মধ্যে তাদেরই একজনকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন, যে তাদের সামনে তার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করবে, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবে এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমতের শিক্ষা দিবে, যদিও তারা এর আগে স্পষ্ট গোমরাহিতে নিপতিত ছিল।

আল্লাহ তায়ালা উক্ত আয়াতে রাসূলের চারটি দায়িত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। যথা তিলাওয়াতে কুরআন, তা'লীমে কুরআন, তাযকিয়ায়ে নফস ও কুরআনের উপর নিজে আমল করা এবং অপরকে করানো। [সূরা জুমা: ২]

এ চারটি দায়িত্ব রাসূলের অবর্তমানে তিনটি কেন্দ্র থেকে পালিত হচ্ছে। যথাক্রমে, এক. তাবলীগ তথা দাওয়াতের মাধ্যমে। দুই. তাযকিয়া ও ইসলাহ অর্থাৎ আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে। তিন. ইলমী গবেষণা ও রিসার্চ তথা ইসতিম্বাতের মাধ্যমে। প্রথম কাজটি যারা করছেন তারা দাঈ। দ্বিতীয় কাজটি যারা করছেন তারা হক্কানী পীর-মাশায়েখ। তৃতীয় কাজটি যারা করছেন তারা ফকীহ বা মুফতীসহ বিজ্ঞ আলেম-উলামাগণ।

উপরোক্ত তিন কাজের প্রত্যেকটি কাজ উলামাদের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে চলে আসছে দীর্ঘ চৌদ্দশ বছর যাবৎ। কোন যুগে আলেমদের তত্ত্বাবধান ছাড়া দ্বীনী এ কাজগুলো সম্পাদন হয়নি। হওয়া সম্ভবও নয়। এ কারণে যে দাওয়াতী কাজ আলেমদের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে থেকে পরিচালিত হয়েছে সেগুলো সঠিকভাবে পালিত হয়েছে। যদি কোন দিন এ কাজ আলেমদের তত্ত্বাবধান শূন্য হয়ে যায় তাহলে তা সঠিকভাবে পরিচালিত হওয়া সম্ভব হবে না। তদ্রূপ আত্মশুদ্ধির কাজও যুগে যুগে কুরআন সুন্নাহয় অভিজ্ঞ আলেম দ্বারা পরিচালিত হয়ে এসেছে। যেখানেই অজ্ঞ ব্যক্তি পীর বা সাধক হওয়ার দাবী করেছে তার দ্বারা ইসলামের আলোর পরিবর্তে বিদআত ও কুসংস্কারের অন্ধকার ছড়ানো ছাড়া আর কিছুই হয়নি। এক কথায় পীর বা শাইখে তরীকত আলেম হতে হয়। গাইরে আলেম হক্কানী পীর হতে পারে না।

তেমনভাবে ইলমী গবেষণা, মাসআলা ও ফতোয়া প্রদান, কুরআন-সুন্নাহ হতে যুগোপযোগী সমস্যার সমাধানের উদ্ভাবন তথা ইস্তিম্বাতও একমাত্র বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ উলামা বা ফকীহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষে যে সম্ভব নয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যদি কোনো সময় দেখা যায় কোন গাইরে আলেম গভীর ইলমী গবেষণায় হাত দিয়েছে। তাহলে সে নিজেও পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যকেও পথভ্রষ্ট করবে- এ কথা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, শেষ যুগে এমন লোকদের আবির্ভাব হবে যারা ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও মানুষ তাদের ধর্মীয় গুরু মনে করে তাদের থেকে জানতে চাইবে। তারা ইলম ছাড়া (যুক্তি দিয়ে) জবাব দেবে। ফলে তারা নিজেরাও গোমরাহ হবে অন্যদেরকেও গোমরাহ করে ছাড়বে। [সহীহ বুখারী, হাদীসঃ ১০০]

মুদ্দাকথা, কুরআন ও হাদীসের উক্তি দ্বারা প্রমাণিত যে, ইলমী বা ফিকহী ও কুরআন-হাদীস বিষয়ক গবেষণামূলক কাজ একমাত্র বিজ্ঞ আলেম ছাড়া অন্য কেউ করতে পারে না। আর নবী-রাসূল, সাহাবা এবং তাদের ওয়ারিশদের থেকে শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞানার্জন ছাড়া আলেম হওয়া সম্ভব নয়। প্রসিদ্ধ তাবেঈ মুহাম্মদ ইবনে সীরীন রহ. বলেন, ‘এ ইলম দ্বীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই তোমরা লক্ষ রাখো কেমন ব্যক্তিবর্গ থেকে ইলম গ্রহণ করছ।’ [সহীহ মুসলিমঃ ১/১৪]

সুতরাং অভিজ্ঞ উস্তাদ ছাড়া, কুরআন হাদীসের মূলভাষা আরবীতে পাণ্ডিত্ব অর্জন ছাড়া শুধু বিভিন্ন অনুবাদ-ইতিহাস ও বই-পুস্তিকা পড়ে নিজস্ব পড়াশুনা ও ব্যক্তিগত গবেষণার মাধ্যমে একজন অভিজ্ঞ আলেমের তত্ত্বাবধানে থেকে কোন লোক ইসলামের দাওয়াতী কাজ হয়ত আঞ্জাম দিতে পারে, কিন্তু কোন অবস্থাতেই শরয়ী সমাধান, ফতোয়া প্রদান, কোন তাফসীর সঠিক বা ভুল, কোন হাদীস সহীহ বা যঈফ, কোনটি মান্য বা অমান্য, এসব সূক্ষ্ম গভীর ইলমী বিষয়ে সে সিদ্ধান্ত দেয়ার ও মন্তব্য করার অধিকার রাখে না।

বর্তমান সময়ের বহুল আলোচিত স্কলার, মিডিয়াপার্সন এবং বিশেষভাবে বর্তমান সমাজের এলিট শ্রেণীর জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব ডা. জাকির নায়েক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় একজন ডাক্তার। শিক্ষিত কোন আলেম নন। কোন বিজ্ঞ আলেমের নিকট পড়াশুনাও করেননি। নিজে নিজেকে আলেম বলে দাবীও করেন না। এমন ব্যক্তি কোন বিজ্ঞ আলেমের অধীনে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করতে পারেন। ব্যক্তিগত শিক্ষার দ্বারা কেবল এতটুকুই করতে পারেন। কিন্তু তিনি তার পাশাপাশি এমন বিষয়ে নাক গলাচ্ছেন যা একমাত্র মুজতাহিদ ইমামগণের পক্ষে সম্ভব। আমাদের বুঝে আসে না- তিনি এক দিকে নিজেকে আলেম বলতে নারাজ, কিন্তু অপরদিকে ইজতিহাদী বিষয়ে ইচ্ছামত মত প্রকাশসহ ফতোয়া প্রদান এবং সিদ্ধান্ত

দানের কাজ অবিরাম করে যাচ্ছেন। এ কারণেই ডা. জাকির নায়েকের লেকচার বক্তৃতা দ্বারা মুসলিমবিশ্ব মারাত্মক গোমরাহির দিকে ধাবিত হচ্ছে। তার এসব লেকচার কখনো দেখা যায় লামাযহাবীদের ওকালতী, কখনো মাওলানা মওদুদী সাহেবের প্রতিনিধিত্ব, আবার কখনো শিয়া মতবাদের পক্ষাবলম্বন ও অনেক সময় বিজাতীয়দের পক্ষে ওকালতী ইত্যাদি।

নিম্নে তার কয়েকটি বিভ্রান্তিকর উক্তি তুলে ধরে তার সংক্ষিপ্ত খণ্ডন ও সমুচিত জবাব পেশ করা হলো। প্রথমেই আমরা তার সম্পর্কে কিছুটা পরিচয় লাভ করে নেই।

ডা. জাকির নায়েক এর পরিচয়

ডা. জাকির আব্দুল করীম নায়েক। ১৮ অক্টোবর ১৯৬৫ সালে ভারতের মুম্বাইয়ে জন্ম। সেন্টপিটার্স হাইস্কুল থেকে মেট্রিক, কৃষ্ণচন্দ্র রাম কলেজ মুম্বাই থেকে এফ এস সি এবং মুম্বাই মেডিকেল কলেজ থেকে এম বি বি এস ডিগ্রি অর্জন করেন। পেশায় একজন ডাক্তার। ১৯৯4 সালে আহমদ দীদাতের সাথে তার সাক্ষাত ঘটে। আহমদ দীদাতের দাওয়াতী কার্যক্রম ও কর্মপন্থা তাকে আকৃষ্ট করে। তার মতো একজন দাঈ ও ইসলাম প্রচারক হওয়ার জন্য বিভিন্ন ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থের উপর ব্যাপক পড়াশোনা ও গবেষণা করেন। মুসলিম অমুসলিমদের বিভিন্ন সভা সেমিনারে তুলনামূলক বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা এবং যুক্তিতর্কের মাধ্যমে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব, ইসলামই একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম ও আদর্শ- এ কথা মানুষের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। অপূর্ব ভাষাসৌকর্য, বক্তৃতার বাগ্মীয় উপস্থাপন ও মিডিয়ার কল্যাণে অল্পদিনে দেশে বিদেশে ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন।

যদিও ইতিহাস কিংবা অন্য যে কোন বিষয়ের ছাত্র পৃথিবী ও ইসলামের ইতিহাস অধ্যয়ন করে এবং বিভিন্ন ধর্মের উপর গবেষণা করে ইসলামের শাশ্বত শ্রেষ্ঠত্ব ও অন্য সব ধর্ম ও মতাদর্শের অসারতা বুঝে নিতে পারে। কেননা ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝার জন্য কুরআন হাদীসের ব্যাপক বুৎপত্তি থাকাও জরুরী নয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'সত্য মিথ্যা থেকে পৃথক হয়ে গেছে'। [সূরা বাকারাঃ ২৫৬] এ আয়াতে দ্বীনে মুহাম্মদী-ই যে একমাত্র অনুসরণযোগ্য দ্বীন ও আদর্শ- এ কথা মানুষের সামনে দিবালোকের মতো স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। যে কেউ চাইলে ধর্মগুলোর ভালোমন্দ যাচাই করে ইসলামে প্রবেশ করতে পারে।

কিন্তু এতটুকু জ্ঞান অর্জন করেই দাওয়াত ও তাবলীগের এমন পন্থা অবলম্বন শরীয়ত নির্দেশিত কোন পথ নয়। কেননা অন্য ধর্মের গ্রন্থাবলী পাঠের যে কারো অনুমতি নেই। প্রমাণ, রাসূল সা. একদিন ওমর রা. কে তাওরাত পড়তে দেখে খুব

রাগান্বিত হয়েছিলেন। তাছাড়া ডা. জাকির নায়েক আলেমে দ্বীন নন, কোনো দ্বীনী প্রতিষ্ঠানে ইলমে দ্বীন অর্জন করেননি। তারপরও ইসলামের দিকে অমুসলিমদের আকৃষ্ট করার জন্য এই পথ অবলম্বন করেছেন। যুক্তি ও প্রযুক্তিনির্ভর এ যুগে এটা অবশ্যই প্রশংসাযোগ্য কাজ। উলামায়ে উম্মত প্রথমে তার এই কাজ নীরবে সমর্থন করেছেন। কিন্তু বিভিন্ন বিতর্ক অনুষ্ঠানে তাকে কুরআনের তাফসীর, হাদীসের ব্যাখ্যা, আকীদা ও ফিকহী মাসাইল সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্ন করা হলে, তিনি আলেমে দ্বীন না হয়েও কুরআনের তাফসীর, হাদীসের ব্যাখ্যা এবং ফকীহে মুজতাহিদ কিংবা কোনো মাযহাবের অনুসরণ না করে ফিকহী বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিতে শুরু করেন এবং উলামায়ে উম্মতের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত কিংবা তাদের অধিকাংশের গৃহীত সিদ্ধান্তের বিপরীতে অগ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্ত মানুষের সামনে পেশ করতে থাকেন। এ সবকিছুর কারণে তাকে নিয়ে বিতর্কের ঝড় ওঠে। পক্ষে বিপক্ষে তাকে নিয়ে বিভিন্নজন লেখালেখি শুরু করেন। তাই সংগত কারণেই তার আকীদা ও তার পেশকৃত বিতর্কিত ব্যাখ্যা ও মাসআলাগুলো শরয়ী দৃষ্টিকোণ পর্যালোচনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে এমন কিছু অপব্যাখ্যা, ভুল ফতোয়া ও ভ্রান্ত বিশ্বাস সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

কুরআনের আয়াতের অপব্যাখ্যা : ‘হুর’ শব্দের অর্থ সঙ্গী বা সাথী

একটি প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে ডা. জাকির নায়েক বলেন, ‘প্রকৃতপক্ষে হুরের অর্থ সঙ্গী বা সাথী। পরকালে জান্নাতে পুরুষরা পাবে বড় বড় সুন্দর চোখবিশিষ্ট সুন্দরী নারী, আর নারীরা পাবে বড় সুন্দর চোখবিশিষ্ট স্মার্ট পুরুষ। [লেকচার সমগ্রঃ ১/৩৫৯]

ডা. সাহেব ‘হুর’ এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে কুরআন-হাদীস বিরোধী এ মত পেশ করেছেন। কারণ কুরআন ও হাদীসের আলোকে প্রমাণিত হয় ‘হুর’ দ্বারা একমাত্র সুন্দরী রমণীই উদ্দেশ্য। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

﴿ حُورٌ مَّقْصُورَٰتٌ فِى ٱلْخِيَامِ ﴾

অর্থঃ তারা এমন হুর যাদেরকে তাঁবুতে হেফাজতে রাখা হয়েছে [সূরা রহমানঃ ২৭]

উক্ত আয়াতের তাফসীরে ইমাম বুখারী রহ. বর্ণনা করেন, ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, ‘হুর’ হলো কালো তারাবিশিষ্ট চক্ষুধারী নারীগণ। মুজাহিদ রহ. বলেন, ‘হুরুম মাকসূরাত’ বলে ঐ সব নারী উদ্দেশ্য যাদের চোখ ও মনঃপ্রাণ স্বামীর উপর নিবদ্ধ। তারা স্বামী ব্যতীত অন্য কিছুর আশা করে না। [বুখারীঃ ২/৭২৪]

হাদীসে এসেছে, উম্মে সালমা রা. বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ তায়ালার এ আয়াত প্রসঙ্গে আমাকে কিছু বলুন। রাসূল সা. বললেন, 'হুর' শুভ্র এবং ডাগর চক্ষুবিশিষ্ট রমণী।

তাছাড়া উক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা 'হুর' এর সিফাত 'মাকসূরাত' এনেছেন। যা আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ীও প্রমাণ বহন করে যে, 'হুর' মহিলা হবে; পুরুষ হবে না। তাই উল্লেখিত আয়াত, হাদীস ও কুরআনের শব্দের ব্যবহার দ্বারা এটিই প্রমাণিত হয় যে, 'হুর' দ্বারা শুধু সুন্দরী রমণী উদ্দেশ্য; সুন্দর পুরুষের অর্থ এতে বিদ্যমান নেই।

কুরআনের আয়াতের অপব্যাখ্যা : নারী-পুরুষ কর্তৃত্বের দিক দিয়ে সমান

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

﴿ ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ ﴾

অর্থঃ পুরুষ নারীদের অভিভাবক, যেহেতু আল্লাহ তাদের একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছে এবং যেহেতু পুরুষগণ নিজেদের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে। [সূরা নিসাঃ ৩৪]

উক্ত আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে ডা. জাকির নায়েক বলেন- "অনেকে বলে, 'কাওয়ামুনা' অর্থ শ্রেষ্ঠত্বের দিক দিয়ে এক স্তর উপরে, কিন্তু বাস্তবে 'কাওয়াম' শব্দটি 'ইক্বামাতুন' থেকে নির্গত।" এর মাধ্যমে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি নারী ও পুরুষকে শ্রেষ্ঠত্বের দিক থেকে সমান বলেছেন। তার মতে উক্ত আয়াতের তাফসীর হলো, পুরুষ নারীর এক স্তর উপরে দায়িত্বের দিক থেকে। শ্রেষ্ঠত্ব কিংবা কর্তৃত্বের দিক থেকে নয়। তাই রাষ্ট্রক্ষমতা ও শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে নারীও অংশগ্রহণ করতে পারে, শুধু পুরুষ নয়।

এটি নারী পুরুষের স্তর নিয়ে কুরআন হাদীসের বিচার-বিশ্লেষণবিরোধী একটি মত। কারণ, উক্ত আয়াতে 'কাওয়াম' শব্দটি 'ক্বিওয়ামুন' বা 'কিওয়ামাতুন' থেকে এসেছে 'ইক্বামাতুন' থেকে নয়। অর্থাৎ পুরুষ কর্তৃত্বশীল। আল্লাহ পুরুষকে কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের মাধ্যমে নারী থেকে এক স্তর উপরে মর্যাদা দিয়েছেন। কারণ, পুরুষ পরিপূর্ণ কর্মক্ষমতাসহ বিভিন্ন দিক থেকে নারীর উপরে। রাষ্ট্রক্ষমতা ও শাসনকার্য পরিচালনায় একমাত্র পুরুষ কর্তৃত্বের অধিকার রাখে। নারী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও নেতৃত্বের যোগ্য নয়। রাসূল সা. ইরশাদ করেন, সে জাতি কখনোই সফল হবে না যারা নিজেদের নেতৃত্বের ভার কোন নারীর কাঁধে অর্পণ করেছে। [সহীহ বুখারী, হাদীসঃ ৪৪২৫]

এই হাদীসের দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের দিক দিয়েও পুরুষ নারী থেকে এক স্তর উপরে। ইবনে কাসীর রহ. 'কাওয়াম' শব্দের অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন- 'পুরুষ নারীর তত্ত্বাবধায়ক। পুরুষ নারীর কর্তাব্যক্তির মর্যাদায় এবং নারীর চেয়ে বড়। তাকে শাসন করবে এবং শিষ্টাচার শিক্ষা দিবে যখন তার মধ্যে বক্রতা দেখা দেয়। [তাফসীরে ইবনে কাসীরঃ ২/২৫৬]

অন্য আরেকটি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, নারীদের এক স্তর উপরে পুরুষদের মর্যাদা রয়েছে। [সূরা বাকারাঃ ২২৮] ইবনে কাসীর রহ. উক্ত আয়াতের তাফসীরে লিখেন- 'পুরুষদের মর্যাদা দেয়া হয়েছে নারীদের উপরে সৃষ্টি ও চরিত্রগত, পদমর্যাদা, আনুগত্য, খরচের দায়িত্ববহন, ভালো কাজে অগ্রসর হওয়ার ও দুনিয়া আখিরাতে ফযীলত দেয়ার মধ্যে।' [তাফসীরে ইবনে কাসীরঃ ১/৪৫৯] অর্থাৎ উক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সর্বদিক থেকে পুরুষকে এক স্তর উপরে মর্যাদা দিয়েছেন।

অতএব ডা. সাহেবের এই মত একান্তই অগ্রহণযোগ্য যে, দায়িত্বের দিক দিয়ে পুরুষ নারী থেকে এক স্তর উপরে, নেতৃত্বের দিক থেকে নয়। তিনি এই মত প্রকাশের মাধ্যমে কুরআন-সুন্নাহর সরাসরি বিরোধিতা করেছেন। কুরআনের আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। যারা কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের দিক থেকে নারীকে পুরুষের সমান অংশীদার মনে করে এই আয়াতের অপব্যাখ্যা করে, তারা বস্তুত পশ্চিমাদের এ মতবাদের পক্ষে কুরআন থেকে সমর্থন যোগানের চেষ্টা করে। তাই আজ প্রশ্ন উঠেছে, তিনি কি পশ্চিমাদের হয়ে কাজ করছেন?

একটি ভুল ফতোয়া : আল্লাহকে ব্রাহ্মণ ও বিষ্ণু নামে ডাকা যাবে

ডা. জাকির নায়েক বলেন, আল্লাহ পাককে ব্রাহ্মণ ও বিষ্ণু নামে ডাকা যাবে। এমনকি যে কোন নামে ডাকা যাবে, তবে তা সুন্দর হতে হবে। অথচ এ ক্ষেত্রে সঠিক মাসআলা হলো আল্লাহ তায়ালার নাম অথবা তার গুণগত উত্তম নাম যেগুলো আল্লাহর নাম বলে প্রমাণিত, সেগুলো দিয়েই আল্লাহকে ডাকা যাবে। অন্য কোন নাম দিয়ে নয়। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

﴿وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا۟ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِىٓ أَسْمَٰٓئِهِۦ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ﴾

আল্লাহর রয়েছে সব উত্তম নাম, কাজেই তাঁকে সে নাম ধরে ডাকো। আর তাদেরকে বর্জন করো যারা তাঁর নামে বাঁকা পথে চলে। তারা নিজেদের কৃতকর্মের ফল শীঘ্রই পাবে। [সূরা আরাফঃ ১৮০]

এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা তাঁর সুন্দর নামসমূহের মাধ্যমে তাঁকে ডাকতে আদেশ করেছেন। কুরআন হাদীসে তাঁর যে নামগুলো উল্লেখ রয়েছে, সেগুলোই তাঁর সুন্দর নাম। কোনো আয়াত বা হাদীসে ব্রাহ্মণ বা বিষ্ণু নাম উল্লেখ নেই। তাই তা দিয়ে আল্লাহকে ডাকা যাবে না। আল্লাহ তায়ালা উক্ত আয়াতে যারা তাঁর নামের বিষয়ে বক্রতা অবলম্বন করে তাদের থেকে দূরে থাকতে বলেছেন। ডা. জাকির নায়েক আল্লাহর নাম সম্পর্কে এই বক্তব্য দিয়ে স্পষ্ট কুরআনবিরোধী মত পেশ করেছেন। কোনো মুসলমান কখনো এমন মত পোষণ ও এমন আকীদায় বিশ্বাস রাখতে পারে না। ইমাম ফখরুদ্দীন রহ. উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেন- "উক্ত আয়াত প্রমাণ করে আল্লাহ তায়ালার অনেক সুন্দর নাম রয়েছে। সেগুলোর মাধ্যমেই আল্লাহকে ডাকা সকলের ওয়াজিব। এটা প্রমাণ করে আল্লাহর নামগুলো 'তাওকীফী' অর্থাৎ পূর্ব নির্ধারিত; মানুষের পরিভাষাগত নয়। এর দ্বারা বুঝা যায়, তাকে 'জাওয়াদ' বলা যাবে; 'সখী' বলা যাবে না। তদ্রূপ তাকে 'আকিল' 'তাবীব' ও 'ফক্বিহ' বলা যাবে না।" [তাফসীরে কাবীর: ১৫/৪১৫]

উল্লেখ্য, বিষ্ণু ও ব্রাহ্মণ হিন্দুদের ধর্মীয় পরিভাষাগত নাম। এ নামে তারা তাদের দেব-দেবীদের ডাকে। যদি অন্য ধর্মের পরিভাষা দিয়ে তাঁকে ডাকা জায়েয হতো, তাহলে তাঁকে রাসূল সা. মক্কার মুশরিকদের পূজ্য দেব-দেবীদের নাম ধরে ডাকতেন। তাঁকে 'সনম' ও 'লাত-উজ্জা' বলা বৈধ হতো। অথচ কোনো হাদীসে পাওয়া যায় না যে, রাসূল সা. তাকে ঐ সব নামে ডেকেছেন। কিংবা ডাকতে বলেছেন।

একটি ভ্রান্ত বিশ্বাস : কুরআনে ভুল হতে পারে

কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

﴿ وَقَوْمَ نُوحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا۟ ٱلرُّسُلَ ﴾

অর্থ: নূহ আ. এর জাতি যখন রাসূলদের মিথ্যা বলল। [সূরা ফুরকান: ৩৭]

উক্ত আয়াত সম্পর্কে ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল বলেছেন- "কুরআনে উল্লেখ আছে যে, নূহ আ. এর জাতি তাদের 'রাসূলদেরকে' প্রত্যাখ্যান করেছিলো। অথচ আমরা ইতিহাস থেকে জানি যে, নূহ আ. এর জাতির নিকট একজনমাত্র নবীকে পাঠানো হয়েছিলো। সুতরাং এটি পবিত্র কুরআনের একটি ব্যাকরণগত ভুল। কুরআনে বলা উচিৎ ছিলো, 'নূহ আ. এর জাতি তাদের রাসূল কে প্রত্যাখ্যান করেছিল।"

ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেলের এ অভিযোগের উদ্ধৃতি টেনে ডা. জাকির নায়েক বলেন- আমি আপনাদের সাথে একমত যে, কুরআনের এ আয়াতে ভুল হতে পারে। [লেকচার সমগ্র: ১/৫১২]

ডা. সাহেব এখানে সরাসরি কুরআনের সূরা বাকারার ২য় আয়াতকে অস্বীকার করেছেন। যে আয়াতে বলা হয়েছে যে, 'এটি এমন এক কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই। তিনি মেনে নিয়েছেন কুরআনে ব্যাকরণগত ভুল হতে পারে। পূর্ববর্তী মুফাসসীরদের তাফসীরের উপর সার্বিক ধারণা ও শ্রদ্ধাবোধ থাকলে তিনি এমন কথা বলতেন না।

এ আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যায় ইবনে কাসীর রহ. বলেন, এমনভাবে নূহ আ.-এর সম্প্রদায়ের সাথে সে আচরণ করা হয়েছে যখন তারা আল্লাহ প্রেরিত রাসূল নূহ আ. কে মিথ্যারোপ করে। যে ব্যক্তি একজন রাসূলকে মিথ্যারোপ করে সে সব রাসূলকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করে। কারণ ধর্মের মূলনীতির প্রশ্নে সব নবী রাসূল এক ও অভিন্ন। যদি মেনে নেয়া যায়- আল্লাহ তাদের প্রতি সব নবী রাসূলকে প্রেরণ করতেন, তাহলেও তারা সকল রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করত। এ জন্যই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- 'নূহ সম্প্রদায় যখন রাসূলদের প্রত্যাখ্যান করল।' অথচ তাদের প্রতি কেবল নূহ আ. কেই প্রেরণ করা হয়েছিল। [তাফসীরে ইবনে কাসীর: ৬/১০০]

সুতরাং 'রাসূলদেরকে তারা প্রত্যাখ্যান করেছে'- এ আয়াত দ্বারা কুরআনে ব্যাকরণগত ভুল প্রমাণের প্রশ্নই ওঠে না; বরং নূহ আ. কে প্রত্যাখ্যান করা রাসূলগণকে প্রত্যাখ্যান করার শামিল। এ কথাই আল্লাহ বলেছেন এবং এজন্যই বহুবচন শব্দ ব্যবহার করেছেন, যেমনটি পূর্ববর্তী প্রসিদ্ধ সকল মুফাসসিরগণ বলেছেন।

একটি ভুল ফতোয়া : নারী পুরুষের নামাযের মধ্যে কোনো ব্যবধান নেই

জাকির নায়েক বলেন- 'নারী-পুরুষের নামাযের মধ্যে কোনো ধরনের ব্যবধান নেই।' এর প্রমাণ হিসাবে তিনি একটি হাদীস উদ্ধৃত করেন। হাদীসটি এই, এক মহিলা এসে রাসূল সা. কে বলল- 'আমি পুরুষের নামায পড়েছি।' এর উত্তরে রাসূল সা. তাকে কিছু বলেননি। এ দ্বারা বুঝা যায়, নারী পুরুষের নামাযের পদ্ধতি এক ও অভিন্ন।

ডা. জাকির নায়েক এখানেও স্পষ্ট ভুলের শিকার হয়েছেন, একটি হাদীসের বাহ্যিক অর্থ দেখে তিনি এমন ভুল মত প্রকাশ করেছেন। বাস্তবে হাদীসটি দ্বারা

প্রমাণিত হয় নারী পুরুষের নামাযে ব্যবধান রয়েছে। কেননা মহিলা বলেছে- ‘পুরুষের নামায’। নারী হয়েও পুরুষের নামায বলাই প্রমাণ করে উভয়ের নামাযে ব্যবধান রয়েছে। এ ছাড়াও অনেকগুলো সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, উভয়ের নামাযের নিয়মে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। নিম্নে কিছু পার্থক্য প্রমাণসহ উল্লেখ করা হলো-

১. তাকবীরে তাহরীমার সময়ে পুরুষ কান ও নারী কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠাবে। এ সম্পর্কে হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর রা. থেকে বর্ণিত রাসূল সা. তাকে বলেন, হে ওয়ায়েল বিন হুজর ! যখন নামায পড়বে, কান পর্যন্ত হাত উঠাবে, আর মহিলা তার উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে। [মুজামে কাবীরঃ ২২/১৯]

২. হাত উঠানোর সময় পুরুষেরা হাত বুকের সাথে মেলাবে না। পক্ষান্তরে মহিলারা হাত উঠানোর সময় হাত বুকের সাথে মিলিয়ে রাখবে। [দেখুন, মুসান্নাফে আব্দির রাজ্জাকঃ ৩/১৩৭]

৩. পুরুষেরা সিজদা অবস্থায় উভয় হাত জমিন থেকে পৃথক রাখবে। কিন্তু মহিলারা জমিনে বিছিয়ে রাখবে। [দেখুন, সুনানে আবু দাউদঃ ১১৮]

তাবেয়ী ইয়াযিদ বিন আবী হাবীব রহ. বলেন, একবার রাসূল সা. নামাজরত দুই মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তাদের বললেন, যখন সিজদা করবে তখন শরীর জমিনের সাথে মিলিয়ে রাখবে। কেননা মহিলারা এ ক্ষেত্রে পুরুষের মতো নয়। প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান লিখেন, উল্লেখিত হাদীসটি সকল ইমামের মূলনীতি অনুযায়ী দলিল হিসেবে পেশ করার যোগ্য।

এসকল আলোচনা থেকে এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, ডা. জাকির নায়েক কুরআন-হাদীসের নানা ধরনের ভুল ব্যাখ্যাসহ কুরআনে ভুল হওয়ার মত ভ্রান্ত বিশ্বাসের প্রবক্তা। তাই জাকির নায়েকের যে কোন কথাকে চোখ বুজে মেনে নেয়া যাবে না বরং কুরআন-হাদীসের গভীর জ্ঞান রাখেন এমন হক্কানী আলেমদের থেকে সঠিক বিষয়টি জেনে সে অনুযায়ী আমল করতে হবে। অন্যথায় এমন বিভ্রান্তিকর বক্তব্য মেনে আপনার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ আমলগুলো এমনকি ঈমান রক্ষা করাও মুশকিল হয়ে পড়বে।

সর্বোপরি একজন প্যান্ট-শার্ট ও টাই পরা গবেষক এবং যার বিভিন্ন সেমিনারে সামনের সারিতে বেপর্দা নারীদেরকেও উপবিষ্ট দেখা যায়, এমন ধর্ম প্রচারকের নিকট থেকে ধর্ম জানার পরিবর্তে সারাটা জীবন যারা ধর্ম গবেষণার জন্য উৎসর্গ করেছেন এবং যাদের প্রতি দৃষ্টি দিলে আল্লাহ ও আখিরাতের কথা খুব সহজেই স্মরণ হয় এমন সুন্নতের প্রকৃত অনুসারী বিদগ্ধ আলেম থেকে ধর্মীয় বিষয়আশয় জানতে চাওয়া যে শ্রেয় তা তো বলার অপেক্ষা রাখে না। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন।

লেখকঃ প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, শাইখ যাকারিয়া ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বসুন্ধরা ঢাকা

পহেলা বৈশাখ উদযাপন

মুফতী হিফযুর রহমান

দ্বীন ও ইসলাম শব্দের ব্যাখ্যা

আল্লাহ তায়ালাই আমাদের একমাত্র জীবনবিধান দান করেছেন। তিনি কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম। [সূরা আলে ইমরান:১৯]

আরবী ভাষায় দ্বীন শব্দের একাধিক অর্থ রয়েছে। তন্মধ্যে এক অর্থ রীতি ও পদ্ধতি। কুরআনের পরিভাষায় দ্বীন সেসব মূলনীতি ও বিধি-বিধানকে বলা হয়, যা হযরত আদম আ. থেকে শুরু করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সা. পর্যন্ত সব পয়গাম্বরের মধ্যে সমভাবেই বিদ্যমান রয়েছে। 'শরীয়ত' অথবা 'মিনহাজ' শব্দটি পরবর্তী পরিভাষা। 'মাযহাব' শব্দটি দ্বীনের বিভিন্ন শাখায় বিধি-বিধান অর্থে ব্যবহৃত হয়। যা বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন উম্মতের মধ্যে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে। কুরআন বলে,

﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا وَٱلَّذِىٓ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ وَمَا وَصَّيۡنَا بِهِۦٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓۖ أَنۡ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ ﴾

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য সে দ্বীন প্রবর্তন করেছেন, যার নির্দেশ নূহ ও অন্যান্য পয়গাম্বরকে দেয়া হয়েছিল। [সূরা শুরা:১৩]

এতে বুঝা যায়, সব পয়গাম্বরের দ্বীন এক ও অভিন্ন ছিল। অর্থাৎ আল্লাহর সত্তার যাবতীয় পরাকাষ্ঠার অধিকারী হওয়া এবং সমুদয় দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র হওয়া এবং তাকে ছাড়া কেউ উপাসনার যোগ্য না হওয়ার প্রতি মনে-প্রাণে বিশ্বাস স্থাপন করা ও মুখে স্বীকার করা। কেয়ামত দিবস, হিসাব-নিকাশ, পুরস্কার ও শাস্তিদান এবং জান্নাত-জাহান্নামের প্রতি অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করা। মুখে স্বীকার করা, আল্লাহর প্রেরিত নবী-রাসূল ও তাদের বিধানের প্রতিও তেমনিভাবে ঈমান আনা। ইসলাম শব্দের প্রকৃত অর্থ আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করা এবং তার অনুগত হওয়া। এ অর্থের দিক দিয়ে প্রত্যেক পয়গাম্বরের আমলে যারা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং তাদের আনীত বিধি-বিধানের আনুগত্য করেছে, তারা সবাই মুসলমান ও মুসলিম নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য ছিল এবং তাদের ধর্মও ছিল ইসলাম।

মোটকথা, প্রত্যেক পয়গাম্বরের আমলে তার আনীত দ্বীনই ছিল দ্বীনে ইসলাম এবং আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য। পরে এগুলো একের পর এক রহিত হয়েছে। এবং পরিশেষে দ্বীনে-মুহাম্মদীই 'ইসলাম' নামে অভিহিত হয়েছে। যা কেয়ামত পর্যন্ত কায়েম থাকবে।

যদি ইসলামের দ্বিতীয় অর্থ নেয়া হয় অর্থাৎ মুহাম্মদ সা. এর আনীত ধর্ম। তবে আয়াতের অর্থ হবে এই যে, এ যুগে মুহাম্মদ সা. এর শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ইসলামই একমাত্র গ্রহণযোগ্য। পূর্ববর্তী দ্বীনগুলোকে তাদের সময়ে ইসলাম বলা হলেও এখন তা রহিত হয়ে গেছে। অতএব, উভয় অবস্থাতে আয়াতের প্রকৃত অর্থ একই দাঁড়ায়। তাই কুরআনে সম্বোধিত উম্মতের সামনে ইসলামের যে কোন অর্থই নেয়া হোক না কেন সারমর্ম হবে এই যে, রাসূল সা. এর আবির্ভাবের পর কুরআন ও তার শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ধর্মই ইসলাম নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য এবং এ ধর্মই আল্লাহ তায়ালার কাছে গ্রহণযোগ্য, অন্য কোন ধর্ম নয়। এ বিষয়বস্তুটি কুরআনের অসংখ্য আয়াতে বিভিন্ন শিরোনামে বিধৃত হয়েছে।

ইসলামেই মুক্তি নিহিত

আজকাল ইসলামের উদারতার নামে কুফর ও ইসলামকে এক করার চেষ্টা করা হয়। বলা হয় যে, সৎকর্ম সম্পাদন করলে ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী হলে যে কোনো ধর্মাবলম্বীই মুক্তি পাবে। সে ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান অথবা মূর্তিপূজারী যাই হোক। আলোচ্য আয়াত এ উদ্ভট মতবাদের মূলোৎপাটন করে দিয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে এভাবে ইসলামের মূলনীতি বিধ্বস্ত করা হয়। কারণ, এর সারমর্ম দাঁড়ায় এই যে, ইসলামের বাস্তব কোনো ভিত্তি নেই। এটা একটা কাল্পনিক বিষয়, যা কুফরের পোশাকেও সুন্দর মানায়। কুরআন মাজীদের অসংখ্য আয়াত পরিষ্কার বলে দিয়েছে যে, আলো ও অন্ধকার যেরূপ এক হতে পারে না, তদ্রূপ অবাধ্যতা ও আনুগত্য উভয়টি আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় হতে পারে না। যে ব্যক্তি ইসলামের কোন একটি মূলনীতি অস্বীকার করে, সে নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালার প্রতি বিদ্রোহী ও পয়গাম্বরের শত্রু। প্রচলিত অর্থে সৎকর্ম বা নেক আমল ও প্রথাগত চরিত্রে সে যতই সুন্দর হোক না কেন তাতে কিছু আসে যায় না। সর্ব প্রথম আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের ওপরই পরকালের মুক্তি নির্ভরশীল। যে ব্যক্তি এ থেকে বঞ্চিত, তার কোনো কর্ম ধর্তব্য নয়।

বিধর্মীদের অনুকরণ

ইসলাম একটি পূর্নাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। জীবন থেকে মৃত্যু অবধি যাবতীয় বিষয়াবলীর সুন্দর ও সুষ্ঠু অনুপম সমাধান ইসলাম আমাদেরকে উপহার দিয়েছে। অন্য কোনো ধর্ম বা মতবাদ থেকে এখানে ধার বা হাওলাত আনার কোনো প্রয়োজন নেই। ইসলামে নবী সা. আনন্দ উৎসবের জন্য দুটি দিবস নির্ধারণ করেছেন। ঈদুল ফিতর বা রমজানের ঈদ, ঈদুল আযহা বা কুরবানীর ঈদ। ইসলামী সন হিসেবে খ্যাত হিজরী সন। এ সনের শুরু হয় মহররম মাস থেকে। কুরআন-হাদীসের কোথাও এ মাসের ১ম তারিখে আনন্দ উৎসবের কথা দেখা যায় না। ইংরেজি নববর্ষ ইংরেজরা পালন করত। যা বিভিন্ন অশ্লীল কাণ্ড-কীর্তন ও কুসংস্কারের মাধ্যমে পালিত হয়ে থাকে।

পহেলা বৈশাখের আবির্ভাব

১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশ যখন মোঘল সম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় তখন সামাজিক ক্ষেত্রে ও ফসলের মৌসুমের প্রতি লক্ষ্য রেখে জমির খাজনা বা কর আদায়ের সুবিধার্থে চন্দ্র সন হিজরীর পরিবর্তে ঋতুভিত্তিক সৌর সনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হয়। ফলে সম্রাট আকবরের নির্দেশে তার আমিল ফতেহ উল্লাহ হিজরী ৯৬৩ সনে তৎকালীন জ্যোতির্বিদ্যা জ্ঞানের আলোকে সৌর মাস ভিত্তিক সৌর সন প্রচলনের প্রয়াসে ফসলী সন হিসেবে বাংলা সন উদ্ভাবন করেন। এরপর থেকে বাংলা নববর্ষ উদযাপিত হয়ে আসছে। অথচ অতীতের নববর্ষ উদযাপনও এখনকার মত সর্বদা পহেলা বৈশাখে পালন করা হতো না; বরং পহেলা বৈশাখ থেকে শুরু করে বৈশাখের যে কোনো দিন সুবিধামত সময়ে পালন করা হতো। ব্রিটিশ শাসনামলে ইংরেজদের নববর্ষ উদযাপনের যে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব ছিল তার বিরুদ্ধাচরণেও বাংলা নববর্ষ বিরাট ভূমিকা পালন করতো। এ উৎসবের আর্থ-সামাজিক কারণও ছিল। জমিদার মহাজন ও বণিক-ব্যবসায়ীদের পুণ্যাহ, হালখাতা, আর মেলার বেচাকেনা বিশেষভাবে বিবেচ্য ছিল। এ বাংলা নববর্ষে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুব সমাজকে সংঘবদ্ধ করে বীরত্ব ও শক্তি সাহসের অনুশীলন করা হতো বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।

পহেলা বৈশাখ উদযাপিত হয় বিধর্মী তরীকায়

কিন্তু এখন অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। এখন পহেলা বৈশাখ ও নববর্ষ উদযাপিত হয় সম্পূর্ণ বিধর্মী ও হিন্দুয়ানী তরীকায়। এ ব্যাপারে মুসলমান তরুণ-তরুণীদের উদ্বুদ্ধ করছে এদেশীয় নামধারী কিছু সংখ্যক বুদ্ধিজীবী। তারাই এদেশের তরুণীদের

শাঁখা-সিঁদুর পরতে ও উলুধ্বনি দিতে শিখিয়েছে। এ জ্ঞানপাপীরাই এদেশের তরুণ-তরুণীদের বুঝিয়েছে যে, এগুলোই হচ্ছে বাঙালীর বাঙালীত্ব। এগুলো না করলে বাঙালী হওয়া যায় না। এছাড়াও সূর্যোদয়ের পর থেকেই শুরু হয় বর্বর যুগের ন্যায় বিভিন্ন বয়সী ছেলে-মেয়েদের অবাধ চলাফেরা , ঘোড়-দৌঁড়, পুতুল নাচ, সাপের খেলা, বানর খেলা, জুয়ার আসর, যাদু, নাগর দোলাসহ একই প্লেটে তরুণ-তরুণীর ইলিশ ভাজা ও পান্তাভোজ। এমনকি সেদিন যুবতীরা অনেক যুবককে পান্তা খাইয়ে পর্যন্ত দেয়। শুনা যায় পান্তার প্লেটের দাম অনেক। আর খাইয়ে দিলে আরো অনেক। হায়রে বিবেক! পান্তার সিরিয়াল নাকি খুব লম্বা হয়। সন্ধ্যার পর থেকে শুরু হয় বিভিন্ন পার্টি। নাইট ক্লাব, গেস্ট হাউস, অফিসার্স ক্লাব ও লেডিস ক্লাবে উলঙ্গ ও অর্ধ উলঙ্গ তরুণ-তরুণীদের নাচ-গানে মুখরিত অশ্লীল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মধ্যরাতে শুরু হয় বিয়ার হুইস্কি, ব্যান্ডি, ফেনসিডিল, আফিম, হিরোইন, গাজাসহ বিভিন্ন মাদকদ্রব্য পানের ধুম। সৃষ্টি হয় তাদের মধ্যে যৌন উত্তেজনা, পরিণত হয় ক্লাব-সেমিনারগুলো পতিতালয়ে। এভাবে উদযাপিত হচ্ছে বিগত কয়েক বছর ধরে পহেলা বৈশাখ। তবে অতীতের চেয়ে এখন ঢাকায় নববর্ষ পালনের রঙ যেন আরো কড়া আরো চড়া। সে দৃশ্য যদি কেউ না দেখে ভাষায় প্রকাশ করে তা বোঝানো খুবই কষ্টকর। ভোর পাঁচটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত রাধা-কৃষ্ণের রঙ্গলীলা অনুষ্ঠিত হয় টি. এস. সি মোড়ে, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ও রমনা পার্ক এলাকার বিভিন্ন স্থানে। নারী-পুরুষ, তরুণ-তরুণীদের মধ্যে থাকে না কোনো রকম বাছ বিচার। বিকেল তিনটা থেকে চারটা পর্যন্ত যারা গত পহেলা বৈশাখে (২০০১খ্রি.) বৃষ্টির দৃশ্য দেখেছে, তারা স্পষ্টভাবেই বলেছে যে, ভারতীয় উলঙ্গ সিনেমাও ঢাকার এ দৃশ্যের কাছে সারেন্ডার। পিপীলিকার মত নারী-পুরুষের ভিড়।

বিজাতীয় কালচার পরিহার করুন

মনে রাখতে হবে, আমরা মুসলমান। পহেলা বৈশাখ উদযাপন ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকার হিন্দুয়ানী ও খৃষ্টানী অনুষ্ঠানের সাথে ইসলামের আদৌ সম্পর্ক নেই। ইসলাম এরূপ বাজে আনুষ্ঠানিকতা সর্বস্ব ধর্ম নয়। সুস্থ সুন্দর গাম্ভীর্যপূর্ণ তাহযীব-তামাদ্দুন ইসলামের অবদান। ইসলামী আচার-আচরণ ছেড়ে এসব জাহান্নামী উৎসব কখনো মুসলমান কল্পনা করতে পারে না। তথাকথিত প্রগতিবাদী নামক দুর্গতিবাদীদের ষড়যন্ত্রে বিজাতীয় কৃষ্টি-কালচারে আমরা অভ্যস্ত হতে পারি না। বাঙালীত্ব এবং মুসলমানিত্বের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করা ইসলামী তাহযীব তামাদ্দুন ও এদেশের ঐতিহ্যকে অবমাননা করা বৈ কিছু নয়। তাই আমাদের সকলকেই এই মর্মে শপথ গ্রহণ করতে হবে যে, আমরা মুসলমান। আমাদের পরিচয় হল, আমরা রাসূলে আকরাম সা. এর অনুসারী। আমাদের ধর্ম ইসলাম। ইসলামের শাশ্বত কালচারের ওপর আঘাত আসবে আর আমরা কাপুরুষের মত দুচোখ মেলে বসে থাকবো তা কস্মিনকালেও হতে পারে না।

ভিনজাতির অনুসরণ

আজকাল বিনোদন, খেলা-ধুলাসহ জীবন যাপনের প্রায় সব ক্ষেত্রে বিধর্মী ও বিজাতীয় অনুকরণ ব্যাপক আকারে সর্বগ্রাসী রূপ ধারণ করেছে। আমরা সিরাতে মুস্তাকীম তথা সরল ও সত্য পথ পরিত্যাগ করে বাঁকা ও গলদ পথে চলতে শুরু করেছি। এটা কখনো আমাদের জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে না। বিজাতীয় অনুকরণ সম্পর্কে মানবতার কাণ্ডারী নবী মুহাম্মদ মুস্তফা সা. ইরশাদ করেন-

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

অর্থাৎ- যে ব্যক্তি ভিনজাতির সাথে সামঞ্জস্যতা অবলম্বন করবে, সে কিয়ামতের দিবসে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। [আবু দাউদঃ ৪০৩১]

আল্লামা আব্দুর রউফ মানাবী রহ. এ হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন,

أي تزيا فى ظاهره بزيهم وفى تعرفه بفعلهم وفى تخلقه بخلقهم وسار بسيرتهم وهديهم فى ملبسهم وبعض أفعالهم.

অর্থাৎ বিজাতির প্রকাশ্য চাল-চলন ইখতিয়ার করা, তাদের রীতি-নীতি অনুযায়ী চলা, তাদের চরিত্রে চরিত্রবান হওয়া, কাপড়-চোপড়ে, বেশ-ভুষায় তাদের তরীকা অবলম্বন করা। [ফয়যুল কাদীরঃ ৫৭৪৩]

আল্লাহ, রাসূল, কুরআন, হাদীস, দ্বীন ইসলামের মত তুলনাহীন নেয়ামত পাওয়া সত্ত্বেও আমরা উন্মাদের মত অন্যের দ্বারে তাদের কুৎসিত ও বিশ্রী কালচারের জন্যে দ্বারস্থ হচ্ছি। হায়রে কপাল মন্দ চোখ থাকিতে অন্ধ। জনৈক ভদ্রলোক পায়জামা-পাঞ্জাবী পরে সেজে-গুজে কোথাও যাচ্ছিল। পথিমধ্যে দেখতে পেল তেঁতুল বৃক্ষের নিচে এক উলঙ্গ পাগল দাঁড়ানো। সারা শরীরে বস্ত্র বলতে কিছুই নেই। শুধুমাত্র এদিক-ওদিক আবৃত করার মত এক টুকরো কাপড়। ভদ্রলোক অনাকাঙ্ক্ষিত এ ঘটনা দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায়। লজ্জায় পকেট থেকে হাত রূমালটি বের করে মুখে ধারণ করে দৃষ্টি নিচের দিকে অবনত করে। পাগল লোকটি ভদ্রলোকের এ অবস্থা দেখে যথাস্থানে উপস্থাপিত কাপড়ের টুকরোটি খুলে ভদ্রলোকের ন্যায় মুখে ধারণ করে। আজ আমরা বিচার-বিশ্লেষণ না করে উন্মাদের ন্যায় বিধর্মীদের অনুকরণে ব্যস্ত।

হাকীমুল উম্মত শাহ আশরাফ আলী থানুভী রহ. তাঁর কিতাবে জনৈক হিন্দুস্তানী বুযুর্গের ঘটনা নকল করেছেন। তিনি বলেন, এক মহল্লার মসজিদে ওই বুযুর্গ সদা-সর্বদা ইবাদত বন্দেগীতে মশগুল থাকতেন। নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতিরেকে

মসজিদের বাইরে আসতেন না। একদিন মসজিদ থেকে বের হলেন। দিনটি ছিল হিন্দুদের হলি খেলার দিন। তাদের কালচার ও সংস্কৃতি হল, সেদিন তারা যাকেই পাবে তার গায়ে রং ছেটাবে। পশু-পাখি, জীব-জানোয়ার, জন মানুষ কেউ এর থেকে রেহাই পায় না। বুযুর্গ সামনে দেখতে পেলেন একটি গাধা তার গায়ে কোনো রকমের রং নেই। ওই সময় তিনি পান খাচ্ছিলেন। পানের রং মিশ্রিত কিছু থুথু গাধার গায়ে নিক্ষেপ করে বললেন কেউ তোর গায়ে রং দেয়নি আমি দিয়ে দিলাম। এ তো দিনের বেলার কথা , ইশার নামাজের পর যখন শুয়ে পড়লেন, স্বপ্নে দেখেন হাশর কায়েম হয়ে গেছে। মাথার ওপর সূর্য, তামাম জমিন তামার মত উত্তপ্ত। মানুষের হাহাকার আর ছুটাছুটি। বিভীষিকাময় অবস্থা। ভয়ানক চেহারার ফেরেশতারা লোহার জিঞ্জির দিয়ে তার হাত-পা বেঁধে টেনে হিঁচড়ে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এ কঠিন ও করুণ অবস্থায় তিনি ফেরেশতাদের বলতে লাগলেন, কি ব্যাপার আমি তো সারা জিন্দেগী এ মসজিদেই রয়েছি। ইবাদত-বন্দেগীই আমার কাজ। আমি তো কখনো খোদার নাফরমানি করিনি। আমাকে কেন জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাচ্ছ? ফেরেশতারা বললেন, ইবাদত-বন্দেগী করলে কি হবে? তুমি কি ওই দিন বিধর্মীদের অনুকরণে গাধার গায়ে পানের রং মিশ্রিত থুথু নিক্ষেপ করোনি? আল্লাহর হাবীব সা. কি বলেননি? যে যার অনুসরণ করে তার হাশর তার সাথে হবে। এরপর ওই বুযুর্গের ঘুম ভেঙ্গে যায়। তিনি স্বীয় ত্রুটি বুঝতে সক্ষম হন। অযু করে নামায আদায় করে জিন্দেগীর তরে তওবা করে পরিশুদ্ধ হয়ে যান।

লেখক, মুহাদ্দিস ও প্রধান মুফতী, জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া মুহাম্মদপুর ঢাকা।

মধ্যযুগীয়, পশ্চাদমুখী ইত্যাদি বলে আর চেঁচামেচি করবেন না

মাওলানা মোহাম্মদ হেমায়েত উদ্দীন

সম্প্রতি ইসলামী আদর্শ সম্বন্ধে বুদ্ধিজীবী নামক এক শ্রেণীর লোক একটু বেশী হারে বলতে শুরু করেছেন যে, এটি নাকি মধ্যযুগীয় ব্যাপার-স্যাপার, এটি নাকি অন্ধকার যুগের ব্যাপার-স্যাপার, এটি নাকি পশ্চাদমুখিতা। বিশেষত রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামী আদর্শের কোন কিছু প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে কেউ কথা বললেই ঐ শ্রেণীর লোকেরা সমস্বরে চেঁচামেচি শুরু করে দেন যে, আমাদেরকে মধ্যযুগীয় আদর্শে ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে, আমাদেরকে অন্ধকার যুগে ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। যুগ এখন এগিয়ে চলেছে তখন আমাদেরকে পশ্চাতে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। যেমন ধরুন কেউ রাষ্ট্রীয়ভাবে বে-হায়া বেলেল্লাপনার বিরুদ্ধে, উলঙ্গপনার বিরুদ্ধে, আইন করার আওয়াজ তুলল, ইসলামের পর্দা ব্যবস্থা কায়েম করার আওয়াজ তুলল, অমনি ঐ শ্রেণীর লোকেরা সমস্বরে চেঁচামেচি শুরু করে দিলেন যে, "আমাদেরকে মধ্যযুগীয় আদর্শে ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। যুগ এখন এগিয়ে চলেছে তখন আমাদেরকে পশ্চাতে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। মোটামুটিভাবে তারা ইসলামী আদর্শকে এই তিনটি বিশেষণে বিভূষিত করে থাকেন- মধ্যযুগীয়, অন্ধকারযুগীয়, পশ্চাদমুখী।

জানি না এই শ্রেণীর লোকেরা 'মধ্যযুগীয়' বলে ঠিক কী বুঝাতে চান। আমরা তাদের কথিত অনেক কথারই তো মানে মতলব ঠিক মত বুঝি না। তারাও কোন দিন তা ভালভাবে খোলাসা করে বলেন না। মৌলবাদ, জঙ্গিবাদ, ধর্ম নিরপেক্ষতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা, ইত্যাদি কত কথারই মানে মতলব বা চৌহদ্দি সম্বন্ধে তারা স্পষ্ট করে কিছু বলেন না। যখন যেখানে যেভাবে সুবিধে তারা এই শব্দগুলো ব্যবহার করে স্বার্থ সিদ্ধি করেন। 'মধ্যযুগীয়' শব্দটার দশাও সে রকম। এর দ্বারা তারা যে ঠিক কী বোঝাতে চান তা আমরা পুরোপুরি স্পষ্টভাবে বুঝি না। তবে মোটামুটি এতটুকু বুঝি যে, মধ্যযুগীয় কথাটাকে একটা খারাপ ও নেতিবাচক অর্থেই তারা ব্যবহার করে থাকেন। তাই তারা প্রায়শই 'মধ্যযুগীয় আদর্শ' না বলে মধ্যযুগীয় বর্বরতা' কথাটা ব্যবহার করে থাকেন। ইসলামী আদর্শকে তারা মধ্যযুগীয় বর্বরতা আখ্যা দেন। 'মধ্যযুগীয়'- এর সঙ্গে এই 'বর্বরতা'- এর ব্যবহার তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানান দিয়ে থাকে। জানি না কেন তারা মধ্যযুগীয় কথাটাকে খারাপ অর্থে নিয়ে থাকেন। ইতিহাসে প্রাচীন ও আধুনিক কালের মধ্যবর্তী সময় মধ্যযুগ (Middle age) হিসাবে আখ্যায়িত হয়ে থাকে। কেউ কেউ সীমানা নির্ধারণ করে দিয়ে বলেছেন, রোমক সাম্রাজ্যের পতন (৫ম শতাব্দী)

ও ইউরোপের অভ্যুদয় (১৫ শ শতাব্দী)- এর মধ্যবর্তী কাল হল মধ্যযুগ আবার কেউ কেউ বলেছেন মোটামুটি ভাবে ১১শ থেকে ১৭শ শতাব্দী পর্যন্ত যুগকে মধ্যযুগ বলা হয়, যে যুগে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারাদির ফলে মানুষের জীবন যাত্রায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়নি। তখন সবেমাত্র ইউরোপে নতুন জ্ঞান সাধনার উন্মেষ হতে শুরু করেছে। আর পাদ্রীদের মনগড়া গবেষণাহীন মতামত গবেষকদের কাছে ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হতে শুরু করেছে। এভাবে সৃষ্টি জগতের রহস্য যতই উদঘাটিত হতে থাকে, বিজ্ঞানীদের সঙ্গে পাদ্রীদের মতবৈষম্য ততই প্রকট হতে থাকে। পাদ্রীগণ তখন শাসন শক্তি প্রয়োগ করে গবেষক ও বিজ্ঞানীদের শায়েস্তা করতে থাকে। অবশেষে শুরু হয় উভয় পক্ষের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। দীর্ঘ দু'শ বৎসরের (১৬ ও ১৭ শতাব্দী) এ সংগ্রাম ইতিহাস পাঠকের নিকট 'গির্জা বনাম রাষ্ট্রের সংগ্রাম' নামে পরিচিত। স্মরণ করা যেতে পারে যে, প্রকৃত ইলমে ওহীর সঙ্গে (যার উপর ইসলাম পন্থীরা প্রতিষ্ঠিত তার সঙ্গে) বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার (যদি তা সঠিক হয়) ও উদঘাটিত সৃষ্টির রহস্যের তাত্ত্বিকভাবে কোন সংঘাত বা বৈপরীত্য নেই, থাকতে পারে না। আরও স্মরণ করা যেতে পারে যে, পাদ্রীগণ সঠিক ইলমে ওহীর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না, তারা মনগড়া কিছু মতাদর্শকে ধর্মের নামে শোষণের হাতিয়ার হিসাবে সম্বল করে অতি সুখে দিন গুজরান করেছিল। এরই ফলে বিজ্ঞানের সাথে তাদের সংঘর্ষ হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এটাকেই ইউরোপীয়রা ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের সংঘাতরূপে অভিহিত করে আর তাদের এদেশীয় এজেন্টরা তা তড়িৎ বেগে আমদানি করে ফেলে। সম্ভবত এখান থেকেই বুদ্ধিজীবীগণ মধ্যযুগীয় বলে ইসলামপন্থীদেরকে বিজ্ঞান বিরোধী রূপে অভিহিত করতে চান। কিন্তু এটা পাদ্রীদের ব্যাপারে প্রযোজ্য হতে পারে ইসলামপন্থী আলেম মৌলভীদের ব্যাপারে নয়। বরং ইসলামপন্থীদের মতাদর্শ ও অবস্থান সেই মধ্যযুগেও যেমন বিজ্ঞানের সঙ্গে সংঘাতবিহীন ছিল, এখনও তেমন রয়েছে। অতএব ইসলাম ও ইসলামপন্থীদের ব্যাপারে মধ্যযুগীয় কথাটার প্রয়োগ হবে সত্যতার অপলাপ। যারা সত্যিকার অর্থে মধ্যযুগীয় তাদের প্রগতিশীল আর যারা তেমন নয় তাদেরকে মধ্যযুগীয় আখ্যায়িত করা হবে উল্টা কারবার। ইসলাম ও ইসলামপন্থীদেরকে মধ্যযুগীয় আখ্যায়িত করে বুদ্ধিজীবীগণ এই সত্যের অপলাপ এবং উল্টো কারবারই করে চলেছেন।

কিন্তু বুদ্ধিজীবীগণ মধ্যযুগীয় বলে বিজ্ঞানবিরোধীই যে বোঝাতে চান তা-ও তো স্পষ্ট নয়। কারণ তারা মধ্যযুগীয় কথাটার সঙ্গে বর্বরতার কথাটা প্রয়োগ করে থাকেন। বিজ্ঞানবিরোধী হওয়া আর বর্বর হওয়া আদৌ সমান্তরাল নয়। সভ্যতা, শিষ্টাচার, মনুষ্যত্ব- এগুলোর সঙ্গে বিজ্ঞানের সরাসরি সম্পর্ক কোথায়? বিজ্ঞানের সরাসরি সম্পর্ক তো বস্তুর সঙ্গে, বস্তুবিষয়ক আবিষ্কারের সঙ্গে, আর সভ্যতা,

শিষ্টাচার, মনুষ্যত্ব- এগুলোর সম্পর্ক হচ্ছে মানবীয় আচার-ব্যবহার ও মানবীয় চরিত্রের সঙ্গে। অতএব বিজ্ঞানবিরোধী আর বর্বর কথাটা আদৌ সমার্থবোধক নয়। এমতাবস্থায় মধ্যযুগীয় বর্বর বলে বিজ্ঞানবিরোধী বোঝাতে চেয়ে কি বুদ্ধিজীবীরা তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন?

'বর্বরতা' কথার প্রয়োগ সম্বন্ধে সামান্য আর একটু বলতে চাই। বর্বরতা অর্থ অসভ্যতা, অশিষ্টতা, পশুত্বব্যঞ্জক আচরণ ইত্যাদি। যারা সামান্য ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞান রাখেন তারা জানেন ইসলাম একটা বর্বর জাতিকে কেমন সভ্য ও শিষ্ট জাতিতে পরিণত করেছিল। ইসলাম অসভ্যতা, অশিষ্টতা ও পশুত্বব্যঞ্জক আচরণ ও রীতিনীতি তথা বর্বরতা প্রতিরোধে যতটা সোচ্চার ও যত্নবান, পৃথিবীর আর কোন ধর্ম বা মতাদর্শ ততটা সোচ্চার ও যত্নবান নয়। অথচ এটা ইসলামী আদর্শকেই তথাকথিত বুদ্ধিজীবীগণ বলেছেন বর্বরতা, আর প্রকৃত বর্বরতাকে তারা আখ্যায়িত করছেন সভ্যতা, প্রগতিশীলতা ইত্যাদি। এমন উল্টো ব্যাখ্যা প্রদান মস্তিষ্ক বিকৃতির পরিচয় কিনা তা তাদের ভেবে দেখা উচিৎ। রাস্তা-ঘাটে, ক্লাবে, পার্কে নারীদের শ্লীলতাহানি ও ফুসলিয়ে ফাসলিয়ে তাদের সতীত্ব হরণ বর্বরতা, নাকি এগুলোর বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া বর্বরতা তা তাদের সত্যিকার অর্থে ভেবে দেখা উচিৎ। তারা বর্বরতার কথাটার অর্থ ও বর্বরতা প্রতিরোধে ইসলামের ভূমিকা সম্বন্ধে মোটেই অবগত নন, তারা ইতিহাস সম্বন্ধে এতটাই অজ্ঞ- তাদের সম্বন্ধে এমনটা ধারণা আমরা রাখি না। আসলে তারা জেনে বুঝেই মিথ্যাচার করেন, জেনে বুঝেই উল্টো কথা বলেন, উল্টো ব্যাখ্যা দেন। তারা বোঝেন উল্টো, বলেনও উল্টো, করেনও উল্টো। এই শ্রেণীর লোকদেরকে তাই উল্টো করেই হাশরের ময়দানে উঠানো হবে, উল্টো করেই জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। যেমন আচরণ তেমনি ফল। কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا۟ مَسَّ سَقَرَ ﴾

অর্থাৎ, যে দিন তাদেরকে মুখ হিঁচড়ে (অধোমুখী করে) টেনে নেওয়া হবে জাহান্নামে। (বলা হবে) আগুনের স্পর্শ আস্বাদন কর। [সূরা ক্বামারঃ ৪৮]

এখানে আরও উল্লেখ করতে হয় যে, মধ্যযুগীয় কথাটার দ্বিতীয় ব্যাখ্যা অনুসারে বিজ্ঞানের উন্নতি বিচারে এই যুগটা তেমন অগ্রসর বিবেচিত না হলেও আদর্শ প্রতিষ্ঠার বিচারে এ যুগটি অনগ্রসর নয়; বরং সবচেয়ে অগ্রসর। এই মধ্যবর্তী যুগের প্রথম ভাগেই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আদর্শ, সবচেয়ে নির্ভুল আদর্শ তথা ইসলামী আদর্শ বিকশিত, বিস্তৃত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অতএব আদর্শিক উৎকর্ষ লাভের প্রশ্নে মধ্যযুগীয় আদর্শেই ফিরে যেতে হবে। আদর্শের আলোচনা প্রসঙ্গে (দ্বিতীয় অর্থে) মধ্যযুগীয় কথাটাকে খারাপ ও নেতিবাচক অর্থে নেওয়ার অবকাশ নেই।

বে-হায়া বেলেল্লাপনা ও উলঙ্গপনার পক্ষ অবলম্বনকারীগণ হবেন আদিযুগীয়, তথা তাদের স্বীকৃত ভাষায় বর্বর যুগীয়। এমন কি তারা হতে চাইবেন? নিশ্চয়ই না।

যারা ইসলামী আদর্শকে অন্ধকার যুগের ব্যাপার স্যাপার বলে আখ্যায়িত করে থাকেন তাদের অবগতির জন্য উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অন্ধকার যুগ হল ইসলাম পূর্ব জাহেলী যুগ। ইসলাম এই জাহেলী যুগের কুফ্র, শির্ক, জুলুম ও নানাবিধ পাপাচারের অন্ধকার দূর করে আলোর সূচনা করেছিল। ইসলাম অন্ধকার যুগকে আলোর যুগে পরিণত করেছিল। কুরআন সুন্নাহর আদর্শ হল নূর তথা আলো। কুরআনে কারীমের এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে।

﴿ قَدْ جَآءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَٰبٌ مُّبِينٌ ﴾

অর্থাৎ, তোমাদের কাছে এসেছে আল্লাহ পাকের কাছ থেকে নূর অর্থাৎ সুস্পষ্ট কিতাব। [সূরা মায়িদাঃ ১৫]

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

﴿ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ﴾

অর্থাৎ, তোমাদের কাছে আমি পাঠিয়েছি সুস্পষ্ট নূর। [সূরা নিছাঃ ১৭৪]

অতএব কুরআন সুন্নাহর যুগ অন্ধকার যুগ নয়; বরং আলোকিত যুগ। ইসলামপূর্ব জাহেলী যুগ হল সর্ববাদিসম্মত অন্ধকার যুগ। ইসলামী আদর্শের কথা শুনলে যারা অন্ধকার যুগে ফিরিয়ে নেওয়ার অপচেষ্টা বলে চেঁচামেচি করেন, তারা নিজেদের জ্ঞানান্ধতার পরিচয় দেন। আসলে তারাই রয়েছেন অন্ধকারে। আলেম উলামা ও মোল্লা মৌলভীগণ সমাজকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যান আর তাদের বিরুদ্ধবাদী এই বুদ্ধিজীবীরা সমাজকে নিয়ে যান অন্ধকারের দিকে।

কুরআনে কারীমে কত সুন্দর করে বলা হয়েছে,

﴿ ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَوْلِيَآؤُهُمُ ٱلطَّٰغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَٰتِ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴾

অর্থাৎ, আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক। তিনি তাদেরকে বহুবিধ অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে যান। আর যারা কাফের তাদের অভিভাবক হল তাগুত, এরা তাদেরকে আলো থেকে বের করে বহুবিধ অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। তারাই জাহান্নাম বাসী তারা সেখানে স্থায়ী হবে। [সূরা বাকারাঃ ২৫৭]

আল্লাহ্ বলেছেন, তিনি অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে যান। আলেম উলামা ও মোল্লা মৌলভীগণও সে মোতাবেক সমাজকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে যান। এর বিপরীত লোকেরা করে এর বিপরীত। তারা সমাজকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। অথচ তাদের দাবী সম্পূর্ণ উল্টো। তথাকথিত এই বুদ্ধিজীবীদের উদ্দেশ্যে তাই বলছি, উল্টা সমঝিলি রে রাম ! বোঝেও উল্টো, বলেও উল্টো, করেও উল্টো। তাদেরকে তাই উল্টো করেই হাশরের ময়দানে উঠানো হবে, উল্টো করেই জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

তথাকথিত বুদ্ধিজীবীগণ ইসলামী আদর্শের বিরোধিতা করেও আদি অন্ধকারেই ফিরে যাওয়ার প্রবক্তা সাজছেন। বে-হায়া বেলেল্লাপনা ও উলঙ্গপনার পক্ষ অবলম্বন করে যেমন তারা আদিযুগীয় সাব্যস্ত হচ্ছেন তেমনি ইসলামের অন্যান্য আদর্শের বিরোধিতা করেও তারা আদিযুগীয় সাব্যস্ত হচ্ছেন।

আর ইসলাম পশ্চাদমুখী কিনা- এ প্রসঙ্গে খুব বেশি কিছু বলার প্রয়োজন থাকেনি। কারণ কুফর, শির্ক ও পাপাচারের আদি অন্ধকারের পর এসেছে ইসলামের আলো। ইসলামের দ্বারা সাধিত হয়েছে আলোকিত আদর্শ ও উৎকর্ষ। অতএব যারা কুফ্র, শ্র্ক ও পাপাচারের আদি অন্ধকার পথে ফিরে যায়, তারাই প্রকৃতপক্ষে পশ্চাদমুখী। যারা ইসলামী আদর্শের প্রবক্তা, তারা পশ্চাদমুখী হতে পারে না, তারা প্রগতিশীল, কারণ তারা অন্ধকার পরবর্তী আলোর পথের যাত্রী।

ইসলামের আলো বিকশিত হওয়ার পরেও কালক্রমে বহুমুখী আধুনিক অন্ধকার সমাজকে গ্রাস করেছে। বুদ্ধিজীবীগণ বেশির থেকে বেশি এই দাবি করতে পারেন যে, তারা আদি অন্ধকার নয় বরং পরবর্তী এই সব আধুনিক অন্ধকারের প্রবক্তা। কিন্তু এ দাবী করে তারা আদিযুগীয় হওয়া থেকে নিষ্কৃতি পাবেন না। কারণ আধুনিক কালে প্রচলিত সব পাপাচারই আদিকালের পাপাচারেরই নতুন সংস্করণ বরং কোন কোনটার হুবহু পুরাতন সংস্করণই চলছে। জুলুম, সম্পত্তি আত্মসাৎ, চুরি, কালোবাজারি, মুনাফাখোরী, বে-হায়া বেলেল্লাপনা, বাদ্য বাজনা ইত্যাদির অনেক নতুন সংস্করণ ও নতুন কলাকৌশল চালু হয়েছে। আবার ডাকাতি, ছিনতাই, যেনা, বেপর্দেগী, ছেলে মেয়েদের ঢলাঢলি, নাচ, গান- এসবের পুরাতন সংস্করণই হুবহু চলছে। এভাবে সব পাপই কোন না কোনভাবে হলেও পুরাতন পাপেরই পুনরাবৃত্তি। এমনকি অধুনা ইসলামপন্থী দ্বীনদার মুসলমান ও আলেম উলামাকে যেসব গালিগালাজ ও কটূক্তি করা হয়ে থাকে তা-ও কোন না কোনভাবে পুরাতন যুগের গালিগালাজ ও কটূক্তিরই পুনরাবৃত্তি। সেগুলো সবই পুরনো রেকর্ডের ভাঙ্গা সুর।

সেই আদি যুগে হযরত শুহাইব আ. এর সম্প্রদায় হযরত শুআইব আ. কে বলত,

﴿ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَىٰكَ فِينَا ضَعِيفًا ﴾

অর্থাৎ, আমরা তোমার কথাবার্তার সিংহভাগই বুঝি না, তুমি তো আমাদের মধ্যে দুর্বল। [সূরা হুদঃ ৯১]

হযরত হূদ আ. এর সম্প্রদায় হযরত হূদ আ. কে বলত,

﴿ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِىٓ ءَالِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ ﴾

অর্থাৎ, তুমি তো আমাদের কাছে (তোমার বক্তব্যের স্বপক্ষে) কোন স্পষ্ট দলীল উপস্থাপন করতে পারলে না। আমরা তোমার কথায় আমাদের দেবদেবীদের (অর্থাৎ আমাদের আদর্শ) ছাড়তে পারি না। [সূরা হূদঃ ৫৩]

লক্ষ করুন এ কথাগুলোকেই এখন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলা হচ্ছে যে, আমরা হুজুরদের কথা বুঝি না, তাদের কথায় কোন যৌক্তিকতা নেই, সমাজে তাদের কোন প্রতিষ্ঠা নেই, তারা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন, তারা সমাজের পরগাছা, হুজুরদের কথায় আমরা আমাদের আদর্শ ত্যাগ করতে পারি না ইত্যাদি।

বস্তুত পরবর্তী সর্বযুগের পাপীরাই পূর্ববর্তী পাপীদের অনুসরণ করে থাকে। সর্বযুগের পাপীদেরই পাপের মৌলিক ধরণ এক। কুরআনে কারীমের এক আয়াতে বলা হয়েছে,

﴿ بَلْ قَالُوا۟ مِثْلَ مَا قَالَ ٱلْأَوَّلُونَ ﴾

অর্থাৎ, বরং তারা বলে যেমন তাদের পূর্ববর্তীরা বলত। [সূরা মুমিনূনঃ ৮১]

এক হাদীসে নবী করীম সা. কথাটিকে এভাবে বলেছেন,

لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ.

অর্থাৎ, তোমরা (পাপের ধরনের ক্ষেত্রে) তোমাদের পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করবে বিঘতে বিঘতে, হাতে হাতে। এমনকি তারা যদি কোন গুইসাপের গর্তে ঢুকে থাকে তোমরাও তাতে ঢুকবে। [বুখারীঃ ৩৪৫৬; মুসলিমঃ ২৬৬৯]

তাই ইসলামপন্থীদের তেমন চিন্তার কিছু নেই। তাদেরকে যা কিছু এখন শুনতে হচ্ছে তা নতুন কিছু নয়, নিত্য চলে আসা এক ধারাবাহিকতা মাত্র। কিন্তু ইসলাম-বিদ্বেষী বুদ্ধিজীবীদের জিজ্ঞাসা করি প্রগতিশীলতার দাবিদার হয়ে আর কতদিন

এই পুরানো কাসুন্দি ঘাঁটবেন, আর কতকাল এই পুরানো রেকর্ডের ভাঙ্গা সুর বাজাবেন? এই পুরাতন চেঁচামেচি বন্ধ করুন। এই একঘেয়েমিতে আমরা যে বড্ড বিরক্তি বোধ করি। বারবার পুরানো কথার খণ্ডন করতে আমাদের যে ত্যক্ততা ধরে গেছে। অবশ্য আমরা ত্যক্ত-বিরক্ত হই জানলে আপনারা আবার সেটাকে সাফল্য মনে করে আরো উৎসাহিত হয়ে ওঠেন কিনা তাই বলছি, আমরা আপনাদের এসব কথায় বড় আনন্দ পাই এই ভেবে যে, আমাদের মহান পূর্বসূরিগণও এরূপ কথা বার্তা শুনেছেন, শুনে আমাদের জন্য তারা সহনশীলতার সঙ্গে পরিস্থিতি উৎরানোর আদর্শ রেখে গেছেন। আমরা যে আমাদের মহান পূর্বসূরিদের মিছিলে শামিল হতে পারাতে আনন্দ বোধ করি।

লেখক: শাইখুল হাদীস, জামিয়া ইসলামিয়া তাঁতীবাজার ঢাকা

অদৃষ্ট বিশ্বাসের মর্মকথা

মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম

তাকদীর বা ভাগ্যবিশ্বাস ইসলামের অন্যতম প্রধান আকীদা। এ বিশ্বাস ছাড়া কেউ মু'মিন ও মুসলিমরূপে গণ্য হয় না। বিশ্বাসটির সারকথা হল- জগতে এ পর্যন্ত ভালোমন্দ যা কিছু হয়েছে এবং ভবিষ্যতে হবে সৃষ্টিকর্তা পূর্বেই নিজ জ্ঞান ও ইচ্ছা মোতাবেক তা স্থির করে রেখেছেন। তাঁর সে স্থিরীকরণকে কাযা (ফয়সালা) ও কদর (পরিমাপ, নির্ধারণ) বলে। কি কি জিনিস সৃষ্টি হবে, কত পরিমাণে হবে, কি আকৃতিতে হবে, কে কতকাল বাঁচবে, কে কিভাবে কি পরিমাণে জীবিকা লাভ করবে, কার কি রোগ-ব্যাধি হবে, কি উপায়ে আরোগ্যলাভ হবে, মোটকথা ব্যক্তি ও জাতির উত্থান-পতন, সুখ-দুঃখ, নির্মাণ-ধ্বংস ও হাসি-কান্নার যাবতীয় ঘটনা পূর্বেই স্থিরীকৃত হয়ে আছে এবং লাওহে মাহফুজে তা লিখে রাখা হয়েছে। এটাই তাকদীর এবং সে অনুসারেই সবকিছু ঘটছে।

মানুষ ছাড়া অন্যসব সৃষ্টির নিজস্ব কোন বুদ্ধি-বিবেচনা ও ইচ্ছাশক্তি নেই। তারা প্রাকৃতিকভাবেই সেই অনাদি ফয়সালা অনুযায়ী চলছে। তাদের জন্য আল্লাহ তায়ালা যে নিয়ম স্থির করে রেখেছেন তার বাইরে তারা যেতে পারে না। মহাবিশ্বের কোথাও তার সে নিয়মের কোন ব্যত্যয় নেই এবং তা হওয়া সম্ভব নয়। ইরশাদ হয়েছে,

﴿ لَا ٱلشَّمۡسُ يَنۢبَغِي لَهَآ أَن تُدۡرِكَ ٱلۡقَمَرَ وَلَا ٱلَّيۡلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ ﴾

সূর্য পারে না চাঁদকে গিয়ে ধরতে আর রাতও পারে না দিনকে অতিক্রম করতে। প্রত্যেকেই আপন-আপন কক্ষপথে সাঁতার কাটে। [ইয়াসীন:৪০]

﴿ وَلِلَّهِ يَسۡجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ طَوۡعٗا وَكَرۡهٗا وَظِلَٰلُهُم بِٱلۡغُدُوِّ وَٱلۡأٓصَالِ ۩ ﴾

আল্লাহর প্রতি সিজদাবনত হয় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় এবং তাদের ছায়াগুলিও সকাল ও সন্ধ্যায়। [সূরা রা'আদ-১৫] অর্থাৎ বস্তু ও আয়তন সব কিছুই আল্লাহর প্রাকৃতিক বিধানের সামনে আনত। সে বিধান লঙ্ঘনের ক্ষমতা নেই কারও। এমনকি ছায়ার হ্রাস-বৃদ্ধিও তার ইচ্ছা অনুসারেই হয়ে থাকে।

মানুষের ব্যাপারটা দু'রকম। মানুষের কিছু আছে প্রাকৃতিক বিষয়, যাতে তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন ভূমিকা নেই। যেমন কে কখন জন্ম নেবে, গায়ের রং ও

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেমন হবে। বুদ্ধি-বিবেচনা ও অভ্যন্তরীণ গুণাবলী কী রকম হবে। আয়ু, জীবিকা ইত্যাদির পরিমাণ কী হবে ইত্যাদি। মানুষের এ জাতীয় বিষয় তার ইচ্ছার কোনও রকম সংশ্লিষ্ট ছাড়াই সরাসরি আল্লাহ তায়ালার ফয়সালা অনুসারে হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে মানুষ বিলকুল নিরুপায় এবং সরাসরি নিয়তিচালিত।

দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে মানুষের কার্যাবলী, যা তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা সম্পাদিত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে মানুষ জড় পদার্থের মত সম্পূর্ণ বাধ্য ও ইচ্ছারহিতও নয় এবং নিরঙ্কুশ স্বাধীনও নয়।

জড় পদার্থের মত যে নয়; বরং কিছু না কিছু কর্ম স্বাধীনতা তার আছে, এটা বোঝার জন্য বিশেষ বিদ্যা-বুদ্ধির দরকার পড়ে না। কোন মানুষই নিজেকে জড় পদার্থের মত মনে করে না। কেউ নিজেকে অন্যের হাতের পুতুল বলে ভাবতে পারে না; বরং এরূপ ভাবকে প্রত্যেকেই নিজের পক্ষে অবমাননাকর ও গালিস্বরূপ মনে করে। তা কেন মনে করে? এজন্যই তো যে, আপন চিন্তা-চেতনা ও কাজকর্মে সে নিজেকে স্বাধীন সত্তা বলেই বিশ্বাস করে। সুতরাং মানুষের কর্ম-স্বাধীনতার বিষয়টা একটা স্বতঃসিদ্ধ বিষয়, যা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। তবে সে স্বাধীনতা নিরঙ্কুশ নয়। এক পর্যায়ে অদৃষ্টের কাছে হার মানতেই হয় এবং এটাও এক অনস্বীকার্য সত্য। প্রত্যেকেরই জীবনে এর বাস্তব অভিজ্ঞতা রয়েছে। মনে কতকিছু করার সাধ জাগে। তার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টাও চালানো হয়। এক পর্যায়ে দেখা যায়, চেষ্টাই সার। সাধ আর পূরণ হয় না। আবার অনেক কিছুকেই অনাকাঙ্ক্ষিত ভেবে এড়ানোর চেষ্টা করা হয়। সেজন্য সব রকম তদবির করা হয়। কিন্তু এক পর্যায়ে সব তদবির ব্যর্থ হয় এবং তকদীরের কাছেই হার মানতে হয়। সুতরাং মানুষ নিরঙ্কুশ স্বাধীনও নয়।

বস্তুত নিরঙ্কুশ স্বাধীন হওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভবও নয়। কেননা তার অর্থ দাঁড়ায় তার উপর আল্লাহ তায়ালার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেই। কোন সৃষ্টির উপর স্রষ্টার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ না থাকা সম্ভব কি? আল্লাহ তায়ালা সর্বশক্তিমান। তাঁর শক্তি ও ক্ষমতার কোন সীমা পরিসীমা নেই। তার জ্ঞান যেমন সর্বব্যাপী, কুদরতও তেমনি সর্বব্যাপী। তার জ্ঞান ও ক্ষমতার বাইরে যাওয়ার সাধ্য নেই কারও। জগত-সংসারের একচ্ছত্র অধিপতি আল্লাহ সম্পর্কে এটাই তাওহীদি আকীদার শিক্ষা। সুতরাং আপন কর্মে এক পর্যায়ে স্বাধীনতা থাকার পরও মানুষ আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা এখতিয়ারের অধীন। অর্থাৎ স্বাধীনতা ও অপারগতা এ দুয়ের মাঝখানে তার অবস্থান। বিষয়টাকে হয়তো আলী রা. এভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে, তুমি চাইলে এক পা তুলে অন্য পায়ে ভর করে দাঁড়াতে পার, কিন্তু দুটো পা-ই তুলে রেখে যদি দাঁড়াতে চাও, তা পারবে না কিছুতেই। ব্যস, এই হচ্ছে মানুষের স্বাধীনতা ও বাধ্যবাধকতা। সে পূর্ণ স্বাধীনও নয় এবং পূর্ণ নিরুপায়ও নয়।

সে সব বিষয় উপায়-উপকরণের সাথে যুক্ত, তাতে নজর দিলে এ কথা আরও বেশি পরিস্ফুট হয়। একটু লক্ষ করলেই বোঝা যায়, চাষাবাদ করা, ব্যবসা-বাণিজ্য করা, ওষুধ খাওয়া ইত্যাদি কাজসমূহ মানুষের ইচ্ছাধীন।

এগুলো উপায়-উপকরণ। এর দ্বারা উদ্দেশ্য ফসল জন্মানো, জীবিকা অর্জন করা ও আরোগ্যলাভ করা। এগুলো সেই উপায়-উপকরণের ফল। সেই উপায় অবলম্বনে মানুষ স্বাধীন হলেও এই ফল লাভে সে আদৌ স্বাধীন নয়। এতে তার কোন এখতিয়ারই নেই। এটা সম্পূর্ণ আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছাধীন। তিনি চাইলে এ ফল দিতেও পারেন, চাইলে নাও দিতে পারেন। যদিও ইহজগতে তাঁর রীতি হল উপায় অবলম্বন করলে ফল দিয়ে দেওয়া। তার ঘোষণা রয়েছে।

﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَـٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾ وَأَنَّ سَعْيَهُۥ سَوْفَ يُرَىٰ ﴾

মানুষ তাই পায় যা সে করে এবং তার কর্ম অচিরেই দেখানো হবে। [সূরা নাজম: ৩৯,৪০]

এ কারণেই উপায় অবলম্বন জরুরী। বেকার বসে থাকা ইসলামের শিক্ষা নয়। যেহেতু উপায় অবলম্বনের ক্ষমতা তাকে দেওয়া হয়েছে। যে বিষয়ে নিজ ক্ষমতা আছে। বৈধ পন্থায় তাতে লিপ্ত থাকাই সে ক্ষমতার যথার্থ মূল্যায়ন এবং এটাই কাম্য। তবে ফলাফলের বিষয়টা যেহেতু আল্লাহর হাতে তাই তাঁর হাতেই তা ছেড়ে রাখা চাই। তা নিয়ে মাথা ঘামানো বোকামি। আল্লাহ তায়ালা চাইলেই তা অর্জিত হবে। মাথা ঘামিয়ে কিছু লাভ হবে না। তাতে অশান্তি অস্থিরতাই বাড়বে। সারকথা, চেষ্টা-চরিত্রে বান্দা স্বাধীন কিন্তু ফলপ্রাপ্তিতে সে স্বাধীন নয়, তা সম্পূর্ণ আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছাধীন।

দেখা যাচ্ছে আপন কাজে মানুষের কিছু না কিছু স্বাধীনতা আছে। এই স্বাধীনতার কারণেই তার উপর বিধি-বিধান আরোপ করা হয়েছে। সে চাইলে নিজ ইচ্ছা প্রয়োগের সাথে তা পালনও করতে পারে এবং চাইলে পালন নাও করতে পারে। ইচ্ছার এ স্বাধীনতার কারণেই সে পুরস্কার ও শাস্তির উপযুক্ত হবে। এই হচ্ছে তাকদীর ও নিয়তি সম্পর্কে মোটামুটি কথা। এর বেশি গভীরে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। মূলত এ এক অন্তহীন রহস্য। আল্লাহ তায়ালার অসীম জ্ঞান ও অপার কুদরতের সাথে এর সম্পর্ক। সীমিত জ্ঞান-বুদ্ধির মানুষের পক্ষে এর কুল-কিনারা পাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং বেশি গভীরে না গিয়ে এই সরল ও সাদামাঠা ধারণার উপরই ক্ষান্ত থাকা উচিত। কুরআন মাজীদে তাকদীর সম্পর্কে এরূপ সহজ-সরল ধারণাই আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে। নিম্নে এ সম্পর্কিত কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা যাচ্ছে-

﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَٰهُ بِقَدَرٍ ﴾

১. আমি প্রতিটি জিনিস সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাণে। [কামার: ৪৯]

﴿ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴾

২. আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের জন্য একটা পরিমাণ স্থির করেছেন। [তালাক: ৩]

﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ شَرِيكٌ فِى ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُۥ تَقْدِيرًا ﴾

৩. সার্বভৌমত্বে তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেককে পরিমিত করেছেন যথাযথ অনুপাতে। [ফুরকান: ২]

﴿ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِۦ ۚ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِۦٓ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ ﴾

৪. 'আল্লাহর অজ্ঞাতসারে কোন নারী গর্ভধারণ করে না এবং প্রসবও করে না। কোন দীর্ঘায়ু ব্যক্তিকে যে আয়ু দেওয়া হয় এবং তার আয়ুতে যা হ্রাস করা হয় তার সবই এক কিতাবে (লাওহে মাহফুজে) লিপিবদ্ধ আছে। [ফাতির: ১১]

﴿ مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾

৫. কোন মসিবতই আল্লাহর হুকুম ছাড়া আসে না [তাগাবুন: ১১]

﴿ مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾ لِّكَيْلَا تَأْسَوْا۟ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا۟ بِمَآ ءَاتَىٰكُمْ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾

৬. পৃথিবীতে অথবা তোমাদের প্রাণের উপর যে মসিবত দেখা দেয় তার মধ্যে এমন কোনোটি নেই, যা সেই সময় থেকে এক কিতাবে লিপিবদ্ধ নেই যখন আমি সেই প্রাণসমূহ সৃষ্টিও করিনি। নিশ্চয়ই আল্লাহর পক্ষে এটা সহজ। তা এই জন্য যে, তোমরা যা হারিয়েছ তার জন্য যাতে দুঃখিত না হও এবং যা আল্লাহ তোমাদেরকে দান করেছেন তার জন্য উল্লাসিত না হও। আল্লাহ এমন কোন ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না। যে দর্প দেখায় ও বড়ত্ব প্রকাশ করে। [হাদীদ-২২-২৩]

তাকদীর সংক্রান্ত আয়াতসমূহ দ্বারা যেমন এ বিশ্বাসের অপরিহার্যতা প্রমাণিত হয়, তেমনি জীবনের চড়াই-উৎরাইয়ে এ বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা সম্পর্কেও ধারণা পাওয়া যায়।

সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে- অদৃষ্ট বিশ্বাস দ্বারা তাওহীদের বিশ্বাস পরিপূর্ণতা লাভ করে। যে ব্যক্তি তাকদীরকে বিশ্বাস করে না, সে আল্লাহ তায়ালার জ্ঞান ও এখতিয়ারকে সংকুচিত করে ফেলে। তার বিশ্বাস মতে জগতে এমন বহু কিছু ঘটে, যে সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার কোন পূর্ব সিদ্ধান্ত নেই। তাঁর জ্ঞান ও ইচ্ছার বাইরে সম্পূর্ণ নতুনভাবে তা ঘটে। ভাল-মন্দ কার্যকলাপেও মানুষ এমনই স্বাধীন যে, তাতে আল্লাহ তায়ালার কোন ইচ্ছা কার্যকর নয়। মানুষের ইচ্ছাই তাতে চূড়ান্ত। এভাবে সে আল্লাহর পাশাপাশি এক নিরঙ্কুশ ইচ্ছাময়কে দাঁড় করায়, যা তাওহীদের পরিপন্থী এক শিরকী ধারণা। এজন্যই বলা হয়, যারা তাকদীর বিশ্বাস করে না, তারা এ উম্মতের মাজুসী (যারা দুই ঈশ্বরে বিশ্বাসী)।

সুতরাং ব্যক্তির তাওহীদী বিশ্বাস তখনই পূর্ণতা লাভ করবে যখন সে বিশ্বাস করবে জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে যা কিছু ঘটছে ও ঘটবে সবই আল্লাহ তায়ালার পুর্বসিদ্ধান্তের অধীন। তাঁর ইচ্ছা ও মহাপরিকল্পনার বাইরে মহাজগতের কোন কিছুই ঘটে না-

﴿ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَٰتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَٰبٍ مُّبِينٍ ﴾

'তাঁর অজ্ঞাতসারে একটি পাতাও পড়ে না। মাটির অন্ধকারে এমন কোন শস্যকণা অঙ্কুরিত হয় না অথবা তাজা ও শুকনা এমন কোন বস্তু নেই যা সুস্পষ্ট কিতাব (লাওহে মাহফুজে) লিপিবদ্ধ নেই। [আন'আম-৬০]

মানবমনে যখন এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, নিয়তিতে যা নির্ধারিত আছে কেবল তাই ঘটে ও তাই ঘটবে তার বাইরে কিছু ঘটবে না। তখন স্বাভাবিকভাবেই আল্লাহ তায়ালার প্রতি এক অটুট আস্থা জন্ম নেয় এবং কঠিন থেকে কঠিনতর কাজের হিম্মত সৃষ্টি হয়ে যায়। তখন দুশমন যত শক্তিশালী হোক তাকে ভয় পায় না। ঝুঁকি যত প্রচণ্ডই হোক পরওয়া করে না। এবং হুমকি যত মারাত্মকই হোক গ্রাহ্য করে না। তা করবেই বা কেন যখন সে জানে,

﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِتَٰبًا مُّؤَجَّلًا ﴾

আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কারও মৃত্যু হতে পারে না। যেহেতু তার মেয়াদ সুনির্দিষ্ট [আলে ইমরান-১৪৫]

﴿ لَّن يُصِيبَنَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا ﴾

আমাদের জন্য আল্লাহ যা নির্দিষ্ট করেছেন তা ছাড়া আমাদের অন্যকিছু হবে না। তিনিই আমাদের অভিভাবক [তাওবা: ৫১]

এ বিশ্বাসে বলিয়ানের পক্ষেই সম্ভব দজলা নদীর উপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দেওয়া, তরবারির দোচালা পথে বেপরোয়া এগিয়ে চলা এবং সকল রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা

করে সত্য-ন্যায়ের পথে অবিচল থাকা। সুতরাং ভাগ্যবিশ্বাসের সাথে কর্মবিমুখতার কোন সম্পর্ক নেই। বরং এ বিশ্বাস দৃঢ় মনোবল ও ন্যায় নিষ্ঠতার সাথে কর্মমুখর হওয়ার প্রেরণা যোগায়। তাই তো ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় এ বিশ্বাস যাদের অন্তরে সর্বাপেক্ষা বেশি দৃঢ় ছিল সেই সাহাবীগণ মানবেতিহাসের সর্বোচ্চ বেশি কর্মতৎপর ছিলেন। ইবাদত বন্দেগীতে যেমন তারা ছিলেন অসাধারণ নিষ্ঠাবান, তেমনি জাতীয় উৎকর্ষসাধন ও ইতিহাস নির্মাণের প্রচেষ্টায়ও তারা ছিলেন সর্বকালের সেরা আদর্শ। এ রকম অদম্য সাহসী, দুর্নিবার দিগ্বিজয়ী, কর্তব্যকর্মে অটুট-অবিচল, পাহাড়সম ধৈর্যের অধিকারী, অথচ নিরহংকার ও বিনয়-বিনম্র একটি কর্মবীর সম্প্রদায়ের নজীর কে কোথায় খুঁজে পাবে? সন্দেহ নেই তাদের এ অসাধারণত্ব তাকদীর বিশ্বাসের সুফল।

এ বিশ্বাস যার অটুট সে যে কোন প্রলোভনকে সহজেই অগ্রাহ্য করতে পারে। যে চিন্তা করে আমার ভাগ্য তো নির্ধারিত হয়েই আছে। আল্লাহ তায়ালার ঘোষণা রয়েছে-

﴿ نَحۡنُ قَسَمۡنَا بَيۡنَهُم مَّعِيشَتَهُمۡ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا ﴾

পার্থিব জীবনে তাদের জীবিকা আমিই বণ্টন করেছি। [যুখরুফ: ৩২]

﴿ وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزۡقُكُمۡ ﴾

এবং আসমানেই (নির্ধারিত হয়ে আছে) তোমাদের রিযক। [যারিয়াত: ২২]

সেই নির্ধারিত হিস্যার অতিরিক্ত কেউ পেতে পারে না। সুতরাং অহেতুক ন্যায়-নীতি বিসর্জন দেওয়া কেন? এভাবে সে লোভ, লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদি মন্দ চরিত্র থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়।

অদৃষ্ট বিশ্বাস মানবমনে কৃতজ্ঞতাবোধ জাগ্রত করে ও তাকে অহংকার অহমিকা থেকে রক্ষা করে। কেননা সে যখন জানে তার যা কিছু প্রাপ্তি সবই পূর্ব নির্ধারিত, তখন কোন অর্জন ও সফলতাকেই নিজ বুদ্ধি-কৌশল ও চেষ্টা শ্রমের ফসল ভেবে গর্ব করতে পারে না। বরং সে চিন্তা করে এটা কেবলই আল্লাহ তায়ালার দান। তিনি চাইলে আমার প্রচেষ্টাকে ব্যর্থও করে দিতে পারতেন। যেমন অনেকেরই ব্যর্থ হয়। তা না করে যখন আমাকে সফলতা দান করেছেন তখন তাঁর শুকর গোযারী করা আমার অবশ্যকর্তব্য।

আবার কারও চেষ্টা-শ্রম বৃথা গেলে ভাগ্যবিশ্বাসই পারে তাকে হতাশা থেকে রক্ষা করতে। কারণ সফলতা যখন চেষ্টার অনিবার্য ফল নয়; বরং আল্লাহর দান যে ব্যাপারে তার সিদ্ধান্ত স্থির হয়ে আছে। তখন বিফলতার ক্ষেত্রে এই বলে নিজেকে

প্রবোধ দেওয়ার সুযোগ হয় যে, এটা আমার ভাগ্যেই ছিল না কিংবা এই মুহূর্তে পাওয়ার ছিল না। কাজেই যতই চেষ্টা করি না কেন আমি ভাগ্যকে তো খণ্ডাতে পারব না।

আমার কর্তব্য ভাগ্যকে বরণ করে নেওয়া ও আল্লাহ তায়ালার ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকা। একে রিযা বিল কাযা বলে। এটা ফরজ। এরূপ যে করবে তার জন্য আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে অনেক বড় সুসংবাদ আছে। ইরশাদ হয়েছে-

﴿ وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ ۝١٥٥ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتۡهُم مُّصِيبَةٞ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيۡهِ رَٰجِعُونَ ﴾

সুসংবাদ দাও ধৈর্যশীলদেরকে, যারা তাদের উপর বিপদ আপতিত হলে বলে, আমরা তো আল্লাহরই এবং নিশ্চিতভাবে আমরা তারই কাছে ফিরে যাব। [বাকারাঃ ১৫৬]

এ সন্তুষ্টি যেমন উপস্থিত যে কোনও বিপদাপদে জরুরী, তেমনি জরুরী প্রাপ্ত জীবিকা স্বাস্থ্য সম্মান স্বামী স্ত্রী সন্তান তথা আল্লাহ প্রদত্ত জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট সবকিছুতে।

অহমিকা ও হতাশানাশ এবং খুশীমনে পরিস্থিতিকে মেনে নেওয়ার এই সুফল সম্পর্কেই ইরশাদ হয়েছে-

﴿ لِّكَيۡلَا تَأۡسَوۡاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمۡ وَلَا تَفۡرَحُواْ بِمَآ ءَاتَىٰكُمۡ ﴾

(তাকদীরের লিখন) এজন্য যে, তোমরা যা হারিয়েছ তার জন্য যাতে হতাশাবোধ না কর এবং আল্লাহ তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে উল্লাসিত না হও। [হাদীদ-২২]

অদৃষ্ট বিশ্বাস কেবল অহমিকা ও হতাশারোধকই নয়; সেই সাথে নবোদ্যমের উদ্বোধকও বটে। কেননা অদৃষ্টে কি আছে তা তো জানা নেই। এবারের চেষ্টা বিফলে গেছে বলে আগামীতেও সফলতা লাভ হবে না, এমন তো কোন কথা নেই। সুতরাং চেষ্টাতে ক্ষান্ত দেওয়া কোন বুদ্ধির কথা নয়। বুদ্ধির দাবি আল্লাহ তায়ালার ঘোষণায় আস্থা রাখা যে,

﴿ وَأَن لَّيۡسَ لِلۡإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴾

মানুষ তাই পায় যা সে করে। [নাজমঃ ৩৯]

লেখকঃ শাইখুল হাদীস, জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া তেজগাঁও ঢাকা।

কওমী মাদরাসায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চর্চা : ভাবনা ও নির্দেশনা

মাওলানা আহমদ মায়মূন

কুরআন ও হাদীসের দ্ব্যর্থহীন ভাষ্য ও মুমিনের বিশ্বাস মুতাবেক প্রধানত জগৎ দুটিঃ ইহজগৎ ও পরজগৎ। মানুষসহ সকল সৃষ্টিজীব এ পৃথিবীতে জন্মে, বেড়ে ওঠে এবং অনেক অনুকূলতা ও প্রতিকূলতার চড়াই-উৎরাইয়ের মাঝ দিয়ে অগ্রসর হতে চেষ্টা করে। একপর্যায়ে প্রত্যেকের আপন আপন জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। সকল সৃষ্টিজীব এ নিয়ম-নিগড়ে বাঁধা হলেও সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য বিচারে জীবনের সকল ক্ষেত্রে মানুষের যে স্বাতন্ত্রিক অবস্থান রয়েছে তা বলাই বাহুল্য। মানুষ এ জীবনে হাসি-কান্না, আনন্দ-আহ্লাদ, স্নেহ-মায়া, প্রীতি-ভালবাসা, বিরহ-যাতনা, দুঃখ-দুর্দশা, জরা-পীড়া, সুখ-সমৃদ্ধিসহ হাজারো রকম পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়। একসময় সকল লীলা সাঙ্গ করে নিমীলিত চোখে পরপারে পাড়ি জমাতে হয়। এরই নাম ইহজীবন বা ইহজগৎ। ‘ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি’ নামে সমাজে যা প্রচলিত, তার সম্পর্ক কেবলই এ জগতের সাথে। মানুষ যে অবস্থানে আছে, কি করে তার চেয়ে ভাল অবস্থানে উঠবে, ভাল খাবে, ভাল পরবে, কি করে আরও উন্নতি ও সমৃদ্ধি আসবে, কিভাবে আনন্দ ও সুখের মাত্রাগুলো আরও পরিপূর্ণ ও প্রবৃদ্ধি করা যায়, স্থায়ী ও অফুরন্ত করে রাখা যায়, এ জগতের যাবতীয় দুঃখ-দুর্দশাকে কিভাবে এড়িয়ে থাকা যায় বা কত দ্রুত প্রতিহত করা যায়, জরা-পীড়া কি করে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা যায়, এক কথায় কি করে শান্তিকে চিরদিনের জন্য হাতের মুঠোয় ধরে রাখা যায়, এসব ভাবনার তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক চর্চার নামই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। চিরদিনের জন্য চক্ষু নিমীলিত করার পূর্ববর্তী সুখ-দুঃখে আন্দোলিত এ নশ্বর পৃথিবীকে ঘিরেই এসব স্বপ্ন ও ভাবনা আবর্তিত।

সৃষ্টির শুরু থেকে, যখন থেকে মানুষের ব্যক্তিক ও সামষ্টিক কল্যাণের ভাবনার সূচনা হয়েছে, কিংবা বলব, যখন থেকে মানুষের সামনে আসা সকল অভাব ও সংকট দূরীভূত করে নিজের প্রভুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব টিকিয়ে রাখার মনোবৃত্তি মানুষের মনে সৃষ্টি হয়েছে তখন থেকেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারিক চর্চা শুরু হয়েছে। হাজার হাজার বছরের পথ-পরিক্রমা পেছনে ফেলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আজ কত উন্নত ও সমৃদ্ধ তা সবার চোখের সামনে ভাস্বর। বিজ্ঞানের কল্যাণে মানুষ জয় করেছে এ পৃথিবীর দুর্গম গিরি-কান্তার, গহীন অরণ্য, সমুদ্রের তলদেশ, মহা অন্তরীক্ষ, সৌরজগতের নানা গ্রহ-উপগ্রহ। অনুসন্ধিৎসার দৃষ্টি সম্প্রসারিত করেছে এ সৌরজগতের বাইরের দিকে। সমগ্র বিশ্ব এখন মানুষের হাতের মুঠোয় এবং দৃষ্টির আওতায়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বদৌলতে মানুষ হাজারো রকমের দুর্জয়কে জয় করে অভাবিত সাফল্য অর্জন করেছে, তাতে কারো সন্দেহ থাকার কথা নয়।

তবে সুদূর অতীত থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধনের সকল প্রচেষ্টা-প্রয়াসের ফলাফল ও তার ব্যবহার সর্বাংশে মানুষের কল্যাণে এসেছে, তা হয়ত কোন বিবেকবানের পক্ষে বলা সম্ভব নয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মানবতাবিরোধী ব্যবহার কি আমরা কেবল হিরোশিমা-নাগাসাকিতে দেখেছি? চেচনিয়া, বসনিয়া, হারজেগোভিনা, ইরাক, ইরান, আফগানিস্তানের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মানবতাবিধ্বংসী ব্যবহার কি কম হয়েছে? আজকের আকাশ সংস্কৃতির অপ্রতিরোধ্য জোয়ারে গা ভাসিয়ে দেয়া তরুণ প্রজন্মের নৈতিক অবক্ষয় যে মাত্রায় পৌঁছেছে তাও তো এ বিজ্ঞান প্রযুক্তির উৎকর্ষেরই অবদান। এভাবে আরও কিছুদিন চলতে থাকলে মানবতা ও পাশববৃত্তির ব্যবধান ঘুচে গিয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি তার উৎকর্ষের চরম মাত্রা পাবে, তাতে সন্দেহের কি আছে?

আমার এ লেখা পড়ে হয়ত কেউ ভাবতে পারেন যে, আমি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিরোধী। তা কখনই নয়। আমি আজ বিদ্যুতের আলোতে আর বিদ্যুৎ চালিত পাখার নিচে বসে এ লেখাটি লিখছি তাও তো বিজ্ঞানের সুফল ভোগ করছি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মানুষের কল্যাণে ব্যবহৃত হোক তাতো সকলেরই দাবী, সকলের কথা। তবে কল্যাণের সংজ্ঞা কি তা ভেবে দেখা উচিৎ। আজকে মানব কল্যাণের নামে যা বলা বা করা হচ্ছে তা কল্যাণ না অকল্যাণ তা যদি নির্ণয় করতে না পারি তাহলে মানুষের অকল্যাণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার কি করে রোধ করা সম্ভব হবে?

এ জগতের বাইরে আর একটি জগৎ আছে। তার নাম পরজগৎ। পরজগতের জীবন অনন্ত ও অসীম। তার সুখ-দুঃখও অনন্ত ও অসীম। সেই জীবন নিয়ে বিজ্ঞানের কোন মাথা ব্যথা নেই। বিজ্ঞান সেখানে অচল। প্রযুক্তির চাকা সেদিকে অগ্রসর হয় না। মানুষের ইহজগতের শান্তি ও কল্যাণের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চর্চার এবং ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা কেউ অস্বীকার করে না। অগণিত অজস্র লোক তা করছেও, আরও করুক, তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই; বরং উৎসাহিত করার আগ্রহ আছে। তবে কি মানুষের পরকালীন অনন্ত জীবনের শান্তি ও জীবনের অভিপ্রায় কামনা-বাসনাগুলোকে সমৃদ্ধ করতে কিংবা দেশ ও জাতিকে উন্নতির শিখরে উন্নীত করতে শ্রেণী-বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চর্চায় আত্মনিয়োগ করতে হবে এমন নয়; বরং এজন্য একদল উদ্যমী প্রতিভার প্রয়োজন এবং তাই যথেষ্ট।

পক্ষান্তরে পরকালের শান্তি ও কল্যাণ অর্জনের প্রচেষ্টা সর্বস্তরের সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের জন্যই আবশ্যক। যারা এ কাজে সর্বস্তরের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করবে, এ পৃথিবীতে বসে পরকালের জীবনকে সুন্দর ও শান্তিময় করতে যারা

মানুষকে করণীয় ও বর্জনীয় কর্মের শিক্ষা দীক্ষা দেবে, এমন একটি বিশাল জনগোষ্ঠীর অহর্নিশ মনোনিবেশ জরুরী যাদের সংখ্যার মাত্রা হওয়া উচিৎ অন্তত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চর্চাকারীদের চেয়ে শতগুণ বেশী। অথচ তা করছে হাজারে হয়ত বা একজন, যাদেরকে আমরা কওমী মাদরাসার ছাত্র শিক্ষক হিসাবে চিনি। এদের কাজ মানুষকে সভ্যতা-ভদ্রতা, নীতি-নৈতিকতা, শালীনতা, ন্যায়পরায়ণতা, সৎকর্ম ও নিষ্ঠার শিক্ষা দিয়ে মানুষের ইহকালীন জীবনকে পরকালীন শান্তিময় জীবন লাভের উপযোগী করে গড়ে তোলার প্রয়াস চালানো। এজন্য কত বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীর এ কাজে আত্মনিয়োগ করা প্রয়োজন, তা অনুমান করা যেতে পারে। যারা এ খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছেন তাদের সংখ্যা যে, প্রয়োজনের তুলনায় এক সহস্রাংশ বলে অনুমিত তা পূর্বেই বলা হয়েছে।

তবু পরাশ্রয়ী লতিকার ন্যায় পরজীবী কিছু লোক, যারা নিজেদের জীবনের সঠিক গতি-গন্তব্যের ব্যাপারে উদাসীন হলেও নিজেদেরকে প্রগতিবাদী বলে পরিচয় দিতে তৃপ্ত বোধ করে, তারা এ দরদী মাতম (?) তুলে আকাশ পাতাল এক করে ফেলতে চাইছে যে, কওমী মাদ্রাসায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চর্চা হয় না। এ শ্রেণীর লোক নিজেদের কর্তব্যকর্ম ভুলে নিজেদের ভুলত্রুটি দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত না করে অন্যদের ত্রুটি খুঁজতে অভ্যস্ত। সেটি আদৌ ত্রুটি বলে বিবেচিত হওয়ার মত কিনা সে কথা ভিন্ন। 'চালনি না কি সুঁই কে বলে তোর মার্গে ছিদ্র'। এ সব প্রগতিবাদী কয়জন সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করেন? যারা করেন তাদের কয়জন তাদের প্রতি সৃষ্টিকর্তার কি কি আদেশ বা নিষেধ আছে, তা জানেন বা মানেন? তাদের কয়জনের শরীয়তসম্মতভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার জ্ঞান আছে? তাদের কয়জন অন্যায় অবিচার, মিথ্যা প্রতারণা ইত্যাদি থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখেন? তাদের কয়জন নিজেদের হীন স্বার্থে নীতি নৈতিকতাকে শিকেয় তুলে রাখেন না? মোটকথা, তাদের কয়জন নিজেদেরকে অন্যায় অপকর্ম এবং অসৎ ও অবৈধ কার্যকলাপ থেকে রক্ষা করে সৎপথে পরিচালিত করেন?

তাদের হেদায়েতের পথে আনার জন্য, সঠিক পথের দিশা দেওয়ার জন্য এবং তাদেরকে শরীয়তের বিধি বিধান শিক্ষা দেওয়ার জন্য গভীর ধর্মীয় জ্ঞান সম্পন্ন একদল লোকের আত্মনিবেদিত থাকা উচিৎ নয় কি? দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা কওমী মাদরাসায় কুরআন, হাদীস ফিকাহ চর্চায় একদল লোক একনিষ্ঠভাবে নিয়োজিত না থাকলে সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে দ্বীনের দীক্ষা দানকারী বিজ্ঞ আলেমসমাজ কোথা থেকে গড়ে উঠবে?

আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা করার জন্য হাজারে নয়শ নিরানব্বই জন আছে। খাবারে লবণ সমতুল্য এ স্বল্প সংখ্যক আলেম সমাজকেও আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চায় লাগিয়ে দিলে তাদের যে, আম ও ছালা দুটোই যাবে, তা কি বুঝিয়ে বলার দরকার আছে?

এখানে কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন যে, মাদরাসা শিক্ষার্থী-শিক্ষাপ্রাপ্ত তথা আলেমসমাজ সংখ্যায় যত নগণ্যই হোক না কেন, তারা কি তবে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে বঞ্চিত থাকবেন? তাদের এ প্রশ্নের উত্তরে বলব, সাধারণ জ্ঞানের কলা অনুষদের শিক্ষার্থীরা যেমন নিম্ন মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সাধারণ জ্ঞান অর্জন করার পর প্রত্যেকের রুচি ও মেধা মাফিক আপন আপন ভুবনে অগ্রসর হয়, তেমনি কওমী মাদরাসার শিক্ষার্থীও ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি নিচের শ্রেণীগুলোতে নিম্নমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সাধারণ জ্ঞান অর্জন করে তারপর ধর্মীয় জ্ঞানে পাণ্ডিত্য অর্জনের জন্য অগ্রসর হতে পারে। অনেক কওমী মাদরাসার সচেতন কর্ণধারগণ সে ব্যবস্থা রেখেছেন এবং শিক্ষার্থীরাও সেভাবে গড়ে উঠেছে। আর যে সব কওমী মাদরাসার কর্তৃপক্ষের এদিকটি নিয়ে ভাববার সুযোগ হয়নি তারাও হয়ত অনতিবিলম্বে এদিকে দৃষ্টিপাত করবেন বলে আশা করি। দারুল উলূম দেওবন্দ এক্ষেত্রেও আমাদের অনুকরণীয়।

কওমী মাদরাসার শিক্ষার্থীদের বাইরে যে বিশাল জনগোষ্ঠী আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় নিযুক্ত রয়েছে, তারা তাতে নিমগ্ন থাকুক, আরও বেশী করে আত্মনিয়োগ করুক, তাদের নিজেদের এবং সমগ্র দেশ ও জাতির কাঙ্ক্ষিত উন্নতি অর্জনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখুক, তার প্রতি আমরা কেবল সর্বান্তকরণে নৈতিক সমর্থনই জানাই না; বরং এ চেতনাকে সর্বতোভাবে উৎসাহিত করি। রাসূল সা. বলেছেন, 'জ্ঞানের কথা জ্ঞানীজনের হারানো সম্পদ। সে যেখানে তা পাবে সেখান থেকে কুড়িয়ে নেবে।' [তিরমিযী. হাদীসঃ ২৬৮৭]

একটি জাতিকে এ পৃথিবীতে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে হলে, একটি সভ্য জাতিরূপে বাঁচতে ও টিকে থাকতে হলে এবং শান্তি ও সমৃদ্ধি সহকারে জীবন যাপন করতে হলে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার কোন বিকল্প নেই। একটি সমৃদ্ধ জাতির জন্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তার, অভিজ্ঞ প্রকৌশলী, দক্ষ বিজ্ঞানী, বিদগ্ধ অর্থনীতিবিদ, বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ, বিজ্ঞ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, পদার্থবিদ, রসায়নবিদসহ আরও কত ধরনের পণ্ডিত ও গুণীজনদের প্রয়োজন তা কি কেউ অস্বীকার করতে পারে? তবে এর পাশাপাশি এসব বহুবিদ গুণবিদদের ধর্মীয় জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তাও কি অস্বীকার করা যাবে?

ঈমান-আকীদা ঠিক রাখতে হলে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করতে হলে, হালাল-হারাম বুঝতে হলে, সঠিক ও সহীহ শুদ্ধভাবে ইবাদত বন্দেগী করতে হলে, মোটকথা সৃষ্টিকর্তা মাবুদকে চিনে তাঁর আদেশ নিষেধ এবং শরীয়তের অনুশাসন জেনে ও মেনে চলতে হলে যে ন্যূনতম ধর্মীয় জ্ঞানের প্রয়োজন আছে, তা এদের এবং সমগ্র জাতির জন্য আবশ্যক নয় কি? উত্তর তো হ্যাঁ বাচকই হবার কথা।

তাহলে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীর অভিভাবক মুসলিম সরকারের প্রতি, যারা প্রয়োজনের সময় নিজেদেরকে 'ধর্মপ্রাণ' বলে পরিচয় দিতে আনন্দ বোধ করেন, আমাদের জোর দাবি থাকবে, নিম্ন মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত মুসলমানদের সন্তানদের জন্য সাধারণ জ্ঞানের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় ধর্মীয় জ্ঞান সিলেবাসে সংযুক্ত করে তার পাঠদান ও পাঠগ্রহণের বাধ্যতামূলক করা হোক। যাতে তারা হালাল-হারামের পার্থক্য করে, সঠিকভাবে ইবাদত বন্দেগী করে এবং শরীয়তের অনুশাসন জেনে ও মেনে চলতে সমর্থ হয়। অন্যথা মুসলিম জাতি হিসাবে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার এবং মুসলমান বলে পরিচয় দেওয়ার কোন অধিকার তাদের থাকবে না। আল্লাহ্ আমাদের সহায় হোন।

পরিশেষে যারা ধর্মীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব না করে কেবল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চর্চা ও তার উৎকর্ষ সাধনের আবশ্যকতা অনুভব করে চিৎকার করে থাকেন তাদের উদ্দেশ্য করে বিশ্ববরেণ্য দার্শনিক ও বিজ্ঞান-মনস্ক কবি ইকবালের একটি কবিতার কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত করছি।

ڈھونڈنے والا ستاروں کي گذر گاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا
اپنی حکمت کی خم و پیچ میں الجھا ایسا آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا
جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا

'নক্ষত্রপুঞ্জের গতিপথ অনুসন্ধানকারী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ নিজের চিন্তা ও ভাবনার জগৎ পরিভ্রমণ করতে সমর্থ হয়নি। সে নিজের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জটিল গ্রন্থির ফাপরে এভাবে জড়িয়ে পড়েছে যে, আজও তার নিজের জন্য কোনটি উপকারী আর কোনটি ক্ষতিকর, তার চূড়ান্ত হিসাব চুকাতে সক্ষম হয়নি। যে বিজ্ঞানী সূর্যের রশ্মিকে বন্দি ও নিয়ন্ত্রণ করেছে সে নিজের জীবনের অন্ধকার রাতকে ভোরের আলোয় উদ্ভাসিত করতে সমর্থ হয়নি।

লেখক: মুহাদ্দিস, জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা

সমকালীন আলেমসমাজের কর্মসূচী

দাওয়াত তালীম ও খেদমতে খালক

মাওলানা লিয়াকত আলী

ওলামায়ে কেরাম ওয়ারাছাতুল আম্বিয়া। আল্লাহ তায়ালা নবী ও রাসূলগণকে যে দায়িত্ব দিয়ে দুনিয়াতে পাঠিয়েছিলেন, খাতামুন নাবিয়্যীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে নবুওয়াত ও রিসালাতের ধারা শেষ হয়ে যাওয়ার পর সে দায়িত্ব এসে পড়েছে উম্মতে মুহাম্মদীর আলেমগণের ওপর। আল্লাহ তায়ালা কেয়ামত পর্যন্ত এ দ্বীন টিকিয়ে রাখবেন। আর এজন্য নিবেদিত প্রাণ একটি দল সব সময়ই থাকবে। সেই দলটিই হবে সফল, সবচেয়ে মর্যাদাবান এবং আল্লাহ তায়ালার সবচেয়ে প্রিয়। নিশ্চয়ই এ দলটি তারাই হবে যারা আল্লাহ তায়ালার শ্রেষ্ঠ হাবীবের রেখে যাওয়া দ্বীনের তালীম হাসিল করে আবার তা প্রসারের কাজে আত্মনিয়োগ করেছে। আল্লাহর মেহেরবানীতে আলেম সমাজ নিজেদের কর্তব্য সম্পর্কে কখনোই অসচেতন ছিলেন না। সময়ের প্রয়োজনে নতুন কৌশল ও পদ্ধতি অবলম্বনে তারা কখনোই কার্পণ্য করেননি। প্রতিকূল পরিবেশে কিভাবে ইসলামকে সজীব রাখা যায়, তা নিয়ে চিন্তা করা আলেমদের মজ্জাগত বিষয়। আমাদের পুণ্যবান পূর্বসূরিরা এভাবেই ইসলামের খেদমত করেছেন। তাদের সাধনা, চিন্তা ও দূরদর্শিতার সুবাদে আমরা এ আখেরী জমানায় এসেও ইসলামের নির্ভেজাল শিক্ষার সন্ধান পাচ্ছি।

যুগের পরিবর্তন হয়। পাল্টে যায় মানুষের জীবনোপকরণ ও বস্তুসামগ্রীর ব্যবহার পদ্ধতি। বস্তুজগতকে হাতের মুঠোয় আনতে সক্ষম হয়েছে মানব জাতি। যদিও এটা আল্লাহ তায়ালারই দান। তিনি মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত করে সৃষ্টি করেছেন এবং বিশ্ব চরাচরে অন্য সবকিছু থেকে মানুষকে অনন্য ক্ষমতা ও বুদ্ধিমত্তা দান করেছেন। কিন্তু মানুষ যখন নিজেকে শক্তিমান বলে ভাবতে থাকে, তখন তার মধ্যে সৃষ্টি হয় অহমিকা, মহান স্রষ্টার প্রতি বিমুখতা। বিজ্ঞানের চরম উন্নতির এক অশুভ অনুষঙ্গ মানুষের স্রষ্টাবিমুখতা। অবশ্য তা সামগ্রিক নয়। বরং বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে এক শ্রেণীর মানুষের ঈমান আরো দৃঢ় হচ্ছে।

ইসলামের দর্শন ও মূলনীতির ব্যাখ্যায় আগে যেসব জটিলতার মুখোমুখি হতে হতো, এখন তার অনেকটার প্রয়োজন মিটিয়ে দিয়েছে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও উদ্‌ঘাটন। তাছাড়া নবোদ্ভাবিত উপকরণ ও মাধ্যমসমূহ সহজেই কাজে লাগানো যায় ইসলামের প্রসার ও প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে। বলা হয়ে থাকে বর্তমানে

মুসলমানদের ও ইসলামের সংকটকাল চলছে। প্রকৃতপক্ষে ইসলামের জন্য অনুকূল সময় ও যুগ খুব কমই ছিল। প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েই চলতে হয়েছে ইসলামের ধারক বাহক ও একনিষ্ঠ অনুসারীদের। ব্যতিক্রম খুবই কম। এই প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতার মুখেও যারা অবিচল থাকতে পারেন, নিজ লক্ষ্য ও আদর্শে আপসহীন হতে পারেন, তাদের জন্যই অপেক্ষা করে অপরিমেয় প্রতিদান ও পুরস্কার।

আলেম সমাজের মর্যাদা যেমন অনেক উঁচু, তেমনি তাদের দায়িত্ব অনেক কঠিন ও ব্যাপক। তাদেরকে নিজেদের অবিচলতা, একনিষ্ঠতা ও দৃঢ়তার প্রমাণ দিতে হয় দ্বীনের প্রচার প্রসার ও বাস্তবায়নের কর্মসূচীতে। এ কর্মসূচীর কিছু অংশ সময় ও পরিবেশের কারণে পরিবর্তন হয়। আর কিছু অংশ শাশ্বত, অপরিবর্তনীয়। দাওয়াত, তা'লীম ও খেদমতে খালক–এমন তিনটি কাজ, যা ইসলামের খাদেমরা কোনো কালেই ছাড়েননি। বর্তমানেও এ তিনটি কাজের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সমানভাবে বিদ্যমান।

দাওয়াত বা ইসলামের প্রতি আহ্বানের অর্থ অনেক ব্যাপক। প্রথমত: মুসলমানদের কাছে দাওয়াত। নিশ্চয়ই তাদেরকে ঈমান আনার দাওয়াত দেয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু ঈমানের মজবুতি আনার জন্য এবং ঈমানের দুর্বলতা দূর করার জন্য দাওয়াত দিতে হবে। বিশেষ করে যাদের ঈমানে কোনো কপটতা কিংবা শঠতা না থাকলেও কার্যকলাপের দরুন দুর্বলতা ও ঘাটতি রয়েছে। তাদের কর্তব্যবোধ জাগিয়ে তোলা দাওয়াতের একটি উল্লেখযোগ্য উদ্দেশ্য। মূলত: তাবলীগ জামাআতের কর্মসূচী ও দর্শন এটাই। হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস কান্ধলবী রহ. এ কাজটিই করেছিলেন এবং সে ধারাই এখনো চলছে। অতএব কার্যকলাপে ত্রুটিপূর্ণ মুসলমানদেরকে নিষ্ঠাবান ও কর্তব্যপরায়ণ মুসলমানে পরিণত করার চেষ্টা এখানকার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

দ্বিতীয়ত: মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের চেতনা বা মুসলমানিত্বের চেতনা উজ্জীবিত করা প্রয়োজন। হযরত ওমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহু বিখ্যাত উক্তি করেছিলেন, 'আমরা সেই সম্প্রদায়, যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা ইসলামের দ্বারা সম্মানিত করেছেন, হযরত ওমরের এই চিরন্তন বাণীর মর্ম প্রত্যেকটি মুসলমানের হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত করার দায়িত্বও আলেমদের। ইসলাম আল্লাহর নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন, দুনিয়া ও আখিরাতে সাফল্য ও মুক্তির একমাত্র গ্যারান্টি, ইসলামই শ্রেষ্ঠ জীবন বিধান। ইসলামই বিশ্ব শান্তির একমাত্র ব্যবস্থা, মানুষের জীবন ও কর্মকাণ্ডের সাফল্য ও সার্থকতা নির্ভর করে ইসলাম অনুসরণের ওপর– একথাগুলো মুসলমানদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। মুসলমানরা যেন নিজেদের

ধর্মের জন্য গর্ববোধ করে, নিজেদের ধর্মকে সামগ্রিক ও সার্বজনীন বলে ভাবতে শেখে, ইসলামে কোনো ঘাটতি ও অসম্পূর্ণতা নেই বলে বিশ্বাস করে, সেই চেষ্টা চালানো দাওয়াতের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য।

বর্তমানে শিক্ষার হার বেড়েছে। সাধারণ শিক্ষায় অনেক প্রসার হয়েছে। নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা কমে আসছে। কিন্তু নতুন এই প্রজন্ম ইসলাম সম্পর্কে অন্ধকারে থেকে যায়। ইসলামের মৌলিক ও দৈনন্দিন ইবাদত বন্দেগী সম্পর্কেই প্রাথমিক ধারণা নেই তাদের। আর ইসলামের পারিবারিক, সামাজিক, বৈষয়িক ও নৈতিক দর্শন ও নীতিমালা সম্পর্কে তাদের কোনোই ধারণা নেই।

এরপর রয়েছে উচ্চ শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী। ইসলাম সম্পর্কে তাদের বড় একটি অংশ শুধু অন্ধকার লালন করে না। বরং বিরূপ ধারণা পোষণ করে। এটার পিছনে প্রধান কারণ তাদের শিক্ষাগত প্রেক্ষাপট। শিক্ষাব্যবস্থাই মনন ও চিন্তাধারা গঠনে অত্যন্ত প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করে। পশ্চিমা বিশ্বের আধিপত্য চলছে সারা পৃথিবীতে। সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থা পশ্চিমাদের ধাঁচে স্যেকুলার দর্শনে সাজানো। এই শিক্ষাব্যবস্থায় যারা লালিত হয়, তাদের মধ্যে যেন ধর্মের প্রভাব ও আবেদন দুর্বল হতে হতে নিঃশেষ হয়ে যায়- এমন উদ্দেশ্য সবসময় কার্যকর থাকে। ফলে সাধারণ শিক্ষায় যারা যত উঁচু স্তরে উন্নীত হয়, তাদের মধ্যে ধর্মীয় অনুভূতি ততই দুর্বল হবে–এটাই স্বাভাবিক। পশ্চিমারা ধর্ম সম্পর্কে এমনসব তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ পেশ করে, যা কোনো যুক্তিমনস্ক ব্যক্তির মনে ধর্ম সম্পর্কে বিরূপ ধারণা জন্মানোর জন্য যথেষ্ট। সুপরিকল্পিত ও উদ্দেশ্যমূলক শিক্ষা ও প্রচারণায় প্রভাবিত হয়ে আমাদের উচ্চ শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী ইসলামকে অন্যান্য অসার ও প্রমাণহীন ধর্মের সাথে এক করে দেখতে অভ্যস্ত হয়। এই শ্রেণীটির কাছে ইসলামের আসল শিক্ষা ও দর্শন সঠিক উপায়ে পেশ করার জন্য, তাদেরকে ইসলামের সাথে পরিচিত করার জন্য নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। বর্তমানে আলেমদের এটা একটা বিশেষ জরুরী দায়িত্ব। শিক্ষিত শ্রেণীকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করতে, ইসলাম সম্পর্কে তাদের ভুল ধারণা দূর করতে, ইসলাম সম্পর্কে তাদের অস্পষ্টতা কাটানোর জন্য নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সময়ের দাবী। দাওয়াতের এই দিকটি এখনো উপেক্ষিত রয়েছে। দাওয়াতের এই ক্ষেত্রটির দিকে মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন।

সাধারণ মানুষের সামনে ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরা দাওয়াতের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। দৈনন্দিন ইবাদত বন্দেগী, আখিরাতের জীবনের পাথেয় সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা, দুনিয়াবি জীবনের প্রতিটি কাজ ও পদক্ষেপের জন্য অনিবার্য জবাবদিহিতার প্রস্তুতি গ্রহণ এসব বিষয় তুলে ধরে নিয়মিত ওয়াজ মাহফিল

অনুষ্ঠান কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। অতএব ওয়ায়েজ বা বক্তা হওয়া নিছক পেশার জন্য পেশা হিসেবে নয় বরং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য সামনে রেখে একদল আলেমকে এ পেশায় নামতে হবে, নামাতে হবে।

ইসলামের সামগ্রিক শিক্ষা আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে ও ভাষায় সম্পূর্ণ ইতিবাচক পদ্ধতিতে তুলে ধরার উদ্দেশ্য নিয়ে যারা কাজ করবেন, তাদের এই ওয়াজ বা বক্তৃতা নিঃসন্দেহে দ্বীনী দায়িত্ব পালনের অন্তর্ভুক্ত হবে। এ ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতার বিষয় রাজনীতি। কোনো রাজনৈতিক দলের সমালোচনা বা রাজনৈতিক কর্মসূচী বা রাজনৈতিক বক্তব্যের সমালোচনা সচেতনভাবে এড়িয়ে চলতে হবে। যেকোনো গণতান্ত্রিক বা স্যেকুলার রাজনৈতিক দলের এমনকি ইসলামী রাজনৈতিক দলেরও পরিচয় বহন না করলেই ভালো হয়। নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে নিছক ইসলামের সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরাই হবে একমাত্র কাজ। কোনো দলের স্বার্থ হাসিল করার হাতিয়ারে পরিণত হলে শেষ পর্যন্ত নিজের ও নিজেদেরই ক্ষতি হবে।

মোটকথা, ইসলামের দাওয়াত ব্যাপকভাবে বিচিত্র ভঙ্গিতে, কৌশলে ও পরিকল্পনার সাথে পেশ করতে থাকা ওলামায়ে কেরামের জন্য বর্তমানে নয়, সব সময়ের জন্য অবশ্য কর্তব্য ছিল, আছে, থাকবে। ওলামায়ে কেরামের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মক্ষেত্র তালীম বা শিক্ষা। সর্বযুগেই এক্ষেত্রটির প্রতি আলেম সমাজের আগ্রহ ও আকর্ষণ এবং নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা ছিল, এখনো আছে। পার্থিব ও বৈষয়িক সুবিধার সীমাবদ্ধতা মেনে নিয়েও ওলামায়ে কেরাম তালীমকে নিজেদের জীবনের প্রধান ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তাদের চেষ্টা ও সাধনার কারণে উপকরণগত সহায়তার অপ্রতুলতা সত্ত্বেও শূন্য থেকে সূচনা করে বিশাল আয়তনের প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে ওঠে। এখনো শত প্রতিকূলতা ও বাধা সত্ত্বেও এ ধারা অব্যাহত রয়েছে।

তালীমের প্রয়োজন কখনোই ফুরাবে না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তালীমের ধারা অব্যাহত রাখতে বার বার তাগিদ দিয়েছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বর্ণনা করেন– হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন– ইলম অর্জন করো ও লোকদেরকে তা শেখাও। ফারায়েজের শিক্ষা গ্রহণ করো ও লোকদেরকে তা শেখাও। কুরআন মাজীদের শিক্ষা গ্রহণ করো ও লোকদেরকে তা শেখাও। আমাকে প্রত্যাহার করে নেয়া হবে। আর ইলমও অচিরেই প্রত্যাহার করে নেয়া হবে এবং ফিতনাসমূহ প্রকাশ পাবে। এমনকি দুজনে একটি ফরয বিষয় নিয়ে মতভেদ করবে। কিন্তু তাদের দুজনের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়ার মতো কাউকে পাবে না। (দারেমী)

অসংখ্য আয়াত ও হাদীস খুঁজে পাওয়া যাবে ইসলামী উলূমের তালীম অব্যাহত রাখার প্রয়োজনীয়তা ও অপরিহার্যতা সম্পর্কে। কিন্তু তালীমকে প্রাতিষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিক গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। নির্ভেজাল ও মানসম্পন্ন বিস্তারিত দ্বীনী ইলম হাসিল করার জন্য কওমী মাদরাসাগুলোতে যারা ভর্তি হয়, তাদের সংখ্যা খুবই সীমিত। আমাদের মুসলিমপ্রধান দেশেরও ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষুদ্র একটি অংশ মাদরাসায় আসে। অবশিষ্ট বৃহত্তর অংশের দ্বীনী শিক্ষার ব্যবস্থা ও পরিবেশ খুবই শোচনীয়। যারা সাধারণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র, যারা সাধারণ শিক্ষার সর্বশেষ স্তর পার করে কর্মজীবনে প্রবেশ করেছে, আর যারা শিক্ষা লাভের সুযোগ পায়নি–এসব শ্রেণীর জন্যই দ্বীনী তালীমের ব্যবস্থা ও সুযোগ সৃষ্টি করা ওলামায়ে কেরামের কর্তব্য।

মোটকথা, দ্বীনী শিক্ষার বিস্তার ও ব্যাপকতা দান ছাড়া জনসাধারণকে দ্বীনের পথে চালিত করার সুযোগ নেই। তাই অনানুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক দ্বীনী শিক্ষার পদ্ধতি ও কর্মসূচী গ্রহণ করা প্রয়োজন। মসজিদে মসজিদে বয়স্কদের কুরআন মাজীদ ও মাসায়েল শিক্ষা, আমলী তারবিয়াত চালু করা, শিশুদের জন্য প্রভাতী-বৈকালিক মকতব চালু করা, কর্মজীবীদের জন্য নৈশ মাদরাসা চালানো ব্যাপক করা প্রয়োজন। তেমনি কওমী মাদরাসার ঐতিহ্যবাহী দরসে নেজামীর সাথে বর্তমানের প্রচলিত সাধারণ সিলেবাসকে সমন্বিত করে এলাকায় এলাকায় নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা দরকার। সাধারণ শিক্ষায় যে দ্বীনী ঘাটতি আছে এবং দরসে নেজামীতে বৈষয়িক ক্ষেত্রের যে সীমাবদ্ধতা আছে, এ উভয় ধরনের দুর্বলতা দূর করার পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থা ছাড়া মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ সাধন করা দুরূহ ব্যাপার। এখন সুনির্দিষ্ট ও সমন্বিত কর্মসূচী নিতে হবে প্রতিটি এলাকায় এ ধরনের নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার। ভৌগোলিক ছক অনুযায়ী সব এলাকাকে আওতায় এনে প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে তুলতে হবে। তবেই দেশ ও জাতির কল্যাণ নিশ্চিত করা যাবে।

খেদমতে খালক বা সৃষ্টির সেবা অন্যতম মানবিক বৈশিষ্ট্য। শুধু মানুষ নয়, সৃষ্টিকুলের প্রতি দয়া প্রদর্শন ও সৃষ্টি জগতের সংরক্ষণ ও লালন মুমিনের দায়িত্ব। গৃহপালিত তো বটেই, বন্য পশুর প্রতিও সদয় আচরণের তাগিদ রয়েছে ইসলামী শরীয়তে। একটি বিড়ালকে না খাইয়ে মারার কারণে জাহান্নামের উপযুক্ত হওয়া এবং একটি পিপাসু কুকুরকে পানি পান করানোর সুবাদে অধঃপতিতা নারীর জান্নাতের উপযুক্ত হওয়ার কথা বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত আছে। আর মানবসেবার গুরুত্ব তো বলার অপেক্ষা রাখে না। ওলামায়ে কেরামের জন্য এই ক্ষেত্রটির প্রতি বিশেষ নজর দেয়ার প্রয়োজন সব সময়েই ছিল, এখনো আছে। এতে একদিকে যেমন ওয়ারাছাতুল আম্বিয়া হিসেবে দায়িত্ব পালনের প্রতিদান পাওয়া যাবে,

তেমনি প্রতিকূল পরিবেশে জনসাধারণের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছে দেয়ার পথ সুগম হবে। জনসেবার মাধ্যমেই তাদের সাথে সম্পর্ক নিবিড়তর হয়। সন্দেহ নেই, দ্বীনী নির্দেশনা প্রদান ও দ্বীন পালনের দীক্ষা দেয়া জনগণের প্রতি ওলামায়ে কেরামের সবচেয়ে বড় অবদান। কিন্তু পাশাপাশি বস্তুগত সহায়তা, বৈষয়িক ব্যাপারে পরামর্শ দেয়া, অসহায়দের সাহায্য করা, বেকারদের উপার্জনক্ষম করা– এসব কাজেও ওলামায়ে কেরামের সম্পর্ক থাকা প্রয়োজন। অবস্থা ও পরিবেশ অনুযায়ী উপযুক্ত পদ্ধতি ও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। জনসেবাকে বিশেষ উদ্দেশ্য ও কর্মক্ষেত্র বানালে সামগ্রিকভাবে আলেম সমাজের মর্যাদা ও অবস্থান বাড়তেই থাকবে ইনশাআল্লাহ।

লেখক: সহসম্পাদক: দৈনিক ‘নয়া দিগন্ত’,

মুহাদ্দিস ও শিক্ষাসচিব, জামিয়া দারুর রাশাদ মিরপুর ঢাকা।

বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের মাধ্যমেই পশ্চিমাদের পরাজিত করতে হবে

মাওলানা সালমান

আল্লাহ তায়ালা কিয়ামত পর্যন্ত আনেওয়ালা দ্বীনের দায়িত্বশীল ও জিম্মাদারের কর্তব্য নির্দেশ করে ইরশাদ করেছেন, 'আর সমস্ত মুমিনের অভিযানে বের হওয়া সঙ্গত নয়, তাই তাদের প্রত্যেকটি দলের একটি অংশ কেন বের হলো না? যাতে তারা দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে এবং যখন তারা তাদের স্বজাতির কাছে প্রত্যাবর্তন করবে, তখন তাদেরকে সতর্ক করবে, তাহলে আশা করা যায় যে, তারা সতর্ক হবে।' [সূরা তওবা] প্রকৃতপক্ষে এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দ্বীনী মাদরাসার দায়িত্বশীলদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে একটি রূপরেখা দান করছেন। এজন্য পাশ্চাত্যের শিক্ষা ও সভ্যতার আগ্রাসনে ভারতবর্ষ যখন এক নতুন বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে চলেছিল, ঠিক তখনই উপমহাদেশের দ্বীনী গায়রত এবং ঈমান ও ইসলাম হেফাজতের অপরিসীম জযবা নিয়ে ১৯৬৬ সালে হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী রহ. দারুল উলূম দেওবন্দের ভিত্তি স্থাপন করেন। দারুল উলূম প্রতিষ্ঠার আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে হযরত শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান রহ. বলতেন, আমি দেওবন্দের প্রথম ছাত্র। আর দারুল উলূমের পরিচয় আমার চেয়ে তোমরা বেশি জানো না। এ তো এক দুর্গ। মুজাহিদীনে ইসলামের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।' আরো পরিষ্কার ভাষায় তিনি বলতেন, 'দারুল উলূম হলো মুঘল সালতানাতের নিভে যাওয়া প্রদীপের বিকল্প।'

হযরত নানুতবী রহ. হিন্দুস্তানের পুণ্যভূমিকে পশ্চিমা হানাদারদের হাতে তুলে দিতে রাজী হননি। বিভিন্ন ফ্রন্টে ওলামায়ে কেরাম আপাতদৃষ্টিতে পরাজিত হলেও চিন্তা ও চেতনা এবং ঈমান ও আকীদার যুদ্ধে তারা পরাজিত হননি। বরং তারা মুসলিম যুবকদের দ্বীনী মাদরাসার প্রশিক্ষণকেন্দ্রে লালন-পালন করে, এ দেশ থেকে চিরস্থায়ীভাবে ইংরেজদের উৎখাত করার চেষ্টা করেছিলেন। আমরা সেই মহান বুযুর্গানে দ্বীন হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী, মাওলানা ফজলে রহমান গঞ্জেমুরাদাবাদী, হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী, হযরত মাওলানা মাজহার নানুতবী, হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী রাহিমাহুমুল্লাহ প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম, যারা ইসলামের ঈমান ও ইসলামের সংরক্ষণের কাজে জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন তাদের উত্তরসূরি হবার দাবিদার।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আপনাদের মর্যাদা সমুন্নত করেছেন। আপনারা নবী আলাইহিস সালাত ওয়াস সালামের ওয়ারিশ। নবুয়তের মিশনকে বিশ্ব মানবতার কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য যোগ্য দাঈ ও মুবাল্লিগ গড়ার আপনারা হলেন সুনিপুণ

কারিগর, আপনারা আসমানী সংবিধানের রক্ষক। বিশেষ করে আপনারা যারা দ্বীনী ইলমের খেদমত ও জনসংস্কারের দায়িত্ব পালন করছেন, তাদের মর্যাদা হচ্ছে হৃদযন্ত্রের মতো। শরীরের অন্য অঙ্গগুলোর সুস্থতা নির্ভর করে হৃদযন্ত্রের সুস্থতা ও সজীবতার ওপর। সুতরাং আপনাদের ইখলাস, মেহনত, পরিশ্রম ও দূরদর্শিতা এবং কর্মদক্ষতার ওপর নির্ভর করছে মুসলিম উম্মাহর ভবিষ্যৎ।

ইসলামের ইতিহাসে বর্তমান যুগের মতো সঙ্কটের যুগ আর কখনও অতিবাহিত হয়নি। বর্তমান যুগে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ধ্যান-ধারণা এত দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে যে, চোখের পলকে ইসলামবিদ্বেষ মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে যাচ্ছে। মিডিয়ার মাধ্যমে মিনিটের মধ্যে ভিন্ন সংস্কৃতির ছোবল মানুষের দিলে আঘাত হানছে। এ পরিবর্তনশীল অবস্থা সামাল দিতে না পারলে তাতারী আগ্রাসন যেমন মুসলিম বিশ্বের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছিল, কমিউনিজম আগ্রাসন যেমন বুখারা, সমরখন্দ ও তাসখন্দের মুসলিম জনপদকে শেষ করে দিয়েছিল, এ ধরনের আগ্রাসন মুসলিম উম্মাহর বিভিন্ন দেশেও শুরু হয়ে গিয়েছে। তবে এ আগ্রাসন পূর্ববর্তী আগ্রাসনের তুলনায় ভিন্ন এবং অনেক ভয়ঙ্কর। এ অবস্থায় ওলামায়ে কেরামের কর্মকাণ্ড শুধুমাত্র মসজিদ-মাদরাসায় সীমাবদ্ধ না করে বৃহত্তর ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন।

এ পরিস্থিতিতে আমাদের করণীয় কী? এ সম্পর্কে আমাদের পূর্বসূরি মহান আঁকাবিরের কিছু কথা আমি আপনাদের সামনে পেশ করছি। এ প্রসঙ্গে হযরত মাওলানা আতহার আলী রহ. বলেন, 'বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ওলামায়ে কেরামের কার্যক্রমের দৃষ্টিভঙ্গি শুধু মসজিদ, মাদরাসা ও খানকাহ ইত্যাদিতে সীমাবদ্ধ রাখিলে মস্ত বড় ভুল করা হইবে। চতুর্দিক হইতে বিভিন্ন ফেতনা-ফ্যাসাদ যেরূপ ক্ষিপ্র গতিতে বিস্তার লাভ করিতেছে এমতাবস্থায়ও যদি আলেমগণ 'সত্য প্রচার শ্রেষ্ঠ জিহাদ' এই নীতির প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া অগ্রসর না হন এবং হুম বিল্লাইলে রুহবানুন ওয়া বিন্নাহারে ফুরসানুন তথা 'তাহারা রাত্রে সংসার ত্যাগী দরবেশ আর দিনে বীরপুরুষ"-এর মাহাত্ম্যকে নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে ফুটাইয়া না তোলেন, তবে জানিয়া রাখুন, আপনাদের মসজিদ, মাদরাসা ও খানকাহের নেগাহবান ও মোহাফেজ কেহ থাকিবে কি না সন্দেহ। এই বস্তুতান্ত্রিক যুগের প্লাবন আপনা দিগকেই ভাসাইয়া নিয়া যাইবে সকলের আগে। আপনাদের কীর্তিকলাপকে; আপনারা কিছুতেই অক্ষত দেহে নিশ্চিন্তে মসজিদে বসিয়া থাকিতে পারিবেন বলিয়া আশা পোষণ করিবেন না। সূক্ষ্মদৃষ্টিতে চক্ষু মেলিয়া দেখুন এবং কান পাতিয়া শুনুন, তাতারের বিগত তুরস্ক ও বুখারার অতীত ইতিহাস নতুন করিয়া আজ সঙ্কেত ধ্বনিই শুনাইয়া যাইতেছে।'

হযরত মাওলানা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী রহ. বলেন, 'প্রিয় ওলামা ও মাশায়েখ! এখন আর কুঠুরিতে ঘুমিয়ে থাকার সময় নেই। এখন আর সে সময় নেই যে, আপনারা নীরবতার সাথে শুধু ব্যক্তিগত নাজাতের চিন্তাই চালিয়ে যাবেন। এখন তো ময়দানে নামতে হবে, মুসলমানদের সেনাপতিত্বের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে হবে এবং বিশুদ্ধ ইলম-আমল দ্বারা জাতির দিকনির্দেশনার কাজ করতে হবে। আর দিকনির্দেশনা বলতে শুধু ফিকহী মাসায়েল বুঝলে চলবে না; বরং সর্বদিকে সর্ববিষয়ে মানবসমাজের প্রদীপ হতে হবে। নিজেকে গড়তে হবে, জাতিকেও গড়াতে হবে।'

হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. বলেন, 'ফেতনা-ফ্যাসাদ কখনও যুগের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং একই ফেতনা বিভিন্ন যুগে নতুন নতুন রূপ ধারণ করে, নতুন নতুন আঙ্গিকে সামনে আসে এবং তা মুসলিম উম্মাহর সামনে নতুন নতুন বিপদ ও দুর্যোগ ডেকে আনে। অতীত যুগের জাহিলিয়াত এখন নতুন অস্ত্রে বলীয়ান হয়ে ময়দানে নেমে আসছে।' আল্লামা ইকবাল এ প্রসঙ্গে বলতেন : 'আগারচে পীর হ্যায় মুমেন-জোয়ান হে লাত ও মানাত', অর্থাৎ মুমিন যদিও আজ বুড়ো, লাত ও মানাত এখনও নওজোয়ান।'

এটাই বড় বিপজ্জনক যে, জাহিলিয়াতের 'লাত-মানাত' তো নতুন তেজে তেজীয়ান, নতুন বলে বলীয়ান এবং আগ্রাসী শক্তিতে আগুয়ান। অথচ 'ওয়ারিশে নবী' যাদের পরিচয় তারা আজ নির্জীব ও হতোদ্যম। তাদের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছে হতাশা, হীনম্মন্যতা ও পরাজয়ের মানসিকতা। তাগুতি শক্তিগুলো যেখানে নতুন উদ্যমে, নতুন সাজে, নতুন কৌশলে এবং নতুন শ্লোগানে মঞ্চকে তোলপাড় করছে, সেখানে উম্মতের পাহারাদার যারা, তারা গাফলতের ঘুমে বিভোর হয়ে আছে। কিংবা শক্তি-সাহস হারিয়ে জিন্দেগীর ময়দান ছেড়ে দিয়েছে। 'লাত-মানাত' যেখানে লম্ফে-ঝম্ফে, হুঙ্কারে-ঝঙ্কারে যুদ্ধের আহবান জানাচ্ছে সেখানে উলূমে নবুওয়াতের আমানতদার যারা, তারা নিরাপদ আশ্রয়ে দিন গুজরানের কথা ভাবছে। এ কোনোদিন আমাদের তুমি দেখালে হে আল্লাহ!

এ আগ্রাসন মোকাবেলায় আমাদের আজ কী করণীয়? এ প্রসঙ্গে দারুল উলূম দেওবন্দের বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন হযরত মাওলানা হাবীবুর রহমান আযমী বলেন, 'নিকট অতীতে কওমী মাদরাসাগুলো উপমহাদেশে বিশেষ করে হিন্দুস্তানে ইসলাম ও মুসলমানদের স্থায়িত্ব ও উন্নতিতে যে অকল্পনীয় অবদান রেখেছে তা ইতিহাসের একটি বিস্ময়কর অধ্যায়। সমাজ জীবনে এসব মাদরাসা মুসলিম জাতিকে ক্রমাগত এমনসব ব্যক্তিত্ব ও মহাপুরুষ উপহার দিয়েছে, যাদের প্রত্যেকে স্ব স্ব ক্ষেত্রে একটি জাতি অপেক্ষা কোনো অংশেই কম ছিলেন না। এসব যুগশ্রেষ্ঠ আলেম জীবনের

প্রতিটি ক্ষেত্রে অবদান রেখে যান। ইখলাস ও ত্যাগের বিনিময়ে মুসলমানদের ধর্মীয়, জাতিগত, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রয়োজন পূরণ করেন এবং বিগত শতাব্দীর ভয়ঙ্কর রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক তুফানের ভেতর থেকে উপমহাদেশের মুসলমানদের টালমাটাল তরীকে পূর্ণ সতর্কতা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে উদ্ধার করে আনেন। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে আমাদের ও সকল মুসলমানদের পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

আজ থেকে প্রায় দেড়শত বছর আগে যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সামনে রেখে দারুল উলূম দেওবন্দ, মাজাহেরুল উলূম সাহারানপুর এবং একই ধারার অন্যান্য মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সে উদ্দেশ্য শতভাগ সফল হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ! কিন্তু সময়ের ব্যবধানে বিশ্ব পরিবেশের যে পরিবর্তন হয়েছে, তাতে সৃষ্টি হয়েছে নতুন নতুন সমস্যা, মুসলমানদের সামনে এসেছে অনেক চ্যালেঞ্জ। আর তা মোকাবেলার জন্য দেখা দিয়েছে অভূতপূর্ব চাহিদা ও দাবি। কিন্তু আমাদের দ্বীনী শিক্ষালয়গুলোতে এসব নতুন চাহিদা পূরণের সামগ্রী সরবরাহ করা হচ্ছে না। ফলে এখান থেকে যারা ফারেগ হচ্ছেন, তাদের মধ্যে কিছুটা ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। এই ঘাটতিগুলো পূরণ করা গেলে তাদের পক্ষে মুসলিম মিল্লাতের পথনির্দেশনার কাজ আরো সফলভাবে আঞ্জাম দেয়া সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ।

লেখক : প্রিন্সিপাল, দারুর রাশাদ মাদরাসা মিরপুর ঢাকা

ইসলাম ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

উবায়দুর রহমান খান নদভী

সম্রাট বাবর তার উত্তরসূরিকে যে অসিয়ত করে গিয়েছিলেন, তাতে বেশি জোর দিয়েছিলেন সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণের উপর। কারণ হিসেবে বলেছিলেন, সাম্রাজ্যের বুনিয়াদ শক্ত ও টেকসই করতে হলে সংখ্যালঘুদের মনে নিরাপত্তা ও সম্মানবোধ জাগ্রত রাখার বিকল্প নেই। উপমহাদেশের প্রায় আট'শ বছরের মুসলিম শাসনযুগ সংখ্যালঘুদের প্রতি মানবিক ও ইনসাফপূর্ণ আচরণেরই প্রমাণবহ। যখন মুসলিম শাসক ও জনসাধারণ নিজেরা সংখ্যালঘু ছিলেন তখন, আর যখন তারা সংখ্যাগুরু, অন্য কোন সম্প্রদায় সংখ্যালঘু- এ ধরনের প্রতি ক্ষেত্রেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ছিল সমান। সংকীর্ণতা বা নিবর্তন মুসলমানদের আচরণে ছিল বলে ইতিহাসে পাওয়া যাবে না। সামাজিকভাবে বরং মানবতা, উদার আচরণ, সম্প্রীতি ও বদান্যতার স্বাভাবিক গুণাবলীর ফলে উপমহাদেশের ইসলাম দ্রুত প্রসার লাভ করে এবং মুসলিম শাসকদের পক্ষে রাজ্য শাসন সহজ হয়। অপর দিকে কোন কোন সম্প্রদায় তাদের সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক রীতি-নীতি, ভেদবুদ্ধি, মানবতাবিরোধী বিধি-বিধান, জীবন বিমুখ সংস্কৃতি ইত্যাদির ফলে মানুষের আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে। তাদের সংখ্যা কমে যায়। কেউ হয়ে যায় বিলুপ্ত প্রায়।

ইসলামের মূল শিক্ষা ও আদর্শটিই হচ্ছে শান্তি এবং সম্প্রীতি। ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ সা. বলেছেন, গোটা সৃষ্টিকুল আল্লাহর পরিজন। এখানে ধর্ম বর্ণ বা জাতিতে জাতিতে কোন ভেদাভেদ রাখা হয়নি। মহানবী সা. বলেছেন, শুধু মানুষ বলেই কথা নয়, প্রাণস্পন্দনশীল প্রতিটি জীবের প্রতি দয়ার মধ্যেই রয়েছে আল্লাহর তরফ থেকে বিনিময়। তাঁকে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, হে রাসূলুল্লাহ, আমি উত্তম মানুষ হতে চাই, এ জন্যে আমাকে কী করতে হবে ? নবীজি সা. বললেন, মানুষের জন্যে উপকারী সাব্যস্ত হও, তাহলেই উত্তম মানুষ হতে পারবে। এতে বোঝা যায়, যে মানুষের কাজে লাগে, মানুষের উপকার করে, তাদের হিতকামনায় ভূমিকা রাখে সেই মানুষের মধ্যে উত্তম। আল্লাহর রাসূল বলেছেন, পৃথিবীতে বিচরণকারীদের সাহায্য কর, ঊর্ধ্বলোকের অধিপতি তোমাকে সাহায্য করবেন। মানুষ যতক্ষণ তার ভাইয়ের সাহায্যে নিয়োজিত থাকে , আল্লাহ ততক্ষণ সে মানুষটির সাহায্য করতে থাকে।

মানুষের প্রতি আচরণের এসব হাদীসে ধর্ম বর্ণ জাতি বা সম্প্রদায়ের কোন কথা বলা হয়নি। সব মানুষের প্রতি সদাচরণ, তাদের সহায়তা ও কল্যাণের কথাই এখানে বলা হয়েছে। মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকদের প্রতি অপর মুসলমানের আচরণ সম্পর্কে বলা হয়েছে যেমন, প্রকৃত মুসলমান সেই ব্যক্তি, যার হাত ও মুখ থেকে অপর মুসলমান নিরাপদ থাকে। ইসলামে প্রতিবেশীর অধিকার বিষয়ে এতো বেশি নির্দেশনা রয়েছে, যতটা আত্মীয়-স্বজন বা নিজ সম্প্রদায় সম্পর্কেও খুঁজে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। সাহাবায়ে কেরামকে বলাবলি করতে শোনা যেত, তারা বলতেন যে, প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ বিষয়ে আল্লাহর নবী সা. এত বেশি আন্তরিক ও সতর্ক ছিলেন, এত বেশি নির্দেশনা দিতেন যে, আমরা ধারণা করছিলাম প্রতিবেশীকে না আবার উত্তরাধিকার বানিয়ে আয়াত অবতীর্ণ হয়। সম্পত্তিতে তাকেও অংশীদার বানিয়ে দেয়ার কোন বিধান নাযিল হয়ে যাচ্ছে বলে আমরা আশংকা করতাম। এ ক্ষেত্রে প্রতিবেশী বলতে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল প্রতিবেশীকেই বোঝানো হয়েছে। হাদীস শরীফে আছে, হযরত নবী করীম সা. বলেছেন, সে প্রকৃত মুমিন নয়, যে নিজে পেট পুরে খায় আর তার প্রতিবেশী অভুক্ত অবস্থায় ঘুমাতে যায়। এখানেও প্রতিবেশীকে কোন জাতি ধর্ম বা বর্ণে নির্দিষ্ট করা হয়নি। অবারিত মানবতার জয়গান এখানেও পাই।

মহানবী সা. এর এ কঠোর হুঁশিয়ারি সম্বলিত বাণীটিও খুবই প্রাসঙ্গিক। যেখানে তিনি বলেছেন, মুসলিম দেশে যদি কোন সংখ্যালঘু ব্যক্তির সাথে অন্যায় আচরণ করা হয় তাহলে কিয়ামতের দিন আমি তার পক্ষ নিয়ে দায়ী মুসলমানটির বিপক্ষে মহান আল্লাহর দরবারে নালিশ করব। নির্যাতিত সংখ্যালঘুদের পক্ষে আমি মুহাম্মদ সেদিন বাদী হব। পবিত্র কুরআনের অসংখ্য আয়াত মানবতা ও ধর্মীয় সম্প্রীতির স্বপক্ষে প্রমাণস্বরূপ পেশ করা যাবে। উদ্ধৃত করা যাবে অগণিত হাদীস এবং নবী জীবনভিত্তিক হাজারো বাস্তব ঘটনা। দীর্ঘ দেড় হাজার বছরের মুসলিম ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের আলোকেও উপস্থাপন করা যাবে অসংখ্য গৌরবজনক ঘটনা। এ সংক্ষিপ্ত আলোচনায় তা সম্ভব নয়। এ নিয়ে দীর্ঘ রচনা বা গ্রন্থ তৈরি হতে পারে।

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আমর ইবনুল আস্ রা. তখন মিসরের গভর্নর। প্রাচীন খৃষ্টান জনপদে কে বা কারা রাতের আঁধারে সেখানকার জিশুখ্রিস্টের প্রাচীন মর্মর মূর্তিটির নাক ভেঙ্গে রেখে গেছে। এতে গোটা খৃষ্টসমাজে ক্ষোভ ও দুঃখের আবহ তৈরি হয়। আমর ইবনুল আস্ রা. সংবাদ পাওয়া মাত্রই তাদের সাক্ষাত দিলেন এবং বললেন, এ আমার ব্যর্থতা। গভর্নর হিসেবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ধরে রাখা ছিল আমার উপর ফরয। আমি আপনাদের গির্জা ও যীশুমূর্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারিনি। সম্ভব্য স্বল্প সময়ের মধ্যে দুষ্কৃতিকারীদের খুঁজে বের করতে না

পারলে আপনারা আমার নাক কেটে নেবেন। পুলিশ ও গোয়েন্দারা এ ঘটনার কিনারা করতে না পারায় এক সময় তিনি খৃষ্টান জনপদে গিয়ে তাদের নেতৃবৃন্দের হাতে তরবারি তুলে দিয়ে বললেন, আপনারা এ মুহূর্তে আমার নাক কেটে নিন। ঘটনার বাস্তবতায় খৃষ্টানরা হতবিহ্বল হয়ে গেল। তারা মন থেকে দুঃখ ক্ষোভ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বলল, আপনার নাক কাটার কথা বলে আমাদের আর লজ্জা দেবেন না। আমরা মুসলিম শাসন ও সমাজব্যবস্থার প্রতি এমনিতেই মুগ্ধ ও কৃতজ্ঞ। জনগণের জান মাল সম্মান ও ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি এত আন্তরিকতা আমরা অতীতের কোন শাসন আমলেই দেখিনি।

বিশ্বের নানা স্থানে ধর্ম, জাতি ও গোষ্ঠীগত দাঙ্গার কথা শুনা যায়। সাম্প্রদায়িক অস্থিরতা উপমহাদেশেও কম নয়। হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক বৈরিতার জন্ম। ইংরেজ আমলে ‘ডিভাইড এন্ড রুল’ নীতির ফলে এ তিক্ততার জন্ম। মানবেতিহাসের বৃহত্তর মাইগ্রেশন ভারত বিভাগ কোটি মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। অগণিত জীবনে এনে দিয়েছে চির বিষাদ-বিরহ-বেদনা। ১৯৪৭ এর পর থেকে এ পর্যন্ত শুধু ভারতেই ৩০ হাজারের মত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু এ সংখ্যা ও সংঘাতের তুলনায় বাংলাদেশ যেন সকল ধর্ম বর্ণ ও গোষ্ঠীর অভয়াশ্রম, অপূর্ব মিলনমেলা। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাম্প্রদায়িক সম্ভাব ও সম্প্রীতির দেশ এটি। এর প্রধান কারণ এ দেশের মানুষের চিরন্তন ধর্মপ্রিয় অহিংস মনোভাব। উচ্চতর মানবিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ। এ দেশের শতভাগ মানুষ ধর্মে বিশ্বাসী। ধর্মসঞ্জাত সহনশীলতা তাদের সংস্কৃতিকে করেছে চির সুন্দর। বিশেষ করে শতকরা ৯০ ভাগ মানুষের ধর্মবিশ্বাস সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির বার্তাবহ। সংখ্যালঘুদের জান, মাল ও ধর্মীয় নিদর্শন সুরক্ষায় সাড়ে চার লাখ মসজিদ থেকে প্রতিনিয়তই প্রচারিত হয় শান্তি সম্প্রীতি ও সহাবস্থানের পবিত্র বাণী। ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শের কারণেই এটি সম্ভব। কুরআন, সুন্নাহ ও ইসলামী চেতনার প্রেমময় শান্তিপূর্ণ মানবিক বার্তাই এ সৌন্দর্য ও সহজতার পেছনে কার্যকর।

লেখক: সহ সম্পাদক, দৈনিক ইনকিলাব।

ইসলাম পালনে এলাহী বাধ্যবাধকতা ও মদীনা সনদের মূল চেতনা

মাওলানা আবু সালেহ

জিন ও ইনসানসহ জমিন-আসমানের সবকিছুর একমাত্র স্রষ্টা আল্লাহ্ তায়ালা। তিনিই সবকিছুর মালিক। তিনিই জীবনদাতা। তিনিই মৃত্যুদাতা। তিনি একক ও অদ্বিতীয়। তার সমকক্ষ কেউ নেই। তিনিই আমাদের রিযিকদাতা, রক্ষাকর্তা, লালন ও পালনকর্তা। তিনিই সর্বোচ্চ জ্ঞানী। অতীত সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান যেমন পরিপূর্ণ-উজ্জ্বল, তেমনি বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও তাঁর জ্ঞান সুস্পষ্ট ও নির্ভুল।

শ্রেষ্ঠ মাখলুক ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ্ তায়ালা মানুষকে এই ধূলির ধরায় পাঠিয়েছেন তাঁর প্রতিনিধিরূপে। এই মানব জাতি ও জিন জাতির জন্য তাঁর গোলামী বা ইবাদত অপরিহার্য করেছেন। যেমনটি ইরশাদ হয়েছে কুরআনে কারীমের সূরা বাকারা ও যারিয়াতে। সে ঘটনা অধিক স্মরণযোগ্য যখন ফেরেশতাদের জানালাম যে, আমি (আল্লাহ্) পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি প্রেরণ (সৃষ্টি) করতে যাচ্ছি। অতঃপর আল্লাহ্ তায়ালা আদম আ. কে পৃথিবীর সব কিছুর নাম শিক্ষা দিলেন। [সূরা বাকারাঃ ৩০-৩১] অনন্তর আমি জিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছি এজন্য যে, তারা কেবল আমার ইবাদত করবে। [সূরা যারিয়াতঃ ৫৭]

সূরা আম্বিয়ায় ইরশাদ হয়েছে, প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদনকারী। আমি তোমাদের পরীক্ষা করছি এখানে ভালো ও মন্দ দ্বারা। অবশ্যই তোমরা আখিরাতে আমার কাছে ফিরে আসবে। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেছেন, শোনো! আমিই আল্লাহ্! আমি ছাড়া কোন মাবূদ নাই। সুতরাং কেবল আমার ইবাদত করো, (অন্য কারো নয়)। [সূরা তহা:১৪]

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, হে মানব সকল তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের উপাসনা করো যিনি তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তী সকলকে সৃষ্টি করেছেন। যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পারো। হ্যাঁ, সেই একক স্রষ্টারই তোমরা ইবাদত করো যিনি ভূমণ্ডলকে তোমাদের জন্য বানিয়েছেন বিছানা সাদৃশ্য এবং আসমানকে করেছেন ছাদ সরূপ। কেবল তিনিই আসমানে জমা হওয়া মেঘ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। অতঃপর তা দ্বারা তোমাদের রিযিকের ব্যবস্থা করেন। সুতরাং তোমরা জেনে বুঝে আর কাউকে সেই একক মালিক ও দাতার সমকক্ষ দাঁড় করতে যেও না। [সূরা বাকারাঃ ২১-২২]

উপরে উল্লেখিত আয়াতসমূহ দ্বারা সুস্পষ্ট হয় যে, আমাদের সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ্। তিনিই আমাদের মালিক, একমাত্র উপাস্য, একমাত্র মাবূদ, একমাত্র জীবনদাতা, রিযিকদাতা ও মৃত্যুদাতা। আর সে কারণেই আমরা তার গোলামী করতে বাধ্য। কেননা আমাদের নিজস্ব শক্তিতে, নিজস্ব উপাদানে, নিজস্ব ক্ষমতায় আমরা আমাদের জীবন নির্বাহ করতে পারি না। তাঁর দেয়া আলো, বাতাস, অক্সিজেন তথা সব নেয়ামত ভোগ করে জীবন নির্বাহ করি। আবার তাঁর বেঁধে দেয়া সময় পার হলেই আমাদের এই ইহজগত ছেড়ে পরজগতে পাড়ি জমাতে হবে। সুতরাং আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীন নই। আমাদের যাচ্ছে তা করার অধিকার নেই। চিরকাল এই পৃথিবীতে থাকার সুযোগ নেই। আবার যথাসময় না আসতে এই ধূলির ধরা ছেড়ে যাওয়ারও অবকাশ নেই।

এ পৃথিবীতে আমাদের থাকতে হবে তাঁর নির্দেশ মেনে। তাঁর বাতলে দেয়া পথ অনুসরণ করে। আমি যেহেতু তাঁর গোলাম, তাঁর মালিকানায় আমার জান-মাল, ইজ্জত-সম্মান, সচ্ছলতা-অসচ্ছলতা, জীবন-মৃত্যু সবকিছু, সুতরাং তাঁর হুকুম মানতে তার আজ্ঞাবহ হতে আমি বাধ্য। এটাই যৌক্তিক, এটাই সঠিক এবং ন্যায্য। তাঁর অসন্তুষ্টির পথে ধাবিত হওয়ার, তাঁর অবাধ্য হওয়ার কোন অধিকার নেই শ্রেষ্ঠ ও বিবেকবান সৃষ্টি হিসেবে আমার। সুতরাং তাঁর পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া বোধ ও বিশ্বাসের বানী এবং জীবন ধারা অবলম্বন করা সকল মানুষের জন্য অবধারিত। মানুষের এখতিয়ার নেই স্রষ্টাকে উপেক্ষা করার কিংবা তার নির্দেশনা পরিত্যাগ করার। কেননা তিনি একমাত্র মালিক আর মানুষ হলো তার দাসানুদাস।

উল্লেখ্য, অনাদি ও অনন্ত তথা চিরঞ্জীব স্রষ্টার পক্ষ থেকে নাযিল করা জীবন বিশ্বাস (আকায়েদ) ও কর্ম পদ্ধতির নামই হলো আসমানী দ্বীন বা স্রষ্টা অনুমোদিত জীবন ব্যবস্থা। যা মানুষকে সুস্থ সুন্দর মানসিকতার গঠন এবং স্বচ্ছ ও কল্যাণকর কর্ম সাধনায় উজ্জীবিত করে।

না, এই স্বচ্ছ সুন্দর জীবন বিশ্বাস ও জীবন প্রণালী (সভ্যতা সংস্কৃতি) বর্জন করার স্বাধীনতা দেয়া হয়নি স্রষ্টার পক্ষ থেকে জিন ও ইনসানকে। বরং বর্জন করলে কঠিন শাস্তির কথা জানিয়ে দেয়া হয়েছে। আরেকটু খুলে বললে বলা যায়, কোনো মানুষ কোনো মানুষকে ঐশী ধর্ম বিশ্বাস লালন ও পালনে জবরদস্তি করার অধিকার রাখে না। কেউ নাস্তিক হয়ে বসে থাকবে কিংবা ইয়াহুদী, খৃষ্টান, হিন্দু, শিব অথবা মুশরিক হয়ে জীবন যাপন করবে তাতে বাধা দেয়ার অথবা জোর করে মুসলিম বানানোর কারো অধিকার নেই। অনুরূপ কোনো মুসলিমকে ছলে বলে কৌশলে ব্লাকমেইলিং করে ধর্মান্তরিত করারও অধিকার কাউকে দেননি স্রষ্টা। এমন জবরদস্তি করা ধর্ম নয়। বরং তা অধর্ম। তবে হ্যাঁ, কোনো মুসলিম অন্য কাউকে আল্লাহ্ প্রদত্ত সত্য ধর্মের বাস্তবতা, উপযোগিতা ও কল্যাণ বুঝিয়ে

দাওয়াত দিতে পারেন। কুরআনের বর্ণনা মতে, একজন মুসলিমের দায়িত্ব হিসেবে পরিগণিত। পক্ষান্তরে, স্রষ্টা রাব্বুল আলামীন, সর্বোচ্চ দাতা ও একমাত্র মালিক হিসেবে তার অনুগ্রহপ্রাপ্ত জিন-ইনসানকে তাঁর পক্ষ থেকে সুনির্ধারিত দ্বীন পালনে বাধ্য করার অধিকার রাখেন। এ অধিকার যৌক্তিক। কেননা তিনি জানেন তার প্রদত্ত দ্বীন পালনেই রয়েছে বান্দার সমূহ কল্যাণ আর তা পরিত্যাগ বান্দার জন্য বয়ে আনবে ইহ ও পরকালে মহাদুর্ভোগ । সুতরাং যিনি দ্বীন পরিত্যাগ করার অনুমতি না দিয়ে তার নাযিল করা দ্বীন (বর্তমানে ইসলাম) গ্রহণ ও পালনে বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছেন। তদুপরি মানব রচিত কোন মতবাদ বা ধর্ম তার কাছে গ্রহণযোগ্য নয় বলেও সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। দেখুন মহান স্রষ্টা, সর্বোচ্চ প্রজ্ঞাবান, একমাত্র ভবিষ্যৎজান্তা আল্লাহ্ তায়ালা ফরমান, 'মানুষের কি এমন একটা অবস্থা যায়নি যখন সে উল্লেখ করার মতো কিছু ছিল না? নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি এক বিন্দু মিশ্র-বীর্য থেকে। যাতে করে আমি তাকে এ পৃথিবীতে পরীক্ষা করতে পারি। সে কারণেই আমি মানুষকে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি (বোধশক্তি) দান করেছি। আমি মানব জাতিকে সঠিক পথের নির্দেশনা দিয়েছি। (সঠিক পথ কোনটি তা বুঝিয়ে দিয়েছি) এখন সে সঠিক পথ গ্রহণ করে আমার কৃতজ্ঞ বান্দা হবে অথবা তা পরিত্যাগ করে অকৃতজ্ঞ হবে। নিশ্চয়ই আমার দেখানো পথ অস্বীকারকারীদের জন্য আমি প্রস্তুত রেখেছি জিঞ্জির, বেড়ি এবং জ্বলন্ত আগুন।' [সূরা দাহর-১-৪]

সূরা কাহাফে আল্লাহ্ তায়ালা এ প্রসঙ্গে ইরশাদ করেছেন, "হে রাসূল আপনি সকল মানুষকে জানিয়ে দিন হক দ্বীন (ইসলাম) তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছে। সুতরাং যার ইচ্ছা তা গ্রহণ করুক। যার ইচ্ছা অস্বীকার (প্রত্যাখ্যান) করুক। তবে আমি অস্বীকারকারী জালিমদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি অগ্নিশাস্তি, যা তাদেরকে চতুর্দিক থেকে বেষ্টন করে নিবে। সেই অগ্নিময় জাহান্নাম, যখন তারা পানি চাইবে, তখন তাদের দেয়া হবে তেলের গাঁদের মতো ময়লা গরম পানীয়, যার উত্তাপ তাদের মুখমণ্ডল পুড়িয়ে দিবে। জাহান্নামীদের এই পান কতই না নিকৃষ্ট, তাদের অবস্থান কতই না হেয় ও লাঞ্ছনাময়। আর বিপরীতে যারা ইসলামে বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সে অনুযায়ী সৎকর্ম করেছে আমি তাদের পুরস্কৃত করবো। কেননা আমি কোনো নেক আমলকারীর শ্রম বিফল হতে দেই না। (তাদের আমলের অমর্যাদা করি না)। এই বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণদের জন্য রয়েছে (আখেরাতে) স্থায়ীভাবে বসবাসের জান্নাত, যার পার্শ্বদেশ দিয়ে বয়ে গেছে প্রস্রবনধারা, সেখানে তাদের অলংকৃত করা হবে স্বর্ণালংকার দ্বারা, তাদের পরানো হবে সবুজ চিকন ও পুরু রেশমের পোশাক। তারা সেদিন সমাসীন হবে সুসজ্জিত আরামদায়ক আসনে। মুমিন ও নেক আমলকারীদের পুরস্কৃত কতই না সুন্দর, কতই না উত্তম তাদের জান্নাতী অবস্থান। [কাহাফ: ২১-২৩]

সর্বযুগের সকল মানুষের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সা. এরশাদ করেছেন, আমি আরব-অনারব, সাদা-কালো সকল মানুষের নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। (আল হাদীস) অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, 'আমার নুবওয়াত যুগে যদি মুসা আ. এসেও উপস্থিত হন, তবে তাকে আমার অনুসরণকারী হতে হবে।' ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো মতবাদ বা ধর্ম যে মহান রাব্বুল আলামীনের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় তা সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়ে তিনি ইরশাদ করেছেন : আর যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো মতবাদকে ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না বরং এমন ব্যক্তি আখিরাতে ক্ষতির (বিপদের) সম্মুখীন হবে। [সূরা আলে ইমরান: ৮৫]

উপরে উল্লেখিত আয়াত ও হাদীসসমূহ দ্বারা বিষয়টি প্রতিভাত এবং প্রমাণিত যে, আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে নাযিল করা ধর্ম ইসলাম গ্রহণ না করার কোনো এখতিয়ার তিনি কাউকে দেননি ও ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম (৬১০ খৃষ্টাব্দের পরে) আল্লাহ তায়ালার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

সুতরাং কোনো মুসলিম ব্যক্তি অমুসলিম কাউকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করার অধিকার রাখে না বটে, কিন্তু স্রষ্টা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে ইসলাম গ্রহণে এবং পালনে বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ইসলাম গ্রহণ না করার এখতিয়ার তিনি কাউকে দেননি। ইসলাম পালনে বাধ্যবাধকতা নেই বরং ইসলাম বর্জন করারও স্বাধীনতা আল্লাহ্ দিয়েছেন- এরূপ যারা প্রচার করছেন, উপরের প্রমাণভিত্তিক আলোচনা দ্বারা তারা তাদের ভুল বুঝতে পারবেন- আশা করি। নিজে বিভ্রান্তির মাঝে থেকে অপরকেও বিভ্রান্ত করা নিশ্চয়ই সততার পরিচয় নয়।

প্রসঙ্গ- মদীনা সনদ ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ

অধুনা বাংলাদেশের কিছু সংখ্যক হতভাগা কুলাঙ্গার ব্লগার জঘন্য কু-রুচি দিয়ে, আমাদের প্রিয় রাসূল শ্রেষ্ঠ মুনিব মুহাম্মদ সা., নামাজ, রোজা, হজ্জ তথা ইসলাম সম্পর্কে ক্ষমার অযোগ্য কটূক্তি করেছে। যা এদেশের হক্কানী উলামায়ে কেরামসহ ধর্মপ্রাণ মুসলিম অমুসলিম ও আপামর জনতাকে প্রচণ্ডভাবে ক্ষুব্ধ করেছে। দাবী উঠেছে এই সব স্বঘোষিত নাস্তিক ও ধর্ম বিদ্বেষীদের সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান করে আইন পাশ করার। অন্যদিকে ঐসব কুলাঙ্গারদের সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক ডান-বাম পন্থী তথাকথিত প্রগতিবাদী গোষ্ঠী নানা প্রোপাগান্ডা ছড়াতে শুরু করেছে। যা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক বানোয়াট।

এ নির্দিষ্ট ও চিহ্নিত গোষ্ঠীর অধিকাংশই ইসলাম সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। যারা কিছু পড়াশুনা করেছেন ইসলাম নিয়ে, তারাই স্বেচ্ছাচারী হয়ে ইসলামের

অপব্যাখ্যা করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হচ্ছেন। তারা গায়ের জোরে বলতে চাচ্ছেন কেউ ইসলাম গ্রহণ না করলে অথবা ইসলাম সম্পর্কে কটূক্তি করলে তার কোনো বিচার এই জগতে করা যাবে না, ইসলাম বর্জন করার স্বাধীনতা খোদ আল্লাহই দিয়েছেন। তাদের মতে মদীনা সনদে যে ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছে তাতে ইসলাম বর্জন করাটি অন্তর্ভুক্ত। [মাহমুদ মাহমদ সুমন দৈনিক সংবাদ- ০৯/০৪/১৩ইং]

আমরা ইতিপূর্বে বলে এসেছি, প্রমাণ করে এসেছি যে, ইসলাম বর্জন করার অধিকার আল্লাহ কাউকে দেননি। তবে কোনো মানুষকে জোর করে ধর্ম পালন করানোর অনুমোদনও তিনি দেননি। এর দ্বারা এটা প্রমাণ হয় না যে, ইসলাম বা ইসলামের কোন (শেয়ার) প্রতীক নিয়ে কটূক্তি করলেও তার কোন শাস্তি প্রদান করা যাবে না, অথবা ইসলাম এরূপ কটূক্তিকারীর কোনো শাস্তির বিধান দেয়নি। মদীনা সনদের যে মৌল চেতনা, কিংবা যে চেতনায় মদীনা সনদ নির্মিত হয়েছে তা সেক্যুলারিজম থেকে উদগত ধর্ম নিরপেক্ষতা প্রমাণ করে না। কেননা বহুল প্রচলিত ও প্রচারিত ধর্ম নিরপেক্ষতা আর ইসলামের (মদীনা সনদের) ধর্মীয় সম্প্রীতির বিধান আমাদের এরকম নির্দেশনা দেয় না। ইসলামী শরীয়ত ইসলাম বিদ্বেষী কটূক্তিকারীদের জাগতিক ও পারলৌকিক শাস্তির সুস্পষ্ট বিধান দিয়েছে। এবার আমরা উপরোক্ত কথার প্রমাণ পেশ করছি।

সূরা মায়িদার ৩৩ নং আয়াতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (বিরুদ্ধে সংগ্রামী) বিরুদ্ধাচরণকারী এবং পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের দুনিয়াবী এবং পরকালীন শাস্তির কথা ঘোষণা করে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন, "নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে (বিদ্বেষ ছড়ায়) এবং পৃথিবীতে ফ্যাসাদ ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করে অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী তাদের কতল করা হবে অথবা শুলিতে চরানো হবে, অথবা (বিপরীত মুখী) হাত পা কেটে ফেলা হবে অথবা দেশ থেকে বের করে দেয়া হবে। এসব হলো ইহজাগতিক লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। আর আখেরাতে রয়েছে তাদের জন্য আরো কঠিন শাস্তি"। অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, নিশ্চয়ই যারা (যে কোনভাবে) আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাদের প্রতি দুনিয়া এবং আখেরাতে অভিশাপ বর্ষণ করেন। মুনাফিকরা এবং ইসলাম বিষয়ে যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তারা যদি ইসলাম বিদ্বেষী কর্মকাণ্ড থেকে বিরত না হয় তাহলে আমি তাদের উপর আপনাকে প্রবল করবো এবং এরা অভিশপ্ত। এদের যেখানে পাওয়া যাবে পাকড়াও করা হবে এবং হত্যা করা হবে দৃষ্টান্তমূলকভাবে । [সূরা আহযাব ৫৭-৬১]

আশাকরি ইসলাম সম্পর্কে কটূক্তিকারীর ইহজাগতিক শাস্তির বিষয়টি পরিস্কার হয়ে গেছে সকলের কাছে। এবার আসি মদীনা সনদ প্রসঙ্গে।

উল্লেখ্য, মদীনা সনদটি ছিল একটি সাময়িক সমঝোতার স্মারক। কেননা তখনও ইসলাম নাযিল হচ্ছে। ইসলামী সংবিধান পরিপূর্ণতা লাভ করেছে এর দশ বছর পরে কুরআনে কারীমের (নাযিল) অবতরণ সমাপ্ত হওয়ার পর। মদীনা সনদটি ছিল মদীনার বনূ কাইনুকা, বনূ নজীর ও বনূ কুরাইজা এই তিন প্রধান ইয়াহুদী গোত্রের সাথে কৃত। এই তিন বড় গোত্রের আওতায় অন্যরাও শামিল ছিল। মদীনা সনদের উদ্দেশ্য ছিল ধর্মীয় ও সামাজিক সম্প্রীতির সাথে ভিন্ন ধর্মের মদীনাবাসির ঐক্যবদ্ধ সৌহার্দপূর্ণ জীবন যাপন। যাতে ইসলাম ও ইসলামের নবী মুহাম্মদ সা. থাকবেন কর্তৃত্বের আসনে। সেখানে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সিদ্ধান্তই হবে চূড়ান্ত। যেমনটি ইরশাদ হয়েছে কুরআনে কারীমেও "তিনিই মহিমাময় মহান সত্ত্বা যিনি তাঁর রাসূল মুহাম্মদ সা. কে হিদায়াত ও সত্য দ্বীন দিয়ে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। যাতে তিনি ইসলামকে অন্যান্য ধর্মের উপরে প্রবল করতে পারেন। যদিও তা কাফির মুশরিকদের অপছন্দ হয়"। [সূরা সফ-৯]

মদীনা সনদের সারসংক্ষেপ

১. চুক্তিকারী মুসলমান ও ইয়াহুদীগণ হবে (এক উম্মত) এক পক্ষ (মিত্রপক্ষ)। চুক্তির বাইরের মুশরিকরা হবে বিপক্ষ। বিপক্ষ শক্তিকে চুক্তিকারী কেউ সহযোগিতা করবে না।
২. চুক্তিকারীরা একে অপরের প্রতি হামলা করবে না, হত্যা করবে না। করলে তার মুক্তিপণ বা রক্তপণ পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবে।
৩. চুক্তির বাইরের কোনো গোত্র/সম্প্রদায় চুক্তিকারীদের উপর হামলা করলে চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায় এর মোকাবেলা করবে।
৪. চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রত্যেকে নিজ নিজ ধর্ম পালনে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করবে। ধর্ম পালনে কেউ কাউকে বাধা দিতে পারবে না। প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে না।
৫. চুক্তিবদ্ধ মুসলিম ও ইয়াহুদীদের মাঝে কোনো প্রকার মতভেদ দেখা দিলে অথবা বিচার মিমাংসার প্রয়োজন দেখা দিলে সে ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালা দিবেন মুহাম্মদ সা. এবং উভয় পক্ষ তা মেনে নিতে বাধ্য থাকবে।

উল্লেখ্য, এই চুক্তিতে ইয়াহুদী ও মুসলিম জাতির প্রত্যেকের নিজ নিজ ধর্মে বহাল থাকার স্বাধীনতার কথা জোর দিয়ে বলা হয়েছে। হ্যাঁ কেউ কারো ধর্মে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করবে না, প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে না। কেউ কারো ধর্ম সম্পর্কে কটূক্তি করবে না বরং সহনশীলতা ও সম্প্রীতির পরিচয় দেবে, সে কথা বলা হয়েছে মদীনা সনদে। এর বিপরীতে মদীনা সনদের কোথাও বলা হয়নি যে,

শিশু স্বাধীন রাষ্ট্র মদীনায় যে ইসলাম পালিত হয়ে কোন মুসলিম তার রাষ্ট্রের সাথে কোনো সম্পর্ক থাকবে না। অথবা ব্যক্তি জীবনে ইসলাম পালন করলো কি করলো না, সে ব্যাপারে রাষ্ট্রের বলার কিছু থাকবে না। যা সেক্যুলার মতবাদে রয়েছে। এখানেই তো প্রচলিত ধর্মনিরপেক্ষতার সাথে ইসলামের বিরোধ বা অমিল। ধর্মটা যার যার ব্যক্তিগত ব্যাপার, ধর্মকে রাষ্ট্র পর্যন্ত প্রসারিত করা হবে না, রাষ্ট্র চলবে ধর্মবহির্ভূত রীতিনীতিতে। এই দর্শন সেক্যুলারাজিজসে অনুমোদিত হলেও ইসলামে অনুমোদিত নয়। বরং ইসলাম পালিত হবে ব্যক্তি থেকে রাষ্ট্র পর্যন্ত সর্বত্র। ইসলামে বিশ্বাস না করলেও ইসলাম বা ইসলামী কোনো বিষয়ে কটূক্তি করা কোনো অপরাধ বলে গণ্য হবে না, তাও অনুমোদন করে না ইসলাম। বরং ইসলামের বিধান হলো কেউ গোপনে নাস্তিকতা বা কুফুরীর উপর অটল থাকলে সেটা হবে আখিরাতের শাস্তির উপযুক্ত অপরাধ। কিন্তু প্রকাশ্যে আল্লাহ্ রাসূল, তথা ইসলাম সম্পর্কে কটূক্তি করলে কিংবা কারো ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিলে তা হাবে জাগতিক শাস্তিযোগ্য অপরাধ। যার প্রমাণ আমরা পেশ করে এসেছি। কোন ধর্মেরই কুৎসা রটানোর অনুমোদন দেয় না ইসলাম।

সুতরাং মদীনা সনদের দোহাই দিয়ে কোনো স্বঘোষিত নাস্তিক বা ধর্ম সম্পর্কে প্রকাশ্যে কটূক্তিকারীদের নির্দোষ বানানো, অথবা ইসলামকে তথাকথিত ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ বলে পরিচিত করার অবকাশ নেই। মদীনা সনদের মূল চেতনা হলো ধর্মীয় সম্প্রতি, সৌহার্দপূর্ণ ধর্মীয় সহাবস্থান বজায় রেখে পরিপূর্ণ ইসলাম পালন ও প্রতিষ্ঠা । অন্য কথায় দুষ্টের দমন শিষ্টের লালন মদীনা সনদের মূল চেতনা।

লেখক: মুহাদ্দিস, জামিয়া মাদানিয়া বারিধারা ঢাকা

কীর্তিমান এক বিস্ময়কর মহাপুরুষ
হযরত শাহ জমীর উদ্দীন নানুপুরী রহ.

মাওলানা মুহাম্মাদ আবূ মূসা

অগ্রকথা

পৃথিবীতে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। তারপর আস্তে আস্তে সে বড় হয়। শৈশব, কৈশোর, বাল্যকাল পাড়ি দিয়ে এক সময় সে যৌবনে পা রাখে। অতঃপর যৌবনের কর্মময় জীবনের মধ্য দিয়ে বার্ধক্যে উপনীত হয়। একদিন খবর আসে সে আর দুনিয়ায় নেই। এভাবেই প্রজন্মের পর প্রজন্ম মানুষের আগমন ঘটে পৃথিবীতে। ঘটে চির বিদায়।

এই অসংখ্য মানুষের ভিড়ে অনেকে হারিয়ে যায়। আবার কালের বিশালতায় অনেকের নামও খুঁজে পাওয়া যায় না। সৃষ্টির শুরু থেকে কত মানুষ অতিক্রম করেছে পৃথিবীর এই পথ। মহাকালের কোন কোন সন্ধিক্ষণে জন্ম নেয় এমন সব মানুষেরা যাদেরকে যুগ যুগ ধরে স্মরণ করা হয়। বিস্ময় ভরে দেখা হয় তাদের কীর্তিগুলো। যাদের জীবনের প্রতিটি সময়ের কথা মানুষের জানা থাকে। বংশ পরম্পরা দীর্ঘকাল পর্যন্ত আলোচিত হয় তাঁরা। কুতবুল আলম হযরত শাহ জমীর উদ্দীন নানুপুরী রহ. ছিলেন সেই মনীষীগণেরই একজন, যাঁর অসংখ্য অবদানের কথা চিরকাল স্মরণীয় থাকবে।

আল্লামা শাহ জমীর উদ্দীন নানুপুরী রহ. আজ আমাদের মাঝে নেই। আছেন জান্নাতের বালাখানায়। তিনি ছিলেন একজন পীরে কামিল, মুরশিদে বরহক, কুতবুল আলম এবং চৌকস আলেম, প্রবীণ আলেম, জ্ঞানবান আলেম, আমলদার আলেম, দূরদর্শী আলেম, অমায়িক আলেম ও রুচিশীল আলেম। তিনি অজস্র আলিমের মাঝে সকলের নজর কেড়ে নিয়েছিলেন স্বতন্ত্র মহিমায়। তিনি নবীন প্রবীণ সকলের প্রিয় এবং আস্থাভাজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। শরীয়ত ও তরীকত উভয় ময়দানে তাঁর দৃঢ় পদচারণা ছিল। আল্লাহকে পাওয়ার, তাঁর সান্নিধ্য অর্জন করার বুক ভরা আশা সব সময় তাঁর মধ্যে জাগরূক থাকতো। তিনি মানুষের কল্যাণ ও চিন্তায় সব সময় ব্যতিব্যস্ত থাকতেন।

বহুমুখী গুণের আধার

হযরত রহ. শুধু একজন ব্যক্তি নন। তিনি একটি প্রতিষ্ঠান, একটি বিপ্লব, একটি দর্শন, একজন কিংবদন্তি, একটি ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন, আদর্শ সমাজ প্রবর্তনের

একজন সার্থক সমাজ সংস্কারক, একটি অভ্যুত্থান, ব্যক্তি গঠনের একজন সফল কারিগর, তিনি মহা কাব্যের অমর গাঁথা এবং কালজয়ী এক ইতিহাস। আল্লাহ তাঁকে বহু গুণের আধার করে এই ধরায় প্রেরণ করেছেন। তাঁর মধ্যে ছোটদের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা, বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা, আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখা, জনসাধারণের সাথে সু সম্পর্ক বজায় রাখা, সুন্নতে নববীর পুরোপুরি অনুসরণ করা এবং ইসলাম ও দ্বীনের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করাসহ সকল গুণাবলী বিদ্যমান ছিল।

চরিত্র মাধুরী

কুতবুল আলম হযরত শাহ জমীর উদ্দীন নানুপুরী রহ. অমায়িক প্রকৃতির লোক ছিলেন। যে কোন মহলে যে কোন মানুষের সাথে তিনি সহজেই মিলে যেতে পারতেন। মন দিয়ে সকলকে ভালবাসতেন। অতিথিপরায়ণে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। সাদাসিধা চালচলনে অভ্যস্ত ছিলেন। আড়ম্বরতাকে পছন্দ করতেন না। সর্বদা পরিপাটি চলতেন। অনর্থক কথা ও কাজে সময় নষ্ট করতেন না। অবসরে জিকির আজকারে মশগুল থাকতেন। তিনি ছিলেন দুনিয়াবিমুখী। সর্বদা আখিরাতের চিন্তায় বিভোর থাকতেন। জীবনে একটি মুহূর্তও জিকির ছাড়া থাকতেন না।

হযরত রহ. হাস্যোজ্জ্বল চেহারা ও খোলা মনের মানুষ হিসাবে ছিলেন অনন্য। লেবাস-পোশাক, আমল-আখলাকের দিক থেকে ছিলেন সুন্নতের মূর্তপ্রতীক। মমতা ও শিষ্টাচারিতা ছিল তাঁর মহৎ গুণ। ছিলেন স্বল্পভাষী ।

তিনি ছিলেন...

একজন আবেদ ও আলেম হিসাবে তিনি ছিলেন অহমিকামুক্ত অনুতাপযুক্ত সর্বদা মাওলার কৃতজ্ঞতায় শির অবনত একজন খোদাভীরু আবেদ ও বিচক্ষণ আলিমে দ্বীন। আত্মশুদ্ধির ময়দানে তিনি ছিলেন একজন অন্তরালোক সম্পন্ন বিনয়াবনত মুসলিহ ও মুযাক্কী। একজন শিক্ষক হিসাবে তিনি ছিলেন ছাত্র গড়ার সফলতায় একজন সফল উস্তাদ। সহকর্মী হিসাবে তিনি ছিলেন হাস্যোজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত হৃদয়গ্রাহী এক সহকর্মী। লেখক হিসাবে তিনি ছিলেন কলমের আঁচরে একজন বিদগ্ধ লেখক, বহু গ্রন্থ প্রণেতা একজন স্বার্থহীন লেখক। সমাজ সেবক হিসাবে তিনি ছিলেন একজন সামাজিক অবক্ষয়ে চিন্তিত ও ব্যথিত, অসহায় ও গরীব-দুঃখীদের কষ্টে ভারাক্রান্ত এক দরদী সমাজ সেবক। সর্বোপরী তিনি ছিলেন কৃপণতামুক্ত উদারপন্থী সমাদরী এক অকৃত্রিম মহামানব। যার তুলনা তিনি নিজেই।

বৃহত্তর চট্টলার প্রাণপুরুষ

কুতবুল আলম হযরত শাহ জমীর উদ্দীন রহ. বৃহত্তর চট্টলার প্রাণপুরুষ ছিলেন। আলোকিত ব্যক্তিত্ব ও নন্দিত মহাপুরুষ ছিলেন। ধনী, গরীব, ফকীর, মিসকিন, অসহায়সহ সকলের প্রাণের মানুষ ছিলেন। দোস্ত-দুশমন সকলেই তাঁকে ভালো জানতো। তিনি সাধারণের মাঝে অসাধারণত্বের গুণে গুণান্বিত ছিলেন। জ্ঞান গভীরতা, আধ্যাত্মিক সাধনা ও মানবসেবা তাঁর জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক প্রভাবে বহু মানুষের জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। যার প্রকৃষ্ট প্রমাণ তাঁর জানাযায় সারা দেশের লাখ লাখ মানুষের উপস্থিতি। সকলের একটাই কথা ছিল, ক্ষণকালের এই মহাপুরুষ কখনো আর ফিরে আসবেন না। এই গুণাবলীর লোক আর পাওয়া যাবে না। ইত্যাদি, ইত্যাদি...

জমীরী দস্তরখানা

মেহমানের কদর করা বা মেহমানদারী করা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত। যে মেহমানের কদর করে না, আল্লাহ তাকে পছন্দ করেন না। আর যে মেহমানের কদর করে আল্লাহ তাকে ভালবাসেন এবং তার রুজি রোজগার বাড়িয়ে দেন। আমাদের হযরত রহ. এর মাঝে সর্ব প্রকারের গুণ বিদ্যমান ছিল। তাঁর একটি বড় গুণ ছিল, মেহমানের কদর করা বা মেহমানের যথাযথ সম্মান করা। মেহমানদারীর ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টান্ত বিরল। তার তুলনা তিনি নিজেই। কোন মেহমান তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে এসেছে, আর তিনি তার খোঁজ খবর নেননি বা তার মেহমানদারী করেননি, আপ্যায়ন করেননি- এমন কথা কেউ কোন দিন বলতে পারবে না। হযরত রহ. যখনই কোন মেহমান আসতো, তখনই সে সময়ের উপযোগী এবং মেহমানের চাহিদা মুতাবেক মেহমানদারী করার চেষ্টা করতেন। এতে দেশী বিদেশী মেহমান তাঁর আপ্যায়নে মুগ্ধ হয়ে যেত। বিশেষ করে একজন আলিমের এমন মেহমানদারী কল্পনা করতেও কষ্ট হয়। আমরা ৫০ সালা দস্তারবন্দীর সময় দেখেছি, যেখান থেকে যে কোন ধরনের যত মেহমান এসেছে, তাদেরকে না খাইয়ে যেতে দিতেন না। বলতেন, বাবারা! খানা খেয়েছেন? খানা না খেয়ে যাবেন না।

আমলের ময়দানে

হযরত রহ. যা বলতেন, উপদেশ দিতেন, ওয়ায-নসিহত করতেন তা স্বীয় জীবনে আমলে পরিণত করতেন। যা শুনতেন, শোনাতেন, পড়তেন ও পড়াতেন সবগুলোই নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করতে সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন। হযরতের পুরো জিন্দেগীই ছিল সুন্নত মুতাবেক আমলী জিন্দেগী। সারা দিন আমলে থাকতেন। রাতে সামান্য সময় আরাম করে গভীর রাতে তাহাজ্জুদের নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। নামাযান্তে মাওলার জিকিরে লিপ্ত হয়ে যেতেন। তারপর আল্লাহর দরবারে কায়মনোবাক্যে রোনাজারি আরম্ভ করে দিতেন। আমাদের হযরত রহ. ছিলেন মাওলার খাঁটি আশিক বা প্রেমিক। সব সময় মাওলার প্রেমেই হাবুডুবু খেতেন।

দায়িত্ব সচেতনতা

কুতবুল আলম হযরত নানুপুরী রহ. দায়িত্ব সচেতনতা ও কর্তব্য সম্পর্কে পূর্ণ সজাগ ছিলেন। ছাত্র, শিক্ষক, মুরীদ, পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন, পরিবার-পরিজন ও দোস্ত-আহবাবসহ সকলের প্রতি তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। অধ্যবসায়ের সাথে সাথে লেখা-পড়া, মুরুব্বী ও আসাতিযায়ে কিরামের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা, তাদের খিদমত, ইবাদত বন্দেগী, পরস্পরিক সখ্যতা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণসহ সর্বক্ষেত্রেই তিনি শীর্ষে ছিলেন। শুধু নিজেকে নিয়েই না বরং সবাইকে নিয়েই তিনি ভাবতেন। সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্নত প্রতিষ্ঠা পায়- এটাই ছিল তাঁর মনের একান্ত কামনা ও বাসনা।

যাদুময় বাগ্মী

আমাদের হযরত রহ. একজন সমাজ সংস্কারক হিসাবে যেমনভাবে অগণিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা ও আদর্শের প্রসার ঘটিয়ে জাতির খিদমত করে গেছেন, এমনভাবে ওয়ায-নসিহত, সভা-সমিতি, সেমিনার-সেম্পোজিয়ামে অংশ গ্রহণ করেও জাতীয় খিদমতের এক মহত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। ওয়ায-নসিহতের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর ছিল তাঁর। একজন বিজ্ঞ ও দক্ষ ওয়ায়েয হিসাবে সারা দেশে তাঁর খ্যাতি ছিল। সুললিত কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। দীর্ঘ সময় ধরে আরবী, ফারসী ও উর্দু শের বা কবিতা বলে শ্রোতাদেরকে মোহিত করে রাখতেন। সারা দেশেই তাঁর সুনাম-সুখ্যাতি ছিল। তিনি যে কোন সময় যে কোন বিষয়ে কুরআন ও সুন্নহর আলোকে দীর্ঘ আলোচনা করতে অভ্যস্ত ছিলেন। সাধারণ মানুষ ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর মুক্তোঝরা ওয়ায নসিহত শুনে মুগ্ধ হয়ে যেত।

তাঁর মাহফিলে অজ্ঞ হয়ে প্রবেশ করে বিজ্ঞ হয়ে বের হত। প্রকৃত দ্বীনের উপর চলার শপথ নিয়ে বের হত। তাঁর ওয়াযে তাওহীদ, শিরক, বিদআত, সুন্নত, ইবাদত, আখিরাত বেশী প্রাধান্য পেত। তাঁর আলোচনা ছিল খুবই প্রাঞ্জল এবং তথ্যবহুল।

আল্লামা ইসহাক ফরিদীর প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা

শাইখুল হাদীস, আল্লামা ইসহাক ফরিদী রহ. বিগত ০৫ জুলাই ২০০৫ ইং. দিবাগত রাতে নানুপুরের ইসলাহী জোড়ে অংশগ্রহণ করার সফরে শহীদ হোন। (তখন তিনি তাঁর জীবনের সর্বশেষ বই 'কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইহসান, আত্মশুদ্ধি ও তাসাওউফ' নিয়ে হযরতের দরবারে রওয়ানা হয়েছিলেন) এই মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে হযরত রহ. একেবারে ভেঙ্গে পড়েন। কারণ, আল্লামা ইসহাক ফরিদী রহ. তাঁর খুবই প্রিয়ভাজন ছিলেন। অল্প দিনে তাঁকে খেলাফত দিয়ে ধন্য করেন। সব সময় নিজের কাছে কাছে রাখতেন। ঢাকার সকল সফরে আল্লামা ফরিদী রহ. কে নিজের সাথে সাথে রাখতেন। অনেকে প্রায় বলেই ফেলত যে, ইসহাক ফরিদীকে হযরত এতো ভালোবাসেন কেন? হযরত রহ. বলতেন, আমার একটি স্বপ্ন হলো, আল্লাহ তায়ালা হযরত হাফেজ্জী হুজুর রহ. এবং হযরত শামসুল হক ফরিদপুরী রহ. দ্বারা যে খেদমত নিয়েছেন, মাওলানা ইসহাক ফরিদী দ্বারাও ঢাকার জমিনে সে ধরণের খেদমত নেয়া। কিন্তু আল্লাহর মর্জি, অল্প দিনেই তাঁর প্রিয় বান্দা মাওলানা ইসহাককে নিয়ে যান। আল্লামা ইসহাক ফরিদীর জন্য হযরত রহ. সব সময় দুআ করতেন। কোন নামায এমন নেই যে নামাযের পর তাঁর জন্য দুআ হতো না। অনেক সময় হযরত রহ. দীর্ঘ সিজদায় গিয়ে ইসহাক ফরিদী রহ. এর জন্য দুআ করতেন। দুআ করতে করতে একবার তো প্রায় অসুস্থই হয়ে গেলেন। হযরতের নির্দেশে ফরিদী রহ. এর স্মরণে জামিয়া উবায়দিয়া নানুপুর মাদরাসা থেকে 'ইয়াদে ফরিদী' নামে উর্দুতে একটি কাব্য গ্রন্থও রচিত হয়।

হযরত রহ. ঢাকার সফরে যখনই আসতেন আগে জিজ্ঞাসা করতেন, ওবা, ফরিদী সাহেবের পরিবার কেমন আছে, তাঁর ছেলেটা কেমন আছে, কি পড়ে? আমার সালাম বলবেন। পকেট থেকে টাকা বের করে বলতেন, ফরিদী সাহেবের পরিবারকে এই ক্ষুদ্র হাদিয়া পৌঁছিয়ে দিবেন। দুআ করতে বলবেন।

'আল্লামা ইসহাক ফরিদী স্মারকগ্রন্থ' প্রকাশনা অনুষ্ঠানে

আল্লামা ইসহাক ফরিদী রহ. এর স্বপ্ন ছিল শত শত পৃষ্ঠা সম্বলিত একটি বড় গ্রন্থ রচনা করা। কিন্তু তাঁর আয়ু তাঁকে তা করতে দেয়নি। অবশ্য স্বল্প জীবনে তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। তাঁর ইন্তেকালের পর আমাদের আশা জাগল, তাঁর

জীবনীটাকে বিশালাকারে জাতির সামনে পেশ করার। আল্লাহ তায়ালা আমাদের এই আশা কবুল করেছেন। আলহামদু লিল্লাহ! ফলে ফরিদী সাহেবের ইন্তেকালের মাত্র সাত মাস পরেই রচিত হয় ডাবল ডিমাই সাইজের 'আল্লামা ইসহাক ফরিদী রহ. স্মারকগ্রন্থটি'। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮৩৮। সেই স্মারকগ্রন্থের প্রকাশনা অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন, তাঁরই মুরশিদ হযরত শাহ জমীর উদ্দীন নানুপুরী রহ.। সেদিন হযরত রহ. বলেছিলেন, 'আল্লামা ইসহাক ফরিদী রহ. বহু উঁচা মাপের আলেম ছিলেন। আল্লাহ পাক অল্প দিনে তাঁর থেকে অনেক খিদমত নিয়েছেন। দ্বীনের এমন কোন শাখা নেই, যেখানে আল্লামা ইসহাক ফরিদীর পাদচারণা নেই। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতের বালাখানায় অবস্থানের তাওফীক দিন। তাঁর পরিবারকে হিফাজত করুন।

বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

আমাদের হযরত রহ. বড়দের দুআয় পুষ্ট, মুরুব্বীদের আশীর্বাদে সিক্ত এবং সকলের কাছে সমাদৃত ছিলেন। বড়দের প্রতি তাঁর অগাধ সম্মান ছিল। একবার বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ-এর এক জলসায় মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদরাসার হযরত মুহতামিম সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম আর আমাদের হযরত নানুপুরী রহ.ও ছিলেন। বেফাকের সেদিনের সেই জলসায় বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মাদরাসাগুলোর মুহতামিম এবং নাযেমে তালীমাতগণ উপস্থিত ছিলেন। হাটহাজারীর হুজুরের সভাপতিত্বে অনেকে অনেক কথা বলছিলেন। প্রস্তাব দিচ্ছিলেন। সবিশেষ আমাদের হযরত রহ. কে কিছু বলতে বলা হলে তিনি বললেন, 'এই মজলিসে আমাদের সকলের মুরুব্বী হাটহাজারীর হযরত মুহতামিম সাহেব হুজুর আছেন। হযরত মুহতামিম সাহেবের যে কথা আমারও সে কথা। মুহতামিম সাহেব যা বলেন, আমরা সকলে তাই করে যাব। আসসালামু আলাইকুম'। হযরত রহ. এর অল্প কথায় সকলে বুঝতে পারল যে, বড়দের প্রতি তাঁর কি পরিমাণ শ্রদ্ধাবোধ ছিল!

অন্যের নয় শিক্ষা দিতেন আত্মসমালোচনার

কুতবুল আলম হযরত শাহ জমীর উদ্দীন নানুপুরী রহ. প্রায়ই বলতেন, অন্যের সমালোচনা করা থেকে বিরত থাকবেন। সমালোচনা করলে নিজের সমালোচনা করবেন আল্লাহর কাছে। অযথা অন্যের গীবত করে তার খারাপ আমলের বোঝা নিজের কাঁধে আনবেন না। ইমাম আবূ হানীফা রহ. কে অনেকে বখীল বলতো এ কারণে যে, তিনি অন্যের সমালোচনা করা থেকে বিরত থাকতেন। তাই অন্যের

আমলনামা নিজের কাঁধে নেওয়ার ব্যাপারে কৃপণতা করতেন। ইমাম বুখারী রহ. বলেছেন, যেদিন থেকে আমি জেনেছি যে, গীবত করা হারাম সেদিন থেকে আমি অন্যের গীবত করা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকি।

হাদিয়া দেওয়া ও নেওয়া

হাদিয়া দেওয়াও সুন্নত এবং নেওয়াও সুন্নত। অনেকে হাদিয়া নিতে জানেন কিন্তু দিতে জানেন না। এ ব্যাপারে আমাদের হযরত রহ. ব্যতিক্রম ছিলেন। হাদিয়া দেওয়ার ব্যাপারে তিনি ছিলেন অনন্য। অন্যের থেকে হাদিয়া নেওয়ার চেয়ে অন্যকে হাদিয়া দিতে বেশী ভালবাসতেন। ভক্তদের খোঁজ খবর নিতেন। অভাবী কেউ কখনো তাঁর দরবারে উপস্থিত হলে তাকে আর্থিকভাবেও সহযোগিতা করতেন। যারা তাঁর আজীবন শত্রু তাদেরকেও দাওয়াত দিয়ে নিজ হাতে মেহমানদারী করে হাদিয়া দিয়ে বিদায় জানাতেন। এতে তাঁর ঘোর শত্রুরাও মিত্রে পরিণত হয়ে যেত, ফলে তারা বলতো ইনিইতো আমাদের পরম বন্ধু।

শিশুদের প্রতি ভালবাসা

আমাদের হযরত রহ. এর উত্তম গুণাবলীর মধ্যে একটি এটাও ছিল যে, তিনি ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে অনেক আদর করতেন। বুকে জড়িয়ে নিতেন। সোহাগে ভরে দিতেন তাদের তনুমন। যখন কোন বাচ্চাকে দেখতেন, তাকে কাছে টেনে নিতেন। হাদিয়া তুহফাও দিতেন। যে কোন মাদরাসায় যেতেন, মাদরাসার আসাতিযায়ে কিরামের বাচ্চাদেরকে কাছে ডেকে নিতেন। বাচ্চাদের প্রতি সদাচরণ করার জন্য সকলকে বলতেন। বিনা কারণে প্রহার করতে নিষেধ করতেন। তাদের লেখা-পড়ার প্রতি যত্নবান হতে বলতেন।

বাতিল প্রতিরোধে

একটি মূলনীতি হল, এই ধরাপৃষ্ঠে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য যেমনিভাবে আমর বিল মারূফ ‘সৎ কাজের আদেশ’ এর প্রয়োজন, তেমনিভাবে নাহি আনিল মুনকার ‘অসৎ কাজ থেকে বারণ’ এর প্রয়োজনও আরো বেশী। আমাদের হযরত রহ. এই ব্যাপারে সবার আগে ছিলেন। বাতিল যেখানে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল, তিনি সেখানেই তাঁর লব্ধ জ্ঞান ও হাসিমাখা বচন দ্বারা তার বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। আজীবন তাওহীদ ও সুন্নতের পক্ষে এবং বিদআতের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। কুসংস্কার থেকে দূরে থাকতেন। সকলকে এ থেকে দূরে থাকার জন্যে বলতেন।

মাদরাসা শিক্ষা সম্প্রসারণে

আদর্শ জাতি ও মানুষ গঠনে মাদরাসা শিক্ষার অবদান অনস্বীকার্য। প্রকৃত মানুষ একমাত্র মাদরাসা শিক্ষাই উপহার দিতে পারে। আমাদের হযরত রহ. ভাবতেন, একজন ছাত্র যেন খাঁটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উত্তরসূরি হতে পারে। সে যেন শিক্ষা-দীক্ষার ময়দানে একজন ধীমান শিক্ষক হতে পারে, রচনার ক্ষেত্রে একজন বলিষ্ঠ লেখক হতে পারে, সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে একজন দায়িত্বশীল সাংবাদিক হতে পারে, রাজনীতির ক্ষেত্রে একজন প্রজ্ঞাবান রাজনীতিবিদ হতে পারে, সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে একজন জ্ঞানবান সংস্কারক হতে পারে, খেদমতে খালকের ক্ষেত্রে একজন নিঃস্বার্থ সমাজ সেবক হতে পারে। ইহসান ও তাযকিয়ায়ে নফসের ক্ষেত্রে একজন আল্লাহ ওয়ালা হতে পারে। আর উপরোক্ত বিষয়ের জন্য ছাত্রদেরকে গড়ে তোলা দরকার। এ ব্যাপারে আমাদের আঁকাবির আসলাফ যে সিলেবাস তৈরি করে গেছেন, তা বুনিয়াদী সিলেবাস।

আমাদের হযরত রহ. ছাত্রদেরকে যুগোপযোগী হিসাবে গড়ার জন্য আরবী, উর্দু এবং ফারসীর পাশাপাশি ইংরেজি, বাংলা, ইতিহাস, ভূগোল, জ্যামিতি এবং বিশেষভাবে কম্পিউটার শিক্ষার প্রতি জোর দিতেন। তাইতো তিনি অনেক ব্যতিক্রমধর্মী মাদরাসাও প্রতিষ্ঠা করে গেছেন এবং সেগুলোতে উপরোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন। সারা দেশে তাঁর অসংখ্য ছাত্র মুরীদ ও শিষ্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তাঁর ভক্তরা সারা দেশে প্রায় ১১৩ টি মাদরাসা তাঁর নামে নামকরণ করেন। এছাড়াও আরো প্রায় ৪০০ টি মাদরাসা ও হিফযখানা তাঁর সু-পরামর্শে পরিচালিত হত।

মাদরাসায় খানকার দৃশ্য

আমাদের হযরত রহ. এর মনের একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, মাদরাসাগুলো যেন খানকায়ে পরিণত হয়ে যায়। আমাদের আঁকাবির ও আসলাফ এর বাস্তব নমুনা কায়েম করে গেছেন। কারণ, আক্ষরিক অক্ষর জানার নাম ইলম নয়। ইলমে ওয়াহীই প্রকৃত ইলম যা এক ধরনের নূর। আর এ নূর হাসিল করার জন্য অনেক শর্ত রয়েছে। যেমন, ইলম অর্জনকারীকে আল্লাহমুখী ও দ্বীনমুখী হতে হবে। ইলম অনুযায়ী আমল করতে হবে। দিনে ইলম অর্জনে মশগুল থাকতে হবে, আর রাতে বিশেষ করে শেষ রাতে মাওলার দরবারে রোনাজারি করতে হবে। নিয়মিত তাহাজ্জুদ আদায় করতে হবে। নিশি রাত্রে দাঁড়িয়ে নফল আদায় করতে হবে। ইশরাকের নামায আদায় করতে হবে। হযরত রহ. বলতেন, এগুলো দ্বারা মাদরাসা খানকায় পরিণত হবে। আর ইলমেও নূর আসবে। তিনি আরো বলতেন,

'নাকের পানি ও চোখের পানি একাকার না হলে কোন মাদরাসা মাদরাসা হতে পারে না'। একটি মাদরাসার দারোয়ান, দফতরি এবং বাবুর্চিকেও আল্লাহ ওয়ালা হতে হবে। কোন হক্কানী আল্লাহ ওয়ালার সাথে সম্পর্কিত হতে হবে।

তাঁর দুনিয়াবিমুখিতা

আমাদের হযরত রহ. যখনই কারো সাথে কথা বলতেন, তাকে দুনিয়াবিমুখী হয়ে আখিরাতমুখী হওয়ার জন্য বলতেন। অনেক সময় প্রয়োজনের কথা বলতেন। আর তা ছিল মাদরাসা ও মসজিদের প্রয়োজনের কথা। গরীব, এতীম, অসহায়দের সাহায্য-সহানুভূতির কথা বলতেন। হযরত রহ.-এর মাঝে পর অমুখাপেক্ষীতা, স্বার্থহীনতা এবং দুনিয়াবিমুখীতা ছিল প্রবল। সর্বদা তাঁর ফিকির ছিল দ্বীনী ফিকির, জাতীয় ফিকির। ব্যক্তি ফিকির ছিল না কখনো।

তিনি রেখে গেলেন...

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মানুষ যখন মারা যায় তখন তার সব আমল বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি আমল বন্ধ হয় না। এক. সে সদকায়ে জারিয়ার আমল করে যায়। দুই. বা এমন ইলম রেখে যায় যা দ্বারা উপকার হয়। তিন. কিংবা এমন নেক সন্তান রেখে যায় যে তার জন্যে দুআ করবে।

আল্লাহর অশেষ মেহেরবানী আমাদের হযরত রহ. উপরোক্ত তিন পথেই আমলের সিলসিলা জারি থাকার ব্যবস্থা করে গেছেন। অসংখ্য মাদরাসা তিনি প্রতিষ্ঠা করে গেছেন এবং তাঁর পরিচালনায় অনেক মাদরাসা পরিচালিতও হয়েছে। তাঁর ভক্ত অনুরক্তদের সংখ্যাও অনেক। সারা দেশের বহু শাইখুল হাদীস, মুহাদ্দিস ও মুফাসসির হযরত রহ. এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ধন্য হয়েছেন। স্বীয় ঔরসজাত সন্তানদেরকে আলিমে রাব্বানী আলিমে হক্কানী বানিয়ে গেছেন। হযরত রহ. এখন আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু তাঁর অমর কীর্তি জীবন্ত হয়ে থাকবে। কিয়ামত তক অসংখ্য মানুষ তাঁর দ্বারা উপকৃত হতে থাকবে। আর এর দ্বারা তাঁর আমলনামা ভারী হতে থাকবে।

লেখক: প্রিন্সিপাল, শেখ জনূরুদ্দীন রহ. দারুল কুরআন মাদরাসা চৌধুরীপাড়া ঢাকা

জিহাদ কী ও কেন ?

মাওলানা মামুনুল হক

জিহাদ শব্দের অর্থ

জিহাদ শব্দটি আরবী জাহ্‌দ শব্দ হতে নির্গত যার অর্থ ক্লেশ-কষ্ট ভোগ করা। অথবা জুহ্‌দ শব্দ হতে নির্গত, যার অর্থ শক্তি সামর্থ্য। [ইরশাদুস সারী, ফাতহুল বারী]

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রহ. এর মতে শরীয়তের পরিভাষায় জিহাদ বলা হয়, কাফেরদের সাথে সশস্ত্র লড়াইয়ে সামর্থ্য ব্যয় করা। [ফাতহুল বারীঃ ৬/৩]

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহ. লিখেছেন, আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করার উদ্দেশ্যে কাফেরদের সাথে সশস্ত্র লড়াইয়ে সামর্থ্য ব্যয় করা। [উমদাতুল কারীঃ ১০/৭৬]

ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ ফকীহ ইমাম আলাউদ্দিন আবু বকর কাসানী রহ. লিখেছেন, শরীয়তের পরিভাষায় জিহাদ বলা হয়, জীবন দিয়ে, মাল দিয়ে এবং মুখের কথা ইত্যাদি দিয়ে আল্লাহর পথে সশস্ত্র লড়াইয়ের মাধ্যমে শক্তি সামর্থ্য ব্যয় করা। [বাদায়িউস্ সানায়িঃ ৬/৫৭]

আল্লামা ইবনুল হুমাম রহ. ফাতহুল কাদীর গ্রন্থে জিহাদের শরয়ী অর্থ লিখেছেন, কাফেরদের সত্য দীনের দাওয়াত দেয়ার পর গ্রহণ না করলে তাদের সাথে সশস্ত্র লড়াই করা। [ফাতহুল কাদীরঃ ৫/৪১৭]

ইসলামী কোন পরিভাষার ব্যাখ্যায় যাদের কথা গ্রহণযোগ্য তাদের মধ্য থেকে উল্লেখযোগ্য কয়েক জনের বক্তব্য উদ্ধৃত করা হল। উলামায়ে কেরামের উদ্ধৃতিগুলোর প্রতি লক্ষ করলে একটি বিষয়ে সকলেরই ঐকমত্য পাওয়া যাবে যে, কিতাল বা সশস্ত্র লড়াই সম্বন্ধীয় বিষয়কে শরীয়তে “জিহাদ” বলা হয়। সরাসরি কিতাল ছাড়া অন্যান্য পন্থাকেও অনেকে জিহাদের ব্যাখ্যায় সংযোগ করেছেন। সুতরাং জিহাদ কি শুধু কিতাল বা সশস্ত্র লড়াইকেই বলা হয়? না, ইসলামের বিজয় ও কুফরীর পরাজয়ে যে কোন ভূমিকা পালনকেই ইসলামী শরীয়তে “জিহাদ” বলা হয়?

বিষয়টির সমাধান বুঝার জন্য উসূলে ফিকহের একটি আলোচনা উদ্ধৃত করছি। আলোচনাটি শরয়ী পরিভাষা ব্যাখ্যার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট।

শব্দের ব্যবহার

শব্দকে যে অর্থের জন্য নির্ধারণ করা হয় সেটা হল তার হাকীকী বা মূল অর্থ। আর বিশেষ কোন প্রমাণ থাকায় ভিন্ন অর্থে ব্যবহার হলে সেটা হল মাজাযী বা আনুষঙ্গিক অর্থ। [উসূলে সারাখসী, বাযদাবী]

শব্দকে অর্থের জন্য নির্ধারণ তিন প্রকারে হতে পারে। ১. অভিধান কর্তৃক নির্ধারিত হওয়া ২. শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত হওয়া, ৩. সাধারণ বা বিশেষ গোষ্ঠী কর্তৃক নির্ধারিত হওয়া। সুতরাং হাকীকী বা মূল অর্থ তিনটি। ১. আভিধানিক মূল অর্থ (হাকীকী লুগাবী), ২. শরয়ী মূল অর্থ (হাকীকী শরয়ী), ৩. পারিভাষিক বা বিশেষ গোষ্ঠীর নিকট মূল অর্থ (হাকীকী উরফী)। এ তিনটি মূল অর্থের বিপরীতে তিনটি মাজাযী বা আনুষঙ্গিক অর্থ রয়েছে। ১. আভিধানিক আনুষঙ্গিক অর্থ (মাজাযী লুগাবী) ২. শরয়ী আনুষঙ্গিক অর্থ (মাজাযী শরয়ী) ৩. সাধারণ বা বিশেষ গোষ্ঠীর আনুষঙ্গিক অর্থ (মাজাযী উরফী)। ড. আব্দুল করীম যায়দান রচিত "আল ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিকহি" গ্রন্থে বিষয়টিকে এভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। উসূলুল ফিকহিল ইসলামী গ্রন্থেও মুসাল্লামুসসুবূত ও কাশফুল আসরারের উদ্ধৃতি দিয়ে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।

জিহাদের মূল অর্থ

উসূলে ফিকহের আলোচনার আলোকে ইসলামী শরীয়তে জিহাদ কাকে বলে? এ প্রশ্নের একটি প্রামাণ্য জবাব পেতে পারি। কিতাল বা সশস্ত্র লড়াইকেই একমাত্র জিহাদ বলা হয়, না ইসলামের পক্ষে যে কোন পদক্ষেপকেই জিহাদ বলা হয়? বিতর্কের সুনির্ধারিত সমাধান হল- আভিধানিক মূল (হাকীকী লুগাবী) অর্থ অনুযায়ী যে কোন পদক্ষেপের মাধ্যমে চেষ্টা সাধনা চালানোকে জিহাদ বলা হয়। আর মাজাযী শরয়ী বা শরয়ী আনুষঙ্গিক অর্থ হিসাবে ইসলামের বিজয় ও কুফরের পরাজয়ে যে কোন পদক্ষেপকেই জিহাদ বলা হয়। চাই তা অস্ত্রের সাহায্যেই হোক বা সম্পদ ব্যয়, কলমের লিখনি, মুখের বক্তৃতা বা অন্য কোন মাধ্যমে হোক। কিন্তু শরয়ী মূল অর্থ (হাকীকী শরয়ী) অনুযায়ী জিহাদ আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করা তথা ইসলামের বিজয় ও কুফরীর আধিপত্য খর্ব করার উদ্দেশ্যে কাফেরদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধকেই বলা হয়।

বিষয়টির এমন সুনির্ধারিত ব্যাখ্যা না পাওয়া গেলেও মূল বক্তব্যটি অনেক উলামায়ে কেরামের কথা থেকে বুঝা যায়। এ প্রসঙ্গে এখানে তিনটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হচ্ছে।

১ম উদ্ধৃতি: বর্তমান সময়ের প্রাজ্ঞ ইলমী ব্যক্তিত্ব আল্লামা তাকী উসমানী (দা.বা.) তার সুবিখ্যাত রচনা সহীহ্ মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিমে লিখেন,

كلمة الجهاد إذا أطلقت، فإنما يراد بها في الغالب جهد يبذل في قتال الكفار، ولا تطلق على غيره إلا بقرينة تدل على ذلك.

জিহাদ শব্দটি স্বাভাবিকভাবে প্রয়োগ করা হলে তা দ্বারা সাধারণত কেবলমাত্র কাফেরদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র উদ্যোগকেই বুঝায়। বিশেষ কোন প্রমাণ ছাড়া অন্য উদ্যোগকে বুঝায় না। [তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম: ৩/৪]

সশস্ত্র উদ্যোগ ছাড়া অন্য উদ্যোগ বুঝানোর জন্য প্রমাণের প্রয়োজনীয়তা এ কথার বহন করে যে, এটা জিহাদের মূল বা হাকীকী শরয়ী অর্থ নয়। ইতিপূর্বে উসূলে ফিকহের আলোচনায় এসেছে যে, শব্দের আনুষঙ্গিক (মাজাযী) অর্থ বুঝানোর জন্যই প্রমাণের প্রয়োজন হয়।

২য় উদ্ধৃতি: বিখ্যাত ফকীহ ও মুহাদ্দিস আল্লামা মোল্লা আলী কারী রহ. তার জগদ্বিখ্যাত মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ মিরকাতুল মাফাতীহে আভিধানিক অর্থ লেখার পর বলেন,

ثُمَّ غَلَبَ فِي الإِسْلَامِ عَلَى قِتَالِ الْكُفَّارِ.

আভিধানিক অর্থ একে অপরের বিরুদ্ধে শক্তি ব্যয় করা। অতঃপর ইসলামে জিহাদ কাফেরদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই অর্থেই ব্যবহার হয়। [মিরকাত: ৭/৩৪৮] এ থেকেও বুঝে আসে সশস্ত্র লড়াই জিহাদের শরয়ী অর্থ।

৩য় উদ্ধৃতি: বুখারী শরীফের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকার আল্লামা বদরুদ্দীন আবু মাহমূদ আল আইনী রহ. উমদাতুল কারীতে জিহাদ প্রসঙ্গে এক হাদীসের ব্যাখ্যায় পরিষ্কার ভাষায় লিখেছেন,

الْجِهَاد الْحَقِيقِيّ الَّذِي هُوَ الْقِتَال مَعَ الْكُفَّار.

হাকীকী জিহাদ যা কেবল কাফিরদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধকেই বলে। [উমদাতুলকারী: ১২/৪৫০]

উপরোক্ত আলোচনায় জিহাদ কাকে বলে? এ প্রশ্নের সমাধান দেয়ার চেষ্টা করা হল। অভিধানে যে কোন প্রচেষ্টা সাধনাকেই জিহাদ বলা হয়। আর শরীয়তের পরিভাষায় জিহাদের দুটি অর্থ রয়েছে। একটি হল জিহাদের মূল অর্থ। আর তা হল, আল্লাহর পথে সশস্ত্র লড়াই। আরেকটি হল জিহাদের আনুষঙ্গিক বা মাজাযী অর্থ। আর তা হল, ইসলামের বিজয় ও কুফরীর পরাজয়ে যে কোন চেষ্টা সাধনা

করা। উল্লেখ্য, আভিধানিক এবং পারিভাষিক অর্থের মধ্যে ব্যবহারের ক্ষেত্রে পারিভাষিক অর্থেরই প্রাধান্য থাকে। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. 'শরহু নুখবাতিল ফিকার' গ্রন্থে কোন এক প্রসঙ্গে লেখেন,

لكن لما تقرر في الاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفية فقدم على الحقيقة.

পরিভাষা হিসাবে সাব্যস্ত হওয়ার পর পারিভাষিক মূল অর্থ আভিধানিক মূল অর্থ থেকে অগ্রগণ্য হয়। [শরহু নুখবাতিল ফিকারঃ ৯৭]

জিহাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য

নিখিল জগত আর এ বিশ্ব চরাচর আল্লাহর সৃষ্টি। এখানে অসংখ্য মাখলুকাতের বাস। সর্বশ্রেষ্ঠ মাখলুক হল মানুষ। এ পৃথিবীর সুন্দর পরিচালনার জন্য আল্লাহ পাক বিধান দিয়েছেন। আল্লাহর বান্দা হয়ে আল্লাহর দুনিয়ায় বাস করে আল্লাহর অবাধ্য হবে, এটা মেনে নেয়া গেলেও আল্লাহর বিদ্রোহী হয়ে উঠবে অথবা অন্যদেরকে আল্লাহর বিধান অমান্য করতে বাধ্য করবে এটা কি মেনে নেয়া যেতে পারে? কোন সভ্য সমাজ-রাষ্ট্রে কি এধরনের বিষয় মেনে নেয়া হয়?

কাফের হওয়ার অর্থ আল্লাহর অবাধ্য হওয়া, আর জোরপূর্বক আল্লাহর বিধান তুলে দিয়ে অন্য কোন বিধান প্রতিষ্ঠা করা হল আল্লাহর সাথে সরাসরি বিদ্রোহ। বিদ্রোহীরা শুধু নিজেরাই বিদ্রোহ করে না, আমাদেরকেও বিধান অমান্য করতে বাধ্য করে। পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে যেন মানুষ তার সৃষ্টিকর্তার বিধান পালন করতে পারে, এ সুযোগ তার মানবিক ও জন্মগত মৌলিক অধিকার। আর এ অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিদ্রোহ দমনের কোন বিকল্প নেই। তাই বিদ্রোহী, কুফরী শক্তির বিদ্রোহ তথা প্রাবল্য খর্ব করা আর স্রষ্টার বিধানের মর্যাদার প্রতিষ্ঠা আল্লাহর নির্দেশ। এ নির্দেশ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া হল জিহাদ। সুতরাং জিহাদে উদ্দেশ্য হল-

ক. আল্লাহর বিধানের তথা দ্বীনের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা।

খ. সারা জাহানের মানুষের মৌলিক অধিকার আদায়ে বিদ্রোহী কুফরী অপশক্তির প্রাবল্য খর্ব করা। এক কথায় বলতে গেলে আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করা তথা ই'লায়ে কালিমাতুল্লাহ। মৌলিকভাবে এই হয় জিহাদের উদ্দেশ্য। পারিপার্শ্বিক কারণে আনুষঙ্গিক আরো উদ্দেশ্য সংযুক্ত হতে পারে, যেগুলো এ উদ্দেশ্য পূরণে সহায়ক হবে। আল্লামা তাকী উসমানী (দা.বা.) লিখেছেন,

الهدف الأساسي وراء تشريع الجهاد حسب ما تدل عليه النصوص الشرعية هو إعزاز الإسلام و إعلاء كلمة الله وكسر شوكة الكفار.

কুরআন সুন্নাহর বক্তব্যের আলোকে জিহাদ বিধানের মূল উদ্দেশ্য হল- ইসলামের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করা, আর কুফরী শক্তির প্রাবল্য খর্ব করা। [তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিমঃ ৩/৪]

জিহাদ কুফর নির্মূল করার জন্য নয়

আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করা তথা দ্বীন ইসলামের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও কুফরী শক্তির প্রাবল্য খর্ব করাই জিহাদের উদ্দেশ্য। কুফর নির্মূল করা জিহাদের উদ্দেশ্য নয়। দুনিয়ার সকল মানুষকে নিশ্চিতকল্পে নির্বিঘ্নে স্বাধীনভাবে স্রষ্টার বিধান পালনের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়ার জন্য জিহাদ। জোরপূর্বক ইসলামের অনুসারী করার জন্য নয়। অন্যায় জুলুমের উৎস- সৃষ্টির শাসন ব্যবস্থা তুলে দিয়ে স্রষ্টার জমিনে স্রষ্টার বিধান কায়েম জিহাদের লক্ষ্য, ব্যক্তিকে দ্বীন পালনে বাধ্য করা নয়। কর বা জিযিয়া আদায় করে নিরাপদে নিজ ধর্ম পালনের অধিকার লাভ করার বিধান এ কথার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। ইসলামের ইতিহাসও একথার প্রমাণ বহন করে। এ যাবত সংঘটিত অসংখ্য জিহাদের ইতিহাসও তাই। জিহাদের ইতিহাসে এরূপ একটি ঘটনারও উল্লেখ পাওয়া যায় না যে, কাউকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়েছে; বরং জিহাদের মাধ্যমে মানুষকে মানুষের দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা হয়েছে। অতঃপর স্বীয় ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। ইসলাম আপন বৈশিষ্ট্য, শ্রেষ্ঠত্ব আর উদারতার মাধ্যমে এ মুক্ত স্বাধীন মানুষগুলোর হৃদয় জয় করে নিয়েছে।

একটি ঐতিহাসিক উদ্ধৃতি

এ প্রসঙ্গে হযরত রিবয়ী ইবনে আমের রা. এর একটি ঐতিহাসিক উক্তি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। কাদিসিয়ার যুদ্ধে ইরানের সেনানায়ক রুস্তমের প্রস্তাবে মুসলিম সেনাপতি হযরত সা'দ ইবনে মালেক যুহরী রহ. দূত হিসাবে হযরত রিবয়ী ইবনে আমের রা. কে প্রেরণ করেন। রিবয়ী ইবনে আমেরকে তারা জিজ্ঞাসা করে, তোমরা কেন এসেছ? হযরত রিবয়ী রা. দৃপ্ত কণ্ঠে বলেন,

اللَّهُ ابْتَعَثْنَا لِنُخْرِجَ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ، وَمِنْ ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سِعَتِهَا، وَمِنْ جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ

আল্লাহ আমাদের দায়িত্ব দিয়েছেন, যারা মানুষের গোলামীর শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহর গোলামী করতে চায়, তাদেরকে সে শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে, আর

যারা দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি পেতে চায় তাদের প্রশস্ত পরিসরে আসা এবং সকল মতাদর্শের নির্যাতন থেকে যারা পরিত্রাণ চায় তাদেরকে ইসলামের ন্যায় নীতির পথে আসার সুযোগ করে দিতে। [আল বিদায়া ওয়ান নিহায়াঃ ৭/৩১]

কুরআন-হাদীসে জিহাদের উদ্দেশ্য

হযরত আবু মূসা আশআরী রা. হতে বর্ণিত রাসূলে আকরাম সা. এর একটি হাদীসে জিহাদের উদ্দেশ্য অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। হযরত আবু মূসা আশআরী রা. বলেন- এক লোক এসে, রাসূলুল্লাহ সা. কে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, 'আল্লাহর পথে লড়াই কাকে বলে?' কারণ অনেকে প্রতিশোধ পরায়ণতায় লড়াই করে। অনেকে বংশীয় মর্যাদার জন্য লড়াই করে। তখন রাসূলুল্লাহ সা. তার দিকে মাথা উঠিয়ে বললেন,

«مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ العُلْيَا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»

যে আল্লাহর কালিমা বুলন্দ হওয়ার উদ্দেশ্যে লড়াই করবে কেবল তাই আল্লাহর পথে লড়াই বলে গণ্য হবে। [বুখারী, মুসলিম]

আল্লাহর কালিমা দ্বারা উদ্দেশ্য হল, আল্লাহর একক সার্বভৌমত্ব। [উমদাতুল কারীঃ ১৯/১১৮]

পবিত্র কুরআনে কারীমেও বলা হয়েছে,

﴿ وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٞ ﴾

তোমরা কাফিরদের সাথে লড়াই কর, ফিতনা নির্মূল হওয়া পর্যন্ত। [আনফালঃ ৩৯] ফিতনা দ্বারা উদ্দেশ্য হল, দ্বীন পালনে প্রতিবন্ধকতা। [তাফসীরে ইবনে কাসীরঃ ২/২১৩]

কিতাল মানেই জিহাদ নয়

উপরোক্ত আলোচনায় স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, শরীয়তের পরিভাষায় জিহাদের মূল অর্থ হল কিতাল। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, কিতাল অর্থই জিহাদ বা যে কোন কিতালকেই জিহাদ বলা যাবে। এমন কি ইসলামে যে সকল কিতাল বা যুদ্ধের অনুমতি কিংবা নির্দেশ রয়েছে তার সবগুলোও জিহাদ নয়; বরং জিহাদ পরিভাষাটি মৌলিকভাবে শরীয়ত যেরূপ কিতালের জন্য নির্ধারণ করেছে তদ্রূপ সেই কিতালকেই জিহাদ সাব্যস্ত করেছে যা প্রকাশ্য কাফিরদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট

উদ্দেশ্য হাসিলের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। এ প্রসঙ্গে বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফাতহুল বারীর একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করা যেতে পারে। মুসলমানের পরস্পরের যুদ্ধে এক পক্ষ অবলম্বনকারী এক লোক হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. এর নিকট এসে অভিযোগ করে বলেন, আপনি কোন বৎসর হজ করেন, কোন বৎসর উমরাহ করেন, কিন্তু আল্লাহর পথে জিহাদ করেন না। এর কারণ কি? অথচ আপনার জানা আছে এ বিষয়ে আল্লাহ তা'য়ালা কত উৎসাহ দিয়েছেন। হযরত ইবনে উমর রা. তার আহ্বানে ইতিবাচক কোন সাড়া দিলেন না। এ প্রসঙ্গে আল্লামা হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. লিখেছেন,

أَطْلَقَ عَلَى قِتَالِ مَنْ يَخْرُجُ عَنْ طَاعَةِ الْإِمَامِ جِهَادًا وَسَوَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ جِهَادِ الْكُفَّارِ بِحَسَبِ اعْتِقَادِهِ وَإِنْ كَانَ الصَّوَابُ عِنْدَ غَيْرِهِ خِلَافَهُ وَأَنَّ الَّذِي وَرَدَ فِي التَّرْغِيبِ فِي الْجِهَادِ خَاصٌّ بِقِتَالِ الْكُفَّارِ بِخِلَافِ قِتَالِ الْبُغَاةِ فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ مَشْرُوعًا لَكِنَّهُ لَا يَصِلُ الثَّوَابُ فِيهِ إِلَى ثَوَابِ مَنْ قَاتَلَ الْكُفَّارَ.

ঐ ব্যক্তি ইমামের আনুগত্য পরিত্যাগকারী বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে জিহাদ বলে আখ্যা দিয়েছে এবং স্বীয় ধারণামতে এই যুদ্ধ আর কাফিরদের বিরুদ্ধে পরিচালিত জিহাদকে এক করে দিয়েছে। অথচ বাস্তবতা হল এর বিপরীত। জিহাদের বিষয়ে যে সকল ফজিলতের কথা কুরআন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে তা শুধুই কাফিরদের সাথে যুদ্ধের বিষয়ে নির্ধারিত। বিদ্রোহীদের বিদ্রোহ দমন পূর্বক যুদ্ধের ব্যাপারে তা বিবৃত হয়নি। যদিও এ বিদ্রোহ দমন যুদ্ধ শরীয়ত অনুমোদিত। তথাপি এটা সাওয়াব (ও হুকুম) এর দিক থেকে কাফিরদের সাথে যুদ্ধের মত (জিহাদ) নয়। [ফতহুল বারীঃ ৮/২৩৩]

জিহাদ ও আন্দোলন

ইকামাতে দ্বীনের তৃতীয় মৌল কর্মসূচী দ্বীনকে বিজয়ী করা প্রসঙ্গে আলোচনা ছিল। তাগলীবে দ্বীন বা দ্বীনকে বিজয়ী করার কর্মসূচীর দুটি স্তর রয়েছে। ১. শরীয়তের পরিভাষায় জিহাদ ২. জিহাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে অন্যান্য কর্মসূচী। বিষয়টি ভালভাবে বুঝার জন্য দুটি প্রশ্নের উত্তর প্রয়োজন ছিল। ১. জিহাদ কাকে বলে? ২. জিহাদের উদ্দেশ্য কি? দুটি প্রশ্নেরই প্রামাণ্য উত্তর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। পূর্বের আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে নির্ধারিত প্রক্রিয়া অবলম্বনকে জিহাদ বলা হয়। আর যদি একই উদ্দেশ্য হাসিলের লক্ষ্যে ভিন্ন প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয় যেমন, বর্তমান সময়ে দেশে দেশে দ্বীনের বিজয় ও ইসলাম কায়েমের উদ্দেশ্যে আন্দোলন সংগ্রাম পরিচালিত হচ্ছে। শরয়ী

পরিভাষা অনুযায়ী একে জিহাদ বলা না গেলেও এ যে তাগলীবে দ্বীন বা দ্বীন বিজয়ের এক মহান ধারা এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই। দীর্ঘদিনের ইসলামী ইতিহাস একথার সাক্ষ্য বহন করে।

উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম

দৃষ্টান্ত স্বরূপ উপমহাদেশের দুই আড়াইশ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেও এর সত্যতা প্রমাণিত হবে। এখানে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে ১৭৫৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত উপমহাদেশের ইসলাম ও ইসলামী সংগ্রামের ইতিহাস উদ্ধৃত করা সংগত মনে করছি।

১৭৫৩ সালে উপমহাদেশের ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য একটি কালো অধ্যায়ের সূচনা হয়। স্বাধীন ভারতের কর্ণাটক অঞ্চলের উপর ইংরেজদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় এ সময়। এরপর ধীরে ধীরে সারা ভারতই তাদের হস্তগত হয়ে যায়।

উপমহাদেশের স্বাধীনতার অগ্রপথিক শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলভী রহ. ভারতের শত্রু কবলিত দারুল হারব ঘোষণা করেন। ছড়িয়ে পড়ে গোটা উপমহাদেশে বিদ্রোহের অগ্নিশিখা। গড়ে ওঠে ইংরেজ বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ। পর্যায় ক্রমে বড় ধরনের দুটি সশস্ত্র মিশন পরিচালিত হয়। যার উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের আধিপত্য পুনঃ প্রতিষ্ঠা এবং উপমহাদেশের স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনা। প্রথম উদ্যোগটি পরিচালিত হয় শহীদে বালাকোট হযরত সৈয়দ আহমদ রহ. এবং শাহ ইসমাঈল শহীদ রহ. এর নেতৃত্বে, আর দ্বিতীয়টি পরিচালিত হয় হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ. ও তার তিন শিষ্য হাফেজ যামেন শহীদ রহ. কাসেম নানূতভী রহ. ও রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. এর সমন্বিত প্রয়াসে।

১৮৫৭ সালে শামেলীর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে মুসলমানরা পরাজিত হয়। হাফেজ যামেন রহ. শাহাদাত বরণ করেন। পর্যাপ্ত সামরিক প্রস্তুতি ও সরঞ্জামের অভাবে সশস্ত্র জিহাদের পরিকল্পনা আপাতত বিরত রাখতে হয়। এদিকে রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. কে গ্রেফতার করা হয়। হাজী ইমদাদুল্লাহ রহ. হিজরত করে মক্কায় পাড়ি জমান। আর কাসেম নানূতভী রহ. আত্মগোপন করে ইসলাম ও স্বাধীনতা রক্ষার নতুন মিশনের পরিকল্পনা করতে থাকেন।

নব দিগন্তের দ্বার

ইতিহাস একথাই প্রমাণ করে যে, পরাজয় কখনো মুসলমানদের হতোদ্যম করেনি, বরং মুমিন সৈনিকগণ পরাজয় থেকে শিক্ষা নিয়ে পূর্বের চেয়ে অধিক সাহস ও হিম্মত এবং বজ্র কঠিন শপথ নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করেছে, ছিনিয়ে এনেছে বিজয়ের কাঙ্ক্ষিত মুকুট।

হযরত কাসেম নানূতভী রহ. ছিলেন এমনি এক সাহসী বীর সেনানী যিনি এক ময়দানে পরাজয় বরণ করে শত্রুর নিকট ছুড়ে দিয়েছেন নতুন রণক্ষেত্রে মুকাবিলার দৃপ্ত চ্যালেঞ্জ।

ইংরেজদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ মেয়াদী রণ কৌশল অবলম্বন করেই গড়ে তুলেন "দারুল উলূম দেওবন্দ"। যার মূল লক্ষ্য ছিল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আড়ালে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনের একটি শক্ত ভিত্তি রচনা করা। যারা মনে করেন যে, দারুল উলূম নিছক একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তারা এর প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচয় বহন করেন। ইলম আমল, দ্বীন ও মাযহাবের হেফাজতের সাথে সাথে দেশ ও জাতির হেফাজত ও তার স্বকীয় মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দুর্দমনীয় প্রেরণা ছিল এর প্রতিষ্ঠার অন্যতম উৎস।

দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার পরে হযরত কাসেম নানূতভী রহ. এর হায়াত বেশী দিন দীর্ঘায়ত হয়নি। হযরত কাসেম নানূতভীর রহ. পথ ধরেই ইসলাম ও স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন তারই যোগ্য উত্তরসূরি শাইখুল হিন্দ মাহমুদ হাসান রহ.। তিনি এক্ষেত্রে তুর্কী খেলাফত ও আফগানিস্তানসহ বহির্বিশ্বের পরিচয় বহন করে। আরেকটি সশস্ত্র জিহাদের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়ে যায়। কিন্তু কুদরতের লীলা খেলা, রেশমি রুমালের চিঠি ফাঁস হয়ে গেলে সে বিপ্লবের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং শাইখুল হিন্দ রহ. সহ নেতৃস্থানীয় অধিকাংশ ব্যক্তিবর্গ ইংরেজদের কারাবন্দী হয়ে পড়েন।

কিন্তু তিলে তিলে গড়ে তোলা জনমত এবার রুদ্র রোষে ফেটে পড়ে। শাইখুল হিন্দের মুক্তির দাবীতে সারা ভারতে প্রতিবাদের ঝড় বয়ে যায়। অবশেষে তিন বছর সাত মাস বন্দী জীবন শেষ করে ৮ই জুন ১৯২০ খৃস্টাব্দে তিনি মুক্তিলাভ করেন।

সশস্ত্র জিহাদ থেকে আন্দোলন

মাল্টার রুদ্ধ কারাগারে থেকে ফিরে এসেই শাইখুল হিন্দ রহ. বিপ্লবের নতুন ধারার সূচনা করেন । তিনি সিদ্ধান্ত নেন, ভারতকে স্বাধীন করতে সামরিক শক্তি প্রয়োগ নয়। গণ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ইংরেজদেরকে এদেশ ছাড়া করতে হবে। এ

চিন্তা থেকেই শাইখুল হিন্দ রহ. গড়ে তোলেন রাজনৈতিক প্লাটফর্ম “তাহরীকে খেলাফত- খেলাফত আন্দোলন”। সর্ব প্রথম তিনি ঘোষণা করেন চমকপ্রদ এক রাজনৈতিক কর্মসূচী। ভারতবাসী ইংরেজদের বিরুদ্ধে ‘তরকে মুয়ালাত’ তথা অসহযোগ আন্দোলন গড়ে তোলার ডাক দেন। পরে মহাত্মা গান্ধীর ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও এই কর্মসূচীর প্রতি সংহতি প্রকাশ করা হয়। সারা ভারতে শাইখুল হিন্দের এই নতুন কর্মসূচী ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। শাইখুল হিন্দ রহ. উপমহাদেশের শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কেরাম স্বাক্ষরিত “ইংরেজদেরকে সহযোগিতা করা হারাম” ফতোয়া প্রচার করে দেয়ার পর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অফিস আদালতসহ সর্বক্ষেত্রেই ইংরেজ সরকার সম্পূর্ণ গণবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অবশ্য কিছু দরবারী আলেম যে ইংরেজ সরকারের পক্ষ অবলম্বন করেনি তা নয় । কিন্তু শাইখুল হিন্দের বিপরীতে তাদের কথা ও ফতোয়া জাতি গ্রহণ করেনি। অসহযোগ আন্দোলনের কার্যকারিতা সম্পর্কে মাওলানা আবুল কালাম আযাদ বলেছেন, ‘এ অসহযোগ আন্দোলনই ছিল অসহায় ভারতবাসীদের হাতে বিজয়ের সর্ব প্রথম নির্ভুল হাতিয়ার।

কাঙ্ক্ষিত বিজয়

১৯২০ সালে অসহযোগের মধ্য দিয়ে ইংরেজ বিরোধী যে গণ আন্দোলন শুরু হয়েছিল, ধীরে ধীরে তাই গণ প্রতিরোধে পরিণত হয়। ১৮৩১ সালের বালাকোটের রক্তস্নাত অধ্যায় যে চেতনার বীজ বপন করেছিল, ১৮৫৭ সালের শামেলীর রণাঙ্গন যে বীজের অঙ্কুর নির্গত করেছিল, ১৯২০ সালের অসহযোগ ও গণ আন্দোলনের মাধ্যমে তাই পত্র পল্লবে সুশোভিত হয়ে ওঠে। অবশেষে ১৭৫৩ সাল থেকে দীর্ঘ দুই শতাব্দীকাল পর্যন্ত অবিরাম চলতে থাকা স্বাধীনতার তরী ১৯৪৭ সালে মনযিলে মকসূদে নোঙ্গর করে। অর্জিত হয় একটি স্বাধীন সার্বভৌম ইসলামী রাষ্ট্র। পরবর্তী ইতিহাস যতই তিক্ত হোক, কিন্তু পূর্বের বাস্তবতা তাতে পাল্টে যাবে না।

উদ্দেশ্য এক প্রক্রিয়া ভিন্ন

প্রিয় পাঠক! লক্ষ করুন। উপমহাদেশের দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামে কেন্দ্রীয়ভাবে বড় বড় যে উদ্যোগগুলো গ্রহণ করা হয়েছে তা উল্লেখ করা হল। এখানে মোট চারটি উদ্যোগের কথা পরিষ্কারভাবে এসেছে। ১. বালাকোট যুদ্ধ, শাহাদাতের মাধ্যমে যার বাহ্যিক পরিসমাপ্তি। ২. শামেলীর যুদ্ধ, রক্তক্ষরণের মাধ্যমে যা একটি পর্যায়ে উপনীত হয়। ৩. রেশমি রুমাল আন্দোলন। ৪. তাহরীকে খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন।

উল্লেখ্য, প্রথম তিনটি উদ্যোগই ছিল সশস্ত্র। দুটি বাস্তবায়িত হয়েছে, তৃতীয়টি ছিল বৃহৎ পরিকল্পনা যেটি বাস্তবায়িত হওয়ার পূর্বেই পরিস্থিতি পাল্টে যায়। আর চতুর্থ উদ্যোগটি ছিল গণমুখী একটি আন্দোলন। একই উদ্দেশ্যে পরিচালিত চারটি উদ্যোগ। দুটিতে কিতাল হয়েছে, একটিতে কিতালের পরিকল্পনা ছিল, আরেকটিতে তাও ছিল না। রেশমি রুমাল আন্দোলনের রূপকার শাইখুল হিন্দই অসহযোগ আন্দোলনের পুরোধা। তাই বলছিলাম সশস্ত্র উদ্যোগ যে উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়, একই উদ্দেশ্যে অস্ত্র ছাড়া আন্দোলনও চলতে পারে এবং অনেক সময় অনেক প্রেক্ষিতে অধিক কার্যকরীও হতে পারে। আমাদের আলোচিত ইতিহাসই এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ। মূল উদ্দেশ্য হল দ্বীনের বিজয়। ইসলামের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ও কুফরীর প্রাবল্য খর্ব করা। প্রক্রিয়া কি হবে সে বিষয়টি অবশ্যই মূল নয়। বরং সার্বিক বিবেচনায় যে প্রক্রিয়া অধিক কার্যকর সাব্যস্ত হবে সে প্রক্রিয়াতেই উদ্দেশ্য হাসিল করতে হবে।

লেখক: মুহাদ্দিস, জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া মুহাম্মদপুর ঢাকা

৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ
ইতিহাস ঐতিহ্য প্রত্যয়

মাওলানা নাসীম আরাফাত

পাকিস্তান আমলে আমার জন্ম। তবে বয়সে তখন ছোট ছিলাম। সে সময়ের কথা বর্ষীয়ানদের মত আমি কলকলিয়ে বলতে পারব না । কিন্তু তার পরও তো আমার একটা স্মৃতিশক্তি ছিল। স্মৃতির ক্যামেরায় এখনো কিছু বীভৎস ভয়ানক চিত্র স্পষ্ট হয়ে আছে। তার আলোকেই দু' চারটি কথা লিখছি।

বৃটিশ আমলে আমার দাদা ছিলেন একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। তৎকালীন সময়ে তিনি একজন নামকরা বিচারক ছিলেন। মাতবর নামেই তিনি উপাধি পেয়েছিলেন। সবাই তাঁকে কাসেম আলী মাতবর নামে চিনত। জানত। দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, উজ্জ্বল চোখ, সদা গম্ভীর ও অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও বহু জমিজমার অধিকারী ছিলেন। আমি তাঁকে দেখেছি। শ্মশ্রুমণ্ডিত চেহারায় তাঁকে মুসলিম শাসকদের মতই মনে হত।

পাকিস্তান আমলে আমাদের পরিবারের যথেষ্ট সুখ ছিল। প্রাচুর্য ছিল। অভাব কখনো দেখিনি। ২৬ মার্চের রাতে আমরা খিলগাঁওয়ে ছিলাম। রাতে গোলাগুলির আওয়াজে ঘুম ভেঙ্গে গেল। রাজারবাগে পাকবাহিনী আক্রমণ করেছে। যুদ্ধ চলছে। মাঝেমাঝে বিকট আওয়াজে শিউরে উঠতাম। এলাকার যুবক ও পৌঢ় ব্যক্তিরা ইট মেরে মেরে লাইট পোষ্টের বাতিগুলো ভেঙ্গে ফেলল। ইট পাথর আর গাছের গুড়ি ফেলে রাস্তায় ব্যারিকেড সৃষ্টি করল যেন পাক বাহিনী আসতে না পারে। ভয়ে সবার চেহারা ফ্যাকাসে। হৃদয় চুপসে আছে।

আমাদের বাড়িতে একজন গৃহশিক্ষক ছিলেন। বাড়ি ছিল কুমিল্লার বাঞ্ছারামপুর। বড় ভাল মানুষ ছিলেন। আমরা সে রাতেই তার সাথে কুমিল্লায় রওনা হয়ে গেলাম। কিভাবে যাব। ক'দিন থাকব। সাথে কী কী নিতে হবে। এ বিষয়গুলো নিয়ে কারো কিছু ভাববার সময় ছিল না। ফুরসতও ছিল না । আমাদের আশেপাশের অনেকেই পালিয়ে গেছে। যাচ্ছে। নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে বেরিয়ে যাচ্ছে । আমার দাদার পরিবারের প্রায় সবাই তার সাথে রওনা হল। অন্ধকার রাতে টর্চ লাইটের আলো ফেলে ফেলে মেরাদিয়া হাট পশ্চাতে রেখে ত্রিমোহনী হয়ে বুলতায় পৌঁছলাম। বহু মানুষ এ পথে পালিয়ে যাচ্ছে। সবাই আতংকিত। ভয়ার্ত। মানুষের কষ্টের সীমা ছিল না। তারপর কিভাবে বাঞ্ছারামপুরে

পৌঁছেছিলাম তা আর মনে নেই। তবে এতটুকু মনে আছে, একটি ছোট লঞ্চ আমাদেরকে একটি চরে নামিয়ে দিয়েছিল। গাঢ় সবুজে ছাওয়া ক্ষেতের আইল ধরে হাঁটতে হাঁটতে আমরা তাদের বাড়িতে গিয়েছিলাম। বাদাম গাছগুলো টেনে তুলে পানিতে ধুয়ে খোসা থেকে কাঁচা বাদাম বের করে পরম উল্লাসে খেয়েছিলাম।

এরপর পাকবাহিনী সারা দেশে ছড়িয়ে পড়লে মানুষের মাঝে কিছুটা স্বস্তি ফিরে আসে। আর অপ্রস্তুত বাংলার মানুষ পিছু হটে প্রস্তুতি নিতে থাকে। মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং নিতে অনেকে ভারত চলে যায়। এসময়ে আমরা আবার খিলগাঁয়ে ফিরে এলাম। আমার জেঠা ছিলেন অত্যন্ত সাহসী। নির্ভীক। তিনি আমাদের সাথে যাননি। তখনকার বেশ কিছু স্মৃতি আমার এখনো মনে গেঁথে আছে। দিনের বেলা আমরা ছোটরা একটু ঘোরাফেরার সুযোগ পেলেও সন্ধ্যা নামার আগেই আমাদেরকে ঘরে ফিরতে হত। রান্নাবান্না দিনেই সেরে ফেলতে হত। রাতে বাতি বা আগুন জ্বালানো নিষেধ ছিল। আলো দেখলেই নাকি পাকসেনারা আলো লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ত। আমাদের বাড়ির উত্তরে ঝিলপাড়ে একটি দু'তলা বিল্ডিং ছিল। সেটা ছিল পাক সেনাদের ক্যাম্প। সেখানে পাক বাহিনীর সহায়তা করার জন্য কয়েকজন রাজাকার ছিল। আমার বেশ মনে আছে, একজন রাজাকার ছিলেন খুবই ভাল। সজ্জন। যেদিনই পাক সেনারা প্রহরায় বের হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিত তিনি এসে ঘোষণা দিয়ে যেতেন , কেউ যেন আলো না জ্বালায়। কেউ যেন বাইরে না বেরোয়। এভাবে নানাভাবে লোকদের সহায়তা করতেন। সে সময় সবাই তাকে শ্রদ্ধা করত। ভালবাসত।

আমার এক মামা ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের একজন শীর্ষ নেতা। নাম আলাউদ্দিন। ইউনিভার্সিটিতে পড়তেন। আমরা তাঁকে মাষ্টার মামা বলে ডাকতাম। মার সাথে মান্ডায় বড় খালার বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি অধিকাংশ সময় সেখানেই থাকতেন। সেখানেই তাঁকে শেষ বারের মত দেখেছিলাম। দেখতে খুব সুদর্শন ও স্মার্ট ছিলেন। শার্ট-প্যান্ট পরতেন। সেদিন তিনি কয়লার ইস্ত্রি দিয়ে কাপড় ইস্ত্রি করছিলেন। স্বাধীন হওয়া প্রায় এক সপ্তাহ আগে তিনি ও তাঁর এক মুক্তিযোদ্ধা বন্ধু পাকবাহিনীর হাতে ধরা পরেছিলেন। শহীদ হয়েছিলেন। তারপর বহু লাশের মধ্য থেকে নানা তাঁর প্যান্টের ব্যাল্ট দেখে তাঁকে সনাক্ত করেছিলেন। বাসাবো মাঠের উত্তর প্রান্তে মসজিদের সংলগ্নে তাঁর সমাধি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল। তিনি তাঁর কবর যিয়ারত করতে বাসাবোতেও এসেছিলেন।

আরেকটি স্মৃতির কথা কখনো ভুলব না। আমার এক ভগ্নীপতি ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা। নাম কাজী খলীল। তাঁরা সংবাদ পেলেন । রিজার্ভ করা এক ট্রেনে এক দল পাকসেনা ঢাকার বাইরে যাচ্ছে। সে রাতেই আমার দাদী ইন্তেকাল করেছিলেন। রাতে তাঁরা বাগিচার নিকটে রেললাইনের নিচে বোমা পেতে দাদীকে দেখতে এসেছিলেন। সাথে একটি লাল কাপড়ে বেঁধে এনেছিলেন প্রচুর গোলা আর অস্ত্রশস্ত্র।

সিপাইবাগ থেকে মেরাদিয়া যাওয়ার পথে দক্ষিণে মেরাদিয়া কবরস্থান। তখন এ স্থানটি একেবারে ফাঁকা ছিল। কোন বাড়িঘর ছিল না। সে কবরস্থান থেকেই তিনি ও তাঁর সঙ্গী যোদ্ধারা পাকবাহিনীর উপর আক্রমণ করেছিলেন। সে যুদ্ধে তিনি আহত হয়েছিলেন। তাঁর পেটের পার্শ্বে একটি গুলি বিদ্ধ হয়েছিল। সুস্থ হয়েছিলেন। তবে একটু কুঁজো হয়ে গিয়েছিলেন। সোজা হয়ে হাঁটতে পারতেন না।

এক রাতে এক মুক্তিযোদ্ধার আর্তচিৎকারে আমাদের ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে কী হৃদয় বিদারক করুণ চিৎকার! ভয় পেয়ে গেলাম আমরা। পাকবাহিনী তাঁকে মারতে মারতে রেল গেইটের দিকে নিয়ে যাচ্ছে আর উর্দু ভাষায় গালি দিচ্ছে। ভয়ে আমাদের অন্তরাত্মা কাঁপছিল। চারদিক অন্ধকার। কোথাও কোন আলো নেই। তাই তাঁর আর্তনাদ শোনা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলাম না। সকালে রেল গেইটের ঢালে জোড় পুকুরের পুলের নিচে তাঁর লাশ দেখতে পেলাম। গুলি বিদ্ধ অবস্থায় নিথর পড়ে আছে। শুনেছিলাম তাঁর নাম বাকী। মৌচাকের মোড়ে শহীদ বাকী নামক মুক্তিযোদ্ধা কবর দেখলে এখনো তাঁর সেই আর্তচিৎকার ধ্বনি আমাকে আবেগাপ্লুত করে। অশ্রুসজল করে।

এরপর সময় গড়িয়ে দেশের অবস্থা আরো সঙ্গিন হয়ে গেল। মুক্তিযোদ্ধারা চারদিকে প্রতিরোধ বুহ্য গড়ে তুলল। ইতিমধ্যে শুনলাম, দেশের বুদ্ধিমান ও প্রভাবশালীদের লিস্ট তৈরী হচ্ছে। আমার পিতা ও চাচা-জেঠারা আমার দাদার ব্যাপারে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। তাই আবার আমরা দাদাকে নিয়ে ছুটলাম সেই গৃহশিক্ষকের বাড়িতে। স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত আমরা কুমিল্লার বাঞ্ছারামপুরেই ছিলাম। যুদ্ধের আর কিছুই দেখলাম না। তবে দু'একটি যুদ্ধ বিমান বিকট আওয়াজে উড়ে যেতে দেখেছি। দেশ স্বাধীন হলে মানুষের মাঝে যে কী আনন্দ আর উল্লাসের বন্যা বয়ে গিয়েছিল তা আর কলমের খোঁচায় লেখা সম্ভব নয়।

পরদিনই আমরা একটি বড় গয়না নৌকা ভাড়া করে ঢাকার পথে রওনা হলাম। যতই ঢাকার দিকে আসতে লাগলাম ততই মৃত লাশের বীভৎস দৃশ্য বাড়তে লাগল। নদীর স্রোতে ভেসে যাচ্ছে নারী-পুরুষ আর শিশুর লাশ আর লাশ। নদীর

মাঝে মাঝে এলোমেলো ডুবে আছে পাক বাহিনীর যুদ্ধজাহাজ। ডেকে-ছাদে পরে আছে পাকসেনার লাশ। এ সব করুণ দৃশ্য দেখতে দেখতে আমরা নারায়ণগঞ্জের দিকে এগিয়ে আসছি। যতই এগিয়ে আসছি ততই বাড়ছে পচাঁ লাশের দুর্গন্ধ আর বীভৎস চিত্র। দেখলাম, এক পাকসৈন্যের লাশ ভেসে যাচ্ছে। পিঠে বাঁধা এক নাবিস্কো বিস্কুটের টিন। আরো এগিয়ে দেখলাম, একটি চরে এলোপাতাড়ি পড়ে আছে সত্তর আশি জনের লাশ। কারো কারো হাতে ঘড়িও দেখতে পেলাম। কারো পায়ে জুতাও ছিল। তাদেরকে এক লাইনে দাঁড় করে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।

বহু কষ্টে অনাহারে আর অর্ধাহারে আমরা নারায়ণগঞ্জে এসে পৌঁছলাম। তারপর মুড়িরটিন নামক বাসে করে খিলগাঁয়ে পৌঁছলাম। রাতের অন্ধকারে পৌঁছেছিলাম। তাই স্বাধীনতার আনন্দ-উল্লাস কিছুই অনুভব করতে পারি নাই।

সকালে উঠে দেখি, চারিদিকে স্বাধীনতার লাল-সবুজ পতাকা পতপত করে উড়ছে। সে কী আনন্দ! সে কী স্ফূর্তি আর উল্লাস! রাস্তার পাশে পাশে ব্যাংকার। স্বাধীন বাংলাদেশে সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস নিচ্ছে। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর জুলুম-অত্যাচার থেকে মুক্তি পেয়ে আল্লাহর দরগাহে শুকরিয়া আদায় করছে।

এতো রক্তের বিনিময়ে আমরা যে স্বাধীনতা পেলাম তার ফল কি আমরা ভোগ করতে পেরেছি ? কখনো কি ভোগ করতে পারব ? যে স্বপ্নের আশায় বিভোর হয়ে মুক্তিযোদ্ধারা প্রাণ দিয়েছেন সে স্বপ্ন কি আদৌ বাস্তবায়িত হবে? এর জওয়াব কি কেউ দিতে পারবে? থাক তা ভবিষ্যতের কোলেই রইল।

স্বাধীনতার পর আমি খিলগাঁও মডেল স্কুলে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়লাম। তারপর আমাকে আব্বা ও মামা আমাকে কামরাঙ্গীরচরে নিয়ে গেলেন। নূরীয়া মাদরাসায় ভর্তি করে দিলেন। শুরু হল আরেক জীবন। সময় গড়িয়ে গেল। এরপর কানে ভেসে আসতে লাগল, আমি নাকি রাজাকার। শুধু আমিই নই। আলেম মানেই রাজাকার। না হয় রাজাকারের বাচ্চা। এরপর লেখাপড়া শুরু করলাম। মুক্তিযুদ্ধ কী ? মুক্তিযোদ্ধা কারা ? কেন আলেমদের কেউ কেউ রাজাকার হয়েছিলেন? কেন পাকিস্তানীদের সমর্থন করেছিলেন? কেনইবা আলেমদের আরেকটি দল নীরব থেকে জালিমদের বিরুদ্ধে দু'আ করেছিলেন।

স্বাধীনতার কথা বলতে হলে, ভালভাবে বুঝতে হলে একেবারে গোড়া থেকেই বলতে হবে। বলতে হবে ৪৭ এর পাকিস্তান স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা। বলতে হবে তার প্রেক্ষাপট। বলতে হবে পাকিস্তান আমলে আলেমদের অবিরাম গৌরবোজ্জ্বল আন্দোলনের কথা। বলতে হবে রক্তাক্ত পিচ্ছিল পথের ইতিহাসের কথা। তা না হলে সব অস্পষ্ট থেকে যাবে।

৪৭ এর স্বাধীনতা আন্দোলনে আলেমদের অবদান

ইংরেজ আমলের আগে, পলাশী পূর্ববর্তী মুসলিম আমলে, বাংলা মুলুক ছিল পৃথিবীর সবচে´ সমৃদ্ধ ও সম্পদশালী দেশ। শায়েস্তা খার আমলে টাকায় আট মণ চাল পাওয়া যেত। আর ১৭৫৭ সালে ভাগ্য বিপর্যয়ের সময়ও বাংলার রফতানি বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল তৎকালীন মুদ্রায় সাড়ে সাত কোটি টাকা। পাঁচ সদস্যের একটি পরিবারের ভাত, মাছ, গোশত, দুধ, ঘি, চিনি ইত্যাদি খেয়ে সাধারণ মানের কাপড় পরে এক মাস চলার জন্য প্রয়োজন হত মাত্র এক টাকা চার আনা।

মুর্শিদ কুলিখার আমল থেকে দীর্ঘ ৫৫ বৎসরের সঞ্চিত সম্পদ একত্রিত করা ছিল নবাব সিরাজ উদ্দৌলার কোষাগারে। সার্জন ফোর্থের হিসাব মতে পূর্ণিয়া যুদ্ধের পর মনি-মুক্তা-হীরা-জহরতের মূল্য বাদে তৎকালীন মুদ্রায় তার পরিমাণ ছিল আটষট্টি কোটি টাকা।

পলাশী যুদ্ধের পর নবাব সিরাজ উদ্দৌলার দেওয়ান রামচাঁদ , বাবু মুনশী, নব কিষণ, লর্ড ক্লাইভ ও মীর জাফরকে নিয়ে এ বিত্ত-সম্পদ লুট করেছিল। এভাবে সোনার বাংলার সম্পদ লুট করেই ইংরেজদের সৌভাগ্যের দ্বার উন্মোচিত হয়েছিল আর সেই লুণ্ঠিত সম্পদে ইংল্যান্ডে ঐতিহাসিক শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল।

ইংরেজ সিভিলিয়ান ডাবলিও ডাবলিও হান্টারও এ কথা স্বীকার করেছেন। তার ভাষায়,"বাংলার যে সব মুসলমানদের কারো পক্ষেও সে দিন দরিদ্র হওয়ার কথা কল্পনা করাও সম্ভব ছিল না তাদেরকেই ইংরেজ শাসনামলে অল্প দিনের মধ্যেই সুপরিকল্পিতভাবে একটি অসহায় বিত্তহীন জনগোষ্ঠীতে পরিণত করা হয়।"

মুসলমানদেরকে জমিদারী ও জায়গীরদারি থেকে উৎখাত করে ইংরেজদের পদলেহী হিন্দুদের তা প্রদান করা হয়। মুসলমানদের প্রশাসন থেকে বরখাস্ত করে হিন্দুদের বসানো হয়। হাজার হাজার ওয়াকফ সম্পত্তি ছিনিয়ে নিয়ে মাদরাসা মক্তবসহ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস করে দেয়া হয়। মুসলিম সমাজকে ধর্ম, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, সব দিক থেকে পঙ্গু করে দেয়ার চেষ্টা চালানো হয়। মসলিনসহ বাংলার ঐতিহ্যবাহী বস্ত্র শিল্পকে ধ্বংস করে দেয়ার লক্ষ্যে মসলিন শিল্পীদের হাতের আঙ্গুল কেটে ফেলা হয়। মুর্শিদাবাদ থেকে রাজধানী স্থানান্তরিত করে হিন্দু অধ্যুষিত কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়। উপমহাদেশে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে যারা সর্বাধিক শোষণ বঞ্চনা ও নিগ্রহের শিকার হয়েছিল, তারা বাংলার মুসলিম জনগোষ্ঠী। মুসলিম অধ্যুষিত পূর্বাঞ্চল। আমাদের প্রিয় জন্মভূমি স্বাধীন বাংলাদেশ।

এ কারণেই বাঙ্গালী মুসলমানরা বারবার ফুঁসে উঠেছিল। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছিল। অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সংগ্রামে আবির্ভূত হয়েছিল। কখনো বিপ্লবী পথে। কখনো নিয়মতান্ত্রিক পথে। কখনো ধর্মীয় জাগরণের অবয়বে। কখনো জালিমের বিরুদ্ধে দ্রোহের মাধ্যমে। তিতুমিরের বাঁশের কিল্লার আন্দোলন। ফকীর বিদ্রোহ। ফরায়েজী আন্দোলন। নীলকরদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। এ সব আন্দোলনের পশ্চাতে এক ধর্মীয় চেতনা সর্বদা জাগরূক ছিল। আলেম-উলামাদের আত্মত্যাগে তা ছিল মহীয়ান। আলোকোদ্ভাসিত।

কিন্তু বিক্ষুব্ধ অবহেলিত মুসলিম সমাজ যখনই সামান্যতম উন্নতির সুযোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল তখনই ইংরেজদের অনুগ্রহভোগী হিন্দুরা নানা ছুতোয় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল।

১৯০৫সোলে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ সৃষ্টি, এবং ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে কলকাতার সুবিধাভোগী হিন্দু বাবুদের স্বরূপ সবার নিকট প্রকাশিত হয়ে পড়েছিল।

আঠারো শতকের শেষার্ধ ও গোটা উনিশ শতক ধরে একটানা বঞ্চিত হওয়ার পর বিশ শতকের প্রথম থেকেই বাঙালী মুসলিম সমাজ আত্মপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দৃঢ় সংকল্প হয়ে উঠেছিল। ইংরেজ ও হিন্দুদের নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও তারা একের পর এক সাফল্য ছিনিয়ে এনেছিল।

এসব সাফল্যের মধ্যে ছিল, ১৯০৬ সালে ঢাকায় নিখিল মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা। ১৯২১ সালে ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। ১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় সীমিত আকারে হলেও প্রদেশের শাসন কর্তৃত্ব লাভ। ১৯৪৫-৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে পাকিস্তান দাবীর স্বপক্ষে ঐতিহাসিক নিরঙ্কুশ রায় প্রদান । এসব আন্দোলনের পশ্চাতে আলেম-উলামাদের ছিল সক্রিয় উজ্জ্বল ভূমিকা। অবিশ্বাস্য কুরবানি আর মুজাহাদা।

দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতায় আলেম সমাজের বিভক্তি

ভারত স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারতবর্ষের আলেম সমাজ ঐক্যবদ্ধ ছিল। কিন্তু যখনই নানা কারণে ভারত বিভক্তির প্রশ্ন এসে গেল এবং মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা নিয়ে পাকিস্তান নামক একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের দাবী উত্থাপিত হল আর মুসলিম লীগ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা সংগ্রামে এগিয়ে চলল তখনই আলেম সমাজের মাঝে বিভক্তি দেখা দিল। একদল জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের নেতৃত্বে অখণ্ড ভারতের স্বপক্ষে রায় দিল। তাঁদেরও একটি দর্শন ছিল। একটি মত ছিল। কুরআনের আলোকেই

তাঁরা মজবুত যুক্তি পেশ করেছিল। আলেমদের একটি বিরাট দলও তাঁদের পক্ষে ছিল। এরা শাইখুল ইসলাম হোসাইন আহমদ মাদানী রহ. এর মতাদর্শে উজ্জীবিত ছিলেন। তাছাড়া জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের লোকেরা তখন বলত, মুসলিম লীগের নেতৃত্বে যারা রয়েছে তাদের অধিকাংশই ইংরেজদের হাতেগড়া। মুখে মুখে এরা যতই ইসলামের কথা বলুক আসলে এদের দ্বারা কখনো ইসলামী আইন বাস্তবায়িত হবে না। হতে পারে না।

আরেকদল উলামায়ে কেরাম ছিলেন হযরত থানভী রহ. এর চিন্তাধারায় উজ্জীবিত, অনুপ্রাণিত। এদের শীর্ষে ছিলেন সাইয়্যেদ সুলায়মান নদভী রহ. , জাফর আহমদ উসমানী রহ., শিব্বির আহমদ উসমানী রহ., ফুরফুরার পীর হযরত মাওলানা আব্দুল হাই সিদ্দীকি রহ., আল্লামা আযাদ সোবহানী রহ., মাওলানা আজিজুর রহমান নেছারাবাদী রহ., মাওলানা রুহুল আমীন রহ., মাওলানা মোয়েজুদ্দীন হামেদী রহ., মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী রহ., হযরত মাওলানা আতহার আলী রহ. । এদের ছাড়াও আরো অনেক উলামায়ে কেরাম।

তাঁদের স্বপ্ন ছিল, তাঁদের প্রাণের দাবী ছিল মুসলমানদের একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হলে সেখানে কুরআনের আইন বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। মুসলমানরা আবার ফিরে পাবে তাদের অতীত ঐতিহ্য। বিশ্বের দিকে দিকে লাঞ্ছিত পদদলিত আর অবহেলিত মুসলমানরা আবারো উজ্জীবিত হবে। চারদিকে ইসলামী জাগরণ সৃষ্টি হবে।

তাই তাঁরা বলিষ্ঠ কণ্ঠে মুসলিম লীগের সমর্থন করেছিলেন। মুসলিম লীগের প্রচার করতেন। ওয়াজ মাহফিলসমূহে শত শত মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতেন। এ কারণেই মুসলিম-জনতা কায়েদে আজম মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহকে নেতা মেনে তারই নেতৃত্বে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ ও মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ তখন জনসভায় কুরআন উঁচিয়ে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করতেন, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হলে আমাদের আর নতুন কোন সংবিধানের প্রয়োজন হবে না। ১৪ শত বৎসর আগের এ সংবিধানই হবে আমাদের সংবিধান।

তখন কুরআনের আইন বাস্তবায়নের স্বপ্নিল স্বপ্নে উজ্জীবিত হয়েছিল বাংলার সব ধরনের সব শ্রেণীর মুসলিম জনতা। নবীন-প্রবীণ সকলে। উজ্জীবিত হয়েছিল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, উলামায়ে কেরাম, পীর-মাশায়েখ, শিল্পী-সাহিত্যিক-সাংবাদিক, কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র। এ আন্দোলনে যেমন উজ্জীবিত হয়েছিলেন বিদ্রোহী কবি নজরুল, ফররুখ আহমদ, আল্লামা ইকবাল তেমনি উজ্জীবিত হয়েছিলেন কবি শামসুর রহমান ও কবি সুফিয়া কামাল। পাকিস্তানের প্রশস্তি গেয়ে

নজরুল, ফররুখ আহমদ আর গোলাম মোস্তফারা যেমন কবিতা লিখলেন তেমনিভাবে কবিতা লিখলেন কবি শামসুর রহমান। লিখলেন,

নিঃসীম উজ্জ্বল আকাশে
ঝলমল রৌদ্রের আকাশে
আজাদির রাঙা দিন জ্বলছে।।
সাত রঙা চেতনার দীপ্তি
স্বপ্নের প্রশান্ত ছন্দে
নব জীবনের কথা বলছে।

আর সুফিয়া কামাল কায়েদে আজমের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে লিখলেন,

কায়েদে আজম ! হে মহান নেতা
সাড়া দাও, সাড়া দাও
তোমারে ভুলেনি , আজো ডাকিছে
বঞ্চিত সর্বহারা।

১৯৬৮ সালের ১৪ আগস্ট “পাকিস্তানী খবর” পত্রিকায় লিখলেন,

এই খানে একটি পতাকা
চন্দ্র ও তারকা আঁকা
কোটি প্রাণের নব প্রাণের প্রতীক
উচ্ছ্বসিত করি দিক দিক
এখনও মুক্তির স্বাদে দুর্ভিক্ষে প্লাবনে
মানুষের দানে
স্বাধীন হইয়া বাঁচিবার
প্রেরণা অপার
এই পাকভূমি আজও সংগ্রামে দূর্বার
এই দিন আসে বারবার

আর ফররুখ আহমদ লিখলেন সিন্দাবাদ ,

আজকে তোমার পাল উঠাতেই হবে
ছেড়া পালে আজ জুড়তেই হবে তালি
ভাঙা মাস্তুল দেখে নিক করতালি
তবুও জাহাজ আজ ছোটাতেই হবে।

আর বিদ্রোহী কবি নজরুল লিখলেন,

যেথায় মিথ্যা ভণ্ডামি ভাই করব সেথায় বিদ্রোহ।
ধামা ধরা! জামা ধরা ! মরণ ভীতু । চুপ রাহো!

আমরা জানি সোজা কথা , পূর্ণ স্বাধীন করব দেশ!
এই দুলালাম বিজয় নিশান, মরতে আছি মরব! শেষ।

কারারুদ্ধ নজরুলের কণ্ঠে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল ।

কারার ঐ লৌহ কপাট
ভেঙে ফেল, কররে লোপাট
রক্ত জমাট ,
শিকল-পূজোর পাষাণ-বেদী!
ও রে ও তরুণ ঈশাণ !
বাজা তোর প্রলয় বিষাণ!
ধ্বংস নিশান
উড়ুক প্রাচীর প্রাচীর ভেদী।

তাই মুসলমানদের এ দাবী চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার স্বাদ চিরতরে মিটিয়ে দেয়ার প্রত্যয়ে কলকাতার মহাসভাপন্থী ও কংগ্রেসের কট্টর সাম্প্রদায়িক হিন্দুরা মুসলমানদের উপর আক্রমণ শুরু করল। রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা শুরু হল। কলকাতায় প্রায় ৫০,০০০ নর-নারী নিহত হল। তাদের অধিকাংশই ছিল মুসলমান। নোয়াখালীর দাঙ্গায় ২২০ জন প্রাণ হারাল। বিহারে সুপরিকল্পিতভাবে ১৫,০০০ মুসলমানকে নির্মমভাবে হত্যা করা হল। এভাবে মধ্য প্রদেশ , দিল্লী, পাঞ্জাব, যুক্ত প্রদেশেও দাঙ্গায় হাজার হাজার মুসলমান নিহত হল। গোটা ভারতবর্ষে এ দাঙ্গার আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল।

সে এক করুণ ইতিহাস। বরং ইতিহাসের এক রক্তাক্ত অধ্যায়। হাজার হাজার মুসলমানের রক্তের বিনিময়ে অবশেষে পাকিস্তান স্বাধীন হল। পশ্চিম পাকিস্তানে স্বাধীনতার পতাকা তুললেন হযরত মাওলানা শিব্বির আহমদ উসমানী রহ.। আর পূর্ব পাকিস্তানে স্বাধীনতার পতাকা তুললেন হযরত মাওলানা জাফর আহমদ উসমানী রহ.।

পাকিস্তান আমলে উলামায়ে কেরামের আন্দোলন

লাখ কোটি মুসলিম নর-নারীর রক্ত-সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু সেই ইসলামী শাসনতন্ত্র কোথায় ? সেই ইসলামী জীবনবিধান কোথায় ? কোথায় সেই ওয়াদা আর প্রতিশ্রুতি ? মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ তা ভুলে গেল। ক্ষমতার মোহে তারা দিশেহারা। তারা পাগলপারা।

হযরত মাওলানা শিব্বির আহমদ উসমানী রহ. এ টালবাহানায় খুব মনক্ষুন্ন হলেন। ব্যথিত হলেন। ছুটে গেলেন কায়েদে আযম মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহর কাছে। বললেন, কোথায় আপনার সেই প্রতিশ্রুতি? কোথায় সেই কুরআনী আইন বাস্তবায়নের ওয়াদা ?

জবাবে জিন্নাহ বললেন, মাওলানা সাহেব! ইয়ে তু সিয়াসী ওয়াদা থা। এটা তো রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি ছিল। কখনো কখনো বললেন, ইয়ে তো বাত কি বাত থি। আরে সেটা তো কথার কথা ছিল।

আহ্ ! শাইখুল ইসলাম হোসাইন আহমদ মাদানী রহ. এর কথাই এখন হৃদয়পটে ভেসে উঠছে। পাকিস্তান স্বাধীন হলে তাকে ভারতবর্ষের মুসলমানদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, "হিন্দুস্তান মে মুসলমান খত্‌রে মে রাহেগা আওর পাকিস্তান মে ইসলাম খত্‌রে মে রাহেগা"।

ঠিক তাই হল। পাকিস্তানের প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে আটকে গেল কোটি কোটি মুসলমানের ভাগ্যের চাকা। হাজার হাজার শহীদের রক্তের দাবী। সে কী গভীর ষড়যন্ত্র ! ষড়যন্ত্রকারী খুব বেশী নয়। তবে তারা ক্ষমতাসীন। এরা মুখে মুখে ইসলামের কথা বললেও জীবনাদর্শে তাদের ইসলাম নেই। ইসলামের জন্য কোন প্রকার কুরবানী দিতেও তারা প্রস্তুত নয়। মুখে মুখে জনদরদির কথা বললেও হৃদয়ে তাদের দরদ নেই। এরা মুনাফিক। এরা জাতীয় গাদ্দার। এরাই মীর জাফর আর ঘসেটি বেগমদের প্রেতাত্মা।

কিন্তু তাই বলে কি আলেম সমাজ বসে থাকতে পারে? নিরাশ হতে পারে? কিছুতেই না। আবার শুরু হল আন্দোলন। ইসলামী আইন বাস্তবায়নের আন্দোলন। কুরআনের আইন বাস্তবায়নের আন্দোলন।

পাকিস্তানের ইতিহাসের তিন অধ্যায়

পাকিস্তানে ইসলামী আইন বাস্তবায়নের ইতিহাসকে আমরা তিন অধ্যায়ে ভাগ করতে পারি।

১. ১৯৪৭ - ১৯৫৮ অর্থাৎ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর হতে আইয়ূব খানের সামরিক আইনের শুরু পর্যন্ত মোট এগারো বৎসর।

২. ১৯৫৮ - ১৯৬৮ অর্থাৎ আইয়ূবের শাসনামলের দশ বৎসর।

৩. ১৯৬৯ - ১৯৭১ অর্থাৎ আইয়ূব পরবর্তী সময় থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত ৩ বৎসর।

প্রথম অধ্যায় , ১৯৪৭ - ১৯৫৮ সাল

পাকিস্তানের ইতিহাস এক লজ্জাজনক ইতিহাস। ২৩ বৎসরের এ জাতীয় জীবনে যত আন্দোলন আর উত্থান-পতন হয়েছে, যত হত্যাকাণ্ড, অনাচার-অবিচার আর ক্ষ্য হয়েছে এসব কিছুর পিছনে ছিল একটি ব্যর্থতা। তা হল পাকিস্তানের ক্ষমতাসীনরা জনগণকে কোন সংবিধান উপহার দিতে পারেনি। বারবার মুসলিম জনতা আর আলেম-উলামার প্রাণের দাবী উপেক্ষিত হয়েছে। নিকষ কালো ষড়যন্ত্র এ দাবীকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছে। যারাই এ দাবী নিয়ে সোচ্চার হয়েছে তাদেরকেই নির্যাতন আর নিপীড়নের শিকার হতে হয়েছে। তাদেরকে অখণ্ড ভারতের প্রবক্তা মাওলানা আবুল কালাম আযাদ আর শাইখুল ইসলাম হোসাইন আহমদ মাদানী রহ. এর কাতারে টেনে এনে ইসলামের অগ্রনায়ক এ মহান ব্যক্তিদ্বয়ের ভাবমূর্তিকে খাটো করার জন্য তাদেরকে পাকিস্তানের শত্রু আর ভারতের দালাল হিসাবে জনগণের সামনে তুলে ধরার অপচেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু উলামায়ে কেরামের অগ্রযাত্রা এক মুহূর্তের জন্যও থেমে যায়নি। উলামায়ে কেরামের কণ্ঠ ক্ষণিকের তরেও স্তব্ধ হয়ে যায়নি। বিত্ত-বৈভব আর অর্থের প্রলোভনের হাতছানিতে তারা বিভ্রান্ত হয়নি।

১৯৪৮ সালে কায়েদে আজম মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহর ইন্তেকালের আগেই আল্লামা জাফর আহমদ উসমানী রহ. এর সভাপতিত্বে লালবাগ শাহী মসজিদে এক বিশাল সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বহু আলেম এতে অংশগ্রহণ করেন। বক্তৃতায় বক্তৃতায় উজ্জীবিত হয় সর্বস্তরের মানুষ। তারপর ইসলামী আইন বাস্তবায়নের পক্ষে চার দফা আদর্শ প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এরপর উলামায়ে কেরাম পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের শহরে নগরে বন্দরে সভা সেমিনার আর সেম্পোজিয়ামের মাধ্যমে জনগণকে উৎসাহিত করতে থাকে।

এদিকে ১৯৪৯ সালে ২৩ জুন মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে টাঙ্গাইলের শামছুল হক এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে সরকারী মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী (জনগণের) মুসলিম লীগ গঠিত হয়। এ দলই হল স্বাধীন পাকিস্তানে সর্ব প্রথম বিরোধী দল। ফলে অনেক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এতে সমবেত হয়। ৪৯ সালেই ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে দলীয় কর্মসূচীর অংশ হিসাবে গভর্নমেন্ট হাউজের দিকে আওয়ামী মুসলিম লীগের উদ্যোগে এক ভুখা মিছিল বের করা হয়। ১৪ আগস্ট মাওলানা আব্দুল হামীদ খান ভাসানীকে গ্রেফতার করা হয়। এবং ৫০ সালের ১লা জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। এভাবেই বিরোধী দলীয় কর্মকাণ্ড প্রসার লাভ করতে থাকে।

১৯৫০ সাল। লিয়াকত আলী তখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। ইসলামী আন্দোলনকে রোধ করার জন্য একটি শাসনতান্ত্রিক মূলনীতি ঘোষণা করে এবং সরকারীভাবে যাকাত আদায়ের জন্য একটি আইন পাশের ষড়যন্ত্র করে। পাকিস্তান জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম উক্ত আইন ও মূলনীতির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করে। অবস্থা বেগতিক দেখে পূর্ব পাকিস্তানের মন্ত্রী নুরুল আমীনের সহায়তায় উক্ত কুখ্যাত আইনের সমর্থনের জন্য ১৯৫১ সালে মোমেনশাহীতে মুসলিম লীগের এক সম্মেলন অহ্বান করা হয়।

তখন শামছুল হক ফরিদপুরী রহ. ও আতহার আলী রহ. ও অন্যান্য উলামায়ে কেরাম পোস্টার হ্যান্ডবিল প্রচার করে, বিরাট বিরাট সম্মেলন করে মুসলিম লীগের কারসাজির প্রতিবাদ করেন। লিয়াকত আলী তখন মোমেনশাহীতে সম্মেলন করেছিলেন বটে, তবে উক্ত আইনের পক্ষে কোন কথা বলেননি। পরে ঢাকার পল্টন ময়দানের এক সভায় ইসলামের বিরুদ্ধে কোন আইন হবে না বলে ঘোষণা দেন এবং যাকাত বিল প্রত্যাহার করে নেন।

এরপর আসে আরেক নতুন ফেৎনা

মুসলিম লীগের কর্ণধাররা তখন আন্দোলনরত উলামায়ে কেরামকে স্তব্ধ করার জন্য বলতে থাকে, মুসলমানদের মাঝে নানা ফেরকা, শিয়া-সুন্নী, হক্কানী-বিদআতী, হানাফী-শাফেয়ী। এ অবস্থায় আমরা কাদের কথা শুনব ? কাদের মতে ইসলামী আইন জারি করব?

তখন উলামায়ে কেরাম গোটা পাকিস্তানে ছড়িয়ে পড়ে। সব ধরনের মুসলমানদের নিকট ছুটে যায়। সবাইকে নিয়ে আসে এক মঞ্চে। ১৯৫১ সালের ২১ জানুয়ারি থেকে ২৫ শে জানুয়ারি পর্যন্ত আল্লামা সাইয়্যেদ সুলাইমান নদভী রহ. এর সভাপতিত্বে করাচীতে ৪ দিন ব্যাপী সর্বদলীয় উলামা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। ৪ দিনের ঐ মহা সম্মেলনে পাকিস্তানে ইসলামী শাসনতন্ত্র তৈরির জন্য ২২ দফা আদর্শ প্রস্তাব রচনা করেন ও পাশ করেন। তারপর তা ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের কর্তাদের নিকট সমর্পণ করে ইসলামী আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য চাপ দিতে থাকেন। কিন্তু তাতেও কোন ফল উদয় হয়নি।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন পূর্ব পাকিস্তানের আরেক ট্রাজেডি। উলামায়ে কেরাম এ আন্দোলনকেও সমর্থন করে তাকে জোরদার করেছিলেন। মানুষের নিকট তা গ্রহণীয় করে তুলেছিলেন। হযরত মাওলানা আতহার আলী রহ. জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের ব্যানারে এ আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন। তিনি জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম পাকিস্তানের সংবিধানের ধারায় লিখলেন।

'উর্দুর সাথে বাংলাকেও পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করতে হবে।' তারপর বিভিন্ন সভা সমাবেশ ও সম্মেলনে সুস্পষ্ট তথ্য ও পরিসংখ্যান দিয়ে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার যৌক্তিক প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত জোরালো ভাষায় তুলে ধরেন। শামছুল হক ফরিদপুরী রহ. তখন গর্জে উঠে ঘোষণা করেছিলেন, মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা দান আমাদের ন্যায্য অধিকার। আমাদের তা দিতেই হবে।

এভাবে বাংলার লেখক, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, প্রাবন্ধিকসহ সবাই সাধ্যানুযায়ী সমর্থন করেছিল। ফলে রাষ্ট্র ভাষার পক্ষে জোরালো মত সৃষ্টি হল। এর ধারাবাহিকতায় ৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে সরকারের ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ছাত্ররা বাংলাভাষার পক্ষে মিছিল বের করল। শহীদ হল সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ অনেকে। বিক্ষোভে ফেটে পড়ল সারা দেশ। শহীদদের স্মরণে শহীদ মিনার তৈরি করা হল। কিন্তু পাঁচ দিনের মাথায় ২৬ ফেব্রয়ারি পুলিশ তা গুড়িয়ে দিল।

এভাবে পাঁচ বৎসর যেতে না যেতেই মুসলিম লীগের প্রতি বিশেষত পাকিস্তানীদের প্রতি বাংলার মানুষের মন বিষিয়ে উঠতে লাগল।

যুক্তফ্রন্টের রাজনীতি ও উলামায়ে কেরামের মুজাহাদা

জনাব এ, কে ফজলুল হক ছিলেন পূর্ব বাংলা সরকারের এডভোকেট জেনারেল। তিনি চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে রাজনীতিতে প্রবেশ করলেন। ইতিমধ্যে মাওলানা ভাসানী ও শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে তরুণ ছাত্রদের সক্রিয় সমর্থনে আওয়ামী মুসলিম লীগ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। সবার ধারণা ছিল, ফজলুল হক সাহেব আওয়ামী মুসলিম লীগেই যোগ দান করবেন। কিন্তু তা আর হলো না। তিনি কৃষক-শ্রমিক পার্টি নামে একটি নতুন দল গঠন করলেন।

এদিকে বগুড়ার জনাব মুহাম্মদ আলী সাহেব ১৯৫৪ সালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়ে পূর্ব পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা করেন। এতে চারদিকে সাড়া পড়ে যায়। মানুষ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নির্বাচন করা তখন সময়ের দাবী হয়ে ওঠে। তাই আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক-শ্রমিক লীগ, নেযামে ইসলাম পার্টি, পাকিস্তান গণতন্ত্রী দল ও খেলাফতে রব্বানী পার্টি মিলে একটি ঐক্যবদ্ধ প্লাটফর্ম তৈরি হয় । নাম হয় যুক্তফ্রন্ট।

পাকিস্তান যেহেতু ইসলামী ভাবধারায় সৃষ্টি হয়েছিল, তাই পাকিস্তানের রাজনীতিতে কমিউনিস্ট রাজনীতি নিষিদ্ধ ছিল। আর কমিউনিস্টরা সেই চেতনা নিয়েও পাকিস্তানে আসেনি। তাই মুসলিম লীগের দুর্বলতার সুযোগে তারা সংগঠিত হতে

থাকে । প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা মনি সিং এর এক সার্কুলারে তারা মজবুত রাজনৈতিক সংগঠন আওয়ামী মুসলিম লীগে ঢুকতে থাকে এবং দলের মাঝে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার আদর্শ প্রচার করে নিজেদের একটি প্রভাব বলয় প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়। তারা বেশ দূর এগিয়েও যায়।

নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট অভূতপূর্ব সাড়া পায়। বিজয় লাভ করে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন। এ বৎসরই ২১-২৩ অক্টোবর কাগমারী সম্মেলনে আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে মুসলিম শব্দটি বাদ দিয়ে এ দলটি সার্বজনীন হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে। নাম হয় আওয়ামী লীগ।

৫৪ এর নির্বাচনে নেজামে ইসলাম পার্টির সভাপতি হযরত মাওলানা আতহার আলী রহ. পাকিস্তানে ইসলামী অনুশাসন প্রতিষ্ঠার পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের সাথে এক চুক্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন। চুক্তি নামার তৃতীয় ধারায় লিখেছিলেন,

‘অত্র পার্টিসমূহ প্রচলিত শরীয়ত বিরোধী আইনসমূহকে পর্যায়ক্রমে রহিত ও কুরআন সুন্নাহ মোতাবেক আইনকে অতি দ্রুত প্রদেশ ও কেন্দ্রের জন্য সংকলন ও চালু করার প্রচেষ্টা করবে।’

নেজামে ইসলাম পার্টি যদিও যুক্তফ্রন্টের একটি শরীক দল ছিল এবং নির্বাচনের মাত্র চার মাস আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু তার কর্মতৎপরতা ও প্রচার প্রসারে ইসলামপ্রিয় জনগণ আবার ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। ঈমানী চেতনায় আবার উজ্জীবিত হয়ে উঠতে থাকে। জনাব আবুল মনসুর আহমদ লিখেন, ‘জনগণের উৎসাহ পল্লীগ্রামের নারী জাতির মধ্যেও ছড়াইয়া পড়িল। আমার নিজের এলাকায় দেখিয়াছি, পর্দা রক্ষা করিয়াও দলে দলে মেয়েরা ভোট কেন্দ্রে আসিয়াছে। পর্দা রক্ষার জন্য তারা এইরূপ অভিনব ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে; চারজন যুবক একটা মশারির চারকোণা ধরিয়াছে। পনের বিশজন মেয়ে-ভোটার এই মশারির নিচে ঘিচি-ঘিচি করিয়া ঢুকিয়াছে। তারপর মশারি চলিয়াছে । আর মশারির মধ্যে মেয়েরা চলিয়াছে। প্রতি গ্রাম হইতে মিছিল করিয়া ভোটাররা ভোট কেন্দ্রে আসিয়াছে।’

ফলে নেজামে ইসলাম পার্টি যুক্তফ্রন্টের মাঝে তৃতীয় হয়েছিল। হযরত আতহার আলী রহ. এর দূরদর্শিতা ও প্রজ্ঞার কারণে নেজামে ইসলাম পার্টির ব্যানারে পূর্ব পাকিস্তানের কিছু যোগ্য লোক এসেম্বলিতে যোগদান করেছিল। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় জনাব ফরিদ আহমদ মন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছিলেন আর প্রাদেশিক মন্ত্রীসভায় তিনজন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছিলেন। কেন্দ্রীয় এসেম্বলির স্পীকারও নির্বাচিত হয়েছিলেন নেজামে ইসলাম পার্টির সদস্য জনাব আব্দুল ওয়াহাব সাহেব।

কিন্তু বিধিবাম। কুদরতের ফয়সালা ছিল অন্য। তাই যুক্তফ্রন্টের মাঝে বিরোধ শুরু হল। দ্বন্দ্ব দেখা দিল। এটা হক-বাতিলের দ্বন্দ্ব নয়। এটা হক-শহীদের দ্বন্দ্ব। মানে এ কে ফজলুল হক আর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর দ্বন্দ্ব। এতে ইন্ধনের যোগান দিল কায়েমি স্বার্থবাদী মন্ত্রিত্বের লোভী তাদেরই প্রিয় পাত্ররা। এরপর আওয়ামী লীগের মাঝেও অন্তর্বিরোধ শুরু হল। ক্রমেই সার্বিক অবস্থা সঙ্গিন থেকে সঙ্গিনতর হয়ে চলল। ক্ষমতা অদল বদলের পালা চলল। সবশেষে এগিয়ে এল একটি কলঙ্কময় রক্তাক্ত দিবস।

১৯৫৮ সালের ২৩ আগস্ট। গণপ্রতিনিধিরা বক্তৃতা ও ভোটের দ্বারা দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করার পবিত্র দায়িত্ব নিয়ে আইন সভায় আসেন। এসেম্বলিতে যোগ দান করেন। সে দিন সে শিক্ষিত ভদ্র সমাজের নেতৃস্থানীয় বয়স্ক লোকেরাও ইতরের মত গুণ্ডামী শুরু করল। ডেপুটি স্পিকার জনাব শাহেদ আলী পাটোয়ারীর দিকে চেয়ার, ওয়েট পেপার, মাইকের মাথা, জুতা, যে যা পেল ছুড়ে মারতে লাগল। প্রাণপণ চেষ্টা করেও শেষ রক্ষা করা গেল না। দেহরক্ষীরা চেয়ারের পাহাড় না তুললে মঞ্চেই মরে চ্যাপ্টা হয়ে যেতেন। সে দিন তিনি না মরলেও পরদিন হাসপাতালে ইন্তেকাল করলেন। তার অপরাধ, তিনি সরকার পক্ষকে সমর্থন করেছিলেন।

দেশের অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা আর হানাহানিতে ধর্মপ্রাণ মানুষেরা চরম উৎকণ্ঠার মাঝে কালাতিপাত করতে লাগল। মনে হতে লাগল, ইসলামী আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের আশার সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়েছে। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে তার কিরণ। নিষ্প্রভ হয়ে গেছে তার আলো। ভয়াবহ এক পরিস্থিতির পদধ্বনি শোনা যাচ্ছিল পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ ১৯৫৮ - ১৯৬৮ সাল

পাকিস্তানের সেনাপ্রধান তখন আইয়ূব খান। অত্যন্ত ধুরন্ধর প্রকৃতির মানুষ। এগিয়ে এলেন সাধু বেশে। ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্যাকে দিয়ে সারা দেশে সামরিক শাসন জারি করালেন। তাকে দিয়েই কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দিলেন। আর আইয়ূব খানকে প্রধানমন্ত্রী ও মার্শাল ল এডমিনিসট্রেটর নিযুক্ত করালেন। তারপর ২৭ তারিখে মির্যা সাহেবকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করলেন এবং রাতের আঁধারেই উড়োজাহাজে করে বিদেশে পাঠিয়ে দিলেন।

তারপরই তিনি স্বমূর্তিতে আবির্ভূত হলেন। রাজনীতিবিদদের উপর শুরু হয়ে যায় জোর-জুলুম, জেল আর নির্যাতন। সামরিক অধ্যাদেশ জারি করে রাজনীতিবিদদের

বিরুদ্ধে অভিযোগের পর অভিযোগ উত্থাপন করে জোর করে রাজনীতি থেকে অবসর দেয়া হল। পূর্ব বাংলার ৮২ জন নেতাকে রাজনীতিতে অযোগ্য ঘোষণা করা হল। এমনকি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পর্যন্ত সামরিক অধ্যাদেশের শিকার হন। ৩০৩ জন আমলাকে চাকুরী থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়।

১৯৬০ সালের ১৩সেপ্টেম্বর ঢাকার স্পেশাল জজ মওদুদ আহমেদ একটি সাজানো দুর্নীতি মামলায় শেখ মুজিবুর রহমানকে ২ বছর জেল ও পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে ছয় মাস অতিরিক্ত কারাদণ্ড দেয়। পরে অবশ্য সে রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করলে তা বাতিল হয়ে যায়। এরপর আইয়ূব খান পাকিস্তানের জনগণকে এক চমৎকার গণতন্ত্র উপহার দিবেন বলে ঘোষণা দেয়। তার নাম মৌলিক গণতন্ত্র।

১৯৬২ সালের ৩০শে জানুয়ারি আইয়ূব খান রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করে। কারাগারে তার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যায়। ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে তিনি জেনেভা যান। সেখান থেকে বৈরুত আসেন। সে সময় পাকিস্তান গোয়েন্দা বাহিনীর এক লোক ছদ্মনামে বৈরুতে পাঠানো হয়। আর বৈরুতে এক হোটেলের কামরায় একাকী শহীদ সোহরাওয়ার্দী গভীর রাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। তাঁর মৃত্যুর সংবাদে সারা দেশে শোকের ছায়া নেমে আসে। মরদেহ দেশে ফিরিয়ে এনে যথাযোগ্য মর্যাদায় দাফন করা হয়। শহীদ সোহরাওয়ার্দী সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মগ্রহণ করলেও সারা জীবনের সঞ্চয় বলতে তেমন কিছুই ছিল না। ১৩ হাজার টাকার একটি ওভার ড্রাফটই রেখে গিয়েছিলেন।

১৯৬৯ সালের ২৫শে অক্টোবর আইয়ূব খান তথাকথিত মৌলিক গণতন্ত্রের অধ্যাদেশ জারি করেন এবং ১৯৬০ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি এ মৌলিক গণতন্ত্রীদের ভোটে আস্থা ভোটের আয়োজন করে। হ্যাঁ-না ভোটের আয়োজন করে প্রশাসনের সহায়তায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করে জয়ী হন।

আইয়ূবের মৌলিক গণতন্ত্রের ধারা মতে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের পরপরই একটি কনভেনশন আহ্বান করা হয়। ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত এই কনভেনশনে মুসলিম লীগ পুনরুজ্জীবিত করা হয়। কনভেনশন ডেকে জন্ম হল বলে তার নাম রাখা হয় "কনভেনশন মুসলিম লীগ'। এর নেতা হলেন চৌধুরী খালেকুজ্জামান। অপর দিকে সে বৎসরই ২৭ নভেম্বর মুসলিম লীগের কাউন্সিল ডেকে পুনরুজ্জীবিত করা হয় বলে তার নাম রাখা হয় " কাউন্সিল মুসলিম লীগ'। এর নেতা হন খাজা নাজিমুদ্দীন।

মৌলিক গণতন্ত্রীদের ভোটে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন আহ্বান করা হয় ১৯৬২ সালের ৮ জুন। অধিবেশনের উদ্বোধনী দিনেই আইয়ূব খান সামরিক আইন প্রত্যাহার করেন।

জাতীয় পরিষদ নির্বাচনের একদিন আগে ১৯৬২ সালের ২৭ এপ্রিল সাড়ে দশটায় বাঙালী জাতীয়তাবাদের পথিকৃৎ , কৃষক-শ্রমিকের মুক্তিদাতা শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। ২৮ এপ্রিল তাঁকে ঢাকায় সমাহিত করা হয়। সে দিন তাঁর জানাযায় ও দাফনে লাখ লাখ মানুষ শরিক হয়েছিল।

এর পর আসে ৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ। ১৭ দিনের এ যুদ্ধে তাসখন্দ চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার মাধ্যমে শেষ হলেও সার্বিক দৃষ্টিতে তা ছিল পাকিস্তানের পরাজয়। পূর্ব পাকিস্তানকে অরক্ষিত রেখে এ যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল। তাই ৫২ এর ভাষা আন্দোলন, ৫৪ এর নির্বাচন এবং ৬২ এর ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে ৬৫ এর পাক-ভারত যুদ্ধ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের চোখ খুলে দিল। তারা ভাবতে শুরু করল যে,পূর্ব পাকিস্তানকে নিয়ে পশ্চিমাদের কোন মাথা ব্যথা নেই । তাই অনেক ভেবে-চিন্তে ৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান লাহোরে ৬ দফা দাবি উত্থাপন করেন এবং তাতে স্বায়ত্ত শাসনের দাবী করেন।

এরপর থেকেই রাজনৈতিক অঙ্গন ৬ দফা দাবী নিয়েই অগ্রসর হতে থাকে। আর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের উপর আসতে থাকে মিথ্যা অভিযোগ, অপবাদ। শুরু হয় জেল জুলুম আর নির্যাতন-নিপীড়ন। কারাগারে নিক্ষেপ করা হয় শেখ মুজিবুর রহমানকে । দেড় বৎসরেরও অধিক কাল এক নাগাড়ে কারাগারে অন্তরীণ থাকার পর ৬৮ সালের ১৭ জানুয়ারি জেল গেটেই আবার তাকে গ্রেফতার করা হয়। কারণ তিনি আগরতলার মামলার গুরুত্বপূর্ণ আসামী। মূলত আইয়ূব খানের পরিকল্পনা ছিল, এ মামলার মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমানকে দেশদ্রোহী, ভারতের এজেন্ট প্রমাণ করে মৃত্যুদণ্ড দেয়া। পূর্ব পাকিস্তানীদেরকে সশস্ত্র বাহিনী থেকে বিতাড়িত করা আর আওয়ামী লীগকে ধ্বংস করে ৬ দফা আন্দোলনকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়া।

কিন্তু তা আর হল না। চলল আন্দোলনের পর আন্দোলন। মুক্তি পেলেন শেখ মুজিবুর রহমান। আইয়ূবের গদি হল টালমাটাল। গাদ্দাররা সরে পড়ল আইয়ূবের পাশ থেকে। ফলে ৬৮ সালের ২৫ মার্চ সামরিক আইন জারি করে প্রধান সেনাপতি ইয়াহইয়া খানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে ইতিহাসের আস্তকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হন।

আইয়ূব আমলে উলামায়ে কেরাম

১৯৫৮ সালের কথা। আইয়ূব খান ইসলামী রিচার্স সেন্টার প্রতিষ্ঠা করে তার মাধ্যমে মুসলিম পারিবারিক আইন নামে এক অনৈসলামিক আইন জারি করল। সাথে সাথে পাকিস্তানে জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে আমদানি করল।

উলামায়ে কেরাম এর বিরোধিতায় এক বিরাট আন্দোলন সৃষ্টি করল। বিরাট বিরাট সভা , মাহফিল ও মিছিল করে এর প্রতিবাদ করতে লাগল। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃস্থানীয় উলামায়ে কেরামের আন্দোলনে পাকিস্তানের জনগণ আইয়ূবের বিরুদ্ধে ফেটে পড়ল। দিশেহারা আইয়ূব তখন অর্থের লোভ দেখিয়ে এ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে স্তব্ধ করতে চেষ্টা করে। কিন্তু তাতে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে স্বার্থান্বেষী একদল দুনিয়াদার আলেমের সমর্থনে তা বাস্তবায়ন করতে সামর্থ্য হয়।

১৯৬১ সালে ঈদুল ফিতরের সময় আইয়ূব খান হুকুম জারি করল, পাকিস্তানের উভয় প্রদেশে একই সময় ঈদ উৎসব পালন করতে হবে । চাটুকাররা তা বাস্তবায়নে লেগে গেল। পশ্চিম পাকিস্তানের পেশোয়ারে না কোথায় চাঁদ দেখা গেছে। সুতরাং আইয়ূব খান হুকুম দিল, পূর্ব পাকিস্তানেও আগামী কাল ঈদ উৎসব পালন করতে হবে।

কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের হক্কানী উলামায়ে কেরাম তার তীব্র প্রতিবাদ করলেন। হযরত মাওলানা শামছুল হল ফরিদপুরী রহ. তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করে বললেন, আগামীকাল ঈদ হবে না । সকলের উপর রোযা রাখা ফরয। এ ব্যাপারে আমি কোন রাজা-বাদশাহর হুকুম মানব না। মানতে রাজি নই। কারো বুকের পাটায় জোর থাকলে কিতাব-পত্র নিয়ে আসুক। দেখাক কিভাবে শরীয়তের দৃষ্টিতে ঈদ হয়।

গভর্নর সাহেব মাইকে ঈদের ঘোষণা দিলেন। রেডিও-টেলিভিশনে তা প্রচার করা হল। কিন্তু উলামায়ে কেরাম বসে থাকলেন না। তাঁরা এর পাল্টা ব্যবস্থা করলেন। শামছুল হক ফরিদপুরী রহ. এর নেতৃত্বে তাঁরা এগিয়ে এলেন। মাইকে মাইকে ঘোষণা করতে লাগলেন, আগামী কাল রোযা রাখতে হবে। আগামী কাল ঈদ হবে না।

পরদিন দেখা গেল ঈদের ময়দান একেবারে ফাঁকা। কেউ ঈদের নামায পড়তে আসেনি। দু'একজন কৌতূহলী জনতা হাঁটাহাঁটি করছে আর কয়েকজন সরকারী কর্মচারী রোযা রেখে আইয়ূবের রক্ত চক্ষু থেকে বাঁচার জন্য নামাযের অভিনয় করে ঈদের ময়দান থেকে পালাল।

১৯৬৪ সালে শামছুল হক ফরিদপুরী রহ. অসুস্থ হয়ে লাহোরে এক হাসপাতালে ভর্তি হন। এ সুযোগে আইয়ূব খান তিনজন প্রভাবশালী মন্ত্রীর মাধ্যমে ১০ লক্ষ

টাকার একটি চেক দেয়ার চেষ্টা করে। তখন শামছুল হক ফরিদপুরী রহ. বলে পাঠান, টাকা দিয়ে গরু-ছাগল কেনা যায়। মানুষ কেনা যায় না।

১৯৬৫ সালে নির্বাচনের আগে আইয়ূব খান পূর্ব পাকিস্তানে এলেন। উদ্দেশ্য উলামায়ে কেরামের সমর্থন আদায় করা। প্রেসিডেন্ট হাউজে পূর্ব পাকিস্তানের আলেমদের ডাকলেন। হক্কানী উলামায়ে কেরাম তাতে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু শামছুল হক ফরিদপুরী রহ. সবার কথাকে উপেক্ষা করে তাতে যোগ দিলেন। সবাইকে বলে দিলেন, আমি বোবা বুঝদিল নই। দেখি কেমন করে ওরা আমাকে ধোঁকা দেয়।

শামছুল হক ফরিদপুরী রহ. প্রেসিডেন্ট হাউজের সভায় যোগদান করলেন। উদ্বোধনী ভাষণে আইয়ূব খান বললেন, "মাওলানা ছাহেবান, পীর ছাহেবান, হযরত উলামায়ে কেরাম, আমি বিগত পাঁচ বৎসরে ইসলামের অনেক খেদমত করেছি। আগামী নির্বাচনে যদি আপনারা আমাকে সমর্থন করেন। তাহলে ইনশাআল্লাহ আমি ইসলামের জন্য আরো অনেক অনেক কাজ করব। দেখুন বিগত সময়ে আমি ইসলামিয়াতকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক করেছি। আমি কেন্দ্রে ইসলামী রিচার্স ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছি। পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামী একাডেমী প্রতিষ্ঠা করেছি। আরো অনেক কিছু করেছি। আপনারা আমাকে ভোট দিলে আরো অনেক অনেক কিছু করব।

ঠিক তখন সিংহ পুরুষ শামছুল হক ফরিদপুরী রহ. দাঁড়িয়ে গেলেন। কণ্ঠ তাঁর বলিষ্ঠ। কণ্ঠ তাঁর তেজোদৃপ্ত। যেন অগ্নি উদগিরণ করলেন। বললেন, "আপনি ইসলামের জন্য কিছুই করেননি। করেছেন শুধু ইসলামের সাথে এক নম্বরের ধোঁকাবাজি।"

ফিল্ড মার্শাল আইয়ূব খান চোখ লাল করে ফেললেন। বললেন, আপনি কার সামনে কথা বলছেন, খবর আছে ? আমি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট। পাঠানের বাচ্চা পাঠান।

শামছুল হক ফরিদপুরী রহ. এর কণ্ঠ আরো তেজোদৃপ্ত। আরো বলিষ্ঠ। আরো বলিয়ান। বললেন, আপনার খরব আছে কি? আমি মুসলমানের বাচ্চা মুসলমান। আমাকে একা মনে করলে ভুল হবে। দশ কোটি মুসলমান আমার পশ্চাতে দণ্ডায়মান। সাবধানে কথা বলুন।

আইয়ূব খান এবার থমকে গেলেন। একেবারে ভরকে গেলেন। বললেন, আমি কিভাবে ধোঁকাবাজি করলাম ?

শামছুল হক ফরিদপুরী রহ. তখন বললেন, আপনি ইসলামী রিচার্স ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছেন, তা সত্য। কিন্তু তার ডাইরেক্টর বানিয়েছেন নাস্তিক ড. ফজলুর রহমানকে। পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামী একাডেমী প্রতিষ্ঠা করেছেন তা সত্য। কিন্তু তার ডাইরেক্টর বানিয়েছেন আরেক বিতর্কিত ব্যক্তিকে। আপনি অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ইসলামিয়াতকে বাধ্যতামূলক করেছেন। তবে তার জন্য কোন শিক্ষক রাখেননি। এভাবে একাধারে কিছু উদাহরণ পেশ করার পর বললেন, কাজেই ধোঁকাবাজি ছাড়া আর কী করেছেন ?

এভাবে একের পর এক আন্দোলন করে জাতীয় প্রত্যেকটি প্রয়োজনে উলামায়ে কেরাম পাকিস্তানী শাসকদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। বিরাট বিরাট সভা-সমাবেশ করেছেন। ওয়াজ মাহফিলে বক্তব্য রেখেছেন। এসব শীর্ষস্থানীয় আলেমদের আলাদা আলাদা জীবনী গ্রন্থও রয়েছে। যা আমাদের জন্য চিরকাল হিদায়াতের মশাল হয়ে থাকবে। যা আমাদেরকে দৃপ্ত হৃদয়ে সম্মুখে এগিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করবে। তাঁদের কয়েকজনের নাম পত্রস্থ করা হল।

তাঁরা হলেন, হযরত মাওলানা রিয়াছত আলী, সিলেট। হযরত মাওলানা বশির উদ্দীন, শাইখে বাঘা, সিলেট। হযরত মাওলানা আরিফে রব্বানী, মোমেনশাহী। হযরত মাওলানা বুরহানুদ্দীন, গফর গাঁও। হযরত মাওলানা আবুল হাসান, যশোর। হযরত মাওলানা ইদ্রীস, সন্দীপ। হযরত মাওলানা হারুন, শাইখে বাবু নগরী, চট্টগ্রাম। হযরত মাওলানা পীর মুহসিন উদ্দীন দুদু মিয়া, শরীয়তপুর। হযরত মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন, ফেনুয়া, কুমিল্লা। হযরত মাওলানা দৌলত আলী, বালিয়া, মোমেনশাহী প্রমুখ উলামায়ে কেরাম।

আর পশ্চিম পাকিস্তানে শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কেরামের মধ্যে ছিলেন হযরত মাওলানা মুফতী মাহমূদ । হযরত মাওলানা গোলাম গাউস হাজারুবী। হযরত মাওলানা আব্দুল হাকীম শিয়ালকুটী। কারী আজমল খান। হাফেজুল হাদীস হযরত মাওলানা আব্দুল্লাহ দরখাস্তী । প্রমুখ উলামায়ে কেরাম।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ ১৯৬৯ - ১৯৭১ সাল

ইতিহাস সর্বদা আপন গতিতে চলমান। তাই ৫৮ সালের মতই আরেকটি নাটকীয় চিত্র দেখতে পেল পাকিস্তানের জনগণ। ৫৮ এর ৭ অক্টোবর ইস্কান্দার মির্যাকে দিয়ে সামরিক আইন জারি করিয়ে আইয়ূব খান ক্ষমতা হাতিয়ে নিয়েছিল। ঠিক তার দশ বৎসর পর আবার ঠিক একই কাণ্ড ঘটল। ৬৯ এর ২ মার্চ ইয়াহইয়া খান আইয়ূব খানকে দিয়ে সামরিক আইন জারি করিয়ে ক্ষমতা হাতিয়ে নিলো। তবে ৬

দফা আন্দোলন ও স্বায়ত্ত শাসনের আন্দোলনকে স্তব্ধ করার জন্য আইয়ূব খান ইয়াহইয়া খানকে একটি প্রেসক্রিপশন ধরিয়ে দিয়ে গেল। তিনি তার শেষ বক্তৃতায় বললেন,

“বিরাজমান রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে কোন রকম পরিবর্তন দেশের সার্বভৌমত্বের বিরোধী হবে। অর্থাৎ ৬ দফা আন্দোলন কিছুতেই বরদাশত করা হবে না।”

ইয়াহইয়া খান ক্ষমতায় এসে সুবোধ বালকের মতই ঘোষণা করল, ক্ষমতা আঁকড়ে রাখার কোন অভিলাষ আমার নেই। সারা দেশে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তরই আমার একমাত্র লক্ষ্য। তারপর সামরিক বিধিবলে প্রকাশ্য রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ হল। তারপর ১লা জানুয়ারি থেকে প্রকাশ্য রাজনীতির আদেশ জারি করেন এবং ৫ অক্টোবর ও ২২ অক্টোবর নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন।

কিন্তু সবাই যখন নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে ঠিক তখন আগস্ট মাসে দেশ বন্যায় ভেসে গেল। তাই ৭ ও ১৭ ডিসেম্বর নির্বাচনের তারিখ পুনরায় নির্ধারণ করা হল। ইতিমধ্যে ১২ নভেম্বর এক প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে উপকূলবর্তী জেলাগুলো তছনছ হয়ে গেল। লক্ষাধিক লোক মারা গেল। বহু ঘরবাড়ি আর গবাদি পশু ভেসে গেল। কিন্তু পাকিস্তান সরকার তখন নির্বিকার । কোন ধরনের ত্রাণ সামগ্রী পাঠানোর ব্যবস্থা করল না। তাই পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ আবার নতুন করে ভাবতে শুরু করল যে, বিপদে বাঙালীদের দেখার জন্য বাঙালী রাজনৈতিক নেতৃত্ব ছাড়া আর কোন উপায় নেই। তাই আওয়ামী লীগকেই তারা রায় দিল।

নির্বাচন হল। জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ ১৬০ আসন পেল। আর প্রাদেশিক পরিষদে পেল ২৮৮ টি আসন। সমস্ত হিসাব-কিতাব ভুল প্রমাণিত করে আওয়ামী লীগ সমগ্র পাকিস্তানে ৩১৩ আসনের মধ্যে ১৬৭ আসন পেয়ে একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করে সরকার গঠনের যোগ্যতা অর্জন করল।আর ভুট্টোর পিপলস পার্টি পিছিয়ে পড়ল। কায়েমী স্বার্থবাদীরা এতে প্রমাদ গুনল। আর ভুট্টো গিয়ে মিলল ইয়াহইয়া খানের সাথে। শুরু হল ষড়যন্ত্র। ভুট্টো দিশেহারা হয়ে প্রলাপ বকতে শুরু করল।

২০ ডিসেম্বর বলল, পাঞ্জাব ও সিন্ধ পাকিস্তানের দুর্গ বিশেষ। তাই পিপলস পার্টিকে বাদ দিয়ে সংবিধান রচিত হতে পারে না । সরকারও গঠিত হতে পারে না। ২১ ডিসেম্বর বলল, বিগত ২৩ বৎসর পূর্ব পাকিস্তান দেশ গঠনে ন্যায্য হিস্যা পায়নি । তাই বলে আগামী ২৩ বৎসর পাকিস্তানের উপর তারা প্রভুত্ব করবে, তা হতে পারে না।

১১ জানুয়ারি ইয়াহইয়া খান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে বৈঠক করেন। তারপর ১৪ জানুয়ারি মন্তব্য করেন, "শেখ মুজিবুর রহমান হচ্ছেন দেশের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী। তিনি দায়িত্ব গ্রহণের পর আমি আর থাকব না। পাকিস্তানে শেখ মুজিবই সরকার গঠন করবে।" ইতিমধ্যে ভুট্টো আরেক অভিনব প্রস্তাবও দিয়েছিল, তা হল, দুই পাকিস্তানের দুই প্রধানমন্ত্রী হবে।

এভাবে পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত করার জন্য ভুট্টো যেন মরিয়া হয়ে ওঠে। একের পর এক বিবৃতি চলতে থাকে। আর পরিবেশ ঘোলাটে হতে লাগল। ইতিমধ্যে একদিকে ৩ মার্চ ঢাকায় পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের বৈঠক আহবান করা হয়। অপরদিকে ভুট্টো ইয়াহইয়া খানের সাথে বৈঠক করে এক সভায় ঘোষণা দিল, "পশ্চিম পাকিস্তানের কোন সংসদ সদস্য ঢাকার অধিবেশনে যোগদান করলে তাকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হবে। তবুও ৪০ জন সদস্য ঢাকায় আসল। কিন্তু ভুট্টোর হুমকি-ধমকিতে ইয়াহইয়া খান ১লা মার্চই জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য মুলতবি ঘোষণা করল।

ফলে রাজনৈতিক নেতা-কর্মীরা আর পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ রাস্তায় নেমে এল। বিক্ষোভে ফেটে পড়ল। ২ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের বট তলায় ডাকসুর তৎকালীন সহ-সভাপতি অ স ম আব্দুর রব সর্ব প্রথম স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করল।

৩ মার্চ আওয়ামী লীগ দেশব্যাপী হরতালের ঘোষণা দিল। সেদিন ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে স্বাধীন বাংলা ছাত্র পরিষদের জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমান জনতার দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, কল-কারখানা, রেল-স্টিমার, বিমানসহ সব ধরনের যোগাযোগ বন্ধ রাখার নির্দেশ দিলেন। সে দিনের ডাকে বাংলায় অভূতপূর্ব সাড়া পরে গেল। স্বাধীনতার পক্ষে জনমত সুদৃঢ় হল। বেসামরিক শাসনযন্ত্র অচল হয়ে পড়ল।

পশ্চিম পাকিস্তানের অনেকে তখন অনুধাবন করতে লাগল যে, দেশ ক্রমেই অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে। তাই এয়ার মার্শাল আজগর খান, বেলুচিস্তানের ন্যাপের নেতাসহ অনেকে শেখ মুজিবুর রহমানের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের আহ্বান জানাল। তারা ভুট্টোকে পশ্চিম পাকিস্তানের একক নেতা নন বলে ঘোষণা দিল ।

৩ মার্চ ইয়াহইয়া খান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ভুট্টোসহ ১২ জন নেতাকে ১০ই মার্চ পুনরায় গোল টেবিল বৈঠকে বসার আহ্বান করল। কিন্তু বঙ্গবন্ধু তা প্রত্যাহার করলেন।

৬ মার্চ এক বেতার ভাষণে ইয়াহইয়া খান স্থগিত সংসদ অধিবেশন আবার ২৫ মার্চ আহ্বান করলেন । এদিকে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে পূর্ব পাকিস্তান প্রকৃত পক্ষেই অচল হয়ে গেল। ১৫ মার্চ ইয়াহইয়া খান ঢাকায় আসলেন। ১৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনা করলেন। ২২ মার্চ বঙ্গবন্ধু , ইয়াহইয়া ও ভুট্টো তিনজনে বৈঠক করলেন। বৈঠকের পর ভুট্টো সন্তোষ প্রকাশ করলেন।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ বৈঠক আর আলোচনা ছিল আইওয়াশ। কালক্ষেপণের ফন্দি। আর পর্দার অন্তরালে চলছিল পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক অভিযানের পূর্ণ প্রস্তুতি। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিমানে আসছিল সৈন্য। আসছিল গোলা-বারুদ। ২৪ মার্চ পর্যন্ত অনেকের ধারণা ছিল, শেষ পর্যন্ত একটা আপোষ-মীমাংসা হয়েই যাবে। ২৫ মার্চেও ইয়াহইয়া আর ভুট্টো ঢাকায় অবস্থান করছিল।

৭১-এর ২৫ মার্চ ছিল বৃহস্পতিবার। রাজনৈতিক ডামাডোল আর অসহযোগ আন্দোলনে ঢাকা একেবারে ফাঁকা। চারদিকে থমথমে ভাব। নেতাদের মাঝে চাপা উদ্বেগ আর উত্তেজনা। কিন্তু বঙ্গবন্ধু অসাধারণ ধৈর্য ও সংযমের অনন্য প্রতীক। তিনি তখন আর বাঙালী জাতির নেতা নন। গোটা পাকিস্তানের নেতা। পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী। কাজেই তাঁকে ভেবে চিন্তে অগ্রসর হতে হচ্ছে। সতর্কতার সাথে এগুতে হচ্ছে।

শেষ বারের মত কথা শেষ করে ভুট্টো হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল (বর্তমানে রূপসী বাংলা) থেকে দুপুরের আগেই বেরিয়ে পড়লেন। বিকালে সাঁজোয়া বহর নিয়ে ইয়াহইয়া খান ক্যান্টনমেন্টের দিকে চলে গেলেন এবং সন্ধ্যার আগেই পিন্ডিমুখী বিমানে চাপলেন। রাতে পশ্চিম পাকিস্তানে পৌঁছেই টিক্কা খানকে নির্দেশ দিলেন, পূর্ব পাকিস্তানকে কবরস্থান বানিয়ে দাও।

রাত দশটার দিকে শুরু হল ইতিহাসের সেই নাটকীয় বর্বরতম হত্যাযজ্ঞ। ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে এল সেনাবাহিনী। সাথে ট্যাংক, কামান, ভারী অস্ত্রশস্ত্র। ঝাঁপিয়ে পড়ল ঘুমন্ত নগরীর উপর। যাকে যেখানে যেভাবে পেল নির্মমভাবে গুলী করে হত্যা করল। বাঙালী জাতির উপর আক্রমণ করে পাক বাহিনী প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানের ঐক্য আর সংহতির উপর আক্রমণ করল।

শুরু হয়ে গেল যুদ্ধ। মুক্তি যুদ্ধ। ২৩ বৎসরের শোষণ আর অনাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। স্বাধীনতাকামী বাঙালী জাতির রক্তের বন্যায় ভেসে গেল পথঘাট আর বাংলা মায়ের সজীব সবুজ কোমল প্রান্তর। ভারত হাতছানি দিয়ে ডাকল নিপীড়িত আক্রান্ত বাঙালীদেরকে। ট্রেনিং নিলো আক্রান্ত জনতা। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল পাকিস্তানীদের উপর। এরপর শুরু হল প্রতিরোধ লড়াই। ধীরে ধীরে চতুর্দিক থেকে কোণঠাসা হয়ে পড়তে লাগল পাকবাহিনী।

মাত্র ন' মাস আগে যে ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কণ্ঠে বিঘোষিত হয়েছিল, "এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" সেই ঐতিহাসিক রেসকোর্স (সোহরাওয়ারদী) ময়দানেই নব্বই হাজার সদস্যের বিশাল পাকবাহিনী জেনারেল নিয়াজির নেতৃত্বে আত্মসমর্পণ করল। দেশ স্বাধীন হল। পৃথিবীর মানচিত্রে মজলুমদের রক্তে আরেকটি নতুন দেশ অঙ্কিত হল। নাম বাংলাদেশ।

৭১- এর মুক্তিযুদ্ধে আলেমদের অবস্থান

তৎকালীন অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে প্রতীয়মান হয় যে, বাঙলার আলেম সমাজ তখন কোন একক নেতৃত্বাধীন ছিল না, যার নির্দেশে তারা কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিবে। তাছাড়া আওয়ামী লীগেরও এমন কোন মেনুফেস্টু ছিল না যার আলোকে আলেম সমাজ কোন স্থির সিদ্ধান্ত নিতে পারে। অবশ্য তার সময়ও ছিল না, সুযোগও ছিল না। কারণ হঠাৎ করেই যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। আর শেখ মুজিবুর রহমান তো ২৫ মার্চ পর্যন্ত আশাবাদী ছিলেন , কোন একটা ফয়সালা অবশ্যই হবে। ফলে তিনি গোটা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবেন। সরকার গঠন করবেন। তাই তিনি ৭ মার্চের সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বক্তৃতার শেষে বলেছিলেন, জয় বাংলা, জয় পাকিস্তান। তাই পূর্ব পাকিস্তানের আলেমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবস্থানে থেকেই পরিস্থিতির মোকাবেলা করেছিলেন।

১. একদল আলেম নিজেরা সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। তবে তাঁরা অন্যদের যুদ্ধে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করেছেন। উদ্বুদ্ধ করেছেন। তাঁদের প্রত্যয় ছিল, পাকিস্তানীরা জালেম। সুতরাং জালেমদের কিছুতেই সহায়তা করা যাবে না। এদের অধিকাংশই ছিলেন মুরুব্বী শ্রেণীর বর্ষীয়ান আলেম।

২. মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিলেন। যুদ্ধও করেছিলেন। কিছুদিন আগেও এদের সংখ্যা নগণ্য মনে করা হত। কিন্তু তরুণ আলেম, লেখক ও সাংবাদিক শাকের হোসাইন শিবলীর লেখা "আলেম মুক্তিযোদ্ধার খোঁজে " গ্রন্থটি সে ধারণা ভেঙ্গে দিয়েছে। সুতরাং সে অনন্য গ্রন্থের জন্য তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

উপসংহার

স্বাধীনতার পর চল্লিশ বৎসর পেরিয়ে যেতে চলছে। কিন্তু কোথায় আমাদের স্বাধীনতার সার্থকতা? কারা ভোগ করছে স্বাধীনতার সুস্বাদু ফল? কেন আজ হাজারো মুক্তিযোদ্ধার কণ্ঠে আক্ষেপ আর আহাজারি? এ দিকে আজ কারো খেয়াল

নেই। ফিকির নেই। দেশকে উন্নতি আর অগ্রগতির শীর্ষে পৌঁছে দেয়ার কারো কোন চিন্তা নেই। ইসলামী শাসনকে প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন নিয়ে আলেম উলামা, পীর-মাশায়েখ মুসলিম লীগের ব্যানারে একত্রিত হয়েছিল। সোচ্চার হয়েছিল, সে মুসলিম লীগ করল জাতির সাথে বেইমানী। ফলে পাকিস্তান ভেঙ্গে গেল। হল স্বাধীন বাংলাদেশ।

এর ১০ বৎসর পর হঠাৎ ১৯৮১ এর নির্বাচনে বাংলাদেশের রাজনীতির ময়দানে এলেন অতীশিপর বৃদ্ধ হযরত হাফেজ্জী হুজুর রহ.। অনেকটা উল্কার মতই তাঁর আত্মপ্রকাশ। তিনি এসে বাংলার আপামর মুসলিম জনতাকে তওবার আহ্বান করলেন। তওবার রাজনীতিতে উদ্বুদ্ধ করলেন। আল্লাহর নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে পাকিস্তান চেয়েছিলাম সে পাকিস্তান পেয়েও আমরা প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করিনি। তাই এই তওবা। কিন্তু তাতেও আমাদের চেতনা ফিরে আসেনি। আমরা তওবা করলাম না। আমরা যেন ঘুমের ঘোরেই আছি। ধীরে ধীরে অধঃপতনের অতল গহ্বরে হারিয়ে যাচ্ছি।

স্বার্থান্বেষী মুখোশপরা লোকদের বুলিতে বিভোর না হয়ে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টি আর কুরআনের আইন বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে গেলেই আমাদের স্বাধীনতা অর্থবহ হবে। আমরা শির তুলে আবার বিশ্ববাসীর সামনে দাঁড়াতে পারব। আর তা না হলে আমাদের উপর নেমে আসবে আল্লাহর গযব। হয়তো আমাদের এ স্বাধীনতাও হারাতে হবে।

সবশেষে বলতে চাই, আলেম সমাজ সর্বদা ইসলামী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই রাজনীতি করেছেন। করছেন। করবেন। যাঁরা ৭১ এর যুদ্ধে রাজাকার হয়েছিলেন, পাকিস্তানীদের সহায়তা করেছিলেন তাঁরা অবশ্যই একটি আদর্শের পতাকাবাহী ছিলেন। একটি সুন্দর পৃথিবীর কামনায়ই তারা রাজাকার হয়েছিলেন। আর তাদের সংখ্যা ছিল নগণ্য। আর নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে রাজাকার হওয়াই অন্যায় ছিল না। বরং রাজাকার হয়ে অন্যায়, অবিচার, লুটতরাজ আর ব্যভিচার করা অন্যায় অবিচার। আর তাঁদের দ্বারা তার চিন্তাও করা যায় না। আর যারা তা করেছিল স্বাধীনতার পর “জনতার আদালত” কায়েম করে করে মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডাররা প্রত্যেক এলাকায় এলাকায় তাদের বিচার করেছিল। বহু রাজাকারকে তখন বিচার করে হত্যা করেছিল। নির্মম শাস্তি দিয়েছিল। সুতরাং ঢালাওভাবে রাজাকারদের চিত্রিত করা। আলেমবেশী অআলেমদের অন্যায় আর অপরাধের বোঝা আলেমদের উপর চাপিয়ে দেয়া কিছুতেই ঠিক হবে না। তারপরও যদি কেউ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এধরনের অন্যায়-অপরাধ করে থাকে আর জনতার আদালতে তার বিচার না হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই তার বিচার হওয়া চাই। তার বিচার হতে হবে। এতে কারো কোন দ্বিমত নেই। হতে পারে না।

তারপরও যদি কেউ আমাকে বা আমার মত কোন আলেমকে রাজাকার বলে গাল দেয়। টিটকারি দেয়। তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে, তাহলে আমি শির উঁচিয়ে অত্যন্ত দৃপ্ত কণ্ঠে নির্দ্বিধায় বলব, হ্যাঁ ... আমি রাজাকার (স্বেচ্ছাসেবক) তবে আমি আদর্শহীন নই। অন্যায়-অবিচার আর ব্যভিচারী নই। বরং আমি মুক্তিযোদ্ধা রাজাকার। ঐ মুক্তিযোদ্ধা রাজাকার, যে ন্যায়ের পথে জীবন উৎসর্গ করতে সদা তৎপর, সদা প্রস্তুত, সদা ব্যাকুল-অস্থির। আর বাঙালী জাতির জন্য অতন্দ্র প্রহরী।

সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. ভুলে যাওয়া ইতিহাস, এস, এ, সিদ্দীকী
২. আমার কালের কথা, আবদুল গফুর
৩. বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানদের ভূমিকা, সত্যেন সেন
৪. আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, আবুল মনসুর আহমদ
৫. একশ' বছরের রাজনীতি, আবুল আসাদ
৬. রাজনীতির তিন কাল, মিজানুর রহমান চৌধুরী
৭. সমাজ সংস্কার আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী, আব্দুর রাজ্জাক
৮. হাফেজুল হাদীস আব্দুল্লাহ দারখাস্তী রহ. এর জীবন চরিত, মাওলানা তাফাজ্জল হক
৯. চিরঞ্জীব নজরুল, মো. হারুন - অর- রশীদ
১০. ফররুখ আহমদ ব্যক্তি ও কবি, শাহাবুদ্দিন আহমদ সম্পাদিত
১১. বলেছি বলছি বলব, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন
১২. হায়াতে আতহার, মাওলানা শফীকুর রহমান জালালাবাদী
১৩. হযরত মাওলানা ফয়জুর রহমান স্মারক গ্রন্থ
১৪. আমি আল বদর বলছি, কে, এম, আমিনুল হক
১৫. আলেম মুক্তিযোদ্ধার খোঁজে, শাকের হোসাইন শিবলী
১৬. হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী স্মারক গ্রন্থ
১৭. চান্দ আযীম শখছিয়্যাত, হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী
১৮. আমরা যাদের উত্তরসূরি, হাফেয মাওলানা হাবীবুর রহমান

লেখক: মুহাদ্দিস, জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ ঢাকা

মাদরাসাশিক্ষা এই উপমহাদেশকে কী দিয়েছে

মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন

আমাদের সমাজের বোঝা একশ্রেণীর উটকো বুদ্ধিজীবীর আমরণ লড়াই স্বাধীনতার বিরুদ্ধে। কিন্তু অভ্যস্ত ভণ্ডামীর জাত রক্ষার খাতিরে এই দাসত্বের সংগ্রামকেই স্বাধীনতা দেশ জাতি ও পতাকার স্বপক্ষবিপ্লব বলে প্রচার করে এরা এক রকম মিথ্যা তৃপ্তি অনুভব করে। অধিকন্তু স্বাধিকার স্বাধীনতা দেশ জাতি ও নিরাপদ মানচিত্রের পরীক্ষিত মিত্র বরং রক্ষাকবচ পবিত্র ইসলামকে প্রতিপক্ষ হিসাবে বিদ্রূপ করেও এক ধরনের বিকৃত স্বাদ অনুভব করে এই জনবিচ্ছিন্ন উজবক গোষ্ঠী। আমরা যারা মুসলমান, সৌভাগ্যের অপার কল্যবহন আমরা যারা মাদরাসা শিক্ষার স্বর্ণ-সুতোয় গ্রথিত তাদেরকে মনে রাখতে হবে- এই নট-বুদ্ধিজীবীদের মুখ্য টার্গেট হলো ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে এদেশের সাদাদিল মানুষকে বিভ্রান্ত করা। কারণ এরা জানে, এই যে আমাদের দেশ, স্বাধীন মানচিত্র, লাল সবুজের হৃদয়কাড়া পতাকা- এ সবের শেকড়ে প্রথম রক্ত সিঞ্চন করেছেন এদেশের গর্বিত আলেম সমাজ- মাদরাসা শিক্ষিত সাহসী সন্তানরা।

এটা কি কোন লুকিয়ে রাখার কথা, ১৯৫৭ সালে যখন এই উপমহাদেশকে ব্রিটিশরা দখল করে নিয়েছিল যদি পরবর্তীকালের সাহসী বিপ্লবীরা বাঁক ঘুরে না দাঁড়াতো, জীবন বাজি রেখে লড়াই করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মুখ থুবড়ে না ফেলতো, বুকের তপ্ত খুনে যদি রচনা না করতো আজাদির ইতিহাস তাহলে আজ আমরা স্বাধীন মানুষ হিসাবে পৃথিবীর দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারতাম না। বংশানুক্রমিক দাসত্বের রক্ত বহন করে বেড়াতাম আমরা যুগ যুগ ধরে। মূর্খ যুগের অভিশপ্ত ছায়ায় যাপিত হতো আমাদের জীবন। বাংলাদেশী পাকিস্তানী আর ভারতীয় বলে গর্বিত কোন আত্মপরিচয় থাকতো না আমাদের। আমরা হতাম স্বদেশে পরবাসী। কিন্তু আমাদের পরজীবী বুদ্ধিবেচা ঘুঘুরা এই জ্বলন্ত সত্যকেই আড়াল করতে চায়। চেপে রাখতে চায় দাসত্বের শৃঙ্খল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা আমাদের সাহসী অতীতকে। কারণ, ওই অতীতের দিকে ফিরে তাকালে বেরিয়ে পড়বে তাদের আসল রূপ।

আমরা যদি জানতে চাই কাদের পরামর্শে, কাদের নেতৃত্বে, কাদের সাহসিকতায় দানব ইতরদের দাসত্বের দেয়াল ভেঙ্গে নেমে এলাম স্বাধীনতার সাধের প্রাঙ্গণে তাহলে ইতিহাস আমাদেরকে একথাই বলবে- বলবান ইংরেজ শক্তির অমিততেজা রুদ্ররূপে যখন গলে গিয়েছিল মেরুদণ্ডহীন মোগল সম্রাট আর চতুর সতর্ক স্বার্থপর বাবু রবি বঙ্কিমরা যখন হৃদয় বিছিয়ে অভ্যর্থনা করছিল সৌভাগ্যের দেব-দূত বলে

তখন একমাত্র আলেমসমাজই বেঁকে বসেছিলেন ! বলেছিলেন- এদেশ আমাদের ! আমাদের দেশ শাসন করব আমরা। ইংরেজরা বিদেশী ! আমাদেরকে শাসন করার অধিকার তাদের নেই !

অবশ্য একথাও স্মরণ করা প্রয়োজন, ইংরেজরা শাসন ক্ষমতা দখল করার পর তৎকালীন ভারতবাসীর কী অবস্থা হয়েছিল ! আমরা এখানে তার সামান্য উদ্ধৃতি দিচ্ছি- "ব্যারিস্টার মি. ফুলার তার ভারতীয় চাকরকে সামান্য ত্রুটিতে লাথি মেরে হত্যা করেন। ইংরেজ-আদালতে তার জরিমানা হয় মাত্র ৩০ টাকা । ত্রিবাঙ্কুরের দুইজন ইংরেজ নীলকর 'সাহেব' তাদের দুইজন ভারতীয় চাকরকে নিষ্ঠুরভাবে পিটিয়ে মেরে ফেলে দিবালোকে মাটিতে পুঁতে ফেলেন ...। বিচারে মাত্র তিন বছর বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়। কানপুরে এক ইংরেজ অফিসার ভারতীয় শ্রমিককে লাথি মেরে হত্যা করেন। শ্বেতাঙ্গ জজের বিচারে তার মাত্র ২০০ টাকা জরিমানা হয়। ইংরেজ এজেন্টরা ভারতীয় শ্রমিকদের প্রকাশ্যে নির্মমভাবে বেত্রাঘাত করতো অথচ বলতো, নেটিভকে (ভারতীয়কে) বেত্রাঘাত করার অধিকার তাদের আছে, তার জন্য শাস্তি হয় না ...। আসামের চীফ কমিশনার কটন ইংরেজদের অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন নেটিভদের বেত্রাঘাত জখম ও খুন করার। [জাস্টিস আবদুল মওদুদের সূত্রে- চেপে রাখা ইতিহাসঃ ২৬৯ পৃ.]

শুধু জীবনই নয় এ দেশবাসীর ধর্ম-কর্ম পর্যন্ত হয়ে পড়েছিল চরমভাবে আক্রান্ত। এ আর মল্লিক লিখেছেন, ইংরেজের ইঙ্গিতে ফরিদপুরের শিকদার ও ঘোষ পরিবারের দুজন জমিদারও মুসলমান প্রজাদের জন্য ঘোষণা করলেন, মুসলমানরা গরু কুরবানী করতে পারবে না। কালি ও দুর্গা পূজায় কর দিতে বাধ্য থাকবে। দাড়ির উপরও কর বসানো হয় ...। [প্রাগুক্তঃ ২১৬ পৃ.] ... মসজিদ প্রস্তুত করলে প্রত্যেক কাঁচা মসজিদের জন্য পাঁচ শত টাকা ও প্রত্যেক পাকা মসজিদের জন্য এক সহস্র টাকা জমিদার সরকারকে নজর দিতে হবে ...। [প্রাগুক্তঃ ২১২ পৃ.] মজার বিষয় হলো, যেখানে অন্যায়ভাবে বিদেশীর পদাঘাতে একজন নিরীহ স্বদেশী মারা গেলে তার জরিমানা হয় মাত্র ত্রিশ টাকা সেখানে দাড়ি রাখার জন্য বছরে আড়াই টাকা আর গোঁফ ছোট করার অপরাধে পাঁচ সিকা কর দিতে বাধ্য করা হয়। বাধ্য করা হয় নিজের বাপ দাদার মাটিতে মসজিদ নির্মাণের দায়ে পাঁচশ থেকে হাজার টাকা কর দিতে। এ অবস্থায় যখন স্বদেশীরা ফুঁসে ওঠে তখন রানী ভিক্টোরিয়া এক আইন পাশ করলেন, 'ইস্ট ইন্ডিয়া' কোম্পানির বাছাই করা ইংরেজ অফিসারদের নিয়ে গঠিত নতুন কমিটি বিপ্লবী ও বিদ্রোহীদের ফাঁসি, দ্বীপান্তর ও কারাদণ্ড দিতে পারবে। [প্রাগুক্তঃ ২২৪ পৃ.]

এই আইনের পর ভারতবাসীর জন্যে নির্বিচারে জীবন দানের পথে আর কোন বাঁধা রইল না। বরং আরো পরিষ্কার করে দেয়া হয়েছিল, ইংরেজ বিচারপতিরা ভারতীয় প্রত্যেকের বিচার করার অধিকার রাখেন কিন্তু ভারতীয় বিচারপতিরা কোনক্রমেই কোন ইংরেজ আসামীর বিচার করার অধিকার রাখে না।

এ ছিল সোনার ভারতের সাধের ইংরেজ আমল ! তারপর কি হলো? ক্ষুদ্র দাঙ্গার ছুতোয় বাহাদুর ইংরেজ সিপাহীদের মেহেরবানীর নমুনা দেখুন মনি বাগচীর ভাষায়-

'বহু লোকের ফাঁসি হইল, পল্লীতে পল্লীতে নির্মম বেত্রাঘাত বেপরোয়াভাবে চলিল। সারি সারি ফাঁসিকাষ্ঠে বহু নির্দোষ প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। কর্নেল নীলের নির্দেশে ইংরেজ সৈনিক ও কর্মচারীরা কাশীর পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে প্রবেশ করিয়া সেখানকার বহুলোককে রাস্তার দু ধারের গাছে গাছে ফাঁসি দিয়ে লোকের মধ্যে আতংকের সৃষ্টি করিতে লাগিল।' [চেপে রাখা ইতিহাসঃ ২২৪ পৃ.]

কিন্তু ইংরেজদের এই উদার-স্টাইল হত্যা, লুণ্ঠন ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে কারা রুখে দাঁড়ালেন ? এর জবাব জানার আগে প্রসঙ্গটা জেনে নেয়া ভালো- এত জঘন্যতার পরও কারা ইংরেজদের প্রতি ছিল পরম আস্থাশীল বরং ইংরেজ প্রেমে মাতোয়ারা। সেও ইতিহাসের পাতা থেকেই Bengaless address to the Governor General of India, December 1857- এর বরাতে পড়ুন 'ইংরেজ দিল্লী পুনর্দখল করলে ঐ ১৮৫৭ এর অগ্নিবৎসরের ডিসেম্বর মাসে অবিভক্ত বিশাল বঙ্গের ২৫০০ ভাগ্যবান জমিদার ও নামী-দামী হিন্দুর সই করা এক অভিনন্দনপত্র বর্ধমানের মহারাজার নেতৃত্বে তদানীন্তন গভর্নর জেনারেলের নিকট পাঠানো হয়। তাতে লেখা হয় (ইংরেজি থেকে অনুবাদ): অর্থাৎ হে প্রভু ! আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারী রাজা, জমিদার, তালুকদার, ব্যবসায়ী এবং বাংলা মুলুকের অন্যান্য অধিবাসী আপনার সেনাবাহিনী দিল্লী পুনরুদ্ধার করে যে স্মরণীয় সাফল্য লাভ করেছে (যা ব্রিটিশ ভারতে অতুলনীয়) তার প্রতি আমাদের উষ্ণ অভিনন্দন পাঠাবার সত্বর সুযোগ গ্রহণ করছি। আমাদের গভীর সান্ত্বনা যে, আমাদের এই বাংলায় কোন রকম গোলযোগ হয়নি। এমনকি (ইংরেজের প্রতি) সামান্য আনুগত্যহীনতাও হয়নি; বরং জনগণ সে আনুগত্য ও অনুরাগ দেখিয়েছে যা তাদের পূর্বপুরুষরা প্রদর্শন করেছিল। তারা এই উদীয়মান ক্ষমতার প্রতিপত্তিকে সহজ করে তুলতে যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। [প্রাগুক্ত:২৬ ৩ পৃ.]

একই ভাষায় বঙ্কিম বাবুর গুরু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ইংরেজদের দিল্লী দখলে উল্লসিত হয়ে কবিতার ভাষায় লিখলেন-

ভয় নাই আর কিছু ভয় নাই আর

শুভ সমাচার বড় শুভ সমাচার

পুনর্বার হইয়াছে দিল্লী অধিকার। [প্রাগুক্ত]

এবার দেখুন রবি বাবুর মুখ। কলকাতার মুসলমান শ্রমিকরা যখন 'মার মার' বলে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে ফেটে পড়ে, কলকাতার পথে নেমে ইট-পাথর হাতে তখন ইংরেজবন্ধু রবি বাবু ক্ষুব্ধ-মনে লিখেন- 'কিছুদিন হইল একদল ইতর শ্রেণীর অবিবেচক মুসলমান কলিকাতার রাজপথে লোস্ট্রখণ্ড হস্তে উপদ্রবের চেষ্টা করিয়াছিল। তাহার মধ্যে বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, লক্ষ্যটা বিশেষরূপে ইংরেজের প্রতি। তাহাদের যথেষ্ট শাস্তিও হইয়াছিল। ... কেহ বলিল মুসলমানদের বস্তিগুলো একেবারে উড়াইয়া পুড়াইয়া দেয়া যাক.... [রবীন্দ্র রচনাবলী ১০ খণ্ড, পৃ ৮২৮-২৯ এর সূত্রে- চেপে রাখা ইতিহাসঃ ২৯০ পৃ.]

বিষয়টা আরো পরিষ্কার করেছেন বঙ্কিম বাবু তার "আনন্দমঠ" রচনায়। তিনি লিখেছেন- 'মুসলমানের পর ইংরেজ রাজা হইল। হিন্দু প্রজা তাহাতে কথা কহিল না। বরং হিন্দুরাই ডাকিয়া রাজ্যে বসাইল। হিন্দু সিপাহি ইংরেজের হইয়া লড়িল। হিন্দুরা রাজ্য জয় করিয়া ইংরেজকে দিল। কেননা হিন্দুর ইংরাজের উপর ভিন্ন জাতীয় বলিয়া কোন দ্বেষ নাই। আজও ইংরেজের অধীন ভারত বর্ষে (হিন্দু) অত্যন্ত প্রভুভক্ত। [প্রাগুক্তঃ ২৬২ পৃ.]

সুতরাং প্রভুভক্তরা প্রভুদের বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া প্রভুর গোলামীই তো ভৃত্যের সর্বোচ্চ কাঙ্ক্ষিত আরাধ্য। তাই কোন দুঃখে সংগ্রামে যাবে হিন্দু জাতি ! চমৎকার সাহসিক উচ্চারণ। ধন্যবাদ বঙ্কিমবাবু ! প্রশ্ন হলো তাহলে লড়ল কে? ইংরেজ গোষ্ঠীকে প্রভু না ভেবে শত্রু ভাবল কে? কে রুখে দাঁড়াল? অতঃপর স্বাধীন করল ভারত। পথ তৈরি করল আগামী দিনের 'ভারত পাকিস্তান আর সোনার বাংলাদেশ' সৃষ্টির। সে কে ? এর জবাবও সংরক্ষণ করেছে ইতিহাস ! সে কথা বলার আগে শুধু এতটুকু বলে রাখি, আজ যারা শরীরে হিন্দু রবি বঙ্কিম জমিদারী তালুকদারি স্যার খান বাহাদুর প্রভৃতি রক্ত ধারণ করে আবার বড় গলায় কথা বলেন এই বিশাল সবুজ শ্যামল স্বাধীন অঞ্চলে তাদের ভেবে দেখা উচিত, আসলেই তাদের এ অঞ্চলে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর অধিকার আছে কি-না !

মুসলমানগণই যে বিদেশী বেনিয়া জালেম ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথমে রুখে দাঁড়ান সে কথা অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় উল্লেখ করেছেন ইতিহাসবিদ অমলেন্দু দে। তিনি

লিখেছেন- ‘মনে রাখা প্রয়োজন মুসলিম ওহাবীরাই সর্বপ্রথম বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সংঘবদ্ধভাবে ভারতবর্ষ হতে ইংরেজ বিতাড়নের জন্যে দীর্ঘকাল ব্যাপী এক সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়। আর এই ওহাবী আন্দোলন মুসলিম কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার অভিপ্রায়ে মুসলমানদের দ্বারা পরিচালিত ভারতবর্ষে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলে উল্লেখ করা যায়। [বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ ১৩১ পৃ. এর সূত্রে- চেপে রাখা ইতিহাসঃ ২২০ পৃ.] এখানে অমলেন্দু বাবু যদিও আলেম সমাজের স্বাধীনতা বিপ্লবকে ‘ওহাবী আন্দোলন’ বলে বিকৃত করবার ইংরেজি কৌশলটাকে পরিহার করেননি, তবুও তিনি যে স্বাধীনতা বিপ্লবের মূল উৎসটাকে স্বীকার করেছেন সে জন্য ধন্যবাদ। বাবু মনি বাগচীও তার সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাসে লিখেছেন- ‘ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে মুসলমানরাই সর্বাগ্রে বিদ্রোহী হয়। কারণ মুসলমান সৈন্যরা মনে করছিল তাদের ধর্মে হাত দেয়া হচ্ছে।’ [প্রাগুক্তঃ ২২১]

একই আলো-বাতাসে বেড়ে ওঠা হিন্দুরা যখন বিদেশী অত্যাচারী দানব লুটেরাদের ‘প্রভু প্রভু’ বলে জীবন দিচ্ছে তখন কেন মুসলিম জনগোষ্ঠী ‘খেদাও খেদাও’ বলে বিদ্রোহে জ্বলে উঠল- এই প্রশ্ন ওঠাও এখানে স্বাভাবিক ! আর এই প্রশ্নই মুসলিম জাতিসত্তার মূলমন্ত্র। কারণ মুসলমানগণ পৃথিবীর যেখানেই ছিল এবং আছে তারা তাদের ধর্মবিশ্বাসের মর্যাদাসহ ছিল এবং আছে। এও সত্য, ধর্মবিশ্বাসের এই জ্বলন্ত চেরাগ তাদের জীবনে, জীবন পথের বাঁকে বাঁকে ধরে রেখেছেন আলেম সমাজ। অতীতেও, এখনও। স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি।

দিল্লীর হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ.-ই সর্ব প্রথম চিন্তানায়ক যিনি ইংরেজদেরকে ভারত থেকে বিতাড়নের লক্ষ্যে সংগঠনের বীজ বপন করেন। পরবর্তী সময়ে তাঁর স্বর্ণসন্তান হযরত শাহ আব্দুল আযীয রহ. এর ইংরেজবিরোধী ফতোয়াই গণবিস্ফোরণের সৃষ্টি করে। চির উন্নতশির সৈয়দ আহমদ বেরলবী রহ. সকল ভক্ত-মুরীদসহ এ পথেই জীবন বাজি রেখে লড়াই করেন। অবশেষে পান করেন শাহাদাতের কাঙ্ক্ষিত পেয়ালা। এর সত্যতা দি ইন্ডিয়া মুসলমানসঃ ১-২১-এও স্বীকার করা হয়েছে। তাঁর বালাকোট একশন সম্পর্কে বলা হয়েছে; তাদের হামলার হাত শিখ গ্রামগুলোর উপর পড়তে লাগল বটে, কিন্তু বিধর্মী ইংরেজদের উপর আঘাত হানতে পারলেই তারা তীব্র উল্লাস উপভোগ করত। শ্রী রতন লাহিড়ী আরো লিখেছেনঃ ১৮৩১ খৃষ্টাব্দ হযরত আহমদ সাহেব শহীদ হলেও তাঁর সংগঠন ও আন্দোলন কিন্তু শহীদ বা শেষ হয়নি। পরবর্তীকালে তথাকথিত সিপাহী বিদ্রোহ এবং ১৯৪৮ সালের পূর্ব পর্যন্ত যাঁরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন তারা এবং তাঁদের আন্দোলন সৈয়দ আহমদ বেরলবীর অঙ্কুরিত বীজের সফল বৃক্ষ বলা যায়।

ইংরেজ বেঈমানদের বিরুদ্ধে জ্বলে ওঠা পরবর্তী সিপাহী জনতার অগ্নিবিপ্লব বা শাহ ওয়ালী উল্লাহ, শাহ আব্দুল আযীয, সৈয়দ আহমদ বেরলবী ও ইসমাইল শহীদ রহ. সহ সংগ্রামী আলেম সমাজের বিপ্লবের ফসল- সে কথা ইতিহাসবিদ মনি বাগচীও স্বীকার করেছেন। ১৮৫৭ এর সিপাহী বিপ্লবের কৌশল পর্যালোচনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন- '১৮৪৭ সালের ৩১শে মে সারা ভারতে একসঙ্গে বিদ্রোহ বিপ্লব ও আন্দোলনের আগুন জ্বেলে অভ্যুত্থান ঘটানো হবে ঠিক করা হলো। আর সর্বত্র সংবাদ পাঠাবার ব্যবস্থা হলো 'চাপাতি' রুটির মাধ্যমে। ঐ রুটির ভিতরে থাকতো পত্র। সুদক্ষ ব্রিটিশ গুপ্তচরও তা টের পায়নি। মুসলমান ফকির মাওলানাদের এই কৌশলটি তাঁদের সুনিপুণ বুদ্ধির পরিচয় বহন করে। [প্রাগুক্ত ২২২ পৃ.]

এই হল মাদরাসা শিক্ষিত মাওলানাদের অবদান। আজো যারা মাদরাসা শিক্ষার নাম শুনলে লোচন বিস্ফারিত করেন- মাদরাসার ছাত্র দেখলে ভ্রু কুঞ্চিত করেন, যেসব বুদ্ধিবেচা ঘুঘুরা সুযোগ পেলেই মাদরাসাশিক্ষার কোমরে আঘাত হানেন আর লাফিয়ে পড়ে ঠ্যাঙ্গে কামড় খান - তাদের উদ্দেশ্যে বলি, যদি ভারতবর্ষে মাদরাসাশিক্ষার আগমন না হতো, যদি এই মাদরাসাশিক্ষিত আলেম-সমাজ ধূর্ত ব্রিটিশ বেনিয়াদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেতৃত্ব না দিতেন, যদি তাঁরাও তথাকথিত হিন্দু ও শিক্ষিত শ্রেণীর মত স্যার, চৌধুরী , খানবাহাদুর, রায়বাহাদুর, বিদ্যাসাগর, নাইট, বিশ্বকবি, প্রভৃতি খেতাবের কাঙ্গাল হতেন তাহলে হৃদয়হীন ইংরেজ ভল্লুকদের নির্মম অত্যাচারে এদেশ হতো শ্মশান। পদ্মা মেঘনা যমুনা হতো রক্তনদী। গোলামী ও দাসত্ব হতো এ অঞ্চলের অদিবাসীদের স্থায়ী পিতৃপরিচয়। হতো না সিপাহীবিদ্রোহ, বালাকোট বিপ্লব, শামেলীর যুদ্ধ। ৪৭-এ স্বাধীন হতো না ভারত। এ দেশের রাজকুরসির গর্বিত মালিক হতো সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ। আজ যারা না বুঝেই নব্য সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকান দালালদের সুরে মাদরাসাশিক্ষার বিরুদ্ধে কথা বলেন তাদেরকে মনে করিয়ে দিতে চাই- যদি এই মাদরাসা এবং মাদরাসাশিক্ষিতগণ না থাকেন তাহলে অচিরেই অতীতের মতো আবারো এদেশে সাম্রাজ্যবাদের চৌকি পাতবে আধুনিক সাম্রাজ্যবাদীরা। সুতরাং নিজেদের অস্তিত্বের স্বার্থেই মাদরাসাশিক্ষা চাই।

লেখক: মুহাদ্দিস ও শিক্ষাসচিব, জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া তেজগাঁও ঢাকা

নামাযের পর হাত তোলে দু'আ করা : হাদীস কী বলে?

মাওলানা আরীফ উদ্দীন মারূফ

দুআ ইসলামের স্বতন্ত্র ও মৌলিক ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদেরকে দুআ করতে আদেশ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে,

﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾

অর্থাৎ এবং তোমাদের রব বলেন, তোমরা আমার কাছে দুআ করো। আমি অবশ্যই তোমাদের দুআ কবুল করবো। [১]

এই আয়াতের তাফসীরে আল্লামা ইবনে কাসীর র. বলেন, আল্লাহ তায়ালার বিশেষ রহম ও করম এবং বড় মেহেরবানি যে তিনি তাঁর বান্দাদের দুআ করতে আহ্বান করেছেন। আরো মেহেরবানির কথা হলো যে, তিনি বান্দার দুআ কবুল করারও আশ্বাস দিয়েছেন [২]।

যে বান্দা দুআ করে না, রাব্বি রাব্বি বলে প্রার্থনা করে না সেই বান্দাকে আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেন না। তার প্রতি তিনি অসন্তুষ্ট থাকেন। মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত এক হাদীসে আছে, হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে বান্দা আল্লাহ তায়ালার কাছে দুআ করে না তার উপর আল্লাহ তায়ালা অসন্তুষ্ট হোন [৩]।

দুআ কি, দুআ কিভাবে করতে হয়? কখন করতে হয়? বিস্তারিত বিবরণ হাদীসে রাসূলে বিদ্যমান। তথাপি অধুনা কতিপয় টিভি মুফতীগণ দুআ নিয়ে বিশেষ করে ফরজ নামাযের পর সম্মিলিতভাবে হাত তোলে দুআ করা নিয়ে জনমনে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন। অতিশয়তার শিকার তাদের কেউ কেউ তো পরিত্যাজ্য বিদআত বলেও ফাতওয়া প্রদান করছেন। তাই বিষয়টি সম্পর্কে কেবল নবীজীর হাদীসগুলো উপস্থাপন করে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এই প্রয়াস।

ফরজ নামাযের পর দুআ কবুল হয়

হযরত আবু উমামা আল বাহিলী রা. থেকে বর্ণিত। রাসূল সা. কে জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল, কোন দুআ সবচে' বেশী কবুল হয়? উত্তরে তিনি

---

[১] সূরা গাফির: ৬০

[২] তাফসীরে ইবনে কাসীর: ৭/১৩৫

[৩] ইস্তিহবাবুদ দুআ বাদাল ফারাঈয, শাইখ আবদুল হাফীজ মক্কী, পৃ: ১১

বললেন, শেষ রাতে এবং ফরয নামাযের পর যে দুআ করা হয় [৪]। হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী করীম সা. বলেছেন, তুমি প্রত্যেক নামাযের পর হাত তোলে এই দুআ করবে,

اللهم إلَهي وإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإله جبرئيل وميكائيل وإسرافيل:
أسألك أن تستجيب دعوتِي فإنّي مضطر وتعصمنِي فِي دينِي فإنّي مبلتَى
وتنالَنِي برحمتك فإنّي مذنب وتنفي عن الفقر فإنّي متمسكن.

অর্থাৎ- হে আল্লাহ! তুমিই আমার ইলাহ। ওহে ইব্রাহীম, ইসহাক ইয়াকুবের ইলাহ! ওহে জিবরীল মিকাঈল এবং ইসরাফিলের ইলাহ! আমি তোমার কাছে বিনীত নিবেদন করছি। তুমি আমার দুআ কবুল কর। আমি তো বিপদগ্রস্ত। আমার ধর্মের ব্যাপারে তুমি আমাকে হেফাজতে রাখো। আমাকে তোমার রহমত প্রদান কর। আমি তো বড় গুনাহগার। আমার অভাব ও দারিদ্র্যতা দূর কর। কেননা আমি তো মিসকিন অসহায় [৫]।

নামাযের পর দু'আ না করা নবীজী অপছন্দ করতেন

সুনানে আবু দাউদ এবং সুনানে ইবনে মাযাহ শরীফে হযরত মুত্তালিব ইবনে আবী ওদাআহ থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুলাহ সা. বলেন, রাতের নামায দু রাকআতবিশিষ্ট। প্রত্যেক দু রাকআতে তুমি তাশাহহুদ পাঠ করবে। তোমার অসহায়ত্ব মুখাপেক্ষিতা এবং বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করবে এবং দু হাত তোলে এই বলে দুআ করবে- আল্লাহুম্মাগফিরলি (ওগো মাবুদ আমাকে ক্ষমা করে দাও)। যে এরূপ না করবে তার আমল অসম্পূর্ণ হবে [৬]।

---

[৪] সুনানে তিরমিযী, কিতাবুদ দাওয়াত আমালুল ইয়াউমি, ইমাম নাসঈ, পৃঃ (১৮৬-১৮৭), ইস্তিহবাবুদ্দুআ বাদাল ফারাঈয, শাইখ আবদুল হাফীজ মক্কী, পৃ. ৯৭।

[৫] ইবনুস সুন্নি, কিতাবু আমালিল ইয়াউমি ...পৃ. ১২১ (১৩৮)। কোন কোন মুহাদ্দিস হাদীসটিকে যদিও দাঈফ আখ্যা দিয়েছেন কিন্তু এ ক্ষেত্রে তা অবশ্যই আমলযোগ্য। দেখুন, মুখতাছারুত তোহফা আল মারগুবাহ, ছালাছু রাসাঈল ফি ইস্তিহবাবিদ দুআ, শায়খ আবদুল ফাত্তাহ, পৃঃ ১০০, ইস্তিহবাবুদ্দুআ বাদাল ফারাঈয, শাইখ আবদুল হাফীজ মক্কী, পৃ. ১০৫।

[৬] সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুস সালাত, বাবুন ফি ছালাতিন নাহার, সুনানে ইবনে মাযাহ কিতাবু ইকামাতস সালাত বাবু মা যাআ ফি সালাতিল লায়লি অন নাহারী মাছনা। ইমাম তাহাভী তার মুশকিলুল আসার গন্থে হাদীসটির সনদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। (২/২৪-২৬)। অনুরূপভাবে শাইখ থানভী ইলাউস সুনান গ্রন্থে, শাইখ আহমাদ শাকির তার শারহু মুসনাদে আহমাদে এবং ইমাম মুনযিরি তার আত তারগীব ওয়াত তারহীব গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। শাইখ আবদুল ফাত্তাহ র. বলেন, হাদীসটি সম্পর্কে সূচিন্তিত মত

রাসূলুল্লাহ সা. সাধারণভাবে হাত তোলে দুআ করতেন

রাসূল সা. যখন দুআ করতেন তখন সাধারণত দুহাত তোলেই দুআ করতেন। সাহাবায়ে কেরাম রা. থেকে বর্ণিত বহু হাদীসে একথা উল্লেখ আছে। যেমন, আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত খাল্লাদ ইবনে যায়েদ তার পিতা থেকে, হযরত ছাইব ইবনে ইয়াযিদ তার পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন,

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا رفع يديه ومسح وجهه بيديه

অর্থঃ রাসূল সা. যখন দু'আ করতেন তখন হাত তোলে দুআ করতেন এবং শেষে হাত দিয়ে চেহারা মাসাহ করতেন।

তিরমিযী শরীফে হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه فِي الدعاء لَم يَحطهما حتّى يَمسح بِهما وجهه

অর্থাৎ রাসূল সা. যখন দুআতে হাত তুলতেন তখন চেহারা মাসাহ না করে হাত দুটো নামাতেন না [৭]।

কোন কোন হাদীসে নবী করীম সা. দুআ শেষে হাত দ্বারা চেহারা মাসাহ করার হুকুম ও নির্দেশ দিয়েছেন। সুনানে ইবনে মাযাহ শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত রাসূল সা. বলেন, তুমি তোমার দুআ শেষ করে হাত দ্বারা চেহারা মাসাহ করবে [৮]।

উপরে বর্ণিত হাদীস সমূহ থেকে একথা সুপ্রমাণিত হলো যে, নবী কারীম সা. নামাযের পর হাত তোলে দুআ করেছেন এবং তার সাহাবায়ে কেরামকেও হাত তোলে দুআ করতে নির্দেশ প্রদান করেছেন। এ ক্ষেত্রে একাকী এবং জামাতের সাথে নামায পড়ার মাঝে কোন পার্থক্য করা হয়নি।

এখন প্রশ্ন হলো, এই দুই দুআ কি নবী কারীম সা. সুন্নত নামায আদায় করে করতেন নাকি ফরজ নামায শেষ করে সাথে সাথে করতেন?

হলো এই যে, তা অবশ্যই হাসান এবং আমলযোগ্য। দেখুনঃ ছালাছু রাসাঈল ফি ইস্তিহবাবিদ দুআঃ ৩২, টিকা নং ১

[৭] সুনানে তিরমিযী, কিতাবুদ দাওয়াত, বাবু মা জাআ ফি রাফঈল আইদি ইনদাদ দুআ। হাফিজ ইবনে হাজর আস্কালানি হদীসটিকে হাসান বলেছেন। বুলুগুল মারাম, পৃঃ ৪৯৮, বাবুয যিকর ওয়াদ দুআ।

[৮] সুনানে ইবনে মাযাহ কিতাবুদ দুআ, বাবু রাফঈল ইয়াদাইন ফিদ দুআ।

আমাদের জবাব হলো, হাদীস ভাণ্ডার থেকে বুঝা যায় নবীজি সা. সালাম ফিরানোর পরে সুন্নত আদায়ের পূর্বে দুআ করতেন। কেননা কোন কোন হাদীসে ফরয নামাযের পরে এবং সালাম ফিরিয়ে দুআ করতেন বলে সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। তাছাড়া রাসূল সা. সুন্নত ও নফল নামায সাধারণত ঘরে আদায় করতেন এবং সাহাবীদেরকেও সুন্নত ও নফল ঘরে আদায় করতে বলতেন।

সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আব্দুলাহ ইবনে শাক্বীক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يصلي فِي بيتِي قبل الظهر أربعا، ثُم يَخرج فيصلي بالناس الظهر، ثُم يدخل فيصلي ركعتيْن، ثُم يَخرج فيصلي بالناس العصر، ويصلي بالناس الْمغرب، ثُم يدخل فيصلي ركعتيْن، ثُم يَخرج فيصلي بالناس العشاء، فيدخل فِي بيتِي فيصلي ركعتيْن، الحديث ... وفِي آخره وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتيْن ثُم يَخرج فيصلي بالناس صلاة الفجر.

অর্থাৎ আমি হযরত আয়েশা রা. কে রাসূলের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। উত্তরে তিনি বলেন, তিনি আমার ঘরে জোহরের পূর্বে চার রাকআত সুন্নত আদায় করতেন। এরপর ঘর হতে বের হতেন এবং উপস্থিত মুসলিমদের নিয়ে জোহরের ফরয নামায আদায় করতেন। ঘরে প্রবেশ করে আবার দু রাকআত সুন্নত আদায় করতেন। আছরের সময় ঘর হতে বের হতেন এবং উপস্থিত লোকদের নিয়ে আছরের ফরয আদায় করতেন। এভাবে মাগরিবের নামায আদায় করে ঘরে প্রবেশ করতেন। এরপর দু রাকআত সুন্নত আদায় করতেন। এরপর এশার ফরয নামায আদায় করতেন। এরপর ঘরে এসে দু রাকআত এশার সুন্নত আদায় করতেন [৯]।

সুনানে ইবনে মাযাহ শরীফে হযরত আব্দুলাহ ইবনে সাদ আল আনছারী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيّهما أفضل الصلاة فِي البيت أو الصلاة فِي الْمسجد، قال: لأن أصلي فِي بيتِي أحب إلَي من أن أصلي فِي المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة ...

[৯] সহীহ মুসলিম, সুনান আর রাতিবাহ কাবলাল ফারাইয ওয়া বাদাহুন্না; সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুছছালাত বাবু তাফারিঈ আবওয়াবিত তাতাওয়ী ও রাকআতিস সুন্নাহ।

অর্থাৎ আমি রাসূল সা. কে জিজ্ঞাসা করলাম, সুন্নত এবং নফল নামায ঘরে পড়া বেশী উত্তম নাকি মসজিদে? উত্তরে তিনি বললেন, সুন্নত এবং নফল মসজিদের চাইতে ঘরে আদায় করা আমার কাছে বেশী পছন্দনীয়। তবে ফরয নামায হলে ভিন্ন কথা [১০]।

যাইদ ইবনু ছাবিত রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন, সর্বোত্তম নামায হলো ব্যক্তি যা ঘরে আদায় করে। তবে ফরয নামাযের কথা ভিন্ন [১১]।

উক্ত হাদীসগুলো থেকে একথা সুপ্রমাণিত হলো, রাসূল সা. সুন্নত ও নফল নামায সাধারণত ঘরেই আদায় করতেন এবং পূর্বে বর্ণিত হাত তোলে দুআ করার যে সমস্ত হাদীস তা ফরয নামাযের পরে ছিলো। কেননা তা যদি ঘরে একাকী নামাযের মাঝে হতো তাহলে সাহাবীদের জন্যে তা শুনা ও মুখস্থ করা সম্ভব হতো না। তাইতো মুহাদ্দিসীনে কেরাম হাত তোলে দুআ করার হাদীসগুলোকে মুতাওয়াতির বলে আখ্যা দিয়েছেন [১২]।

ইমাম জাফর সাদেক রহ. বলেন, নফল নামাযের পর দুআ করার চাইতে ফরয নামাযের পর দুআ করার শ্রেষ্ঠত্ব যেমন নফল নামাযের উপর ফরজ নামাযের শ্রেষ্ঠত্ব [১৩]।

আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাযাহ, সহীহ ইবনে হিব্বান এবং মুসতাদরাকে হাকিমে হযরত সালমান রা. থেকে বর্ণিত। রাসূল সা. বলেন,

إن الله حيي كريْم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتيْن

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা বড় লজ্জাশীল, দয়াবান। বান্দা যখন দুহাত তোলে তাঁর কাছে দুআ করে তখন তিনি ব্যর্থ ও শূন্য হাতে তাকে ফিরিয়ে দিতে লজ্জা বোধ করেন [১৪]।

---

[১০] সুনানে ইবনু মাযাহ, কিতাবু ইকামাতিছ ছালাহ, বাবু মাযা আ ফিত তাতাওয়ি ফিল বাইত। ইবনে মাযাহ শরীফের ব্যাখ্যাকার আল্লামা বুছিরি হাদীসটির সনদ ছহীহ বলেছেন, ইমাম ইবনে হিব্বান তার ছহীহ গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

[১১] ছহীহ বুখারি, কিতাবুল আযান, বাবু ছালাতিল লাইল। ছহীহ মুসলিম, কিতাবু ছালাতিল মুসফিরিন, বাবু ইসতিহবাবি সালাতিন না ফিলাহ ফি বাইতিহি।

[১২] তাদরিবুর রাভী, হাফিজ জালাল সুয়ূতিঃ (২/১৮০)। আলোচ্য মাসআলাটির উপর তার স্বতন্ত্র একটি গ্রন্থ আছে। নাম হলো- ফাদ্দুল ভিআ ফি আহাদিসি রাফঈল ইয়াদাইন ফিদ দুআ।

[১৩] তাবারি। ছালাছু রাসাঈল, ২য় রিসালাহ, পৃঃ ৭০।

[১৪] আবু দাউদ, কিতাবুছছালাহ, বাবুদ দুআ। সুনানে তিরমিযি, কিতাবুদদাওয়াত, বাব নং (১১৮)। সুনানে ইবনে মাযাহ, কিতাবুদ দুআ, বাবু রফয়ে ইদাইন ফিদ দু'আ। ছহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস নং (১১৮)। সুনানে ইবনে মাযাহ, কিতাবুদ দুআ, বাবু রফয়ে ইদাইন ফিদ দুআ। ছহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস নং

রাসূল সা. হাত তোলে দুআ করতে নির্দেশ দিয়েছেন

আবু দাউদ শরীফে হযরত মালিক ইবনে ইয়াসার থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন-

إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها

অর্থাৎ তোমরা যখন আল্লাহ্ তায়ালার কাছে কিছু প্রার্থনা করবে তখন হাতের তালু উঠিয়ে চাইবে। তোমরা তাঁর কাছে হাতের পৃষ্ঠদেশ উঠিয়ে চাইবে না [১৫]।

কোন কোন হাদীসে তিনি ফরয নামাযের পরও হাত তোলে দুআ করতে নির্দেশ প্রদান করেছেন। হযরত আবু মূসা রা. থেকে বর্ণিত আছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

من كانت له إلَى الله حاجة فليدع بِها دبر صلاة مفروضة

অর্থাৎ আল্লাহ্ তায়ালার কাছে যার কোন প্রয়োজন থাকে সে যেন প্রত্যেক ফরয নামাযের পর সে বিষয়ে দুআ করে [১৬]।

হাত তোলে দুআ করলে দুআ কবুল হয়

মুযামে তাবরানীতে হযরত সালমান রা. থেকে বর্ণিত আছে রাসূল সা. বলেন,

ما رفع قوم أكفهم إلَى الله تعالَى يسألونه شيئا إلا كان حقا على الله أن يضع فِي أيديهم الذي سألوا

অর্থাৎ কতিপয় বান্দা কোন কিছু চাওয়ার উদ্দেশ্যে যখন মহান আল্লাহর কাছে হাত তোলে দুআ করে তখন তাদের প্রার্থিত বস্তু তাদের হাতে দিয়ে দেওয়া আল্লাহর উপর অবধারিত হয়ে যায় [১৭]।

(২৯৯৯)। মুসতাদরাকে হাকিম: (১/৫৩৫)। ইমাম তিরমিযি হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। আল্লামা হাকিম হাদীসটিকে ইমাম বুখারি ও মুসলিমের শর্তানুসারে ছহীহ বলেছেন। হাফিজ ইবনে হাজার আস্কালানি হাদীসটির সনদ উত্তম বলে মত প্রকাশ করেছেন। দেখুন, ফাতহুল বারি: (১১/১৪৩)।

[১৫] সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুছছালাত, বাবুদ দুআ। ইমাম আবু দাউদ হাদীসটি বর্ণনা করে কোন মন্তব্য করেননি। উলামায়ে কেরাম বলেছেন, হাদীসটির সনদ নির্ভরযোগ্য। হযরত আবু বাকরা রা. সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। আল্লামা নূরুদ্দীন হায়ছামি তার মাজমাউয যাওয়ায়িদ গ্রন্থে হাদীসটি র্বননা করেছেন। (১০/১৬৯)।

[১৬] কানযল উম্মাল, শাইখ আলী মুত্তাকী আল হিন্দী, ইস্তিহবাবুদ্দুআ বাদাল ফারাঈয, শাইখ আবদুল হাফীজ মক্কী, পৃ. (৯৬)।

[১৭] তাবারানী, মুযামেকাবীর, হাদীস নং (৬১৪২) আল্লামা নুরুদ্দীন হাইছামী হাদীসটির বর্ণনাকারিগনকে সহীহ আখ্যা দিয়েছেন। মাযমাউয যাওয়ায়েদ: ১০/১৬৯)।

হাকীম তিরমিযী হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূল সা. বলেন,

يقول الله تعالَى: إنّي لأجدنِي أستحيي من عبدي، يرفع يديه إلَي ثُم أردهما، قالت الملائكة: إلهنا! ليس لذلك بأهل، قال الله تعالَى: لكنِي أهل التقوى وأهل الْمغفرة، أُشهدكم أنّي قد غفرتُ له.

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমার বান্দা যখন আমার কাছে হাত তোলে দুআ করে আমি তা ফিরেয়ে দিতে লজ্জা বোধ করি। ফেরেশতাগণ বললেন, হে আমাদের ইলাহ! সে তো এর যোগ্য নয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, কিন্তু আমিই তো ভয় করার হকদার এবং ক্ষমা করার মালিক। শুনো, তোমাদের সাক্ষী রেখে বলছি, আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি [১৮]।

সুনানে তিরমিযীতে হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন,

ما من عبد يرفع يديه حتّى يبدو إبطه يسأل الله تعالَى مسألة إلا أتاها إياه ما لَم يعجل، فيقول: سألت فلم أعط شيئا.

অর্থাৎ বান্দা যখন এভাবে দুহাত তোলে যে তার বগলদেশ প্রকাশিত হয়ে যায় এবং আল্লাহ তায়ালার কাছে কোন কিছু প্রার্থনা করে অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাকে তা প্রদান করেন। যদি সে তাড়াহুড়া না করে। অর্থাৎ এ কথা বলা যে, দুআ করেছি কিন্তু আমাকে কিছুই প্রদান করা হলো না [১৯]।

রাসূল সা. হাত তোলে দুআ করতেন

ইমাম বুখারী রহ. হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা রাসূল সা. কে দুহাত তোলে দুআ করতে দেখেছেন [২০]।

মুছান্নাফে আব্দুর রাযযাকে হযরত ইবনে শিহাব যুহরীর সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন-

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند صدره في الدعاء ثُم يَمسح بِهما وجهه.

---

[১৮] নাওয়াদিরুল উছুল পৃ: ২৩২। ছালাছু রাসাঈল, শাইখ অবু গুদ্দাহ র. পৃ: ৭৭, টিকা নং: ৪।

[১৯] সুনানে তিরমিযী, কিতাবুদ দাওয়াত, বাব নং (১৫)।

[২০] আল আদাবুল মুফরাদ, ইমাম বুখারি, হাদীস নং (৬১৩), বাবু রফঈল আইদী ফিদ দুআ। হাফেজ ইবনে হাযার আস্কালানী হাদীসটির সনদ ছহীহ বলেছেন। ফতহুল বারী, কিতাবুদ দাওয়াত, বাবু রফঈল আইদী ফিদ দুআ।

অর্থাৎ রাসূল সা. দুআ করার সময় বুক পর্যন্ত দু হাত তুলতেন। দুআ শেষ হলে চেহারাতে হাত বুলাতেন [২১]।

বুখারী শরীফে হযরত আবু মূসা আশআরী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সা. তাঁর দুহাত তোলে দুআ করেছেন। আর তখন আমি তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখতে পেয়েছি [২২]।

ইমাম বুখারী হযরত আয়েশা রা থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা রা. বলেন, এক রাতে রাসূল সা. ঘর হতে বের হয়ে গেলেন। আমি তার পেছনে বারিরাহকে পাঠালাম। তিনি কোথায় যাচ্ছেন তা দেখার জন্য রাসূল সা. বাক্বীর দিকে গেলেন এবং কাছাকাছি দাঁড়িয়ে হাত তোলে দুআ করলেন। এরপর ফিরে এলেন। বারিরাহও ফিরে এলো এবং আমাকে তা জানালো। সকালে আমি রাসূল সা. কে জিজ্ঞাসা করলাম, হে রাসূল! আজ রাতে আপনি ঘর হতে কোথায় বেরিয়ে গিয়েছিলেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমাকে আল্লাহর তরফ থেকে বাক্বীর কবরবাসীদের উদ্দেশ্যে দুআ করার জন্য পাঠানো হয়েছিল [২৩]।

সুনানে তিরমিযী, নাসাঈ এবং মুসতাদরাকে হাকিমে হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সা. এর উপর যখন ওহী নাযিল হতো তখন আমরা তাঁর চেহারা মোবারক থেকে মৌমাছির গুঞ্জন ধ্বনির মত শুনতে পেতাম। একদিন তাঁর কাছে ওহী নাযিল হলো। আমরা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। এরপর নবীজি সা. কেবলামুখী হলেন এবং তাঁর হাত তোলে এভাবে দুআ করলেন,

اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تُهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثرنا علينا وارض عنا وأرضنا ثُم قال: لقد أنزل علي عشر آيات من أقامهن دخل الْجنة، ثُم قرأ: قد أفلح الْمؤمنون حتّى ختَم عشر آيات .

অর্থাৎ ওগো আল্লাহ! তুমি আমাদের নেয়ামত বাড়িয়ে দাও, হ্রাস করো না। তুমি আমাদেরকে সম্মানিত কর, লজ্জিত করো না। আমাদেরকে দান করো, মাহরূম করো না। আমাদেরকে প্রাধান্য দাও। আমাদের বিরুদ্ধে অন্যকে প্রাধান্য দিয়ো না। আমাদের প্রতি তুমি সন্তুষ্ট হয়ে যাও। আমাদেরকেও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট করে দাও।

---

[২১] মুছান্নাফে আবদুর রায্যাক: (২/২৪৭)।

[২২] ছহীহ বুখারী, কিতাবুদ দাওয়াত, বাবুদ দুআ ইনদাল ওযু।

[২৩] বুখারী, কুররাতুল আইনায়ন ফি রাফইল ইয়াদাইন, হাদীস নং (৮৮)।

এরপর বললেন, আজ আমার উপর এমন দশটি আয়াত নাযিল করা হয়েছে যে তা পালন করবে অবশ্যই সে জান্নাতে দাখিল হবে। এরপর তিনি ক্বাদ আফলাহাল মুমিনুন থেকে দশটি আয়াত পাঠ করে শোনালেন [২৪]।

মুসনাদে আবু ইয়ালা শরীফে হযরত বারা ইবনে আযিব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

كان رسول اللّٰه صلى الله عليه وسلم: إذا أصابته شدة فدعا، رفع يديه حتّى يُرى بياض إبطيه

অর্থাৎ রাসূল সা. যখন কোন মসিবত ও পেরেশানিতে আক্রান্ত হতেন তখন তিনি হাত তোলে দুআ করতেন। এমনকি তাঁর বগলের শুভ্রতা পরিলক্ষিত হতো [২৫]।

মুযামে তাবারানীতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সা. যখন দুআ করতেন তখন হাতের তালুকে চেহারার দিকে রাখতেন [২৬]।

রাসূল সা. সম্মিলিতভাবে হাত তোলে দুআ করতেন

মুসনাদে আহমাদে হযরত ইয়ালা ইবনে শাদ্দাদ তার পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন, একদিন আমরা নবী করীম সা. এর সামনে হাযির ছিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে আহলে কিতাবের কেউ আছে কি? আমরা বললাম না, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি দরজা বন্ধ করতে নির্দেশ দিলেন। বললেন, তোমরা সকলে তোমাদের হাত তোলো এবং বলো, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আমরা কিছু সময় আমাদের হাত তোলে রাখলাম। এরপর নবীজি বললেন, ইয়া এলাহি! তুমি তো এই কালিমা দিয়েই আমাকে পাঠিয়েছো। এই কালিমার উপর জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দান করেছো। তুমি তো প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করো না। এরপর বললেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো তোমাদের সকলকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে [২৭]।

---

[২৪] তিরমিযী কিতাবুত তাফসির, সূরা মুমিনুন, সুনানে নাসাঈ, কিতাবুল বিতর, বাবু রফয়ে ইদাইন ফিদ দুআ, মুসতাদরাকে হাকিমঃ ১/৫৩৫ ইমাম হাকেম হাদীসটির সনদ ছহিহ বলেছেন)

[২৫] মুসনাদে আবু ইয়ালা, ফাদদুল ভিআ, ইমাম সুয়ূতী পৃঃ(৮১)।

[২৬] মুজামে তাবারানি কাবীর, (১২২৩৪) (আহাদীসু সাইদ আন ইবনে আব্বাস)।

[২৭] মুসনাদে আহমাদ (৪/১২৪)। আল্লামা হাফেজ মুনজিরি হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। আত তারগীব ওয়াত তারহীবঃ (২/৪১৫)। কিতাবুয যিকর ওয়াদ দুআ, বাবুত তারগীব ফি কওলি লা ইলাহা ইল্লালাহ।

রাসূল সা. ফরয নামাযের পরও হাত তোলে দুআ করতেন

মুযামে তাবারানীতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সা. নামায শেষ করেই হাত তোলে দুআ করতেন [২৮]।

মুসতাদরাকে হাকিমে হযরত হাবীব ইবনে মাসলামা আল ফিহরি থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,

سَمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يَجتمع قوم مسلمون يدعو بعضهم ويؤمن بعضهم إلا استجاب الله تعالَى دعاءهم.

আমি রাসূল সা. কে বলতে শুনেছি, কতিপয় মুসলিম বান্দা একত্রিত হয়ে যখন তাদের একজন দুআ করে এবং বাকিরা তার দুআর উপর আমীন আমীন বলে, তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের সকলের দুআকে কবুল করে নেন [২৯]।

এই হাদীস থেকে সম্মিলিতভাবে দুআ করার কথা যেমন বুঝা যাচ্ছে সাথে আল্লাহ তায়ালা সেই দুআ বিশেষভাবে কবুল করেন তাও প্রতীয়মান হচ্ছে।

হাফেয ইবনে কাসীর বর্ণনা করেন, হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন,

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه بعدما سلم وهو مستقبل القبلة فقال: اللهم خلص الوليد بن الوليد وعياش بن ربيعة وسلمة بن هشام وضعفة المسلميْن الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا من أيدي الكفار.

রাসূল সা. নামাযে সালাম ফিরানোর পর কেবলামুখী হয়ে হাত তোলে দুআ করেছেন। একদিন তিনি এই বলে দুআ করেছেন হে আল্লাহ! তুমি ওয়ালিদ ইবনে ওয়ালিদ, আইয়াশ ইবনে রাবিআহ, সালামাহ ইবনে হিশাম এবং সে সকল দুর্বল মুসলমাদেরকে কাফেরদের হাত থেকে উদ্ধার করো যারা কোন উপায় অবলম্বন করতে পারে না এবং কোন পথও পায় না [৩০]।

---

[২৮] আল্লামা নুরুদ্দীন হাইছামী হাদীসটির বর্ণনাকারীগণকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। মাযমাউয যাওয়ায়েদ (১০/১৬৯)

[২৯] মুসতাদরাকে হাকিম, (৩/৩৪৭)। ইমাম হাকিম বলেন, হাদীসটি ইমাম মুসলিমের শর্তানুসারে ছহীহ।

[৩০] তাফসিরে ইবনে কাসির, সূরা নিসা, আয়াত নং (১০০)। এই হাদীসের সকল রাভী বা বর্ণনাকারী অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য। তবে আলি ইবনে জুদআন নামে একজন রাভি আছেন যাকে কোন কোন মুহাদ্দিস স্মৃতিশক্তির দিক থেকে দূর্বল আখ্যা দিয়েছেন। অথচ ইমাম বুখারি, ইমাম মুসলিম, ইমাম নাসাঈ, ইমাম তিরমিযী, ইমাম আবু দাউদ এবং ইমাম ইবনে মাযাহ র. এর মতো মুহাদ্দিসগন তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন, ছালাছু রাসাঈল ফি ইস্তিহবাবিদ দুআ, শাইখ আবু গুদ্দাহ র.

উপরিউক্ত হাদীস শরীফের আলোকে প্রখ্যাত ইমামগণ ফরজ নামাযের পর হাত তোলে দুআ করাকে বিদআত বলা তো দূরের কথা; বরং তারা উত্তম ও মুস্তাহাব বলে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছেন। হানাফী ইমামগণ ছাড়াও ইমাম শাফেয়ী, ইমাম নববী, মালিক ইবনে রূশদ, মোহাম্মাদ ইবনে কোদামা, এবং ইবনু মুফলিহ- এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য [৩১]।

সারকথা

আরব বিশ্বের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও গবেষক শাইখ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ র. বলেন, এ ব্যাপারে সারকথা হলো, যে দু'আতে আল্লাহ তায়ালার কাছে বিভিন্ন হাজত ও প্রয়োজন প্রার্থনা করা হয় সে সমস্ত দুআতে হাত তোলা মুস্তাহাব। এটা কোন সময় বা অবস্থার সাথে সীমাবদ্ধ নয়।

আর নবী কারীম সা. থেকে বর্ণিত যিকর আযকার ও দুআসমূহ পাঠ করার সময় হাত তুলবে কি না সেসব ক্ষেত্রে কথা হলো, যেখানে হাদীসে নবীজির হাত তোলার কথা প্রমাণিত সেক্ষেত্রে হাত তুলে দুআ করা মুস্তাহাব বলে বিবেচিত হবে। উদাহরণ স্বরূপ কাবা ঘর দেখে দুআ করা, ছাফা পর্বতে দাঁড়িয়ে দুআ করা, কঙ্কর নিক্ষেপের সময় দুআ করা এবং আরাফার ময়দানে দুআ করা। এ সমস্ত জায়গায় নবীজী হাত তোলে দু'আ করেছেন। তাই আমাদের জন্যও হাত তুলে দুআ করা মুস্তাহাব হবে। এছাড়া যে সমস্ত জিকির আযকার হাদীস-কুরআনে বর্ণিত আছে তা পাঠ করার সময় হাত ওঠাবে না [৩২]।

উপরিউক্ত হাদীস শরীফ এবং ইমামগণের বাণীর আলোকে আমরা দ্ব্যর্থহীনভাবে এই সিদ্ধান্ত প্রদান করতে পারি যে, ফরজ নামাযের পর হাত তুলে দুআ করা সুন্নাহ সমর্থিত একটি আদব ও উত্তম কাজ। এর সাথে যেমন কোন সময়ের সীমাবদ্ধতা নেই অবস্থারও শর্ত নেই। ফরজ নামাযের পর যেমন জায়েয অন্য সময়েও জায়েয। একাকী যেমন জায়েয সম্মিলিতভাবেও জায়েয [৩৩]।

---

(১৩৫), ইস্তিহবাবু রাফঈল ইয়াদায়ন বাদাল ফারাঈয, শাইখ আবদুল হাফীজ মক্কী, আলী ইবনে জুদআন সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন, তাহযীবুত তাহযীবঃ (৭/৩২৩)।

[৩১] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুনঃ ইস্তিহবাবুদ দুআ বাদাল ফারাঈয, শাইখ আবদুল হাফীয মক্কী (১১২)।

[৩২] ছালাছু রাসাঈল ফি ইস্তিহবাবিদ দুআঃ ৫৫।

[৩৩] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, ইস্তিহবাবু রাফঈল ইয়াদায়ন বাদাল ফারাঈয, শাইখ আবদুল হাফীজ মক্কী। ছালাছু রাসাঈ ফি ইস্তিহবাবিদ দুআ ওয়া রাফঈল ইয়াদাইন ফিহি বাদাছ ছালাওয়াতিল মাকতূবাহ, শাঈখ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ র.। তুহফাতুল আহওয়াযি, শাইখ আবদুর রাহমান মোবারকপুরী। ২/৫৯, বাবু মা ইয়াকুলু ইযা সাল্লামা মিনাছ ছালাত, মাআরিফুস সুনান, আল্লামা ইউসুফ বানোরী র. ৩/১১৮

ইতিহাস ঐতিহ্যের আলোকে কওমী মাদরাসা শিক্ষা

জুবাইর আহমদ আশরাফ

ইসলাম আল্লাহ তায়ালা মনোনীত সর্বশেষ জীবন বিধান বা পুর্ণাঙ্গ দ্বীন। সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সা. এর প্রতি নাযিলকৃত কুরআন মাজীদে এ দ্বীন বিধৃত হয়েছে। কুরআন মাজীদের বিধান সম্বলিত শেষ আয়াতে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে,

﴿ ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗا ﴾

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং একমাত্র ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম।' [মায়িদা : ৩]

রাসূল সা. তাঁর বিদায়ী হজ্জের ভাষণে এ আয়াত পাঠ করে সকলকে অবহিত করেন। সুতরাং ইসলামই কেয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মানবজাতির জন্য একমাত্র জীবন-বিধান ও জীবন-দর্শন। অতএব এ জীবন বিধান কেয়ামত পর্যন্ত টিকিয়ে রাখার দায়িত্বও আল্লাহ পাকেরই। তিনি কুরআন মাজীদে এ কথা ঘোষণা দিয়ে এরশাদ করেছেন,

﴿ إِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا ٱلذِّكۡرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ﴾

'আমি এ কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক।' [হিজর : ৯]

হযরত মুহাম্মদ সা. সর্বশেষ নবী। তাঁর পর আর কোনো নবীর আগমন ঘটবে না। অপর দিকে পৃথিবী সদা পরিবর্তনশীল। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে নিত্য নতুন পরিবর্তন, সমস্যা ও জটিলতা সামনে আসবে। এসব সংকটকালে মানবজাতিকে সঠিকভাবে পথ-নির্দেশ করবেন শেষ নবীর সুযোগ্য ওয়ারিশ হক্কানী ওলামায়ে কেরাম। এ সকল ওয়ারিশে নবীর মধ্যে যারা বৃহত্তর পরিসরে বিশাল খেদমত আঞ্জাম দেন, যাদের অক্ষয় কীর্তির ফলাফল হয় সর্বব্যাপী ও সুদূর প্রসারী, তাদেরকেই বলা হয় মুজাদ্দিদ বা মহান সংস্কারক।

মুসলিম জাতির সুদীর্ঘ ইতিহাসে কালে কালে বহু মুজাদ্দিদের আবির্ভাব ঘটেছে। তাদের যুগপ্লাবী কীর্তি পাথরে খোদাই করা নকশার মত অক্ষয় হয়ে আছে। তাদের সুদূর প্রসারী ইসলাহী খেদমতের সুফল দেশ-কালের সীমানা অতিক্রম করেছে। ফলে শুধু মুসলিম জাতিই নয়, বরং গোটা মানবসমাজ লাভবান হয়েছে।

হযরত মুহাম্মদ সা. এর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সাহাবায়ে কেরাম এবং তাঁদের সঙ্গে যুক্ত সোনালী যুগের আদর্শ প্রজন্ম শেষ হওয়ার পর নতুন যুগ ও নতুন সমাজের সূচনা হয়। মুসলিম সৈনিকদের সাহসী অভিযানের ফলে দেশের পর দেশ জয় হতে থাকে। ক্রমে বাড়তে থাকে নও মুসলিমের সংখ্যা। সমাজ ও জাতির এ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নানা সমস্যা ও সংকটের উদ্ভব হয়। এহেন জাতীয় সংকটকালে সংস্কারমূলক কীর্তি আঞ্জাম দেন হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয রহ.। এভাবে যুগে যুগে বহু সংস্কারকের আবির্ভাব ঘটে। যাদের আল্লাহ প্রদত্ত মেধা, প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা ও কর্মকৌশলের ফলে মুসলিম জাতি ক্ষণস্থায়ী সংকট উত্তরণে সক্ষম হয়। এসব জাতীয় সংকট নানামুখী চেহারায় এসেছে। কখনো মূর্খ বেদআতপন্থী মুসলিম অথবা মুসলিম নামধারী মুনাফিকদের মাধ্যমে হামলা হয়েছে, আবার কখনো বহিঃশত্রু দ্বারা আক্রমণ হয়েছে। কখনো চিন্তাধারার জগতে কুরআন হাদীসের অপব্যাখ্যার মাধ্যমে, আবার কখনো সশস্ত্র আক্রমণ হয়েছে। যখন যে পরিস্থিতিতে যে ধরনের প্রতিরোধই প্রয়োজন হয়েছে, তদ্রূপ প্রতিরোধের ব্যবস্থা এসব মহান সংস্কারকগণ করেছেন। এসব মুজাদ্দিদের তালিকায় যথাক্রমে হযরত হাসান বসরী, ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালিক, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইমাম আবুল হাসান আশআরী, ইমাম গাযালী, শায়খ আবদুল কাদির জিলানী, আল্লামা ইবনুল জাওযী, সুলতান নূরুদ্দীন জঙ্গী, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী, শায়খ ইযযুদ্দীন ইবনে আবদুস সালাম, মাওলানা রুমী ও আল্লামা ইবনে তাইমিয়ার নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আমাদের উপমহাদেশে যে সব মনীষী সংস্কারমূলক কীর্তি সম্পন্ন করেছেন তাঁদের মধ্যে হযরত মুঈন উদ্দীন চিশতী, হযরত কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী, হযরত খাজা নিজামুদ্দীন সুলতানুল আওলিয়া, হযরত শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহয়া মানিরী ও মুজাদ্দিদে আলফে সানী শায়খ আহমদ সিরহিন্দী রাহিমাহুমুল্লাহু তায়ালার নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়।

মুজাদ্দিদের এই ধারাবাহিকতায় হিজরী দ্বাদশ শতাব্দীতে তাজদীদী খেদমত আঞ্জাম দেন ইমাম শাহ ওলী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী। তিনি দিল্লীর বড় বড় আলেমদের কাছে হাদীস তাফসীর ও ফিকহ শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। এরপর তিনি পবিত্র মক্কা মুকাররমায় প্রায় দুই বছর যাবৎ মুসলিম বিশ্বের স্বনামধন্য প্রজ্ঞাবান মুহাদ্দিস ও মুফাসসিরদের সাহচর্যে অবস্থান করে ইলমে হাদীস ও ইলমে তাফসীরে গভীর বুৎপত্তি লাভ করেন। এর পাশাপাশি তিনি আরব জাহান, মুসলিম বিশ্ব ও পৃথিবীর তাবৎ জাতি ও জনগোষ্ঠীর উত্থান পতনের ইতিহাস সম্বন্ধে সচেতনতা অর্জন করেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে তিনি মুসলিম জাতির ইসলাহী খেদমতে আত্মনিয়োগ করেন।

তিনি সর্ব প্রথম মৌল আকীদা ও বিশ্বাস সংশোধনের উদ্দেশ্যে কুরআন হাদীস চর্চার প্রতি গোটা জাতিকে উদ্বুদ্ধ করেন। নবীয়ে পাক সা. এর সুন্নাহ অনুসরণের মাধ্যমে সব ধরনের বেদআত, কুসংস্কার, রুসুম রেওয়াজ বর্জনের প্রতি তিনি মুসলিম জনসাধারণকে উৎসাহিত করেন। তিনি যুক্তিগ্রাহ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে ইসলামী শরীয়তকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা রূপে উপস্থাপন করেন। হযরত শাহ ওলী উল্লাহ ইসলামী শাসনের আবশ্যকতা প্রমাণিত করেন এবং এ উদ্দেশ্যে জিহাদী ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার প্রতি সবাইকে আহ্বান জানান। হিজরী ১১৭৬ মোতাবেক ১৭৬২ সালে শাহ ওলী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী ৬১ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। পরবর্তী সময় তাঁর পুত্র শাহ আব্দুল আযীয ও শাহ রফীউদ্দীন ইলমে হাদীসের দরস ও তাদরীসের মাধ্যমে এবং হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ ও হযরত ইসমাঈল শহীদ সশস্ত্র জিহাদের মাধ্যমে ওলী উল্লাহী চিন্তাধারা ও মিশন এগিয়ে নিয়ে যান।

ঈসায়ী ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে মুসলিম জাতির অবস্থা ছিল অত্যন্ত নাযুক। ধূর্ত ব্রিটিশ জাতি এদেশে বণিকের বেশে আগমন করে ধীরে ধীরে এদেশের ক্ষমতা দখল করে নেয়। তারা যেহেতু মুসলিম জাতির হাত থেকে রাষ্ট্র ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয় তাই মুসলমানকেই তারা প্রধান শত্রু মনে করে। এদেশে শত শত বছর ধরে হিন্দু মুসলমান একসঙ্গে বসবাস করেছে। কখনো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা হয়নি। কিন্তু ইংরেজ জাতি রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে নিজেদের ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার উদ্দেশ্যে হিন্দু মুসলিম পরস্পরে দ্বন্দ্ব লাগিয়ে দেয়। এরা একই সঙ্গে মুসলমানের সঙ্গে চরম বৈরী আচরণ করে এবং হিন্দু জাতির প্রতি বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেয়। শুধু তাই নয়, মুসলিম জাতির মধ্যেও তাদের অনুগত নানা গোষ্ঠী গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। ফলে মুসলিম সমাজে পরস্পরে অবিশ্বাস ও সংঘাত মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ইংরেজদের দুঃশাসনে অতিষ্ঠ হয়ে সমগ্র উপমহাদেশে মুসলিম সিপাহী ও সাধারণ জনতা সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। কিন্তু ইংরেজদের অনুগত দালালদের গাদ্দারীর কারণে এ বিপ্লব সফলতা লাভ করতে পারেনি। ব্রিটিশ সরকার তখন হিংস্র হায়েনারূপে মুসলিম জাতির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সে বিপ্লবের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন হক্কানী উলামায়ে কেরাম। তাই তাদের উপর চালানো হয় অত্যাচারের ভয়াবহ স্টিম রোলার। নিজেদের জানমাল ইজ্জত আব্রু ও দ্বীন ঈমান হেফাজতের উদ্দেশ্যে জন্মভূমির স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দেওয়ার অপরাধে হাজার হাজার আলেমকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝোলানো হয়, অগণিত আলেমকে নিক্ষেপ করা হয় অন্ধকার কারা প্রকোষ্ঠে এবং শত শত আলেমকে আন্দামান দ্বীপে নির্বাসন দেওয়া হয়। মুসলিম সমাজ তখন জাতীয় বিপর্যয়ে নিপতিত।

জাতীয় জীবনের এহেন বিভীষিকাময় মুহূর্তে একদল যুগ সচেতন ও দূরদর্শী ওলামায়ে কেরাম পরামর্শক্রমে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, কঠিন সংকটের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত মুসলিম জাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে কুরআন হাদীসের প্রকৃত শিক্ষা এবং দীনের সহীহ তালীম সমাজে ছড়িয়ে দিতে হবে। এ আলোকে শরীয়তের জ্ঞানসম্পন্ন একদল সচেতন ও তাজাপ্রাণ মর্দে মুজাহিদ গড়ে তুলতে হবে। যারা প্রকৃত শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে থাকা রুসুম রেওয়াজ ও কুপ্রথা উচ্ছেদে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে। যারা আমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও আদর্শ ধ্বংসকারী, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী এবং জাতীয় সম্পদ লুণ্ঠনকারী, স্বার্থপর, পরবিত্তলোভী বিদেশী ইংরেজদেরকে মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত করতে জীবন বাজি রেখে আমৃত্যু সংগ্রাম করে যাবে। এসব চিন্তাশীল মনীষীর মধ্যে হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী, হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী ও হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গোহী রহ. বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অবশেষে তাঁরা ১৮৬৬ সালে বর্তমান ভারতের উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর জেলায় দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠিত করেন। দারুল উলূম দেওবন্দ শুধু মাত্র একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না। বরং তা ছিল বিশাল এক বিপ্লবের সূতিকাগার। এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই বিশ্বব্যাপী এক মহান সংস্কার আন্দোলন সাধিত হয়। বস্তুত হযরত শাহ ওলী উল্লাহর সংস্কার পরিকল্পনা তাঁর পরবর্তীতে দুই ধারায় অগ্রসর হতে থাকে। হযরত শাহ আব্দুল আযীয, শাহ রফী উদ্দীন ও শাহ মুহাম্মদ ইসহাকের মাধ্যমে কুরআন ও হাদীসের সহীহ শিক্ষা আন্দোলন এবং হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ ও হযরত ইসমাঈল শহীদের মাধ্যমে সশস্ত্র জিহাদ আন্দোলন। এ উভয় আন্দোলন সমন্বিত রূপ পায় দারুল উলূম দেওবন্দে এসে। এ জন্য এ দারুল উলূমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ওলামায়ে কেরাম ছিলেন মুজাদ্দিদের বা সংস্কার আন্দোলনের এক কাফেলা। কালে এ প্রতিষ্ঠান থেকে জন্ম নেন পৃথিবী বিখ্যাত ফকীহ মুহাদ্দিস ও মুফাসসির। যারা কুরআন ও হাদীসের মহাভাণ্ডার সন্ধান করে আধুনিক পৃথিবীতে উদ্ভূত নানা জটিল বিষয়ের সমাধান খুঁজে বের করেন। তাঁরাই সর্বপ্রকার শিরক, বেদআত, কুপ্রথা, কুসংস্কার ও ইসলামের অপব্যাখ্যা প্রতিরোধে সব রকম জুলুম নির্যাতন উপেক্ষা করে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। অবশেষে ধূর্ত ও ক্ষমতাধর ইংরেজদেরকে এদেশ ত্যাগে বাধ্য করেন।

এক কথায়, মুসলিম জাতির ব্যক্তি জীবনের ক্ষুদ্র গণ্ডি থেকে আন্তর্জাতিক জীবনের বৃহত্তর পরিধি পর্যন্ত এমন কোনো অঙ্গন নেই, যেখানে দারুল উলূমের সন্তানগণ উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেননি। এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, তাঁরাই রাসূল সা. এ হাদীসের প্রতিপাদ্য,

يَحْمِلُ هذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلْفٍ عدُوْلهُ يُنْفُوْنَ عَنْهُ تَحْرِيْفَ الغَالِيْنَ وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِيْنَ وَتَاوِيْلَ الْجَاهِلِيْنَ.

প্রত্যেক প্রজন্মের সেইসব লোক এ ইলমের ধারক ও বাহক হবে, যারা আল্লাহভীতি ও আমানতদারীর গুণে গুণান্বিত হবে। তারা সীমালজ্ঘনকারীদের বিকৃতি সাধন, বাতিলপন্থীদের কল্পিত প্রক্ষেপণ ও অজ্ঞ লোকদের অপব্যাখ্যা থেকে এ দ্বীনকে হেফাজত করবে। [মিশকাত, হাদীসঃ ২৪৮; সুনানে কুবরা, হাদীসঃ ২০৯১১]

দারুল উলূম দেওবন্দ মুসলিম জাতির যে তাজদীদ বা সংস্কার সাধন করেছে, সমকালে তো নয়ই, অতীত যুগেও এককভাবে কোন প্রতিষ্ঠানের এরূপ খেদমতের উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতাগণ এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য আটটি মূলনীতি নির্ধারণ করেন। এ মূলনীতিসমূহের আলোকেই দারুল উলূম পরিচালিত হয়। তৎকালীন খেলাফত আন্দোলনের মহান নেতা মাওলানা মুহাম্মদ আলী জওহর এ মূলনীতিগুলি দেখে মন্তব্য করেন, ‘এগুলো মানুষের বিবেক প্রসূত নীতিমালা নয়, বরং আল্লাহ প্রদত্ত মারেফাতের গভীর স্থান থেকে এগুলো উৎসারিত হয়েছে।’ এগুলোকে বলা হয় ইলহামী উসূলে হাশতে গানা বা আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ প্রজ্ঞার আলোকে তৈরি করা মূলনীতি। এ ইলহামী উসূলের অন্যতম হল, এ প্রতিষ্ঠান একক সিদ্ধান্তে নয়, বরং পরামর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে। আর সর্ব সাধারণের চাঁদার ভিত্তিতে তা চলবে। এর ব্যয় নির্বাহের জন্য আয়ের স্থায়ী কোনো ব্যবস্থা করা যাবে না। এতে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের মন সর্বদা আল্লাহমুখী থাকবে। আর সরকার ও বিত্তশালী লোকদের নিয়ন্ত্রণ বা হস্তক্ষেপ এ প্রতিষ্ঠানের জন্য ক্ষতিকর হিসাবে বিবেচিত।

দারুল উলূমের আদলে এসব মূলনীতি অনুসরণ করে সে সময় থেকেই সারা উপমহাদেশে আরও অনেক মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব মাদরাসা সরকারী নিয়ন্ত্রণের বাইরে সাধারণ জনগণের অর্থ, শ্রম, পরামর্শে পরিচালিত হয় বলে এগুলোকে বলা হয় কওমী মাদরাসা। পরবর্তীতে আরব জাহান, ইরান, তুরস্ক, আফগানিস্তান, মায়ানমার, রাশিয়া, চীন, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা ও আফ্রিকায়ও এ ধারার বহু মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে আমাদের বাংলা অঞ্চলেও কওমী মাদরাসা গড়ে উঠতে থাকে। বর্তমান বাংলাদেশে ছোট বড় মিলিয়ে অন্তত ত্রিশ হাজার কওমী মাদরাসা রয়েছে। এগুলো জনগণের দেওয়া আর্থিক অনুদানে দারুল উলূম দেওবন্দের আদর্শে পরিচালিত হচ্ছে।

দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতার কারণে মানুষের কর্মধারায় পার্থক্য হয়ে যায়। কওমী মাদরাসা নিছক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়। বরং সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গিতে সমৃদ্ধ প্রতিষ্ঠান। কওমী মাদরাসার মূল উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গি হল, আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জন করা। এজন্য এখানে প্রতিটি কাজের পূর্বেই আল্লাহর সন্তুষ্টি বিবেচনায় রাখা হয়। যে কাজে আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট হবেন, গুরুত্ব সহকারে তা কর্মসূচিতে রাখা হয়। আর যে কাজে আল্লাহ তায়ালা নারাজ হতে পারেন বলে মনে হয়, সে কাজ জাগতিক দিক থেকে উপকারী মনে হলেও তা বর্জন করা হয়। এ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণায় আক্রান্ত লোকেরা কওমী মাদরাসার সিলেবাস ও শিক্ষা কার্যক্রম নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করে থাকে। তাদের সমাজ ও জীবন শুধু ইহজীবন কেন্দ্রিক। তারা কওমী মাদরাসাকেও এ দৃষ্টিকোণ থেকেই বিবেচনা করে। অথচ একজন মানুষের পরজীবন হল চিরস্থায়ী এবং পার্থিব জীবন ক্ষণস্থায়ী। পৃথিবীর প্রতিটি পদক্ষেপই পরকালের চিরস্থায়ী জীবনের বিবেচনা মাথায় রেখে করতে হবে। এ দৃষ্টিভঙ্গি সামনে রেখে কওমী মাদরাসা পরিচালিত হয়। এ ধারার শিক্ষার্থীদেরকেও এই বোধ ও বিশ্বাসে পরিপুষ্ট করা হয়। এক কথায়, কওমী মাদরাসা শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য, আল্লাহ পাকের জাত, সিফাত ও গুণাবলী এবং ফেরেশতা, আসমানী কিতাব, নবী-রাসূল, তাকদীর ও পরজীবনের প্রকৃত পরিচয় লাভ করে ঈমান ও বিশ্বাস খাঁটি করা এবং সকল এবাদত বন্দেগীর সঠিক পদ্ধতি, স্থান, কাল, শর্ত ও প্রয়োজনীয়তা এবং মুসলিম জীবনের আর্থ-সামাজিক লেনদেন ও নৈতিকতার গুরুত্ব সঠিকভাবে উপলব্ধি করে সে অনুযায়ী আমল করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা।

অতএব জাগতিক কোনো সুযোগ সুবিধা যথা– অর্থ, ক্ষমতা, প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি ইত্যাদি কওমী মাদারাসার শিক্ষার উদ্দেশ্যের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত নয়। এ ছাড়া কুরআন হাদীস ও জ্ঞানীগুণীদের চিন্তাধারার আলোকে বলা যায়, শিক্ষা কখনো জীবিকা নির্বাহের পন্থা হতে পারে না। যেমন আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন,

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾

‘সালাত আদায় শেষ করে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান কর। [জুমআ : ১০]

এ আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করা যায়, জীবিকা নির্বাহের জন্য ভিন্নভাবে চেষ্টা করা হবে। এজন্য দারুল উলূম দেওবন্দের উলামায়ে কেরাম সেখানে পৃথকভাবে কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থাও রাখেন।

কওমী মাদরাসাসমূহ এ দেশের গণমানুষের হৃদয়ের প্রতিষ্ঠান। এ দেশের সর্বশ্রেণীর মানুষ এসব প্রতিষ্ঠানকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। এ দেশের সাধারণ নাগরিক রাজনৈতিকভাবে যতই দ্বিধাবিভক্ত হোক না কেন, কওমী মাদরাসার প্রতি ভালোবাসার ব্যাপারে তারা কখনো বিভক্ত হয়নি। সর্বসাধারণ এ কথা ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে, কওমী মাদরাসাই হল, দেশের সুনাগরিক তৈরির কারখানা। এখানে ছাত্র-ছাত্রীরা নৈতিক শিক্ষা লাভ করে আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়ে ওঠে। এ ধারায় শিক্ষিত হয়ে ছেলেমেয়েরা গোটা সমাজে নৈতিক শিক্ষা ছড়ানোর কাজে ব্যাপৃত হয়।

কওমী ধারার ওলামায়ে কেরাম যেমনিভাবে ইংরেজদের হাত থেকে দেশ উদ্ধারে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন, তেমনি ব্রিটিশ জাতি চলে যাওয়ার পর পাকিস্তানের নির্বোধ নেতৃবৃন্দ যখন বিশ্বাসঘাতকতা করে ইসলাম ও মুসলমানের প্রতি অন্যায় আচরণ শুরু করে, বিশেষ করে আমাদের দেশের প্রতি শোষণ নির্যাতন শুরু করে, তখনও বাংলার হক্কানী ওলামায়ে কেরাম এ সব অত্যাচার ও একদেশদর্শিতার প্রতিবাদ করে তৎকালীন সরকারের রোষানলে পতিত হন। এভাবে ১৯৭১ সালে ওরা যখন সাধারণ নাগরিকদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখনও হক্কানী ওলামায়ে কেরাম সাধারণ মানুষের জান-মাল ইজ্জত আব্রু হেফাজতে নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখেন এবং মুক্তিকামী নিরীহ গণমানুষের পক্ষে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। এ দেশের কওমী আলেম সমাজই মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলিতে এ অঞ্চলের মানুষের পাশে থেকে তাদের শক্তি সাহস ও সান্ত্বনা জোগান।

এ ছাড়া যেহেতু কওমী মাদরাসা গণমানুষের প্রতিষ্ঠান, তাই যখনই এ দেশে কোনো জাতীয় বিপর্যয় যথা– বন্যা, ঝড় জলোচ্ছ্বাস, সিডর, সাইক্লোন ইত্যাদি নেমে আসে, তখনই এসব প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-শিক্ষকগণ প্রতিষ্ঠান বন্ধ রেখে বিপদগ্রস্ত মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ান এবং সাধ্যমত তাদের উপকারে এগিয়ে আসেন। যেমন গত, ২৪/০৪/২০১৩ বুধবার ঢাকার সাভারে 'রানা প্লাজা' নামে যে নয় তলা ভবনটি ধ্বসে পড়ে, সেখানে আশপাশের কওমী মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষকগণই উদ্ধারকাজে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সরকারি উদ্ধারকর্মীরা যে কাজ করতে সাহস পেত না, ছাত্ররা শুধুমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা রেখে সে সব কঠিন কাজ আঞ্জাম দেন। এ ছাড়া আহত লোকদের জন্য প্রচুর পরিমাণে রক্তের প্রয়োজন হলে কওমী মাদরাসার ছাত্র ও শিক্ষকগণই রক্তদানে প্রধান ভূমিকা রাখেন।

বাংলাদেশের কওমী মাদরাসাসমূহকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করা অতীব জরুরী। যেন তরবিয়ত, দাওয়াত, তাবলীগ ও এ'লায়ে কালিমাতুল্লাহর দ্বার সম্প্রসারণ করা যায়, আঁকাবিরের আদর্শের উপর অটল থেকে কওমী মাদরাসাসমূহের নেসাবে তালীম ও তরীকায়ে তালীমের মান উন্নীত করা যায় এবং ইসলাম বিরোধী শক্তিসমূহের ষড়যন্ত্রের হাত থেকে কওমী মাদরাসাকে রক্ষা করা যায়।

কওমী মাদরাসা যেহেতু মুসলিম জাতির সহীহ ঈমান আকীদা ও আমল হেফাজতের উদ্দেশ্যে, গভীরভাবে কুরআন হাদীস ও ফিকহ্ চর্চায় বদ্ধপরিকর, তাই ইসলাম ও মুসলিম জাতির দুশমন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি গোড়া থেকেই কওমী মাদরাসার প্রতি ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ। তারা কুরআন হাদীসের রক্ষাকবচ এসব প্রতিষ্ঠানকে সমূলে ধ্বংস করার জন্য তৎপর। তারা প্রচার মাধ্যমে নানা মিথ্যা অপবাদ ছড়িয়ে সাধারণ মানুষ থেকে মাদরাসাগুলিকে বিচ্ছিন্ন করার অপপ্রয়াসে লিপ্ত। সাম্রাজ্যবাদীদের এ দেশীয় একশ্রেণীর দালালও তাদের প্রভুদের সুরে কথা বলে। আমাদের বিশ্বাস, বর্তমান বাংলাদেশে যারা সরকার পরিচালনা করছেন, তারা অনেকেই কওমী মাদরাসার অকল্যাণ চান না। তবে দেশ ও জাতির চিহ্নিত শত্রুদের চাপে পড়ে কিংবা সরকারের ভেতরকার ইসলামবিদ্বেষী চক্রের প্ররোচনায় বর্তমান সরকার ২০১০ সালে একটি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে। যে শিক্ষানীতির মাধ্যমে কওমী মাদরাসা শিক্ষাধারাকে গলাটিপে হত্যা করার সব বন্দোবস্ত সম্পন্ন হয়। এখানে অত্যন্ত চাতুর্যের সঙ্গে কওমী মাদরাসা শিক্ষাধারা সমূলে ধ্বংস করার অপকৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। যেমন, শিক্ষানীতির পঞ্চম পৃষ্ঠায় *বিভিন্ন ধারার সমন্বয়* শিরোনামে বলা হয়েছে, 'শিক্ষার মান ও শিক্ষার্থীদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে ৮ বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হবে।' এ প্রাথমিক স্তরে বাধ্যতামূলকভাবে যে সব বিষয় পাঠদান করতে হবে সেসব বিষয়ে কুরআন হাদীস বা ধর্মীয় বিষয় নেই। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ না করে শিক্ষানীতিতে প্রদত্ত বাধ্যতামূলক সিলেবাস অনুসরণ করে পাঠ গ্রহণ করার পর একজন ছাত্র ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হবে না। আর যারা হাফেজে কুরআন হতে চায় তাদের জন্য এই বাধ্যতামূলক সিলেবাস মারাত্মকভাবে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে। কারণ প্রাথমিক স্তরের এ সিলেবাসের সঙ্গে কুরআনে কারীম হিফজ করা সম্ভব হবে না। আর অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার পর প্রায় পনের বছর বয়স হয়ে গেলে হিফজ করার বয়সও থাকবে না।

আবার শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে অভিন্ন সিলেবাসে ও অভিন্ন পাঠ্য পুস্তকের মাধ্যমে। প্রাথমিক স্তরের প্রশ্নপত্রও হবে অভিন্ন। শিক্ষানীতির ১২ নং পৃষ্ঠার চতুর্থ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, 'প্রত্যেক ধারায় সকল বিষয়ে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হবে।' এ ঘোষণা বাস্তবায়ন হলে কওমী মাদরাসা মারাত্মক জটিলতার

সম্মুখীন হবে। কেননা কওমী মাদরাসার শিক্ষাবর্ষ শুরু হয় শাওয়াল মাসে, আর স্কুলের শিক্ষাবর্ষ শুরু হয় জানুয়ারি মাসে। সুতরাং একই সময়ে একই প্রশ্নপত্রে সকল ধারার পরীক্ষা গ্রহণ সম্ভব হবে না।

জাতীয় শিক্ষানীতির মাধ্যমে একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার স্লোগান তোলা হয়েছে। কওমী মাদরাসা ইসলামী মূল্যবোধ তৈরির মহৎ লক্ষ্যে নিবেদিত বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান। তাই, সাধারণ শিক্ষার জন্য প্রণীত পাঠ্য পুস্তকের মাধ্যমে পাঠদান করা হলে এর স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকবে না এবং কওমী মাদরাসার লক্ষ্য উদ্দেশ্যও অর্জিত হবে না।

এ সব বিষয় উল্লেখ করে প্রতিবাদ করা হলে উত্তরে বলা হয়, আমরা কওমী মাদরাসা শিক্ষাকে সরকারী স্বীকৃতি দানের মানসে পৃথক কমিশন গঠনের প্রস্তাব দিয়েছি।

এখন প্রশ্ন হলো, কওমী মাদরাসা কি সরকারী স্বীকৃতি চায়? কওমী মাদরাসা প্রধানত আল্লাহর স্বীকৃতি চায়। স্বীকৃতির আড়ালে যদি মাদরাসাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার এবং মাদরাসার স্বাধীন সত্তা ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র লুক্কায়িত থাকে, তবে সে স্বীকৃতির মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী নীল নকশা বাস্তবায়নেরই পথ খোলা হবে। আশা করি, ঈমানদার কোন মুসলমান এতে সন্তুষ্ট হবেন না। এ ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য হল, কওমী মাদরাসা আকাবিরের আদর্শের উপর অবিচল থাকবে এবং সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে অবস্থান করে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে স্বীকৃতি চায়।

আর যদি স্বীকৃতি নিতে গেলে আহলুস সুন্নাতি ওয়াল জামাআতের আকীদা বিশ্বাস অথবা মাসলাকে ওলামায়ে দেওবন্দের সঙ্গে কোনরূপ আপস করতে হয়, তবে সে স্বীকৃতির প্রয়োজন নেই। তারপরও আলাপ-আলোচনার পথ সব সময়ই খোলা আছে। আশা করি, কওমী মাদরাসার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মুরুব্বীগণ বিষয়টি আরও গভীরভাবে ভেবে দেখবেন। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন এবং সকলকে তাঁর দীনের জন্য কবুল করুন। আমীন।

লেখক: মাদরাসা ফয়জুল উলূম আজিমপুর ঢাকা

বালাকোট থেকে মতিঝিল

মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ

কষ্টের এই মিলন, বেদনার এই সামঞ্জস্য কেউ প্রত্যাশা করেনি। অথচ কিছু মিল ও অমিল নিয়ে ঘটে গেছে সেটাই। আজ থেকে ১৮২ বছর আগে ব্রিটিশ ভারতের সীমান্ত অঞ্চল বালাকোটে সংঘটিত এক রক্তক্ষয়ী ঘটনার প্রতিচ্ছবি দাঁড়িয়ে গেল স্বাধীন বাংলাদেশের বুকে; ঢাকার মতিঝিলে। সে ঘটনাটি ঘটেছিল ১৮৩১ সালের ৬ মে। এ ঘটনাটি ঘটেছে ২০১৩ সালের ৬ মে। সেটি ঘটেছিল জুমাবারের দিনদুপুরে। এটি ঘটেছে সোমবার শেষরাতের বাতি নেভানো অন্ধকারে। সেটি ছিল যুদ্ধ, এটি ছিল নিরস্ত্র ঘুমন্ত লাখো মানুষের অবস্থানে নির্বিচার আক্রমণ। ওই ঘটনায় ৭০০ মুসলিম মুজাহিদের মধ্যে শহীদ হয়েছিলেন ৩০০ জন। আর এই ঘটনায় (সরকারি বিবরণ অনুযায়ী কেউ হতাহত হয়নি) ২৫০০ থেকে ৩০০০ মানুষ 'নিহত' হয়েছেন বলে দাবি উঠেছে। ওই ঘটনায় আক্রান্ত মুসলমানরা ছিলেন ভিনজাতির মানুষের সঙ্গে লড়াইরত। আর এ ঘটনায় স্বজাতির কয়েকটি বাহিনী তাদের ওপর হামলে পড়েছে।

বালাকোট আন্দোলনের মূল কথা ছিল- কুসংস্কার থেকে ইসলামী চিন্তা ও আমল রক্ষা, তাওহিদবাদী নিখাদ আধ্যাত্মিকতার বিকাশ ও ব্রিটিশ বেনিয়াদের কবল থেকে স্বদেশকে মুক্ত করার সংগ্রাম। ওই আন্দোলনের নাম ছিল তরিকায়ে মুহাম্মদী। ইতিহাসের সূত্র অনুযায়ী, ওই যুগের গ্রহণযোগ্য সব আলেম ও ইসলামপন্থী মানুষ ওই আন্দোলনের প্রতি সমর্থক ও সহানুভূতিশীল ছিলেন। আর এই আন্দোলনের মূল কথা হচ্ছে, সংবিধানে 'আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' পুনঃস্থাপন, ইসলামবিদ্বেষী উগ্র নাস্তিক ব্লগারদের মৃত্যুদণ্ডের আইন প্রণয়ন করে শাস্তিদান এবং ইসলামী সংস্কৃতি ও জীবনাচারের বিকাশ। এই আন্দোলনের নাম হেফাজতে ইসলাম। এই আন্দোলনের সঙ্গেও দেশের সমকালের সত্যপন্থী গ্রহণযোগ্য সব আলেম ও সব পর্যায়ের মুসলমানরা সহানুভূতিশীল রয়েছেন বলে গণমাধ্যমে এসেছে।

ইসলাম, স্বাধীনতা ও স্বাজাত্যবোধের বিবেচনায় এই দুটি আন্দোলনের মাঝে মিল অনেক। নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য ও ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মাঝে আন্দোলনের প্রতি সমর্থনের দিক থেকেও দুটি আন্দোলনের মাঝে মিল কম নেই। এমনকি ট্র্যাজেডি ও বিপর্যয়ের দিক থেকেও তেমন অমিল পাওয়া যায় না। কেবল বিপর্যয়-পরবর্তী প্রতিরোধের ঘটনার বিষয়টি এখনও অমীমাংসিত। এটি বলতে পারবে হয়তো আগামী দিনের ইতিহাস।

ইসলামী বিশ্বকোষ (১৬ শ' খণ্ড-১ম ভাগ, প্রথম প্রকাশ, পৃষ্ঠা-৪৫, ৪৬, ৪৭)-এর বিবরণ অনুযায়ী ওই ঘটনায় মুসলমানদের বিপক্ষে শিখনেতা শের সিংয়ের বাহিনীর সেনাসংখ্যা ছিল ১০ হাজার। মতিঝিলের এ ঘটনাতেও নিরস্ত্র ঘুমন্ত মানুষের ওপর হামলাকারীদের সংখ্যা ছিল ১০ হাজার। ওই ঘটনায় হতাহত মুসলমনদের লাশ ও তাদের সঙ্গের অমূল্য ঐতিহাসিক সামানপত্র আগুনে পুড়িয়ে দেয়া হয়। আর এ ঘটনায় (জোর অভিযোগ উঠেছে) 'নিহতদের' লাশ গায়েব করে দেয়া হয়েছে। ওই ঘটনার যিনি প্রধান ছিলেন তার নাম ছিল সাইয়েদ আহমদ শহীদ, আর এই কাফেলার যিনি প্রধান তার নাম শাহ আহমদ শফী।

বর্তমান পাকিস্তানের হাজারা জেলার কুনহার নদীর পাশে ছিল বালাকোটের অবস্থান। একটি উঁচু ময়দান। কোনো জনবসতি সেখানে ছিল না। তার পাশেই ছিল মাট্টিকোট পাহাড়। ওই পাহাড় থেকেই শিখ আক্রমণকারী বাহিনী হামলা করে। আর এ ঘটনাটির অবস্থান স্বাধীন দেশ-ঢাকার হৃৎপিণ্ড। মতিঝিল। চারপাশে অফিসভবন, ব্যস্ত নগর, তামাশার সভ্যতা। ওই ঘটনায় যারা শহীদ হয়েছিলেন তাদের সংখ্যা চাপা দেয়ার কোনো চেষ্টা কেউ করেনি। এই ঘটনায় যারা হতাহত হয়েছেন তাদের 'শহীদ' বলে উচ্চারণ করাই মুশকিল হয়ে গেছে। আর 'নিহতদের' ব্যাপারে বলা হচ্ছে, কেউ হতাহত হয়নি। এ ঘটনায় 'শান্তিপূর্ণ, দক্ষতাপূর্ণ ও বিচক্ষণতাপূর্ণ' অভিযান চালানো হয়েছে বলে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রীপরিষদসহ সরকারপন্থী নেতাকর্মী, বুদ্ধিজীবীরা স্বস্তি প্রকাশ করেছেন। ওই ঘটনার পর ইতিহাস তাদের জন্য যুগে যুগে কেঁদেছে, সাড়া দিয়েছে, প্রতিরোধ গড়েছে। আর এই ঘটনার পর নিঃশব্দে চোখের পানি মুছতেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। অদ্ভুত রুদ্ধবাক বেদনার এক ভুবনে ডুবে আছে সারাদেশ। কেউ জানে না এ কষ্টের শেষ কোথায়? ৭ মে হাটহাজারী সংবাদ সম্মেলনে হেফাজতে ইসলামের পক্ষ থেকে বেদনাঘন যে বক্তব্য পেশ করা হয়েছে, সংবাদপত্রে সেটি পড়ে চোখের পানি ধরে রাখা কঠিন হয়ে যায়। তবে আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল সা. ও ইসলামের মর্যাদা রক্ষা এবং ইসলামবিদ্বেষী উগ্র নাস্তিকদের বিচার চাওয়ার 'অপরাধে' চালানো এই অভিযানের বারুদ ধর্মপ্রাণ মানুষের বুকে কত যুগ আগুনের মতো জ্বলতে থাকবে- সে ধারণা হয়তো এখনই করা মুশকিল।

লেখক: নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক 'আলকাউসার'

নতুন মোড়কে কুফর

মাওলানা আব্দুল হালীম

ইসলাম হলো কতগুলো বিশ্বাস অন্তরে লালন, তার মৌখিক স্বীকৃতিদান ও সে অনুযায়ী নিজের জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগকে পরিচালনার নাম। এখানে জীবনের কিছু কিছু ক্ষেত্রে ধর্মকে অনুশীলন করে অন্য ক্ষেত্রে ধর্মের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন তথা 'আল্লাহ ভী খোশ রাহে ভগবান ভী নারাজ না হো যায়ে' নীতি অবলম্বন করার কোন সুযোগ নেই। অনুরূপভাবে রাজনীতি ও রাষ্ট্র ইসলামী অনুশাসনের আওতায় পরিচালিত হলে সেখানে যেমন রাতারাতি আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হওয়ার সুযোগ থাকে না তেমনি অসাধু ও ভেজাল লোকদের সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের পথও রুদ্ধ হয়ে যায়। তাই একশ্রেণীর সুবিধাবাদী মুসলিম রাজনীতিকরা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক একটি কুফরী মতবাদকে ধর্মনিরপেক্ষতার মোড়কে অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার অপপ্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। এতে একদিকে যেমন মুসলিম সমাজে সুবিধাবাদ, দুর্নীতি, ব্যভিচার, অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ, লোভ-লালসা, পাশবিকতা নির্লজ্জতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয় মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। অন্যদিকে একটি বিশাল মুসলিম জনগোষ্ঠী ঈমানহারা হয়ে জাহান্নামের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। যেন কুরআনের সে আয়াতেরই বাস্তবায়ন হচ্ছে,

﴿ وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ ﴾

তোমরা উপনীত (হয়ে) ছিলে অগ্নি গহ্বরের একেবারে প্রান্তে, [সূরা আলে ইমরান-১০৩]। তাই নিম্নে সংক্ষিপ্ত পরিসরে ধর্মনিরপেক্ষতার কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে আলোচনার প্রয়াস পাব বলে আশা করছি।

১. ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সংজ্ঞা।

২. ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের বিভিন্ন রূপ।

৩. ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের কালো থাবা।

৪. বাংলাদেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার সাধারণ ত্রুটি।

বাংলা "ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ" শব্দটি সেক্যুলারিজম এর প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। (Secularism) সেক্যুলারিজম ল্যাটিন শব্দ Secularis থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ হচ্ছে, বৈষয়িক (Worldly), অস্থায়ী (Temporal), প্রাচীন

(Oldage) ইত্যাদি। স্যেকুলার শব্দের অর্থ হচ্ছে ইহলৌকিকতা, ইহজাগতিকতা, পার্থিব, পরকালবিমুখতা, আখিরাতবিমুখতা ইত্যাদি। খ্রিস্টান গির্জার কোন খাদেম যদি বৈরাগ্যবাদী খানকাহী জীবন পরিত্যাগ করে সাংসারিক বৈষয়িক জীবনে প্রবেশ করে থাকে তাহলে তাকে স্যেকুলার বলে অভিহিত করা হয়।

পারিভাষিক অর্থে স্যেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ হচ্ছে এমন একটি মতবাদ, চিন্তাধারা ও বিশ্বাস, যা পারলৌকিক ধ্যান-ধারণা ও ধর্মের সাথে সম্পর্কহীনভাবে সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনার কথা বলে।

অক্সফোর্ড এডভান্সড লার্নারস ডিকশনারীর বর্ণনা মতে, সমাজ, সংগঠন, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে ধর্ম সংশ্লিষ্ট হতে পারে না এমন বিশ্বাসই হলো ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। বস্তুত স্যেকুলারিজম বলতে বোঝায় এমন এক মতবাদ যা পারলৌকিক ধ্যান-ধারণা ও ধর্মের সাথে সম্পর্কহীনভাবে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার কথা বলে। ধর্ম যদি থাকে, তবে তা থাকবে ব্যক্তির একান্ত ব্যক্তিগত জীবনে। রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণ ও পরিচালনায় কোনভাবেই ধর্মকে বিবেচনা করা হবে না। আর মুসলিম বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ইসলাম মুক্ত শাসন।

একটি ভুল প্রচার

বাংলায় Secularism এর অনুবাদ হয়ে থাকে "ধর্মনিরপেক্ষতা"। এ দ্বারা বুঝানো হয় যে, যার ধর্ম তার কাছে। পরধর্ম সহিষ্ণুতা এর উদ্দেশ্য। আসলে ইসলাম বিদ্বেষীদের দ্বারা মুসলমানরা আজীবন প্রতারিত হয়েছে। আর Secularism এর অনুবাদ "ধর্মনিরপেক্ষতা" করাটাও মূলত এ ধরনের ষড়যন্ত্রের একটি প্রামাণ্য দলীল। কারণ বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত ব্যবহারিক বাংলা অভিধানে 'নিরপেক্ষতা' শব্দের অর্থ করা হয়েছে পক্ষপাতহীনতা, অপক্ষপাত ইত্যাদি। সুতরাং কোন ধর্মের পক্ষপাত না করা হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতা যা মূলত ধর্মহীনতারই আরেক নাম। সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ যার ধর্ম তার কাছে এ কথা মোটেও ঠিক নয়। এর অর্থ ধর্মহীনতা বললে মুসলমানরা এটাকে গ্রহণ না করে এর মুখে থু থু নিক্ষেপ করবে সে জন্যে অত্যন্ত চালাকি করে আকর্ষণীয় মোড়কে এমন একটি শব্দ এর জন্যে চয়ন করা হয়েছে। যাতে মুসলমানদেরকে অন্ধকারে রেখে বিভ্রান্ত করে তাদের ধর্মের সাথে সাংঘর্ষিক এ ধর্মহীনতা সহজে গেলানো যায়। এটি তারই একটি সুনিপুণ ষড়যন্ত্র।

উল্লেখ্য যে, এই শব্দটি যখন আরবীতে অনুবাদ করা হয়েছে তখন কিন্তু এ বিষয়টির প্রতি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে খেয়াল রাখা হয়েছে যেখানে সামান্য বিভ্রান্তির কোন সুযোগ নেই। Secularism এর আরবী অনুবাদ হচ্ছে 'আল-লাদিনিয়াহ' অর্থাৎ ধর্মহীনতা।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের বিভিন্ন রূপ

মধ্যযুগীয় ইউরোপে ধর্মযাজকদের ধর্মের নামে গোঁড়ামি, মিথ্যাচার, কুসংস্কার, প্রতারণা ও এর প্রতিবাদে ফেটে পড়া বিজ্ঞানীদের পুড়িয়ে মারা ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ নামক কুফরী মতবাদটির জন্ম হলেও বর্তমানে বিভিন্ন দেশে, বিভিন্নভাবে এর অনুশীলন হচ্ছে। এর মধ্যে চারটি ধরনই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১. উদারনৈতিক ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ
ধর্মের ব্যাপারে এ মতবাদ প্রকাশ্যভাবে মারমুখো নয়। এ মতবাদ ব্যক্তির নিজস্ব পরিমণ্ডলে ধর্মের অনুশীলন স্বীকার করে থাকে। এর মূল আপত্তি সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সাথে ধর্মের কোন প্রকার সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে। পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে এ মতবাদের অস্তিত্ব রয়েছে।

২. চরমপন্থি বা মারমুখো ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ
ধর্ম অনিষ্টের মূল, শোষণের হাতিয়ার, জনগণের জন্যে আফিম স্বরূপ। তাই ধর্মকে শুধু সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে নয় ব্যক্তির মন মগজ থেকেও উৎখাত করতে হবে। সমাজতান্ত্রিক মতবাদ কমিউনিজমই প্রধানত এ মারমুখো ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের প্রবক্তা।

৩. সাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ
এর মূল কথা হলো সাম্প্রদায়িক স্বার্থ দেখা হবে ঠিকই। কিন্তু যে ধর্মের ভিত্তিতে সম্প্রদায়টি গঠিত সে ধর্মের ভিত্তিতে সম্প্রদায়টি পুনর্গঠন করতে প্রস্তুত না হওয়া। যেমন, ব্রিটিশ আমল থেকে আজ পর্যন্ত এদেশে এমন অনেক নেতাই ছিলেন এবং রয়েছেন যারা মুসলমানদের জন্যে বিগলিত প্রাণ। কিন্তু সমাজ জীবনে ইসলামের প্রতিষ্ঠাকে তারা কৌশলে এড়িয়ে যান। আবার অনেকে এমনও বলেন- মুসলমানদের স্বার্থেই নাকি তারা রাজনীতির সাথে পবিত্র ধর্মকে জড়িত করা উচিত মনে করেন না। তারা মূলত সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি দ্বারা আচ্ছন্ন। সাথে সাথে তারা ধর্মনিরপেক্ষতারও সমর্থক। এ দুয়ের অদ্ভুত সমন্বয়েই গড়ে উঠেছে সাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষতা। ইহুদী সম্প্রদায়ের ধর্মনিরপেক্ষতাও এমনি আরেকটি উদাহরণ।

৪. ছদ্মবেশী ধর্মনিরপেক্ষতা
এর তাৎপর্য হচ্ছে প্রকাশ্যে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলা হবে না, কিন্তু কাজে-কর্মে সকল বিষয়ে সকল সেক্টরে ধর্মনিরপেক্ষতা প্রাধান্য লাভ করবে। শুধু কথা বা প্রচারের সময় ধর্মের নামটা ব্যবহার করা হবে। এটাকেই মূলত ধর্ম-ব্যবসা বলে।

৫. ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের পার্থক্য

ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মধ্যে রয়েছে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। দু'টির দুই প্রান্তসীমায় অবস্থান। ইসলামের সাথে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের দূরতম কোন সম্পর্ক থাকাও সম্ভব নয়। উভয় মতবাদের মৌলিক পার্থক্যসমূহ নিম্নরূপ।

ইসলাম	ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ
১। আল্লাহ প্রদত্ত এরশাদ হয়েছে- ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ ۝٣ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴾ "আর তিনি প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না। এটাতো খালেস ওহী, যা তাঁর কাছে পাঠানো হয়।" [সূরা নাজম: ৩-৪]	১। মানুষের তৈরি মতবাদ। এককথায় মানব রচিত।
২। এই পৃথিবী এবং পরকালীন জীবন উভয় ক্ষেত্রকেই গুরুত্ব দেয়।	২। এই পৃথিবী কেন্দ্রিক। ইহজগতমুখী। সম্পূর্ণ পার্থিব।
৩। ধর্ম ও রাজনীতিকে যুক্ত করে। এরশাদ হয়েছে, ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ ﴾ "আমি আমার রাসূলগণকে স্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সাথে অবতীর্ণ করেছি তুলাদণ্ড কিতাব, যাতে মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি নাযিল করেছি লৌহ, যাতে আছে প্রচণ্ড রণশক্তি।" [সূরা আল হাদীদ: ২৫]	৩। ধর্ম ও রাজনীতিকে আলাদা করে।

৪। ইসলাম বিশ্বাসীগণের জীবনের সকল দিক ও বিভাগকেই নিয়ন্ত্রণ করে। এরশাদ হয়েছে, ﴿ ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسِّلۡمِ كَآفَّةٗ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِ ﴾ "পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ কর। আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না।" [সূরা বাক্বারাঃ ২০৮]	৪। ধর্মকে শুধু ব্যক্তিগত গণ্ডিতে আবদ্ধ রাখে।

সারকথা

ইসলাম একটি অবিভাজ্য জীবন ব্যবস্থা। জীবনের প্রতিটি শাখা-প্রশাখায় ইসলামের রয়েছে নিজস্ব নিয়ম পদ্ধতি। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামকে মানলেই ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে মানা হয়। আর জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে ইসলামকে বাদ দিলে আসলে ইসলামই মানা হয় না। বরং জীবনের কোন এক ক্ষেত্র ইসলামবিমুখতা চর্চার জন্য উন্মুক্ত থাকলে অন্য ক্ষেত্রে যতই ইসলাম পালন হোক না কেন সেখানে মুসলমান থাকার কোন সুযোগ থাকে না। এ বিষয়টি আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন. "তোমরা কি কুরআনের কিছু অংশের প্রতি ঈমান আনবে আর কিছু অংশকে অস্বীকার করবে? যারা এটি করে, তারা দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছিত হয়। কিয়ামতের কঠিন দিবসে তাদেরকে কঠিন শাস্তির দিকে পাঠিয়ে দেয়া হবে।" [সূরা বাক্বারাঃ ৮৫] উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায় ধর্মনিরপেক্ষতার সাথে ইসলামের সম্পর্ক বৈপরীত্যের। এই মতবাদ একটি কুফরী মতবাদ, খোদাদ্রোহী মতবাদ।

মুসলিম বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের কালো থাবা

মুসলিম কোন দেশে স্যেকুলারিজম কায়েম করাই সম্ভব হবে না ইসলামের উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আঘাত ও হস্তক্ষেপ না করে। ইসলামী নীতি ও আইন কানুনকে বাতিল বা প্রত্যাখ্যান না করে কোন স্যেকুলার রাষ্ট্র গঠন অবাস্তব। তাই দেখা গেছে যেখানেই সরাসরি স্যেকুলার রাষ্ট্র গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে সেখানেই ইসলামের উপর, ইসলামী শিক্ষার উপর, সংস্কৃতির উপর, এমনকি ব্যক্তিগত আইনের উপরও হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ তুরস্কের কথা বলা যায়।

তুরস্ককে স্যেকুলার রাষ্ট্র বানাতে গিয়ে শুধু যে খেলাফত বিলুপ্ত করা হয়েছে তা নয়, বরং ইসলামকে নির্মূল করারও উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক (১৮৮১-১৯৩৮) স্যেকুলার রাষ্ট্র গঠন করতে গিয়ে আরবীতে আযান বন্ধ করে দিয়েছিলেন। আরবীর বদলে তুর্কি ভাষায় কুরআন পড়তে বাধ্য করা হয়েছিল। 'আল্লাহ' শব্দের বদলে 'তুর্কি তানরি' শব্দ চালু করা হয়েছিল। আযানের সময় আল্লাহু আকবারের বদলে 'তানরি উলুদর' (সৃষ্টিকর্তা মহান) চালু করা হয়েছিল। মহিলাদের হিজাব খুলতে বাধ্য করা হয়েছিল। এমনকি ভিন দেশের পুরুষদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে নাচতে বাধ্য করা হয়েছিল। ইসলামী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলোকে বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। শাসনতান্ত্রিকভাবে সমস্ত ইসলামী রাজনৈতিক তৎপরতা বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। আজও তুরস্কে সে ব্যবস্থা বহাল রয়েছে।

তিউনিসিয়ার উন্নয়ন ও স্যেকুলার সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের নামে প্রেসিডেন্ট হাব্বি বারগুইবা প্রকাশ্যে পবিত্র রমজান মাসে রোজা রাখতে নিরুৎসাহিত করতেন। তিনি মুসলিম মহিলাদেরকে হিজাব পরিধান করতে নিষেধ করতেন।

বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতা

উপরের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষতাকে বিশ্লেষণ করতে হলে একটু পিছন থেকে আসতে হবে। কারণ বাংলাদেশের সংবিধানের মূলনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষতা গ্রহণ করার সময় জনাব শেখ মুজিবুর রহমান এ শব্দটির মর্ম ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যদিও বলেছিলেন- "সকল ধর্মের অনুসারীরা স্বাধীনভাবে যেন নিজ নিজ ধর্ম পালনের সুযোগ পায়।" কিন্তু তার অনুসারী হওয়ার দাবীদারদের অনেকের ঘাড়েই মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের প্রেতাত্মা ভর করেছে। তারা সংবিধান থেকে আল্লাহ শব্দটি তুলে দিয়ে তার বদলে সৃষ্টিকর্তা ব্যবহার করছে। আল্লাহ শব্দ বললে বা লিখলে তাদের ধর্মনিরপেক্ষতা নষ্ট হয়ে যায়। ৯০ ভাগ মুসলমানের এদেশে কামাল আতাতুর্ক স্টাইলে ইসলামী রাজনৈতিক তৎপরতা বন্ধ ও ইসলামী পারিবারিক আইন পরিবর্তনসহ নানান অপতৎপরতায় লিপ্ত রয়েছে। আবার তাদের আশকারা পেয়ে এক শ্রেণীর লেখক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী ও তথাকথিত প্রগতিশীল নেতা-নেত্রী জাতীয় মিডিয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশের মুসলমানদের জীবন, মৃত্যু, সংগ্রাম, সংস্কৃতি ও সামাজিকতাকে নাস্তিক্যবাদী ভাবধারায় ঢেলে সাজাতে চান। জোর করে তারা আমাদের ভাষা, বর্ণনা, আচার-আচরণ ও পরিভাষায় লেপে দিতে চান ধর্মহীনতার কালিমা। তারা মরহুম না বলে বলেন প্রয়াত। ইন্তেকাল না বলে বলেন প্রয়ান। দাফন-কাফন বাদ দিয়ে বলে শেষকৃত্য। তারা জানাযা বাদ দিয়ে বলে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

তারা সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ বাদ দিয়ে বলেন 'ও মাইগড'। দোয়া ও মোনাজাত না বলে বলেন প্রার্থনা। এখন এদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানের প্রশ্ন হলো তারা কি ভবিষ্যতে নামায ও ইবাদত বন্দেগি বাদ দিয়ে পূজা, উপাসনা বা আরাধনা বলবেন? মসজিদ না বলে বলবেন মন্দির বা উপাসনালয়? হাজীকে বলবেন তীর্থযাত্রী? আযানের সময় আল্লাহু আকবার বাদ দিয়ে বলবেন কি (তুর্কিদের মত) সৃষ্টিকর্তা মহান? আলামত দেখে তো এমনই মনে হচ্ছে। এসব আলামত দেখে এদেশের ১৫ কোটি মুসলমানের কাছে ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতার আসল চেহারা।

বাংলাদেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার সাধারণ ত্রুটি

শিক্ষা অর্থ জানা, বোঝা, হৃদয়ঙ্গম করা। কিন্তু কী জানা? সব মানুষেরই মনের কোণে কতকগুলো মৌলিক প্রশ্ন এসে উঁকি দেয়। জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে সেগুলোকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়।

১. আমি কে? আমার কী পরিচয়?

২. আমার কী কর্তব্য? কি-ইবা করণীয় আছে?

৩. অতঃপর এখান থেকে কোথায় যাবো?

সে যাওয়া চূড়ান্ত ভাবে বিলীন হওয়া? না তার পরও কোন জীবন আছে। আছে সুখ বা দুঃখের প্রশ্ন। এসব মৌলিক প্রশ্নের জবাব সকলকে জানতে হবে। যে শিক্ষা ব্যবস্থায় এ সকল মৌলিক প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাওয়া যায় সেটাই প্রকৃত ও পরিপূর্ণ শিক্ষা। এ প্রশ্নগুলোর উত্তর বাদ দিয়ে কোন শিক্ষাই হতে পারে না আমাদের জন্য সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা। প্রচলিত আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এই প্রশ্নগুলোর উত্তর সু-কৌশলে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। তাই একে আর যা-ই হোক শিক্ষা বলা যায় না। বড় জোর কারিগরি প্রশিক্ষণ বলা যেতে পারে।

পাশ্চাত্য দর্শনে মানুষের পরিচয়

পাশ্চাত্য জগতে মানুষের পরিচয় দুইভাবে দেয়া হয়েছে।

১. একটি দল মানুষের বস্তুগত দিকটাকে বড় করে দেখে বিশ্বকে শিক্ষা দিলো মানুষ জন্তু-জানোয়ারের একটি পরিবর্তিত স্তর বৈ-আর কিছুই নয়। প্রতিযোগিতার এই জগতে যার শক্তি আছে সে-ই টিকে থাকবে। সবল দুর্বলকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। এটাই নাকি নিয়তি। তাই ভোগের সংসারে বেঁচে থাকার জন্যে যত ইচ্ছা ভোগ বিলাস করে যাও।

২. অপর একটি দল মানুষের বস্তুগত দিকটাকে বাদ দিয়ে আধ্যাত্মবাদের দিকে চরমভাবে ঝুঁকে পড়েছে। তারা বলে সংসার ঝামেলার স্থান। কাজেই এখান থেকে পালাও।

এ দু'টি প্রান্তিক দলের কেউই আসল মানুষের সন্ধান পায়নি।

মানুষের প্রকৃত পরিচয়

মানুষ হচ্ছে দেহ ও আত্মার সমন্বিত রূপ এর নাম। দেহ হচ্ছে আত্মার বাহন, আর আত্মা হচ্ছে দেহের তত্ত্বাবধায়ক। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে দেহটি দান করেছেন এ সৃষ্টিকে উপভোগ করার জন্য। দেহের তাগিদেই সৃষ্টিকে সে তন্ন তন্ন করে নানা রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারবে। আবার দেহের পবিত্রতার জন্যে আত্মাকেও সে সজীব ও প্রাণবন্ত রাখবে। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ একটি নৈতিক জীবন, নৈতিকতাই তার বৈশিষ্ট্য তাই তার জ্ঞানের বিকাশের সাথে থাকবে নীতিবন্ধন। পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হলে তাকে অনেক বিষয় জ্ঞান আহরণ করতে হবে, জানতে হবে অনেক কিছু। কিন্তু একাজ করতে গিয়ে কোথাও নৈতিকতাকে হারালে বা ভুলে গেলে চলবে না।

অন্যান্য জ্ঞান শিখার প্রয়োজনীয়তা

সমাজে শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য তাকে রাজনীতি চর্চা করতে হবে। তার বস্তুগত প্রয়োজন মিটাতে তাকে অর্থনীতির চর্চা করতে হবে। স্বাস্থ্য রক্ষার খাতিরে তাকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের চর্চা করতে হবে। এ ধরনের অসংখ্য প্রয়োজনে অসংখ্য শাস্ত্র তার অধ্যয়ন ও অনুশীলন করতে হবে। কিন্তু সব কিছুর চর্চা করতে হবে ঐ একই জীবন দর্শনের ভিত্তিতে। কিন্তু আমাদের দেশে প্রচলিত শিক্ষার (সাধারণ) ১ম শ্রেণী থেকে শেষ পর্যন্ত যা কিছু পড়ানো হয় তার প্রায় সবটুকুই ইসলামবিমুখ অনুর্বর মস্তিষ্কের ফসল। তাতে ইসলামের জীবন দর্শন আদৌ প্রতিফলিত হয় না।

বর্ণ পরিচয় থেকেই শুরু করা যাক- অ-তে অজগর, আ-তে আনারস ইত্যাদি। এখানে দেখার বিষয় হলো অজগর এটি একটি হিংস্র বিষধর জন্তু। এতে করে সরলমতি কচি শিশুর মনে নিশ্চয়ই মহৎ ভাবের উন্মেষ ঘটবে না। বরং তার মনে হিংস্রতার উন্মেষ ঘটবে। আর আনারস হলো একটি লোভনীয় খাদ্য বস্তু এর মাধ্যমে লোভ-লালসার পাশবৃত্তি জাগিয়ে তোলাই হবে শিশু শিক্ষার উদ্দেশ্য। কিন্তু এখানে যদি অ-তে অযু এবং আ-তে আল্লাহ পড়ানো হতো তাহলে শিশুর মনে এক পবিত্রতার ছাপ দেয়া সম্ভব হতো। আর ইসলাম এ ধরনের পুত-পবিত্র মনোবৃত্তি সৃষ্টির প্রয়াস পায় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে।

“লেখা পড়া করে যে গাড়ি ঘোড়ায় চড়ে সে” এ শিক্ষা মানুষকে বিলাস বাসনার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। দুধে পানি মেশানোর অংকের মাধ্যমে ছাত্রদের মধ্যে ভেজাল ও ধোঁকা দেয়ার প্রবণতা শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। সুদ কষা অংকের মাধ্যমে সুদকে একটি লাভজনক ও হালাল বস্তু হিসাবে পেশ করা হচ্ছে। দুধে পানি মেশানোর অংক এবং সুদকষা অংককে ইসলামী ছাঁচে ঢালাই করলে ঐ দু'টি অংকের ভাষা ও ভাবকে এমনভাবে প্রকাশ করা যায়, যাতে করে ঐ দু'টি কাজকে দুর্নীতি হিসাবে ছাত্রদের মনে জাগিয়ে দেয়া সম্ভব। যেমন ধরুন, গোয়ালা দুধের সাথে পানি মিশিয়ে ঠকালো? এবং মহাজন সুদী কারবারে যে লাভবান হয় তাতে সে কিভাবে অন্যায় শোষণ করে। এমন ধরনের ভাষা প্রয়োগ করে অংকগুলো সাজানো যেতে পারত। এমনভাবে প্রতিটি বিষয় আলোচনাকালে যদি নৈতিক দৃষ্টিকোণ না থাকে, যদি সেগুলো নৈতিকতার রসে সিঞ্চিত না হয় তবে শুধু আলাদাভাবে দ্বীনিয়াত বা ইসলামিয়াতের লেজুড় জুড়ে ছাত্রদেরকে ইসলামী শিক্ষা দেয়া সম্ভব নয়। বরং তা কাকের পুচ্ছে ময়ূরের পালক জুড়ে দেয়ার মতই হাস্যকর হয়ে দাঁড়াবে। এ ধরনের সংমিশ্রণের ফলে হিতে বিপরীত ফলই হয়ে থাকে। এর ফলে ধর্ম ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষার্থী আল্লাহ রাসূল ও আখিরাতের প্রভাব ও প্রয়োজনীয়তার সন্ধান পায় না। বরং অন্যান্য ক্ষেত্রে তাকে দেখানো হয় এ বিশ্ব চরাচরে আল্লাহ, রাসূল ও আখিরাতের কোন প্রয়োজন নেই। এগুলোকে বাদ দিয়েও আমরা সমাজ, রাষ্ট্র ও পৃথিবী পরিচালনা করতে পারি। প্রকারান্তরে শিক্ষার্থীকে এ কথাই শিখিয়ে দেয়া হয়, আল্লাহ রাসূল ও আখিরাতের কোন অস্তিত্ব নেই আর থাকলেও তাদের কোন প্রভাব মানব জীবনে নেই। মানুষ স্বাধীন সত্ত্বা নিয়ে স্বাধীনভাবে জীবন যাপনের অধিকারী। আল্লাহকে একান্ত মানতেই হয়, তবে তাকে আকাশ রাজ্যে স্থান দাও। জমিনে তার কোন প্রভুত্ব নেই।

এ ধরনের শিক্ষা দ্বারা মানুষ তৈরি করা তো সম্ভবই নয়। কোন আদর্শ প্রাণী তৈরি হবে কি না সে ব্যাপারেও সন্দেহ আছে। কারণ ধর্মহীনতার প্রভাবে প্রভাবিত এমন শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে বর্তমান বাংলাদেশে এমন একটি প্রজন্মের সৃষ্টি হয়েছে, যাদের অত্যাচার থেকে লোকালয়ের মানুষগুলোতো নিস্তার পাচ্ছেই না, সুন্দর বনের প্রাণীরাও আজ তাদের নির্যাতনের শিকার। এ অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য এখনই প্রয়োজন ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করা। ধর্ম নিরপেক্ষতা নির্ভর শিক্ষার বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে রুখে দাঁড়ানো।

লেখক: প্রভাষক, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়।

হিজাব : চেহারাই মূল

শাহ মমশাদ আহমদ

আল্লাহ্ পাক মানবজাতিকে নর ও নারী দু'শ্রেণীতে সৃষ্টি করেছেন। এ দুয়ের সৃষ্টির উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। উভয়কেই সৃষ্টি করেছেন তাঁর দাসত্ব ও ইবাদত বন্দেগীর জন্য। মহান আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ''আমি জিন ও মানবকে আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি''। [সূরা তুরঃ ৫৬]

নর-নারীর সৃষ্টির উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন হলেও উভয়ের মধ্যে আল্লাহ্ পাক একটি সীমারেখা টেনে দিয়েছেন। আর তা হচ্ছে হিজাব বা পর্দা ব্যবস্থা। প্রকৃত অর্থে পর্দা কোন বন্দিত্ব বা অবরোধ নয়। পর্দা নারী জাতির ইজ্জত সম্মানের প্রতীক। নারীর সতীত্ব ও মর্যাদার রক্ষাকবচ।

পর্দার মূল কথা হচ্ছে পরপুরুষের সামনে নারীদের রূপ-লাবণ্য প্রকাশ না করা। মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢেকে রাখাই হিজাব। হাত ও মুখমণ্ডল পর্দার অন্তর্ভুক্ত। আজকাল অনেক মা বোনদের মাথায় নেকাব আর মুখমণ্ডল খোলা রেখে ফ্যাশন পর্দা পালন করতে দেখা যায়। দু একটি টিভি চ্যানেলের কিছু ইসলামী চিন্তাবিদগণও ফ্যাশন পর্দার পক্ষে ফতোয়া দিয়ে যাচ্ছেন। তারা কোরআন ও হাদীসের কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে মুখমণ্ডল পর্দার অন্তর্ভুক্ত নয় বলে মুসলমানের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছেন। দ্বীন ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ হিজাব বা পর্দার অপব্যাখ্যা করে ইসলামকে আধুনিক রূপে উপস্থাপনের অপচেষ্টা মূলত ইসলামদ্রোহী শক্তিরই ইঙ্গিতে হচ্ছে কিনা তা আমাদের ভাবা উচিৎ।

নারীর মূখমণ্ডলসহ সারা শরীর ঢেকে রাখা ফরজ

পবিত্র কুরআনুল কারীমে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন, হে নবী! আপনি মুমিনদেরকে বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। ইহাই তাদের জন্য উত্তম পবিত্রতা। তারা যা করে আল্লাহ্ সে বিষয়ে অবগত এবং (অনুরূপভাবে) মুমিন নারীদেরকে বলে দিন, তারা যেন দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। সাধারণত যা প্রকাশ থাকে তারা যেন তা ব্যতীত অন্য কোন সৌন্দর্য (অন্য কারো নিকট) প্রকাশ না করে এবং বুক ওড়না দ্বারা আবৃত রাখে । তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুস্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, আপন নারীগণ, মালিকানাধীন দাসী, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ ও নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত

কারো নিকট তাদের রূপ সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তারা যেন তাদের গোপন আবরণ প্রকাশের জন্য সজোরে না হাঁটে। [সুরা নূরঃ ৩০,৩১] নারীর মুখমণ্ডল পর্দার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার উপর এ আয়াত পাঁচভাবে প্রমাণ বহন করে।

১. আল্লাহ পাক মুমিনা নারীদের তাদের লজ্জাস্থান হেফাজত করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর লজ্জাস্থান হেফাজত করার একটি বড় মাধ্যম গাইরে মাহরামের সম্মুখে চেহারা ঢেকে রাখা। কেননা চেহারা খোলা রাখলে গাইরে মাহরাম পুরুষ সাধারণত তার চেহারার সৌন্দর্যের দিকে তাকাবে। অতঃপর এ কুদৃষ্টি যিনা-ব্যভিচার এর বড় কারণ হয়ে যেতে পারে। যা অতি বাস্তব এবং হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত আর ইসলামের মূলনীতিমালায় অপরাধের মাধ্যমও অপরাধের ন্যায় হারাম।

২. এ আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ''তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষদেশ পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখে''। মাথার ওড়না বুক পর্যন্ত ঢেকে রাখার নির্দেশ দ্বারা চেহারা ঢাকারও নির্দেশ হয়ে গেছে। কেননা মাথা, গলা এবং বক্ষ ঢাকা থেকে চেহারা ঢাকার গুরুত্ব অনেক বেশী। যেহেতু চেহারা সৌন্দর্যের মূলকেন্দ্র এবং ফিতনার স্থান। মানুষ কারো সৌন্দর্যের ব্যাপারে জানতে চাইলে যদি বলা হয় মুখমণ্ডল খুব সুন্দর, তখন সে তার শরীরের অন্যান্য অঙ্গ দেখার প্রয়োজন মনে করে না। এভাবে অমুক সুন্দরী বলতে অমুকের সৌন্দর্যকে বুঝানো হয়। এতে বুঝা গেল কারো সৌন্দর্য যাচাই করার আসল স্থান চেহারাই। সুতরাং একথা কীভাবে হতে পারে যে, আল্লাহ পাক অপেক্ষাকৃত কম ফিতনার স্থানগুলো ঢেকে চলাফেরার নির্দেশ দিবেন আর যে অঙ্গ সবচেয়ে বেশী ফিতনার স্থান তা খোলা রাখার অনুমতি দিবেন, এটা কখনও হতে পারে না।

৩. আল্লাহ পাক উক্ত আয়াতে বলেন, "তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশমান তা ব্যতীত তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে" এখানে প্রকাশমান সৌন্দর্য বলতে যা প্রকাশ করতে নারী বাধ্য থাকে। যেমন নারীর পরিধেয় উপরের কাপড় । অতঃপর আল্লাহ পাক বলেন, "তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তবে তাদের স্বামীর পিতা (শ্বশুর) এর সম্মুখে প্রকাশ করতে পারবে। এতে বুঝা গেল আয়াতে বর্ণিত প্রথম সৌন্দর্য এবং দ্বিতীয় সৌন্দর্য এক নয়। প্রথম সৌন্দর্যের অর্থ এমন সৌন্দয যা গোপন করা সম্ভব হয় না (যেমন বোরকার কাপড়) আর দ্বিতীয় সৌন্দর্যের স্থান, যেমন মুখ, পেট, হাত, পা ইত্যাদি। যদি আয়াতের উভয় স্থানে সৌন্দর্য একই অর্থে হত অর্থাৎ গোপন সৌন্দর্য, তাহলে ১ম বার ২য় বার এ সৌন্দর্য কাউকে দেখানো জায়েয আর কাউকে দেখানো নাজায়েয বলার কোন অর্থই থাকে না। এতে প্রমাণ হল গাইরে মাহরামের সম্মুখে মুখ খোলা রাখা হারাম।

আল্লাহ পাক মুসলিম নারীদের নির্দেশ দিয়েছেন, যখন তারা কোন বিশেষ প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হয় তখন তারা যেন তাদের মাথা ও মুখমণ্ডল বড় চাদর দিয়ে ঢেকে নেয়। তবে পথ দেখার জন্য উভয় চোখ খোলা রাখতে পারবে।

৪. এ আয়াতে আল্লাহ পাক অনুমতি দিয়েছেন কামনামুক্ত চাকর এবং নাবালেগ অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকদের সম্মুখে নারী বাতেনী সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারে। এ দু'শ্রেণীর ব্যক্তি ছাড়া অন্যের নিকট সৌন্দর্য প্রকাশ করা জায়েয নয়। নাজায়েয হওয়ার কারণ হল ফিতনা ও কুসম্পর্ক হওয়ার ভয়। চেহারা দেখেই যৌনকামনাযুক্ত পুরুষ ফিতনায় জড়িয়ে পড়ে। তাই চেহারার পর্দা অপরিহার্য।

৫. এ আয়াতে পায়ের অলংকারের আওয়াজ দ্বারা পুরুষ নারীর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ার আশংকায় নারীকে জোরে পদচারণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এমতাবস্থায় একজন নারীকে জনসম্মুখে চেহারা খুলে বের হওয়ার অনুমতি কিভাবে থাকতে পারে, সহজেই বিষয়টি বুঝা যায়।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, বৃদ্ধা নারী যারা বিবাহ বন্ধনের আশা রাখে না যদি তারা সৌন্দর্য প্রকাশ না করে তাদের বস্ত্র খুলে রাখে, তাদের জন্য তা করা দোষ নয় তবে এ হতে তাদের বিরত থাকাই উত্তম। [সূরা নূরঃ ৬০]

এ আয়াতে বিয়ের অনুপযুক্ত বৃদ্ধা নারীদের জন্য বোরকা না পরে চলাফেরা করা সৌন্দর্য প্রকাশ না করার শর্তে এবং হাতের তালু ও মুখমণ্ডল খোলা রাখা জায়েয বলা হয়েছে। এতে বুঝা যায়, যারা যুবতী এবং বিয়ের উপযুক্ত তাদের বোরকা ছাড়া চলাফেরা করা এবং হাতের তালু ও মুখমণ্ডল খুলে যাতায়াত করার অনুমতি নেই। যদি তাই না হয়, তাহলে আয়াতে বৃদ্ধা নারীর শর্ত লাগানোর কোন অর্থ থাকে না।

আল্লাহ পাক বলেন, হে নবী আপনার পত্নীগণ ও কন্যাগণ এবং মুমিনগণের স্ত্রীগণ ও কন্যাদেরকে বলে দিন, তারা যেন তাদের চাদরগুলো মাথা হতে মুখমণ্ডলের নিম্নদিকে ঝুলিয়ে দেয়। একারণে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। [সূরা আহযাবঃ ৫৯]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাসসির সম্রাট হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন আল্লাহ পাক মুসলিম নারীদের নির্দেশ দিয়েছেন, যখন তারা কোন বিশেষ প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হয় তখন তারা যেন তাদের মাথা ও মুখমণ্ডল বড় চাদর দিয়ে ঢেকে নেয়। তবে পথ দেখার জন্য চোখ খোলা রাখতে পরবে।

মহানবী সা. বলেন, তোমাদের কেউ যদি কোন নারীকে বিবাহের প্রস্তাব দেয় তাহলে তার জন্য কোন গুনাহ নেই সে নারীর কিছু অংশ (মুখমণ্ডল) দেখা। যদি এ দেখা হয় বিবাহের প্রস্তাবের জন্য, যদিও নারীর অজান্তে হয়। [মুসনাদে আহমদ]

হযরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সা. ফজরের নামাজ পড়তেন। কিছু নারীগণও বড় চাদর গায়ে দিয়ে নামাজে শরিক হতেন। অতঃপর তারা তাদের গৃহে ফিরে যেতেন। তাদেরকে কেউই অন্ধকারের কারণে চিনতে পারত না। হযরত আয়েশা রা. বলেন, বর্তমান নারীদের অবস্থা রাসূল সা. যদি দেখতেন যা আমরা দেখছি, তাহলে তিনি তাদের মসজিদে আসা বন্ধ করে দিতেন, যেভাবে বনি ইসরাইল তাদের নারীদের মসজিদে আসা বন্ধ করেছিলো।

এ হাদীস থেকে নারীদের মুখমণ্ডল যে পর্দার অন্তর্ভূক্ত তা দুভাবে বুঝা যায়। প্রথমত সাহাবা পত্নীগণ রাসূল সা. এর যুগে চেহারা ঢেকে পর্দার মাধ্যমে চলা ফিরা করতেন। অথচ সে যুগ ছিল সর্বোত্তম যুগ। সে যুগের নারীরা কুরআন হাদীস মতে পরবর্তী নারীদের জন্য অনুসরণীয় ছিলেন। মুখমণ্ডল ঢেকে পর্দা করা তাদের জন্য ফরজ ছিল এবং তারা ঐ ভাবে আমলও করতেন, তাহলে এ যুগের নারীদের জন্য কি মুখমণ্ডল ঢাকা ফরজ হবে না? অথচ এ যুগে বেহায়াপনা আর ইভটিজিং এর কথা কার অজানা?

দ্বিতীয়ত হযরত আয়েশা রা. এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর মত বড় মর্যাদার অধিকারী সাহাবীগণ তাদের যুগ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, আমাদের যুগে নারীদের যে আচরণ আমরা দেখছি তা যদি রাসূল সা. দেখতেন, তাহলে তিনি নারীদের মসজিদে আসা বন্ধ করে দিতেন। অর্থাৎ বোরকা পড়েও মসজিদে আসার অনুমতি দিতেন না। চৌদ্দশ বৎসর পর আমাদের যুগের অবস্থা কি? তা সকল সচেতন মানুষের বোধগম্য।

নবী সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি অহংকার করে তার কাপড় টাখনুর নিচ পর্যন্ত পরে আল্লাহ তায়ালা কেয়ামত দিবসে তার দিকে (রহমতের) দৃষ্টি দিবেন না। এ কথা শুনে হযরত উম্মে সালমা রা. বললেন, তাহলে নারীরা কি করবে? রাসূল সা. বললেন, তোমরা টাখনুর নিচে এক বিঘত পর্যন্ত লম্বা করবে। হযরত উম্মে সালমা রা. বললেন, এতেও হাঁটার সময় পা দেখা যাবে। তখন রাসূল সা. বলেন, তাহলে তারা টাখনুর নিচে এক হাত পরিমাণ লম্বা করবে, এর বেশি নয়।

এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, নারীদের পাও সাধারণ অবস্থায় পর্দার অন্তর্ভূক্ত। এ বিষয়টি সাহাবায়ে কেরামের স্ত্রীগণেরও জানা ছিল। আর এতে কোন সন্দেহ নেই নারীর পায়ের ফিতনা চেহারার ফিতনা হতে অনেক কম তা সত্ত্বেও 'পা'কে পর্দায় শামিল করা হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় চেহারা পর্দা করা জরুরী।

হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূল সা. এর সাথে ইহরাম বাঁধা অবস্থায় থাকতাম, আমাদের পাশ দিয়ে আরোহী দল অতিক্রম করত। যখন তারা আমাদের নিকটে পৌঁছে যেতেন, তখন আমাদের প্রত্যেক নারী তাদের মাথার উপর দিয়ে মুখমণ্ডলে চাদর ঝুলিয়ে দিতেন। আর যখন তারা অতিক্রম করে চলে যেতেন, আমরা আমাদের মুখ খুলে ফেলতাম। [আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ]

এ হাদীস থেকে এ কথা বুঝা যায় যে, মহিলা সাহাবীগণ ইহরামের অবস্থায়ও যথাসম্ভব মুখ ঢেকে রাখার ব্যাপারে যত্নবান ছিলেন। মুখমণ্ডল পর্দার অন্তর্ভূক্ত না হলে এরূপ গুরুত্ব দেওয়ার কথা নয়।

যুক্তির দৃষ্টিকোণে হিজাবের মূল উদ্দেশ্যের উপর লক্ষ করলে এ কথা সকলেরই মানতে হবে, চেহারা ব্যতিরেকে পর্দা হয় না, মুখ খোলা অবস্থায় নারীর চলা ফেরা দ্বারা লজ্জা-শরম লোপ পায়। লজ্জা নারীর ভূষণ, ঈমানের অঙ্গ। চেহারা খোলা রেখে হিজাব কখনও ইসলামী নিকাব নয়, তা স্টাইল হতে পারে।

যে সমস্ত আলেমগণ নারীর মুখমণ্ডল ও হাতের তালু খোলা রাখা জায়েয মনে করেন, তারা কিছু দলিল পেশ করে থাকেন, এ বিষয়ে একটু পর্যালোচনা করা দরকার।

তাদের প্রথম দলিল, সূরা নূরের ৩১ নং আয়াত “এবং তারা তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ করবে না, তবে যে সৌন্দর্য সাধারণত প্রকাশিত হয়”। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুখমণ্ডল, হাতের তালু ও আংটি পর্দার অন্তর্ভুক্ত নয়।

দ্বিতীয় দলিল, হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রা. একবার পাতলা কাপড় পরে রাসূলের সা. দরবারে প্রবেশ করলে তিনি সা. অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন হে আসমা, নারী যখন প্রাপ্ত বয়স্ক হবে তখন তার জন্য মুখ ও দু’হাতের তালু ব্যতীত অন্য কিছু দেখা যাওয়া জায়েয নয়।

এ ছাড়াও আরো কয়েকটি হাদীস পেশ করে থাকেন। এ দলিলগুলো ইসলামের মৌলিক নীতিমালার আলোকে খুবই দুর্বল।

প্রথম দলিলে হযরত ইবনে আব্বাসের উদ্ধৃতি দিয়ে যে মন্তব্য বর্ণিত হয়েছে যে, মুখ ও হাতের তালু পর্দার জন্য জরুরী নয়, এটা পর্দার আয়াত নাজিল হওয়ার পূর্বের হুকুম, এটি শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এর উক্তি।

এ দলিলের জবাব এভাবে দেওয়া যায় যে, ইবনে আব্বাস রা. এর তাফসীর তখনই গ্রহণ যোগ্য হবে, যখন এর সাথে অন্য কোন তাফসীর বিরোধ না হয়। আর যদি বিরোধ হয়, তাহলে উভয় তাফসিরের মাঝে যে তাফসীরটি অন্যান্য দলিলের ভিত্তিতে প্রাধান্য পাবে তা গ্রহণ করা হবে। এ মূলনীতির আলোকে আমরা তালাশ করে পাই, হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর তাফসীর আরেকজন বিশিষ্ট সাহাবী হযরত ইবনে মাসউদ রা. এর তাফসীরের সাথে সাংঘর্ষিক। তিনি কুরআন শরীফে বর্ণিত আয়াতের তাফসীর করেছেন, চাদর বা কাপড়ের বাহ্যিক সৌন্দর্য এবং সে সমস্ত অঙ্গ যা নারী প্রকাশ করতে বাধ্য। এ দুই তাফসিরের মধ্যে ইসলামের মেজাজ অনুযায়ী হযরত ইবনে মাসউদ রা. এর তাফসীর অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য।

হযরত আয়েশা রা. এর বর্ণিত হাদীসটি হাদীস শাস্ত্রের মৌলিক নীতিমালা অনুযায়ী মুনকাতি বা সনদ কর্তিত। যা খুবই দুর্বল। যা কুরআনুল কারীম ও সহীহ্ হাদীসের মুকাবিলায় গ্রহণযোগ্য নয়।

এ ব্যাপারে বর্ণিত অন্যান্য হাদীসগুলোও খুবই দুর্বল। এ গুলোকে সহীহ্ মানলেও এ বিষয়ে দলিল হিসাবে মানা যায় না। কেননা হতে পারে তা পর্দার হুকুম অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বের ঘটনা। পর্দার হুকুম অবতীর্ণ হয়েছে ৩য় বা ৫ম হিজরীতে।

পরিশেষে বলব, আজ সারা বিশ্বে নারীরা নির্যাতিত, ধর্ষিত। দেশেদেশে নারীরা ইভটিজিং এর শিকার। এ থেকে পরিত্রাণের জন্য ইসলাম নির্দেশিত হিজাবের প্রতি বিধর্মী নারীরা ধাবিত হচ্ছে। এমনি অবস্থায় সঠিক পর্দার হুকুম নারীর প্রতি পৌঁছানোই হবে ইসলাম প্রীতি। বিভ্রান্তি সৃষ্টি হবে ইসলাম বিদ্বেষী শক্তির সহায়তা। আল্লাহ পাক আমাদের ইসলামের নির্দেশাবলী সঠিকভাবে বুঝার এবং আমল করার তৌফিক দিন।

লেখক: মুহাদ্দিস, জামেয়া মাদানিয়া ইসলামিয়া কাজিরবাজার সিলেট।

শ্রমিকের শ্রম : ইসলামী মূল্যায়ন

মাওলানা আব্দুর রহমান ফারুকী

মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালা বিশ্বজাহানকে অত্যন্ত সুন্দর ও সুচারুরূপে পরিচালনা করছেন। সুনিপুণ হাতে প্রতিটি বস্তুকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। মানবসম্প্রদায়কে এমন সামাজিক জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন যে, চলা ফেরায়, কাজ কর্মে একে অপরের মুখাপেক্ষী হচ্ছে। গরীব শ্রেণী যেমন ধনবানদের মুখাপেক্ষী তেমনি অনেক ক্ষেত্রে বিত্তশীলরাও গরিবদের মুখাপেক্ষী হচ্ছে। মানুষের জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত অনেক কিছুর প্রয়োজন দেখা দেয়। এসব কিছু তৈরি ও উৎপাদনে একশ্রেণীর লোকের অর্থ যোগান দিতে হয় অপর এক শ্রেণীর লোকের শ্রম বিনিয়োগ করতে হয়। তবেই ঐ প্রয়োজনীয় বস্তুটি প্রস্তুত হয়। কিছু মানুষ আছেন যারা অর্থ যোগান দিতে সক্ষম কিন্তু শ্রম দিতে অপারগ। আবার এমন কিছু লোক রয়েছে যারা শ্রম দিতে সক্ষম কিন্তু তাদের কাছে অর্থ নেই। তাই এ দুয়ের মাঝে সমতা বিধান করে প্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্য ও আসবাবপত্র উৎপাদন ও তৈরি করতে হয়। আবার দুই পক্ষের শক্তি একসঙ্গে মিলে তৈরি হয় কলকারখানা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা। এদের এক পক্ষকে বলা হয় মালিক আর অপর পক্ষকে বলা হয় শ্রমিক। যেহেতু ইসলামী অর্থনীতিতে শারীরিক ও মানবিক উভয় প্রকার মেহনতই শ্রমের অন্তর্ভুক্ত। তাই ইসলামের পরিভাষায় শ্রমিক তাকেই বলা হয়, যে ব্যক্তি কোন কিছুর বিনিময়ে নিজের শ্রমকে বিক্রি করে। আর মালিক তাকেই বলা হয়, যে ব্যক্তি কারো নিকট থেকে বিনিময়ের মাধ্যমে ফায়দা ভোগ করে। [ইসলামে শ্রমিকের অধিকার পৃঃ ৯১]

ইসলামের দৃষ্টিতে শ্রম

স্বাভাবিকভাবেই শ্রমিক শ্রেণীর লোকজনের মন ছোট থাকে। তাদের হাতে পুঁজি না থাকাটাই তাদের এই মানসিকতার কারণ। কেমন যেন নিজের জীবনকে পরনির্ভর মনে হয়। তাদের মন যেন দুর্বল না হয় সেদিকে ইসলাম গুরুত্ব দিয়েছে। ইসলামই শ্রমিককে হীনমন্যতা থেকে মুক্তি দিয়েছে। শ্রমিকের হাতে পুঁজি না থাকলেও তার গতরে শক্তি আছে। পুঁজির মূল্যের চেয়ে সেই শক্তির মূল্য কোন অংশেই কম না, শ্রম ব্যয় করতে না পারলে সকল পুঁজি বৃথা যাবে। নিজের শরীরে আল্লাহর দেয়া শক্তি ব্যয়ে উপার্জন করা কোন লজ্জার বিষয় না। বরং তা প্রশংসার দাবী রাখে। কেননা আল্লাহ তায়ালা নামাজ শেষ হয়ে গেলে হালাল রিজিকের

তালাশে বের হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং যে কষ্টেই হোক হালাল রিজিকের ব্যবস্থা করা অবশ্যই প্রশংসনীয় বিষয়। মুসনাদে আহমদে রাসূল সা. থেকে এ মর্মে বর্ণিত হয়েছে- শ্রমজীবীর উপার্জন সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ যদি সে সৎপথে উপার্জন করে। হযরত রাফে ইবনে খাদীজ রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল সা. কে জিজ্ঞাসা করা হলো শ্রেষ্ঠ উপার্জন কোনটি ? জবাবে তিনি বললেন-নিজের শ্রমলব্ধ উপার্জন এবং হালাল ব্যবসার মাধ্যমে যা উপার্জন হয়। [মিশকাতঃ ২৪২]

আমরা গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখতে পাই যে, প্রায় সকল নবীগণই নিজ শ্রম ব্যয়ে উপার্জন করেছেন। সকলে বকরী চরিয়েছেন। দাউদ আ. লোহা দ্বারা বর্ম তৈরি করে জীবিকা চালাতেন। এমনকি আমাদের নবী শ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ সা. ও দীর্ঘদিন খাদিজা রা. এর কাছে শ্রম ব্যয় করে জীবিকা নির্বাহ করেছেন। মূসা আ. হযরত শুয়াইব আ. এর নিকট শ্রম ব্যয়ে জীবন চালিয়েছেন। তাছাড়া ইসলাম ভিক্ষাবৃত্তিকে ঘৃণা করে। তাই ঘৃণ্য ভিক্ষাবৃত্তি থেকে শ্রমের মাধ্যমে বেঁচে থাকা যায়।

ইসলামী সমাজে শ্রমিকের অবস্থান

ইসলামী সমাজে ধনী গরীবের ভেদাভেদ নেই। সাদা কালোর পার্থক্য নেই। মানুষ হিসেবে সকলেই সমান। পরস্পর পরস্পরের ভাই। রাসূল সা. বলেন এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। তিনি আরো বলেন, আজমের উপর আরবের, সাদার উপর কালোর আর কালোর উপর সাদার কোন প্রাধান্য নেই। আল্লাহর কাছে মানুষের মর্যাদার মাপকাঠি হলো তাকওয়া পরহেজগারী। উঁচু-নিচু, মালিক-শ্রমিকের কোন পার্থক্য নেই। এ মর্মে আল্লাহ তায়ালা বলেন, তোমাদের মধ্যে তারাই অধিক মর্যাদাবান যারা বেশি খোদাভীরু ও পরহেজগার। কানযুল উম্মালের এক হাদীসে বর্ণিত, রাসূল সা.বলেন, এমনও হতে পারে যে খাদেম তার মনিব অপেক্ষা উত্তম এবং এও বিচিত্র নয় যে, আল্লাহর নিকট খাদেমের কর্মই অধিক পছন্দনীয় হবে। ইসলামে যেহেতু ধনী-গরীবের কোন ভেদাভেদ নেই তাইতো দেখা যায় ইসলামের শ্রেষ্ঠ মুয়াজ্জিন হযরত বেলাল রা. ছিলেন একজন কৃতদাস। শ্রেষ্ঠ মানব মুহাম্মদ সা. তার প্রিয় কন্যা ফাতেমা রা. কে হযরত আবু বকর রা. এর মত ব্যবসায়ী প্রার্থী থাকা সত্ত্বেও আলী রা. এর মত একজন শ্রমজীবীর হাতেই তুলে দিলেন। অথচ আলী রা. কে অনেক সময় ইহুদীদের ক্ষেত্রেও বদলা দিতে দেখা গেছে। ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর রা. একজন রাখাল ছিলেন। নবীকন্যা ফাতেমা রা. কাজ করতে করতে হাতে দাগ পড়ে গিয়েছিল। প্রায় সকল সাহাবা পরিশ্রম করে জীবন যাপন করেছেন।

ইসলামে শ্রমিক মালিকের সম্পর্ক

ইসলামে শ্রমিক মালিকের সম্পর্ক হলো এক সৌহার্দপূর্ণ ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক। শ্রমিক-মালিক উভয়ই ভাই ভাই। এক ভাই অন্য ভাইয়ের কাজে-কর্মে যেন সহযোগিতা করছে। মালিক শ্রমিকের উপর জুলুমের আচরণ করে না আবার শ্রমিকও মালিকের কাজে অলসতা করবে না। এটাই ইসলাম শিক্ষা দেয়। শ্রমিক-মালিকের সম্পর্ক কেমন হবে এ মর্মে আল্লাহ তায়ালা হযরত শুয়াইব আ. ও হযরত মুসা আ. এর ঘটনা বর্ণনা করেন। যেখানে মালিক শুয়াইব আ. শ্রমিক মুসা আ. কে নিয়োগের সময় বলেছিলেন আমি আপনার উপর অনর্থক কষ্টের বোঝা চাপিয়ে দিতে চাই না। আল্লাহর ইচ্ছায় আপনি আমাকে সৎকর্মশীলদের মধ্য থেকে পাবেন। [কাসাসঃ ২৭] রাসূল সা. ও শ্রমিক মালিকের সম্পর্কের কথা এভাবে বলেছেন, যারা তোমাদের কাজ করে তারা তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ এদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। [বুখারীঃ]

এর দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মালিক শুধু পার্থিব স্বার্থ উদ্ধারের জন্য শ্রমিকের উপর অতিরিক্ত কষ্ট চাপিয়ে দিবে না বরং তাকে পরকালের প্রতি লক্ষ্য রেখে সৎকর্মপরায়ণ হতে হবে। এক ভাই অপর ভাইয়ের কাছে যে আশা করতে পারে শ্রমিকও মালিকের নিকট তা আশা করতে পারে। ভাইকে ভাই যেমন সহযোগিতা করে তেমনি সুযোগ হলে মালিকও শ্রমিককে সহযোগিতা করবে। শ্রমিকের সঙ্গে কেমন সম্পর্ক থাকা চাই কানযুল উম্মালে বর্ণিত হাদীসের প্রতি দৃষ্টি দিলে তা অতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রাসূল সা. বলেন, তোমরা অধীনস্থদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে, তাদেরকে কোন রকমের কষ্ট দেবে না, তোমরা কি জান না তাদেরও তোমাদের মত একটি হৃদয় আছে। ব্যথা দিলে তারা দুঃখ পায়। কষ্ট অনুভব করে। আরাম ও শান্তি দিলে তারা খুশি হয়। তোমাদের কি হল যে, তোমরা তাদের প্রতি আন্তরিকতা প্রদর্শন করো না। তিরমিযী শরীফের একটি হাদীসে রাসূল সা. চাকর ও শ্রমিকদের অপরাধকে দৈনিক সত্তর বার হলেও ক্ষমা করে দিতে বলেছেন। অপর দিকে অত্যাচারী ও অসদাচরণকারী মালিককে সাবধান করে দিয়ে রাসূল সা. ঘোষণা করেন, অসদাচরণকারী মালিক বেহেস্তে প্রবেশ করতে পারবে না। [মাজমাউয যাওয়ায়িদ] মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে, রাসূল সা. বলেছেন, যারা তোমাদের কাজ করছে তারা তোমাদের ভাই। যা নিজে পরবে তাই তাদের পরতে দেবে আর নিজে যা খাবে তাই তাদের খেতে দেবে। সাহাবায়ে কেরাম এ হাদীসের উপর আমল করতেন এমনকি অনেক সময় নিজেদের উপর চাকরদের প্রাধান্য দিতেন। একবার হযরত উমর রা. বলেছিলেন, আল্লাহ ঐ জাতিকে অভিশাপ করুন, যারা নিজেদের খাদেমদের নিয়ে একসঙ্গে খেতে ঘৃণাবোধ করে। [আল আদাবুল মুফরাদ]

শ্রমিকের গুণাবলী

আমরা জানি, সম্পর্ক দুদিক থেকে হতে হয়। শুধু একদিকের ভালো আচরণে সুসম্পর্ক গড়ে উঠবে না। তাই ইসলাম শ্রমিকদের কী কী গুণ থাকা চাই তা বলে দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা একজন শ্রমিকের এমন কতগুলো গুণের কথা বলেছেন যা দ্বারা মালিক শ্রমিকের মধ্যকার সম্পর্ক উৎকর্ষ ও দৃঢ় হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, নিশ্চয়ই সর্বোত্তম শ্রমিক হলো, যে শক্তিশালী ও আমানতদার বা দায়িত্বশীল। [কাসাস] সুতরাং বুঝা গেল একজন শ্রমিক মালিকের কাজকে সম্পূর্ণ নিজের কাজ মনে করবে। দায়িত্বে সচেতন ও কর্মোদ্যমী হবে। বিশ্বস্ততার অধিকারী ও নির্ভরযোগ্য হবে। অত্যন্ত আন্তরিকতা ও পারদর্শিতার পরিচয় দিতে হবে। নিজের সাধ্যানুযায়ী সুন্দর ও সুশৃঙ্খলার সঙ্গে কাজ সমাপ্ত করতে হবে। কোন শ্রমিক কাজে অলসতা করলে কিংবা ফাঁকি দিলে তা মাপে কম দেয়ার অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে। আর যারা মাপে কম দেয় তাদের ব্যাপারে কঠিন শাস্তির ধমকি এসেছে। আর যারা মালিকদের কাজ সুন্দরভাবে আদায় করবে তাদের দিগুণ সাওয়াব দেওয়া হবে। হাদীসে এসেছে তিন প্রকার ব্যক্তিকে দিগুণ সাওয়াব দেওয়া হয়। তাদের মধ্যে একজন ঐ ব্যক্তি যে মালিকের হক আদায় করে এবং সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর হকও আদায় করে। [মিশকাত] তবরানীর এক বর্ণনায় এসেছে, যে শ্রমিক আল্লাহ এবং নিজ মালিকের অনুগত থাকে আল্লাহ তাকে মালিকের চেয়ে সত্তর বছর আগে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

শ্রমিকের অধিকার

ইসলাম সবকিছুর পাশাপাশি শ্রমিকের অধিকার পূর্ণ নিশ্চিত করেছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন স্থানে জুলুম ও অত্যাচার থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। রাসূল সা.ও জুলুম করা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। তিনি ইরশাদ করেন, জুলুম ও শোষণ কিয়ামতের দিন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যাওয়ার কারণ হবে। [বুখারী] বুখারী শরীফের অন্য একটি হাদীসে শ্রমিকদের পূর্ণ অধিকার ফুটে ওঠে। রাসূল সা. শ্রমিকদের সম্পর্কে বলেন, এরা তোমাদের ভাই তোমাদের খিদমত করছে। আল্লাহ এদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন, তাই যার ভাই তার অধীনে রয়েছে সে যেন তাকে তা খেতে দেয় যা সে নিজে খায় । যা সে নিজে পরে তাই পরতে দেবে। আর যে কাজ তার জন্য অতি কষ্টকর সে কাজের বোঝা তার উপর চাপিয়ে দিবে না। অগত্যা যদি সে রকম কোন কাজ করতেই হয় তবে নিজে তাকে সাহায্য করবে। রাসূল সা. শ্রমিককে অনেক বড় অধিকার দিয়েছেন। তাকে আল্লাহর শ্রমিক বলে ঘোষণা করেছেন। মুসনাদে আহমদের এক

বর্ণনায় পাওয়া যায়, রাসূল সা. বলেন, মজুর ও শ্রমিককে তার শ্রমোৎপন্ন দ্রব্য হতেও কিছু অংশ দিও। কারণ আল্লাহর মজুরকে কিছুতেই বঞ্চিত করা যায় না। অন্যত্রে তিনি বলেন, তোমাদের কারো খাদেম যদি খাবার প্রস্তুত করে নিয়ে আসে তবে তাকে সে খানায় নিজের সঙ্গে শরিক করে নিও। কারণ সে তোমার জন্যই আগুন ও ধোঁয়ার জ্বালা সহ্য করেছে। [বুখারী] মালিককে উৎসাহিত করত রাসূল সা. বলেন, তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই যে অধীনস্থদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে। শ্রমিকের পাওনা নিশ্চিত করত রাসূল সা. বলেন- মজুরের ঘাম শুকানোর আগেই তার পাওনা আদায় করে দিও। [বুখারী] রাসূল সা. বুখারী শরীফের অন্য জায়গায় ইরশাদ করেন- 'মালদারের মাল থাকা সত্ত্বেও টালবাহানা করা এক (অসহনীয়) জুলুম।' তাই শ্রমিকের শ্রম নিয়ে খেলা করা যায় না। তার মজুরী আদায়ে টাল বাহানা করা মারাত্মক অন্যায়।

বর্তমান প্রেক্ষাপট

আমরা জানতে পেরেছি যে ইসলাম শ্রমিককে কী পরিমাণ অধিকার ও মর্যাদা দিয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হলো, বর্তমানে শ্রমিকরা তাদের সেই সম্মান ও অধিকার তো পাচ্ছেই না বরং সমাজের সবচেয়ে নিকৃষ্ট বস্তুতে পরিণত হয়েছে। পূর্ণ শ্রম দেয়ার পরও একজন শ্রমিক তার মজুরী আদায় করতে পারছে না। তাদের সুযোগ সুবিধার প্রতি মালিকরা ভ্রুক্ষেপ করছে না। এমনকি তারা তাদের অধিকারের কথা বলতে গেলে অসহনীয় জুলুমের শিকার হতে হয়। তাই আসুন আমরা শ্রমিক মালিকের মাঝে ইসলামী সম্পর্ক বাস্তবায়ন করি। তাদের ন্যায্য অধিকার আদায় করি। তাদের মাঝে ও নিজেদের মাঝে তাকওয়া ও পরহেজগারী আনার চেষ্টা করি। তাহলে ইনশাআল্লাহ আর কখনো হরতাল ধর্মঘট অবরোধ ও যন্ত্রপাতি ভাংচুর এবং হত্যা মামলার মত অপ্রীতিকর ঘটনার সম্মুখীন হতে হবে না। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

লেখক: মুহাদ্দিস, আল-জামিয়াতুল আরাবিয়া আনওয়ারুর রাহমানিয়া

কোণাপাড়া ডেমরা ঢাকা

খুলুকে আযীমের মূর্তপ্রতীক মহানবী সা.

মাওলানা খুরশীদ আলম কাসেমী

আজ থেকে চৌদ্দশ বৎসর আগে গগণছোঁয়া আঁধার কালো এক অধ্যায় অতিক্রম করেছিল পৃথিবী। ইতিহাসের নিকৃষ্টতম দৃষ্টান্তে পরিণত হয়েছিল সে দিনের আরব। রৌদ্র কঠিন মরু প্রকৃতিও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল জুলুমের ভারে। নির্যাতন, নিপীড়ন ও শোষণ-অত্যাচারে ভারী হয়ে উঠেছিল আকাশ বাতাস আর পাখির কলধ্বনি। বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দেও ভেসে উঠেছিল জীবন্ত প্রথিত শিশু কন্যার করুণ আর্তনাদ। উন্নত চরিত্রের পরাকাষ্ঠাসম্পন্ন একজন পথপ্রদর্শকের অভাবে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল সেই আরবের জনপদ। এমনি এক নাজুক সন্ধিক্ষণে মহান প্রতিপালক সেখানে নবী হিসাবে প্রেরণ করেন খুলুকে আযীমের মূর্তপ্রতীক মুহাম্মদ সা. কে। নবীকুল শিরোমণি মুহাম্মদ সা. ছিলেন যাবতীয় গুণাবলীর সর্বোচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত।

উন্নত চরিত্র

সমগ্র জগতের তাযকিয়া ও চরিত্র গঠনের মহান দায়িত্ব যাকে অর্পণ করেছেন সেই মুযাক্কির শ্রেষ্ঠ চরিত্র সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ পাক ঘোষণা করতে গিয়ে বলেন, "হে নবী, নিশ্চয় আপনি উন্নত চরিত্র মাধুরীর উপর অধিষ্ঠিত।" [সূরা ক্বলমঃ ৪]

উন্নত চরিত্রকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। এক. খুলুকে হাসানা, দুই. খুলুকে কারীম, তিন. খুলুকে আযীম। রাসূল সা. ছিলেন খুলুকে আযীমের অধিকারী। আপন চরিত্রের বলিষ্ঠতায় প্রত্যয়ী। নবী নিজেই বলেন, "আমি প্রেরিতই হয়েছি উৎকৃষ্ট চরিত্রের পূর্ণতা সাধনের জন্যে। একজন পুরুষ চরিত্রের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সাক্ষী তার আপন স্ত্রী।"

এই ক্ষেত্রে আদর্শ স্বামীর প্রিয়তমা সহধর্মী হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. বলেন, "পবিত্র কুরআনই ছিল তার পূর্ণ চরিত্র।" প্রশংসার এ দৃপ্ত বাণীগুলো সবই রাসূল সা. এর বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি। শৈশবের ঊষালগ্নেও তার জীবন কাননে ফুটেছিল সৎ চরিত্রের অসংখ্য নিষ্পাপ কুসুম। নানাবিধ গুণাবলী তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল সমগ্র আরবে একমাত্র আল-আমীন তথা বিশ্বাসী রূপে। যৌবনদীপ্ত যুবক মুহাম্মদের সততা ও ন্যায়-নিষ্ঠার বিরল চরিত্র বিমুগ্ধ করেছিল মক্কার ধনবতী খাদিজাকে। অঢেল সম্পত্তির দায়িত্বভার অর্পণ করেও পরিতৃপ্ত নন তিনি। অবশেষে সকল সম্পত্তি তার পদতলে ঢেলে দিয়ে নিজেকেই সপে দিলেন তার বিমল চরিত্রের কাছে।

রহমতের কাণ্ডারী

একথা সন্দেহাতীতভাবে বলা চলে যে, ইসলামের সাফল্যের ব্যাপারে তাঁর চরিত্র-মাধুর্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মনে পড়ে আজ উহুদ যুদ্ধের হৃদয়বিদারক কাহিনীর কথা। প্রিয় নবী সা. এ যুদ্ধে আহত হন। তাঁর দান্দান মোবারক শহীদ হয়। দুশমনের আঘাতে তার চেহারায়ে আনওয়ার রক্তে রঞ্জিত হয়। এমন আহত এবং নাজুক অবস্থাতেও সাহাবায়ে কেরাম রাসূল সা. কে বদ-নসীব দুশমনদের ধ্বংস করার জন্য তাঁকে বদ দোয়া করার অনুরোধ করলে প্রত্যুত্তরে রহমতের কাণ্ডারী মহানবী সা. বললেন, 'আমি বদ দোয়া করার জন্যে প্রেরিত হইনি। আমি বিশ্ব মানবের সামগ্রিক কল্যাণের মূর্তপ্রতীকরূপে প্রেরিত হয়েছি।'

এমনভাবে তায়েফে ইসলামের চরম দুশমনরা যখন প্রিয় নবী সা. এর প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করেছিল। তার দেহ মুবারক ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিল। তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেশতাদের মাধ্যমে এ প্রস্তাব এসেছিল, 'হে আল্লাহর রাসূল ! যদি আপনি অনুমতি দেন, তাহলে আল্লাহর নিদর্শনস্বরূপ দুটি পাহাড় তথা সাফা-মারওয়াকে একত্রিত করে এই জালিমদেরকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দিব।' একদিকে তার দেহ মুবারক থেকে রক্ত ঝরছিল নির্মম পাথরের আঘাতে। অন্যদিকে তার মুবারক যবান থেকে তাদের প্রতি নেক দোয়া করতে গিয়ে বের হয়েছিল শান্তির বানী। তিনি বলেছিলেন, 'না, এদেরকে শাস্তি দিওনা। এরা বুঝেনি। না বুঝে এমনটি করেছে। হয়তো একদিন এদের বংশধরদের মধ্য হতে কেউ না কেউ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। এদেরকে মেরে ফেললে আমি শান্তির বাণী কাদের কাছে পেশ করব। বস্তুত নবী করীম সা. একদিকে যেমন ছিলেন উত্তম চরিত্রের অধিকারী তেমনিই তিনি ছিলেন দয়া-মায়ার জীবন্ত প্রতীক এবং তিনি ছিলেন শান্তির দূত। তাই আল্লাহ তায়ালা তাকে 'রহমতে আলম' খেতাবে ভূষিত করেছেন।

ধৈর্য ও সহনশীলতা

ধৈর্য ও সহনশীলতা উন্নত চরিত্রের একটি বড় নিদর্শন। রাসূল সা. এর এ গুণটি প্রস্ফুটিত হয়ে উঠে কুরআন-হাদীসের কিছু ঘটনাবলীর দ্বারা। নিম্নে তা প্রদত্ত হল।

জনৈক ইয়াহুদী পাওনা টাকা পরিশোধ করার সময়ের পূর্বেই সীমাহীন পিড়াপীড়ি করে রাসূল সা. এর প্রতি গাল-মন্দের সুরে বলল, আপনারা আব্দুল মুত্তালিবের বংশধর প্রাপ্য পরিশোধে অযথা বিলম্ব করেন। এমন মুহূর্তেও রাসূল সা. রাগান্বিত না হয়ে মিষ্টি ভাষায় বললেন, এখন টাকা হাতে নেই, যখনই টাকা হাতে আসবে

আদায় করে দিব। সেই ইয়াহুদী কিছুতেই রাসূলের আকুতি মানল না। উপরন্তু বলে উঠল টাকা পরিশোধ করা ব্যতীত কিছুতেই মসজিদ থেকে হুজরায় প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। অপরদিকে উপস্থিত সাহাবীগণ রাসূল সা. এর প্রতি দুর্ব্যবহারের কারণে রাগে ফেটে পড়ল। রাসূল সা. সাহাবীদেরকে বললেন, তোমরা রাগ করো না। সে পাওনাদার। তার কিছু বলার অধিকার আছে। ফজরের নামাজের পর ইয়াহুদী লোকটি পুনরায় হাজির হয়ে অত্যন্ত বিনীতভাবে আরজি পেশ করে বলল, হে আল্লাহর রাসূল ! আমাকে ক্ষমা করুন। আমি আপনার ধৈর্য ও সহনশীলতার পরীক্ষা নিয়েছি। কেননা তাওরাতে সর্বশেষ নবীর বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে বিশেষভাবে ধৈর্য ও সহনশীলতার উল্লেখ রয়েছে। কথাটি বলেই লোকটি তাওহীদের কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল।

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, একদা রাসূল সা. বাবলা বৃক্ষ তলে একাকী শায়িত ছিলেন। এমন সময় তাঁর একজন শত্রু এসে হাতের তরবারিটি উত্তোলন করে বীরদর্পে প্রশ্ন করল, এখন তোমাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে? প্রিয় নবী সা. অবিচলিত চিত্তে শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন, ‘আল্লাহ’। এ পবিত্র নামটি শোনা মাত্রই তার হাত থেকে তরবারিটি মাটিতে পড়ে গেল। প্রিয় নবী সা. তরবারিটি তুলে নিয়ে তাকে বললেন, এখন বল, তোমাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে? প্রত্যুত্তরে সে বলল, আপনি মহৎ ব্যক্তি আপনি উত্তম। আপনিই রক্ষা করবেন। এমন সুযোগ পেয়েও রাসূল সা. তাকে ক্ষমা করে দিলেন। যে ব্যক্তি উদ্যত হয়েছিল তার প্রাণ নাশ করতে তার বিরুদ্ধে তার কোন অভিযোগ নেই, নেই প্রতিশোধ গ্রহণের কোন ইচ্ছা। এমনকি কোন বদ দোয়াও করলেন না; বরং তাঁর দিল থেকে বেরিয়ে এসেছিল লোকটির জন্য হেদায়াত প্রাপ্তির দোয়া।

দুঃখী মানুষের সেবা

মক্কা নগরীতে প্রিয় নবী সা. দেখলেন এক বৃদ্ধা জঙ্গল থেকে লাকড়ি সংগ্রহ করে মাথায় করে নিয়ে যাচ্ছে। বোঝার ভারে দুর্বল বৃদ্ধা নুইয়ে পড়ছিল। পিয়ারা নবী সা. বৃদ্ধার কষ্ট দেখে অত্যন্ত ব্যথিত হলেন এবং বললেন, বোঝাটি আমার কাঁধে তুলে দিন। সে তাই করল। প্রিয় নবী সা. বোঝাটি তার কুটিরে পৌঁছিয়ে দিলেন। সে অত্যন্ত খুশী হল। সে নবীকে আপ্যায়ন করার ইচ্ছা করল, কিন্তু তার ঘরে কিছুই ছিল না। তাই ব্যথিত কণ্ঠে বলল, আমার ঘরে আজ তোমাকে আপ্যায়ন করার মত কিছুই নেই। কিন্তু তোমাকে একটি উপদেশ দেই, মক্কায় বর্তমানে একজন যুবক নিজেকে আল্লাহর রাসূল বলে দাবী করছে। তার নাম মুহাম্মদ। সে আমাদের পূর্ব পুরুষদের ধর্মের বিরোধিতা করে এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার কথা বলে। তুমি খুব ভাল মানুষ। তাই আমি তোমাকে একটি উপদেশ

দেই, এই যুবকের কথায় কখনো কর্ণপাত কর না। পূর্ব পুরুষদের ধর্মকে অবিশ্বাস কর না। প্রিয় নবী সা. তার কথা শুনে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার কথা শেষ হয়েছে? সে বলল হ্যাঁ। তখন রাসূল সা. বললেন, আমিই সেই যুবক। আমার নাম মুহাম্মদ। আমি এক আল্লাহতে বিশ্বাসী এবং এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করার আহবান জানাই। বৃদ্ধাটি বলল, সত্যিই তুমি সেই যুবক? রাসূল সা. বললেন হ্যাঁ। সাথে সাথে বৃদ্ধা তাওহীদের কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল।

উত্তম চরিত্রের আকর্ষণ

প্রবাদে বলা হয় ব্যবহারে বংশের পরিচয়। ইসলামের সর্বময় বিজয় তরবারির আঘাতে নয় বরং উত্তম চরিত্র ও নমনীয়তার দ্বারা হয়েছে। সমাজ সেবা ও শত্রুকে ক্ষমা করা, মানবতা প্রতিষ্ঠা ও মজলুমকে সাহায্য করা ইত্যাদি ছিল রাসূল সা. এর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নবুওয়াত প্রাপ্তির পর দাওয়াত প্রভৃতির ক্ষেত্রে তার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও উত্তম চরিত্রের আকর্ষণে রূঢ় প্রকৃতির মরু চারীরাও মধুকরের মত ভিড় জমাল তাঁর চার পাশে। নবুওয়াত প্রাপ্তির পর কাফেররা চরম শুত্রুতা করেছে বটে কিন্তু তাঁর অনুপম চরিত্রে কোথাও এতটুকু কালেমা লেপন করার সুযোগ পায়নি। নবীজী সা. তাদের নিকট এতই বিশ্বস্ত ছিল যে, মুশরিকরা পর্যন্ত হেফাযতের উদ্দেশ্যে তার নিকট সম্পদ জমা রাখত। যারা দেশ ত্যাগে বাধ্য করেছিল হিজরতের সময় তাদেরই রক্ষিত সম্পদ হযরত আলীর হাতে সোপর্দ করে যান প্রকৃত মালিকদেরকে পরিশোধ করার উদ্দেশ্যে। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে রাসূলের সকল উত্তম গুণাবলীর রঙ্গে রঙ্গিন হওয়ার তাওফীক দান করুন।

লেখক: মুহাদ্দিস, শেখ জুনুরুদ্দীন রহ. দারুল কুরআন মাদরাসা চৌধুরীপাড়া ঢাকা

ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার : একটি নিরপেক্ষ পর্যালোচনা

মুফতী তাওহিদুল ইসলাম

ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবারঃ উক্তিটি বর্তমান বিশ্বের সর্বাধিক ফ্যাশনেবল রাজনৈতিক মতবাদ Secular democracy স্যেকুলার গণতন্ত্রের একটি মন্ত্র। বলা হচ্ছে, পৃথিবী বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শ প্র্যাকটিস করার পর সর্বশেষ স্যেকুলার গণতন্ত্রই সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। এর চেয়ে উত্তম পদ্ধতি আর হতেই পারে না। কিছুকাল পূর্বে আমেরিকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন বড় অফিসারের পক্ষ থেকে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে যার নাম The end of History and the Last Man অর্থাৎ চূড়ান্ত ইতিহাস ও চূড়ান্ত ব্যক্তি। যার সারাংশ হচ্ছে, ইতিহাসে যে উন্নতি ও অগ্রগতি হয়েছে স্যেকুলার গণতন্ত্র আবিষ্কারের পর Liberal Democracy মুক্ত গণতন্ত্র সৃষ্টি করায় এর চেয়ে ভালো কোনো পদ্ধতি অস্তিত্বে আসতে পারে না। অবিকল এমন বাণী এক সময় কার্লমার্কস থেকেও শুনা গিয়েছিলো। যখন সমাজতন্ত্রকেই চূড়ান্ত পদ্ধতি মনে করা হতো। তিনি বলেছিলেন, সমাজতন্ত্র থেকে উত্তম পদ্ধতি আর আসতে পারে না।

এ পরিসরে আমরা দেখবো স্যেকুলার গণতন্ত্র কতটুকু যুক্তিযুক্ত ও কল্যাণকর। স্যেকুলার মতবাদটির আহ্বান জনগণের মধ্যে তখন সৃষ্টি হয় যখন ইউরোপে পোপতন্ত্রের অত্যাচারে নিষ্পেষিত হয়ে দেয়ালের সাথে তাদের পিঠ ঠেকে যায়। এর প্রতিউত্তরে তারা তাদের ধর্মকে সম্পূর্ণরূপে ছুড়ে মারে। এবং এই থিওরি পেশ করে যে, সর্বোচ্চ শাসন ক্ষমতা জনগণের। আর Democracy অর্থই হলো, জনগণের শাসন। এ মতবাদের অনিবার্য দাবীই হলো ধর্ম যার যার, রাষ্ট্রে থাকবে না ধর্মের বাধ্যবাধকতা। কেননা এর শাসক যেহেতু খোদ জনগণ, তাই এখানে জনগণ ছাড়া কোনো খোদার হুকুম চলবে না। গণতন্ত্রের খোদা স্বয়ং জনগণ ছাড়া আর কেউ নয়। জনগণই ফায়সালা করবে কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ। যে কোনো মন্দ কাজ তা যতই মন্দ ও নিকৃষ্ট হোক না কেন জনগণ বললে সেটাই হবে ভালো। মোটকথা মুক্ত গণতন্ত্র বা Liberal Democracy স্যেকুলারিজম ছাড়া হতেই পারে না। এই মতবাদটির যৌক্তিকতা পরখ করার জন্য সর্ব প্রথম দেখতে হবে যদি সকল জনগণ শাসক হয়, তাহলে শাসিত কারা? কেননা শাসিত ছাড়া শাসকের কোনো অর্থই হয় না। গণতন্ত্রের প্রসিদ্ধ সংজ্ঞা হলো, Democracy is Government of the people by the people for the people অর্থাৎ জনগণই শাসক আবার তারাই শাসিত। তথা যে শাসক

সেই শাসিত। বিষয়টি যেহেতু একেবারেই যুক্তি বহির্ভূত, তাই এর ব্যাখ্যা এভাবে দেয়া হয় যে, জনগণ শাসক হওয়ার অর্থ হচ্ছে, তারা নিজেদের খুশি মত প্রতিনিধি নির্ধারণ করবে। তখন সেই প্রতিনিধি হবে শাসক এবং সাধারণ জনগণ হবে শাসিত।

একটু বাস্তবতার দিকে লক্ষ্য করলেই আমরা দেখতে পাই জনগণ প্রতিনিধি নির্ধারণের পর সম্পূর্ণরূপে হাত-পা খালি হয়ে যায়। এবং সমস্ত ক্ষমতা চলে যায় গুটি কতেক প্রতিনিধির হাতে। তারা তাদের ইচ্ছা মত শাসনকার্য পরিচালনা করে। জনগণের মতের কোনো তোয়াক্কাই তারা তখন করে না। সুতরাং নির্বাচন সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পর এটাকে আর জনগণের শাসন বলা যায় না।

এবার প্রশ্ন হলো, গণতান্ত্রিক এই শাসন পদ্ধতির উদ্দেশ্য কি? এর অস্তিত্ব দেয়ার লক্ষ্যই বা কি? এই প্রশ্নের জবাবের খোঁজে রাষ্ট্র বিজ্ঞানীগণ রীতিমতো ঘর্মাক্ত হয়েছেন। কেউবা অক্ষম হয়ে বলেছেন, এটার ভিন্ন কোনো উদ্দেশ্য নেই। বরং এটাই হলো উদ্দেশ্য। কেউবা বলেছেন, মূলতঃ গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের উদ্দেশ্য হলো, জনগণকে সন্তুষ্ট করণ। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, সবার সন্তুষ্টি তো এক রকম নয়। কেউ একটিতে সন্তুষ্ট আবার কেউবা তার বিপরীতে সন্তুষ্ট। তাহলে কোন সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেয়া হবে? এর যথাযথ কোনো জবাব নেই। তাই এই সমস্যার সমাধানকল্পে বলা হয়, অধিকাংশ মানুষের সন্তুষ্টি যে কাজে অর্জিত হবে সেটাকেই প্রাধান্য দেয়া হবে এবং সেটাই হবে বৈধ। সেমতে যদি অধিকাংশ জনগণ কোনো অন্যায় বা দুশ্চরিত্রের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে যায়, তাহলে সেটাই প্রাধান্য ও বৈধতা পাবে। এ কারণেই কোথাও গণতন্ত্রের ব্যাপারে এ কথা পাওয়া যায় না যে, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে কল্যাণের বিস্তার, অকল্যাণ রোধ। কিংবা নীতি নৈতিকতা প্রচার ইত্যাদি। বরং দেখা হয় অধিকাংশ জনগণ কি চায়? আবার অধিকাংশ বলতে এই উদ্দেশ্য নয় যে, সকল জনগণের অধিকাংশ। বরং আপেক্ষিকভাবে অধিকাংশ হয়ে বাস্তব অধিকাংশের মতের বিপরীত হলেও তা প্রতিষ্ঠিত হবে। উদাহরণ স্বরূপ কোনো এলাকায় চারটি দল রয়েছে যাদের নির্বাচন ইশতিহারে একদল বললো, আমরা সমকামিতার বৈধতা দিবো। দ্বিতীয় দল বললো, আমরা সমকামিতার বৈধতা দিবো না। তবে আন্তঃধর্মীয় বিবাহের অনুমতি দিবো। তৃতীয় দল বললো, আমরা সমকামিতা রোধ করবো। এবং আন্তঃধর্মীয় বিবাহেরও অনুমতি দিবো না। চতুর্থ দল বললো, আমরা সমকামিতা প্রতিহত করবো এবং অন্যান্য বিষয়ে কিছু বললো না। নির্বাচনে দেখা গেলো প্রথম দল পেল শতকরা ২৬% ভোট। আর অন্যান্য দল পেল যথাক্রমে ২৫%, ২৪%, ২৫% = ৭৪% ভোট। এ ক্ষেত্রে বিজয়ী হবে সমকামিতা বৈধতা দানকারী দল। অথচ এর বিরুদ্ধে রয়েছে ৭৪% জনগণ। এভাবে সমকামিতা হবে বৈধ। বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করা হবে ৭৪%

জনগণকে। যে সকল দেশে সরকার গঠন করতে ৫১% ম্যান্ডেট লাগে সেখানে দ্বিতীয় দল জনগণের সাথে কৃত প্রতিশ্রুতির তোয়াক্কা না করে প্রথম দলকে ম্যান্ডেট দিলে সেখানেও সমকামী সরকার গঠিত হয়ে যাবে। এবার গণতন্ত্রের ধোঁকা বুঝতে বাকী থাকার কথা নয়।

আমার এই বক্তব্য শুধুই থিওরি নয়; বরং আজকের পাশ্চাত্যে যারা গণতন্ত্রের চর্চায় মডেল হিসাবে বিশ্বকে নেতৃত্ব দিচ্ছে তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করলে এর বাস্তবতা নগ্ন হয়ে ভেসে ওঠে। যখন থেকেই এই স্যেকুলার গণতন্ত্র তাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে তখন থেকেই তারা চারিত্রিক দেউলিয়াত্বের বেড়াজালে আষ্টেপৃষ্ঠে আটকে পড়ে। ফলে নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতম কাজও গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার অজুহাতে বৈধতা পাচ্ছে। অথবা কমপক্ষে তার পক্ষে দাবী উঠছে। কেননা, গণতন্ত্র কোনো চারিত্রিক মূল্যবোধের দায়ে আবদ্ধ নয়। আর তাতে ঐশী হেদায়াতেরও কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। বরং সম্পূর্ণই জনগণের ইচ্ছা ও কামনার ওপর নির্ভর করে। যার ফলশ্রুতিতে ব্রিটেনের পার্লামেন্ট সমকামিতার বৈধতা দিয়েছে। সেখানে বৈধতার আইন করতালির মাধ্যমে পাশ করা হয়েছে। এবং সমকামীদের বিবাহ আইনানুগ বলে মেনে নেয়া হয়েছে। যখন পার্লামেন্টে বিলটি উত্থাপন করা হয় তখন সবাই এর সমর্থক ছিল না। বরং মতবিরোধ ছিল। তাই মতবিরোধ দূর করার জন্য Wolfendern Commitee. নামে একটি কমিটি গঠন করা হয় জনগণের প্রত্যাশা ও বুদ্ধিজীবীদের সাথে মতবিনিময়ের জন্য। অবশেষে তারা যে রিপোর্ট পেশ করে তার সারাংশ হচ্ছে, সমকামিতা যদিও একটি মন্দ কাজ কিন্তু আমাদের প্রোগ্রাম কোন ভাল-মন্দের বিচার নয়; বরং এর ভিত্তি হচ্ছে জনগণ আইন তৈরির ক্ষেত্রে স্বাধীন। ফলে এই নিয়ম মোতাবেক চরিত্র ও আইনের ক্ষেত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। চরিত্র মানুষের ব্যক্তিগত বিষয়। আর আইন হলো সাধারণ জনগণের ভাল-মন্দের বহিঃপ্রকাশ ও স্বাধীনতার বহিঃপ্রকাশ। ভাল-মন্দের বিধান করা আইনের কাজ নয়। ফলে যেহেতু জনগণের মতামত সমকামিতার বৈধতার দিকে ভারি, তাই আমরা এর সমর্থন করতে বাধ্য। সে মতে আমরা মত দিচ্ছি যেন এটাকে আইন বানিয়ে দেয়া হয়। এভাবে ব্রিটেনের House of Commons সমকামিতার আইনগত বৈধতা দিয়ে দেয়। সাথে আমেরিকাসহ অনেক রাষ্ট্রে এটাকে আইনের রূপ দেয়। তারা প্রকাশ্যে পুরুষের সমকামিতাকে Gay ও নারীদের টাকে Lesbian নাম দিয়ে অবাধে এই নোংরামি চালিয়ে যাচ্ছে। এর উপর বিভিন্ন সংগঠন হচ্ছে, এর বাণী প্রচার করা হচ্ছে।

এর সাথে আরেকটি সংগঠনও কাজ করছে যার নাম Swap Union সোয়াপ অর্থ বিনিময়। এ ইউনিয়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে বধূ বিনিময়। এর জন্য ক্লাবও আছে।

যেহেতু অবিবাহিত নারীরা ফ্রি সেক্সুয়াল জীবন-যাপন করতে আইনানুগ কোনো বাধা নেই। তাই এই অধিকার বিবাহিত নারীদেরকেও দিতে হবে। স্বামীর অধিকার নষ্টের অজুহাতে কোনো বাধ্যবাধকতা থাকতে পারবে না। এ সকল কারণে ইউরোপ আমেরিকার অনেক স্টেটে অধিকাংশ বা অনেকাংশই পিতৃ পরিচয়হীন। কয়েক বছর পূর্বে Time পত্রিকায় বিষয়টি নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। তবে সে শঙ্কা তাদের চারিত্রিক অবক্ষয়ের কারণে নয়; বরং সামাজিকভাবে এসব শিশুদের দেখা শোনার ভার কেউ নিচ্ছে না। ফলে সৃষ্টি হচ্ছে সামাজিক সংকট। এই সমস্যা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য কোনো কোনো স্টেটে গর্ভপাতের আইনানুগ অধিকার দেয়া হয়েছে। স্কুলগুলোতে যৌন শিক্ষা ও জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির সাথে শিশু বয়স থেকেই পরিচয় করানো হচ্ছে। দেখানো হচ্ছে এ জাতীয় উলঙ্গ ফিল্ম। ফলে সন্তান হয়ে যাওয়ার ভয়ে যৌনতায় যে সামান্য বাধ্যবাধকতা ছিলো তাও ধুয়ে মুছে নিঃশেষ হয়ে যায়। এ অবাধ যৌনতার কারণে যৌনবাহিত রোগ এইড্স খোদায়ী গজব হিসাবে তাদের সমাজে মহামারীর রূপ নেয়। এবার এ থেকে বাঁচার জন্য বিদ্যালয়গুলোতে নিরাপদ যৌন সম্পর্কের নামে ব্যাপক যৌন চর্চা হচ্ছে। এতসব কিছুর পরও আমেরিকায় জোরপূর্বক ধর্ষণের হার সারা ওয়ার্ল্ডের মধ্যে সবচেয়ে বেশি।

এই সকল সমস্যা নিহিত রয়েছে একটি স্লোগানে। আর তা হলো ‘‘ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার’’ আমি কসম খেয়ে বলতে পারি আমাদের সমাজে যতদিন যাবৎ গণতন্ত্রের চর্চা চলছে তাতে অনেক আগেই এ সমাজ পাশ্চাত্যের ঘৃণিত সমাজে পরিণত হয়ে যেত। যদি এ দেশের নিষ্ঠাবান উলামায়ে কেরাম নিঃস্বার্থভাবে খেয়ে না খেয়ে নৈতিক শিক্ষা ও মূল্যবোধের ব্যাপক প্রচার প্রসার না করতো।

এ সমাজ যদি আজও সতর্ক না হয়, তাহলে এই নিকৃষ্ট স্লোগানের ধ্বজাধারী ক্ষমতার রাজনীতিকরা অনিবার্যভাবে সমাজকে নিক্ষেপ করবে পঙ্কিলতাপূর্ণ এক অন্ধকার কূপে। যা থেকে নিষ্কৃতির আর কোনো পথ থাকবে না।

লেখক: নায়েবে মুফতী, জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া মুহাম্মদপুর ঢাকা।

উলামায়ে আখিরাতের ১২টি নিদর্শন

মূলঃ আরিফ বিল্লাহ সিদ্দীক আহমাদ বান্দভী
অনুবাদঃ মাওলানা মাজহারুল ইসলাম কাসেমী

১ম নিদর্শনঃ আলেম তার ইলম অনুযায়ী আমল করবে।

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সা. ইরশাদ করেন, কিয়ামত দিবসে সর্বাধিক কঠিন আযাব ভোগ করবে ঐ আলেম, যার ইলম তাকে কোন উপকার করেনি। [মুজামে সাগীর, তাবরানীঃ ১/৩০৫]

হযরত মানছুর ইবনে জাযান রহ. বলেন, আমাকে অবহিত করা হয়েছে যে, জাহান্নামে নিপতিত এমন কিছু লোক থাকবে, যাদের দুর্গন্ধে স্বয়ং জাহান্নামীরা কষ্ট পাবে। তাকে জাহান্নামীরা বলবে, তোর জন্য দুর্ভোগ ! তুই কি আমল করতে? আমরা এমনই কষ্টে নিপতিত, আবার তোর দুর্গন্ধের কারণে আমাদের আরো বেশি কষ্ট হচ্ছে। সে উত্তরে বলবে, আমি আলেম ছিলাম, তবে আমার ইলম দ্বারা আমি উপকৃত হইনি। [শুআবুল ঈমানঃ ৩/৩১৫]

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, যে ইলম দ্বারা উপকার লাভ করা যায় না তথা আমল করা হয় না সেই ইলম এমন ধন ভাণ্ডারের ন্যায়, যা থেকে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা হয় না।

হযরত আবু দারদাহ রা. বলেন, যে ব্যক্তি জানে না বিধায় আমল করে না, তার জন্য একটি ধ্বংস, আর যে জানে কিন্তু আমল করে না, তার জন্য সাতটি ধ্বংস।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, অধিক ওয়াজ ও বয়ানের নাম ইলম নয়, বরং ইলম এর হাকিকত হল আল্লাহভীতি।

২য় নিদর্শনঃ তিনি ঐ ইলম অর্জন করবে যা পরকালে কাজে লাগবে, ইবাদত-বন্দেগীতে আগ্রহ বাড়াবে এবং উৎসাহ সৃষ্টি করবে। যে ব্যক্তি এ জাতীয় ইলম বর্জন করে অন্য ইলম চর্চা করবে, তার দৃষ্টান্ত এরূপ, যেমন কেউ কোন অভিজ্ঞ ডাক্তারের শরণাপন্ন হলো, কিন্তু সময় সল্প। ডাক্তার দ্রুতই চলে যেতে পারে। এমন সময় সে ঔষধের বৈশিষ্ট্য বা চিকিৎসা শাস্ত্রের ব্যাপারে অতিরিক্ত কথা-বার্তায় সময় শেষ করে দিল। ফলে সে আর নিজের রোগ সম্পর্কে চিকিৎসা ব্যবস্থা জানতে পারল না।

৩য় নিদর্শনঃ নিজ ইলমকে দুনিয়া উপার্জনের মাধ্যম বানাবে না। আলেমের সর্বনিম্ন স্তর হলো, দুনিয়ার তুচ্ছতা ও হীনতা এবং তা শীঘ্রই ধ্বংস হয়ে যাওয়ার অনুভূতি থাকবে। পাশাপাশি আখিরাতের শ্রেষ্ঠত্ব, বড়ত্ব ও পরকালীন নেয়ামত

চিরস্থায়ী ও সর্বোত্তম হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করবে। আর এ কথা ভালো করেই জানবে যে, দুনিয়া এবং আখিরাত একটি অপরটির বিপরীত। উভয়টির মাঝে পূর্ব ও পশ্চিমের ন্যায় পার্থক্য। যে কোন একটির নিকটস্থ হলে অপরটি থেকে দূরে থাকবে। আর যে ব্যক্তি উভয়টির বৈপরীত্বের জ্ঞান রাখবে না এবং উভয়টি একত্র করতে লোভ করবে সে এমন বস্তুকে অর্জন করতে লোভ করছে, যা লোভ করার উপযোগী নয়। সে সকল নবীগণের শরীয়তের ব্যাপারে অজ্ঞ। আর যে এতসব জানা সত্ত্বেও দুনিয়াকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দেয়, সে শয়তানের জালে আবদ্ধ। যাকে কুপ্রবৃত্তি ধ্বংস করে দিচ্ছে। যার এমন অবস্থা হবে সে উলামাগণের অন্তর্ভুক্ত কি করে হবে?

৪র্থ নিদর্শনঃ খাবার-দাবার ও পরিধানের ক্ষেত্রে উন্নত, দামী ও চাকচিক্যের মোহে পরবে না; বরং এ সবে মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে এবং আল্লাহ ওয়ালাগণের তরীকা গ্রহণ করবে। এগুলোর প্রতি যত বেশী অনাসক্ত হবে আল্লাহ্র নৈকট্য তত বেশী লাভ হবে। আর উলামায়ে আখিরাতের মধ্যে তার মর্যাদা বৃদ্ধি হবে।

৫ম নিদর্শনঃ রাজা-বাদশা, আমীর-উমারা থেকে সর্বদা দূরে থাকবে। প্রয়োজন ছাড়া তাদের কাছে কখনো যাবে না। তাদের সাথে সম্পর্ক রাখবে না। তাদের সন্তুষ্টির পিছনে দৌড়াবে না। তাদেরকে তোষামোদ করবে না। তাদের কাছে আসা-যাওয়ার দ্বারা তাদের জাগতিক ভোগ সম্ভারের প্রতি আসক্ত হয়ে যাবে। আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত ইলমকে সাধারণ বা তুচ্ছ জানবে। পরিশেষে আল্লাহ্ তায়ালার অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে থাকবে।

প্রিয় নবী সা. ইরশাদ করেন, সর্ব নিকৃষ্ট আলেম ঐ ব্যক্তি, যে শাসকগণের নিকট উপস্থিত হয় (জাগতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য) আর সর্বোত্তম শাসক সেই যে আলেমগণের নিকট উপস্থিত হয় (জাগতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য) আর সর্বোত্তম শাসক সেই যে আলেমগণের নিকট মাঝে মধ্যেই উপস্থিত হয়।

৬ষ্ট নিদর্শনঃ যে কোন বিষয়ে ফতওয়া প্রদানে তাড়াহুড়া করবে না। মাসআলা বর্ণনায় পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করবে। যে মাসআলা ভাল করে জানা থাকবে, তাই বর্ণনা করবে। কোন ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয় থাকলে নিঃসঙ্কোচে বলে দেবে, আমার জানা নেই। হযরত ইমাম শা'বী রহ. বলেন, অজ্ঞাত বিষয়ে জানি না বলে দেওয়ার মধ্যেই অর্ধেক ইলম রয়েছে। হযরত আবু হাফ্স নিশাপুরী রহ. বলেন, আলেম তো তিনিই যাকে প্রশ্ন করার সময় তিনি চিন্তা করেন যে, আল্লাহ্র নিকট প্রশ্নের সম্মুখীন হবো না তো যে, এ উত্তর কোথা থেকে দিয়েছ?

হযরত ইবরাহীম তাইমী রহ. এর নিকট কোন মাসআলা জিজ্ঞাসা করলে তিনি কাঁদতেন আর বলতেন তুমি কি অন্য কাউকে পাওনি যে আমার উপর চড়ে বসছো!

হযরত আব্দুর রহমান বিন আবু লায়লা রহ. বলেন, আমি এই মসজিদে ১২০ জন সাহাবীকে দেখেছি। যখন তাদের কাউকে হাদীস বা কোন বিষয়ে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করা হত তখন প্রত্যেকেই এ কামনা করতো যে, অন্য কেউ এর জবাব দিয়ে দিক। অন্য বর্ণনায় এসেছে তাদের কারও সামনে যখন কোন মাসআলা উপস্থাপন করা হত, তখন তিনি অন্যজনের নিকট পাঠিয়ে দিতেন। তিনি আবার তৃতীয় জনের নিকট পাঠিয়ে দিতেন। এভাবে ঘুরতে ঘুরতে প্রথম জনের নিকট চলে আসত।

৭ম নিদর্শন: বাতেনী ইলম তথা সুলুকের প্রতি গুরুত্বারোপ করবে। আত্মশুদ্ধির জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করবে। এর দ্বারা বাহ্যিক ইলমও বৃদ্ধি পাবে। প্রিয় নবী সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি জানা ইলম অনুপাতে আমল করবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে অজানা ইলম দান করবেন। পূর্ববর্তী নবীগণের ঐশী গ্রন্থসমূহে আছে যে, হে বনী ইসরাঈল! তোমরা এ কথা বলো না যে, ইলম আসমানে আছে। তাকে কে নামাবে? বা ইলম জমিনের গভীরে আছে, তাকে কে উত্তোলন করবে? কিংবা ইলম সাগর পারে আছে তাকে কে সংগ্রহ করবে? বরং ইলম তোমাদের অন্তরসমূহে আছে, তোমরা আধ্যাত্মিক মহান ব্যক্তিবর্গের আখলাক গ্রহণ করো। সিদ্দিকগণের চরিত্রে চরিত্রবান হও। আমি তোমাদের অন্তঃকরণ থেকে ইলম প্রকাশ করবো। যা তোমাদের ঘিরে ফেলবে এবং ঢেকে রাখবে।

সাবেতুল বুনানী রহ. সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তার প্রতিদিনের আমল ছিল পবিত্র কুরআন একবার খতম করা। সব সময় রোজা রাখা।

হযরত সোলাইমান তাইমী রহ.ও পূর্ণ বৎসর রোজা রাখতেন। এবং সাধারণত ইশার অযু দ্বারা ফজর নামাজ আদায় করতেন।

৮ম নিদর্শন: আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি তার ঈমান ও এক্বিন খুব বেশি হবে এবং এর গুরুত্ব তার নিকট সর্বাধিক হবে। কারণ, এক্বিনই হল মূলধন। নবী সা. ইরশাদ করেন, এক্বিনই পূর্ণ ঈমান। এক্বিন শিক্ষা করো। এক্বিন শিক্ষার উপায় হলো, এক্বিন ওয়ালাগণের নিকট গুরুত্বের সাথে বসো এবং তাদের সংস্রব গ্রহণ করো। তাদের অনুসরণ করো। যাতে তোমাদের মাঝেও এক্বিনের পরিপক্কতা আসে।

৯ম নিদর্শন: তার কথা-বার্তা, চাল-চলন, ও উঠা-বসা তথা সব কাজে আল্লাহ ভীতি প্রকাশ পাবে। তার বলা, চুপ থাকা, নড়াচড়া করা ও থেমে থাকা এবং লেনদেন ও আচার-আচরণে আল্লাহ তায়ালার প্রতি অগাধ ভালবাসা, অসামান্য ভক্তি ও অসাধারণ শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হবে। তার দৈহিক অবয়ব দেখলেও আল্লাহ্র স্মরণ সজীব হবে। স্থিরতা, ভাবগাম্ভীর্যতা ও নম্রতা-ভদ্রতা তার স্বভাবে পরিণত হবে। অনর্থক কথা ও অহেতুক কাজ-কর্ম থেকে বিরত থাকবে। কেননা, এগুলো গর্ব ও অহংকারের লক্ষণ এবং আল্লাহ থেকে নির্ভয় হয়ে যাওয়ার প্রমাণ।

হযরত উমর রা. বলেন- ইলম অর্জন কর এবং ইলমের জন্য স্থিরতা ও গাম্ভীর্যতা অর্জন কর।

১০ম নিদর্শনঃ এমন মাসায়েলের প্রতি গুরুত্বারোপ করবে, যা আমলের সাথে সংশ্লিষ্ট, যা জায়েয-নাজায়েয, হালাল-হারাম ও ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত সংক্রান্ত। যা দ্বারা জানতে পারবে অমুক কাজ করা জরুরী, তমুক কাজ থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক। অমুক কাজে পরকালে এই ক্ষতি ইত্যাদি। এমন ইলম নিয়ে অধিক আলোচনা করবে না, যা দ্বারা শুধু মস্তিষ্ক বিনোদন হয় এবং যা শুধু শাখা-প্রশাখাগত সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম বিষয়ক। যেন লোকেরা তাকে পণ্ডিত-প্রজ্ঞাবান ও দার্শনিক বলে।

১১তম নিদর্শনঃ শরীয়তের ইলমের ব্যাপারে গভীরতা ও দূরদর্শিতা থাকবে। প্রত্যেক কাজকে সুন্নতের কষ্টি পাথরে যাচাই করে সুন্নত অনুযায়ী সম্পাদন করবে। শুধু মানুষকে দেখেই আমল করতে আরম্ভ করবে না। কেননা সুন্নত পরিপন্থী বহু কাজ লোক সমাজে প্রচলিত হয়ে যায়। মূল অনুসরণ হবে রাসূল সা. এর প্রকৃত সুন্নতের। আর এই জন্য সাহাবায়ে কেরাম এবং আইম্মায়ে দ্বীনের অনুসরণ করা হয়। কেননা, তারা নবী কারীম সা. এর কথা এবং কাজকে সঠিক অর্থে বুঝতে পেরেছেন।

১২তম নিদর্শনঃ তাদের অন্তরে বিদ্‌আতের প্রতি চরম ঘৃণা থাকবে এবং বিদ্‌আত থেকে কঠোর ভাবে বিরত থাকবে। কোন কাজ অনেক মানুষ এক সঙ্গে পালন করা গ্রহণযোগ্য হওয়ার প্রমাণ নয়। বরং আসল অনুসরণ নবী করিম সা. এর করবে এবং যে কোন কাজের ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের আমল দেখবে। তাদের আমল অনুসন্ধান করবে এবং এর মধ্যে নিবিষ্ট থাকবে। নবী করিম সা. ইরশাদ করেন, আমাদের দ্বীনের মধ্যে যে নতুন কিছু আবিষ্কার করবে তা প্রত্যাখ্যাত। অন্যত্র ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কোন বেদআতীকে সম্মান করলো, সে ইসলামকে ধ্বংস করতে সাহায্য করলো। কেননা বেদআতী নিজ বিদআত দ্বারা ইসলামের শিকড়ে কোঠারাঘাত করে নবী সা. এর সুন্নত মিটিয়ে দিয়ে নিজের পদ্ধতি চালু করতে চায়। এজন্য বেদআতীদের তওবা নসীব হয় না। কেননা তারা বিদআতকে দ্বীন মনে করে এবং এর উপরই চলতে মানুষকে উৎসাহিত করে। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ রা. ইরশাদ করেন, তোমরা এমন এক যুগে আছো, যে যুগে মানুষের অভিলাষ ইলমের অনুসারী। অর্থাৎ ইলমে দ্বীনের আলোকে অভিলাষ বৈধ প্রমাণিত হলে তা মানুষ গ্রহণ করে। অন্যথায় বর্জন করে। কিন্তু শীঘ্রই এমন সময় আসবে, যখন ইলম মানুষের ইচ্ছার অনুসারী হবে। অর্থাৎ মানুষের মন যা কামনা করবে তা ইলম দ্বারা প্রমাণিত করতে চাইবে।

ওলামায়ে আখিরাতের ১২টি নিদর্শন সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করা হলো। আমাদের আলেমদের নিজের হিসাব-নিকাশ ভালভাবে করে নেওয়া উচিৎ। কেননা তাঁরা সমাজের অনুকরণীয় ব্যক্তি। তাদের পদস্খলনে একটি জাতি পদস্খলিত হয়ে যায়। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে হেফাজত করুন।

অনুবাদক: মুহাদ্দিস, জামিয়া দারুল আরকাম আল ইসলামিয়া বি-বাড়িয়া

ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম

বেরলভী ও আহলেহাদীসদের তথাকথিত অবদান ও বাস্তবতা

মাওলানা তাহমীদুল মাওলা

ভারত উপমহাদেশ

বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তান তিনে মিলে ভারত উপমহাদেশ বা ভারতবর্ষ। এ বিশাল সাম্রাজ্যে মানুষের বসবাস কবে থেকে তা নির্ণয় প্রায় অসম্ভব। তবে ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে এদেশে ধারাবাহিকভাবে আর্য হিন্দু, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্যবাদ ও যোগিবাদের রাজত্ব চলমান ছিল। কিন্তু এসব প্রকৃতিবিরুদ্ধ বাদ-মতবাদের অনুসারীদের মধ্যে পরস্পরবিরোধিতার ফলে পুরো ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছিল শ্রেণী বৈষম্য ও সাম্প্রদায়িক আত্মকলহ। ফলে ভারতবর্ষ বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। বৈষম্য হতাশা ও অস্থিরতায় বিচ্ছিন্ন ও বিশৃঙ্খল এবং প্রকৃত অধিকার বঞ্চিত এ জাতির কাছে যখন ইসলামের সাম্যের বাণী ও শান্তি নিরাপত্তার সুবাতাস বইতে শুরু করে তখন থেকেই এদেশে ইসলামের বিজয় শুরু হয়। অতঃপর ধীরে ধীরে পুরো সাম্রাজ্য মুসলমানদের শাসনের আওতায় চলে আসে। এবং তারা বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলো একরাজ্যে পরিণত ও রাজনৈতিক স্থিরতা ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করে বিশ্বময় সুখ্যাতি লাভ করে। মূলত এদেশে ইসলামের আগমন ঘটে খলীফা উমর রা. এর খেলাফতকালেই। অতঃপর ১০০০ খৃষ্টাব্দ (৩৯০ হিজরী) থেকে মূলত ১৮০৬ খৃষ্টাব্দ (১২২২ হিজরী) পর্যন্ত ৮৬৩ বছর নানা বৈচিত্র্য সত্ত্বেও এদেশে মুসলিম শাসন চলে। এ শাসন ব্যবস্থাকে পুরোপুরি ইসলামী নয় বরং মুসলিম শাসন বলা যায়। যাদের মধ্যে ধর্মপরায়ণ ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ আওরঙ্গজেব আলমগীর (১৬৫৯ থেকে ১৭০৭ খৃ. পর্যন্ত প্রায় ৫০ বছর), ফিরূয শাহ্ (১৩৫১-১৩৮৮) যেমন ছিলেন; তেমনি ধর্মদ্রোহী জালালুদ্দীন আকবরও (১৫৫৬ - ১৬০৫) ছিলেন।

তবে দীর্ঘ সাড়ে আটশ বছরের মুসলিম শাসনামলের অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য ছিল– এতে মানুষ ব্যক্তিজীবনে ও ধর্মীয় জীবনে অভাবনীয় স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা লাভ করেছিল। সেখানে হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান সকল ধর্মেরই স্বাধীনতা ছিল। ভিনদেশী খৃষ্টানরা এতই নিরাপত্তা পেয়েছিল যে, স্বাধীনভাবে ধর্মচর্চার পাশাপাশি ব্যবসা-বাণিজ্যের অন্তরালে দেশ দখলের চক্রান্ত করতে পেরেছিল। এ দেশে সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু বলতে কিছু ছিল না। সবাই ছিল এদেশের নাগরিক।

প্রায় সারে আটশত বছরের ইতিহাসে মুসলমানরা হিন্দুদেরকে কেবল হিন্দু হওয়ার কারণে হত্যা করেছে এমন ইতিহাস পাওয়া যায় না। অথচ মুসলমানরা ছিল রাষ্ট্র ক্ষমতার অধিকারী।

এদেশ অর্থনৈতিক দিক থেকে এতই সমৃদ্ধ ও স্বয়ং সম্পূর্ণ ছিল যে, বর্তমানের ইউরোপের উন্নত দেশগুলোর মত স্বনির্ভর দেশ হিসেবে বিশ্বজোড়া খ্যাত হয়ে পড়েছিল। যোগাযোগ ব্যবস্থার কঠিন সময়েও সুদূর ইউরোপে এদেশের সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যের সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে সে দেশ থেকে হাজার-হাজার বনিক সাত সাগর তের নদী পাড়ি দিয়ে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে এদেশে আসতে শুরু করে।

সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসন

আমেরিকা ও রাশিয়ার পূর্বে বিশ্বের পরাশক্তি ছিল ব্রিটেন। তখনকার ব্রিটেনের কৌশল ছিল বর্তমান আমেরিকার চেয়ে ভিন্ন। তারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রাকৃতিক প্রাচুর্যপূর্ণ উন্নত দেশ দখল করে শাসনের নামে শোষণ ও লুটতরাজ চালাত। একই উদ্দেশ্যে তারা সর্বপ্রথম ১৬০০ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আগমন করে ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি রাজনৈতিক তৎপরতা চালাতে থাকে। অবশেষে ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে ও ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধে জয় লাভ করে অধিকাংশ ভারত এবং ১৮০৩-১৮০৬ এর মধ্যে দিল্লীর মূল ক্ষমতা দখল করে পুরো ভারতের অধিকার গ্রহণ করে। গোটা ভারতবর্ষ স্বাধীনতা হারিয়ে পরাধীন হয়ে পড়ে।

ইংরেজরা এদেশের মানুষকে জাতীয় নিরাপত্তা, স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় দিক থেকে কী পরিমাণ জুলুম-নির্যাতন ও শোষণ করেছিল এর কিঞ্চিত নমুনা তুলে ধরার চেষ্টা করব। তবে এ বিষয়ে জানতে হলে আমাদেরকে ইংরেজ আমলের পূর্ববর্তী অবস্থাটাও জানতে হবে।

মুসলিম আমলে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা

মুসলিম আমলে এ দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা কতটা উন্নত ছিল তা অনুমান করার জন্য কেবল এতটুকুই যথেষ্ট যে, অর্থনীতিতে এত পরিমাণ সমৃদ্ধি হয়েছিল, যাতে সে যুগেই সারা দুনিয়ায় এদেশের সুখ-শান্তির সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল।

বস্তুত তখন নানাদিক থেকে আকর্ষণীয় ছিল এই ভারত উপমহাদেশ। স্মরণাতীতকাল থেকে ব্রক্ষপুত্র, মেঘনা, সিন্ধু ও গঙ্গা বিধৌত অববাহিকা,

পলিগঠিত উর্বর ভূমি, অসংখ্য পর্বত, ভূ-প্রাকৃতিক বিচিত্র গঠন, অসংখ্য মূল্যবান খনিজ ও ধাতব পদার্থ, নানাবিধ উপাদেয় খাদ্য ও বহু ধরনের কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদনক্ষেত্র হিসাবে এদেশের প্রতি বিদেশীদের দৃষ্টি সহজেই আকৃষ্ট হত। তাই ফরাসী ব্রিটেনিয়ানসহ আরব-ইউরোপের বনিকেরা দলে দলে এ দেশে আসতে শুরু করেছিল।

সময়ে সময়ে নানা জটিলতা সত্ত্বেও মুসলিম আমলে সকল ধর্মের মানুষেরা তাদের ধর্ম পালনে স্বাধীনতা পেয়েছিল। আট নয়শ বছরের মুসলিম শাসনামলের পরও এদেশের কোটি কোটি হিন্দুরা বহাল তবিয়তে ছিল। অথচ কিছুকালের মধ্যেই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ইন্ডিয়াতেই হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার নামে মুসলিম নিধনের যে নজীর হিন্দুরা স্থাপন করেছে তা সত্যিই বিস্ময়কর। মুসলিম শাসনামলে যদি এমনটা হত তা হলে আটশ বছর পর এদেশে কোন হিন্দু থাকার কথা নয়। কিন্তু সেই নিরাপদ রাষ্ট্রটি ছিল মুসলিম রাষ্ট্র, আর বর্তমান ইন্ডিয়া হিন্দু-মুসলমান যৌথ সংগ্রামে স্বাধীনতা অর্জনকারী ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র! দুঃখজনক হলেও সত্য আমাদের এ দেশে রাজনৈতিক দুর্ঘটনার স্বীকার দু'একটি আচর লাগলেও সংখ্যালঘু নির্যাতনের কথা আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হতে থাকে।

মুসলিম আমলে দ্বীনী শিক্ষার চর্চা ছিল ব্যাপক। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই ধর্মীয় শিক্ষাই ছিল প্রধান। ফলে ধর্মীয় শিক্ষাপ্রাপ্ত এসব নাগরিক ছিল উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী। প্রফেসর মার্ক মিল্‌স বলেন, 'ব্রিটিশ শাসনপূর্বকালে শুধু বাংলা মুলুকেই ৮০ হাজার (প্রাথমিক) মাদরাসা ছিল। কেবল দিল্লী শহরেই প্রায় এক হাজার মাদরাসা ছিল'। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে পুরো ভারতবর্ষে প্রায় ১২ লক্ষ প্রাথমিক মাদরাসা ছিল। যাতে প্রাথমিক শিক্ষার পাশাপাশি জরুরী ধর্মীয় জ্ঞানও শিক্ষা দেওয়া হত। আর এ সকল প্রতিষ্ঠানই চলত সরকারী বরাদ্দ জায়গীরের আয় দিয়ে। ফলে সেটি ছিল ধর্মীয় দিক থেকে পুরো ইসলামী খেলাফত না হলেও সম্পূর্ণ মুসলমানদের অনুকূলে।

ইংরেজ আমলে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা

ইংরেজরা তাদের শাসনামলে এদেশের সকল মূল্যবান সম্পদ, এদেশে উৎপাদিত যাবতীয় উপাদেয় ফসল, উপার্জিত অর্থকড়ি সবই পশ্চিমে পাচার করতে লাগল। যাবতীয় ভুবনজয়ী শিল্পসমূহকে পঙ্গু করে দিল। কৃষকদের জমিজমা ছিনিয়ে নিয়ে জারি করল কুখ্যাত জমিদারী প্রথা। ফলে একসময়কার সুখ-সমৃদ্ধির স্বর্গরাজ্যে দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ। অনাহারে প্রাণ হারায় লাখ লাখ মানুষ।

অবস্থা কত মারাত্মক আকার ধারণ করেছিল তা কিছুটা উপলব্ধি করা যায় স্বয়ং ইংরেজ লেখক ডব্লিও এস ব্লিন্ট এর কথায়। তিনি লেখেন, "আমরা যদি লুটপাটের এ ধারা অব্যাহত রাখি তাহলে এক সময় আসবে যখন ভারতীয়রা বাধ্য হয়ে একে অপরকে ভক্ষণ করবে"।

রাজনৈতিকভাবেও তারা ভারতবাসীকে এমন নির্বিকার করে ফেলেছিল যে, এ দেশের মানুষের জন্য সংঘবদ্ধ হওয়া ও স্বাধীনতার চিন্তা করাও ছিল এক দুঃস্বপ্ন। কিছু পদলেহী পিশাচ হিন্দু জমিদারদের মাধ্যমে এ দেশের মুসলমানদেরকে আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গদের মত গোলাম জাতিতে পরিণত করেছিল। এদেশের নিস্পেষিত গরিব অসহায় কৃষকদেরকে বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে বিভিন্ন দেশ-দ্বীপে পাচার করে দিত। সেখানে তাদেরকে পশুর মত কঠিন কঠিন কাজে ব্যবহার করা হত। আজো পৃথিবীর দূরতম দ্বীপ 'ফিজি' দ্বীপপুঞ্জ ও সাউথ আফ্রিকায় এর সাক্ষী বিদ্যমান।

আর ধর্মীয় দিক থেকে মুসলমানদের কী কী ক্ষতি ইংরেজরা করেছিল তা এক দীর্ঘ ইতিহাস। তারা সারা দেশের সকল ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়। হাজার হাজার আলেম উলামাকে ফাঁসি দিয়ে, আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করে। লাখ লাখ আলেম-মুসলমানদেরকে জেল-জুলুম-নির্যাতন ও দেশান্তর করে। একপর্যায়ে পুরো ভারতবর্ষকে কার্যত আলেমশূণ্য করে ফেলে। চৌত্রিশ হাজার আলেমকে শহীদ করা হয়। ১৮৫৭ সালের ১৮ই নভেম্বর একই দিনে দিল্লীর শাহী মসজিদের আঙিনায় ২৭ হাজার মুসলমানকে হত্যা করা হয়। ইংরেজ লেখক থেম্‌সন এর ভাষায়– '১৪ হাজার আলেমকে ঠাণ্ডা মাথায় ফাঁসি দেয়া হয়। কারো গায়ে শুকরের চামড়া পরিয়ে চর্বি মাখিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়া হত। কাউকে গরম কড়াইয়ে ভেজে ফেলা হত। কখনো হাতির উপর তুলে গাছে ঝুলিয়ে বেঁধে হাতি সরিয়ে নেয়া হত'। ১৯৬১ সালে কুরআন ও ইসলামকে মিটিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে তিন লক্ষাধিক কুরআন মাজিদ আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয়। ফলে এক পর্যায়ে এদেশের মানুষ ইসলামী পরিচয় ভুলে যেতে শুরু করে প্রায়। আলেমের অভাবে জানাযা পড়ানোর লোকের অভাব দেখা দেয়।

বর্ণবাদী হিন্দুদেরকে মুসলমানদের উপর লেলিয়ে দেয়া হয়। শিখদের সহযোগিতায় মুসলিম নিধনের সকল চেষ্টাই করা হয় তখন। হিন্দু-মুসলিম আন্তঃধর্মীয় দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করা হয়।

সর্বোপরি ইসলাম ধর্ম যেন আর কোন দিন তার আপন রূপে এদেশে শক্তিমান হয়ে উঠতে না পারে। বরং ইসলাম ধর্ম কেবল কিছু রসম রেওয়াজের নামই থাকে। ইসলামের নিরাপদ ও বাধাহীন অগ্রগতির পথকে রোধ করার জন্য সবচে'

ক্ষতিকর যে কাজটি তারা তখন করেছিল তা হল মুসলমানদের মধ্যে এমন কিছু নতুন ফেতনার উদ্ভব ঘটায় যার উপমা দূর অতীতেও পাওয়া যায় না। এমন কিছু ফেরকা ও মতবাদের জন্ম এবং পরিপোষণ তাদের হাতে হয়েছে, যা ব্যাপকতা, স্থায়িত্ব ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির ক্ষেত্রে ইতিহাসের অন্য অনেক ফেতনা ও ফেরকা থেকে ছিল অনেক বেশি ভয়ঙ্কর।

এক. কাদিয়ানী ধর্ম। নবীজীর ভবিষ্যদ্বাণী মুতাবেক অনেক ভণ্ডই নবুওত দাবী করেছে। কিন্তু কোন ভণ্ড বা তার দল না এত দীর্ঘ সময় টিকে থাকতে পেরেছে। আর না এভাবে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে। অথচ কাদিয়ানী ধর্মমত আজ সারা বিশ্বে নিরাপদে পশ্চিমাদের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে ইসলামকে ধ্বংস করার সকল চেষ্টা করে যাচ্ছে।

দুই. বেরলভী বা রেজভী সম্প্রদায়। যারা ইংরেজ বিরোধী সংগ্রামের সবচে' ঘোরতর বিরোধী ছিল। ইংরেজদের তোষণ ও ইংরেজ বিরোধী জিহাদরত সংগ্রামী আলেম-উলামাদেরকে 'কাফের' 'ওয়াহাবী' (তৎকালে সন্ত্রাসী অর্থে) ইত্যাদি বলে অপপ্রচার চালানোই ছিল তাদের মূল মিশন। এক্ষেত্রে তারা নবী প্রেমের মত স্পর্শকাতর বাণীকেই মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে।

তিন. ভারতীয় আহলেহাদীস। যারা হাদীস অনুসরণের সুন্নাহসম্মত পন্থা পরিত্যাগ করে এক নতুন বিদআতী পন্থা আবিষ্কার করে। হাদীস অনুসরণের নামে নিজেদের ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্তকে অন্যের উপর চাপিয়ে দেয়ার প্রয়াস পায়। উম্মতের মধ্যে বিভ্রান্তি ও বিভক্তি সৃষ্টির নিরন্তর প্রচেষ্টা চালায়। এরা সর্বদাই বিশেষ কিছু বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে আরব দেশের সালাফী-হাম্বলীদের সাথে মিল থাকার সুযোগে এদেশের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বৃহৎ দল সম্পর্কে তাদেরকে ভুল ধারণা দেয়ার অপচেষ্টা অব্যাহত রাখে। যাতে অনেক আরবরাও বেশ প্রভাবিত হন। এবং এদেরকে তাদের মত জ্ঞান করে এদেশের বিরাট অংশ আলেম-উলামাদের সম্পর্কে ভুল বুঝে থাকেন। অথচ ভারতীয় আহলেহাদীস ও তাদের কর্মপদ্ধতিতে বিরাট ফারাক রয়েছে।

চার. খৃষ্টান মিশনারি কর্তৃক তাদের ধর্মের প্রচার ও ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে নানারূপ প্রশ্ন উত্থাপন পূর্বক এক শ্রেণীর মুসলমানকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করতে থাকে।

স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ফলাফল

১৭৫৭ সালে ইংরেজরা সিরাজুদ্দৌলাকে পরাজিত করে। অতঃপর ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধে এবং অবশেষে ১৮০৩-৬ সালের মধ্যে সর্বশেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ্ থেকে পুরো ভারতবর্ষের ক্ষমতা দখল করে নেয়। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা

ও নিরাপত্তা, দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন, এদেশীয় গণমানুষের পরম আরাধ্য সুখ-শান্তির জন্য, সর্বোপরি ইসলাম ধর্মকে রক্ষার জন্য ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার কোন বিকল্প ছিল না। সময়ের প্রয়োজন ছিল এ উদ্দেশ্যে জিহাদের ডাক দেওয়া। স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘোষণা দিয়ে মানুষের লুপ্ত চেতনা ফিরিয়ে আনা।

ফতোয়া

উলামায়ে দেওবন্দের পূর্বপুরুষ, বিশ্বময় ছড়িয়ে থাকা লাখো কওমী মাদরাসা ও দুনিয়াতে বিশুদ্ধ দ্বীনী শিক্ষার বাহক বৃহত্তম এ দলের প্রাণপুরুষ ও অন্যতম নির্মাতা শাহ আব্দুল আযীয দেহলবী সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে ঐতিহাসিক বিপ্লবী ফতোয়া জারি করেন, ভারতবর্ষ এখন 'দারুল হরব' তথা শত্রুকবলিত হয়ে পড়েছে। তাই এ দেশের প্রত্যেক মুসলমানের ধর্মীয় ও ঈমানী দায়িত্ব হয়ে পড়েছে এদের কবল থেকে দেশ ও ইসলামকে রক্ষা করা। এদের বিতাড়িত করে ঈমান ইসলাম রক্ষার সর্বাত্মক জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়া।

ঐতিহাসিক ফতোয়ার প্রভাব

মাওলানা শাহ আব্দুল আযীযের এ ফতোয়া দাবানলের ন্যায় ছড়িয়ে পড়ে। এ ফতোয়া প্রায় বার লক্ষ ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দেশ ভারতের কোটি কোটি ধার্মিক মানুষ, লাখ লাখ আলেম-উলামাকে ধর্মীয় চেতনায় উজ্জীবিত করে তোলে। যার ফলশ্রুতিতে দেশ জুড়ে সম্মিলিত ও বিচ্ছিন্নভাবে যে আন্দোলন-সংগ্রামের সূচনা হয় তাতে দেড়শত বছর পর ১৯৪৭ সালে ইংরেজরা ভারত থেকে এবং এরই ধারাবাহিকতায় পৃথিবীর দখলকৃত সকল দেশ থেকে তাদের পতন নিশ্চিত হয়। তখনই রাশিয়া-আমেরিকা নতুন পরাশক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

বাংলায় তিতুমীরের আন্দোলন, হাজী শরীয়তউল্লার ফরায়েজী আন্দোলন, শহীদানে বালাকোট সৈয়দ আহমদ শহীদ ও ইসমাঈল শহীদ রহ. এর জিহাদী কাফেলা, ১৮৩১ সালে বালাকোটে শাহাদাত, ১৮৫৭ সালের মুক্তিসংগ্রাম (সিপাহী বিপ্লব) যা পুরো ভারত জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। এবং যে বিদ্রোহে প্রায় বিশ লাখ লোক অংশ গ্রহণ করেছিল। এর মূল কেন্দ্রগুলো ছিল দিল্লী, আম্বালা, পাটনা, সিত্তানা প্রভৃতি অঞ্চলে। তখনই হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কীকে আমীরুল মু'মিনীন, কাসিম নানুতুবীকে প্রধান সেনাপতি করে স্বাধীন থানাভবন সরকার গঠন করা হয়। অবশেষে ৫৭ এর আজাদীর সংগ্রামে দুঃখজনক পরাজয়। অতঃপর দ্বীনী ও জাতীয় মুক্তিকে সামনে রেখে ১৮৬৬ সালে দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা।

প্রথম ছাত্র শাইখুল হিন্দ কর্তৃক ১৮৯০ সালে জামিয়াতুল আনসার প্রতিষ্ঠা। ১৯১৬ সালে ভারতের স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে বহির্বিশ্বের সাথে যুক্ত হয়ে রেশমি রুমাল আন্দোলনের প্রচেষ্টা, ১৯১৯ সালে খেলাফত আন্দোলন এবং সর্বশেষ ১৯৪২ সালে হিন্দু-মুসলিম সম্মিলিতভাবে ভারত ছাড় আন্দোলনের মাধ্যমে ইংরেজদের এদেশ থেকে বিতাড়িত করা হয়।

এ স্বাধীনতার ঘোষক শাহ আব্দুল আযীয দেহলবী ও তাঁর অনুসারীরা কী পরিমাণ ত্যাগ জেল-জুলুম ও রক্তের বিনিময়ে দেড়শ বছর এ আন্দোলনকে জিইয়ে রেখেছেন। যার ফলে সর্বভারত ব্যাপী ইংরেজ খেদাও আন্দোলনের সূচনা হয়, এবং তা সফল হয় তা এক দীর্ঘ ইতিহাস। এ ক্ষেত্রে শাহ আব্দুল আযীযের বিপ্লবী চেতনা জাগানিয়া ফতোয়ার ভূমিকার কথা কোন বিবেকবান মানুষ অস্বীকার বা খাট করতে পারবে না। তবে দুঃখজনক বাস্তবতা হল আজ বিকৃত ইতিহাসে এর কোন উল্লেখ নেই বলে ইতিহাস পাঠকেরা এ সত্য সম্পর্কে জানেন না।

স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধীরা ইংরেজ সরকারের সুবিধাভোগী দালাল

দখলদার ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে সর্বদা সবচে' শক্তিশালী বেগবান আন্দোলনটা ছিল মূলত ধর্মীয় চেতনা থেকেই। যা তারা সুস্পষ্টই স্বীকার করেছে। আর এর মূলে ছিল ভারতকে 'দারুল হরব' বলে ফতোয়া দিয়ে জিহাদ ফরজ হয়ে যাওয়ার ঘোষণা। তাই তারা একদিকে যেমন জিহাদের বিধান সম্বলিত কোরআনের তিন লক্ষাধিক কপি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ছিল, তেমনি অপরদিকে মুসলিম নামধারী কিছু সুবিধাভোগী লোকদের দ্বারা এ ফতোয়া জারি করার চেষ্টা করেছে যে, ভারত 'দারুল হরব' নয় বরং ভারত 'দারুল ইসলাম'। তারা ভারত 'দারুল হরব' হওয়ার ফতোয়াকে অস্বীকার করে। এবং একে স্বাধীন করার জন্য জিহাদের প্রয়োজনীয়তাকেও অস্বীকার করে। কুরআন-হাদীস ও ফিকহের কিতাব থেকে বিভিন্ন উদ্ধৃতি পেশ করে সাধারণ ধর্মপ্রাণ মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করে ভারতের স্বাধীনতাকে বাধাগ্রস্ত করে। মুসলমানদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। স্বাধীনতা যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধা ও সংগ্রামী মুজাহিদদের 'ওহাবী' (সন্ত্রাসী অর্থে) ও তাদের নেতৃস্থানীয়দের 'কাফের' 'বিভ্রান্ত' আখ্যায়িত করে ইংরেজ সরকারের সর্বোচ্চ সহযোগিতা করেছে। এদের শীর্ষে ছিল ১. কাদিয়ানী সম্প্রদায় ২. বেরলভী বা রেজভী সম্প্রদায় ৩. ভারতীয় আহলেহাদীস।

কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী সরাসরি নবুওয়াত দাবি করার কারণে তার বিভ্রান্তিটা ও স্বার্থসিদ্ধির বিষয়টা সুস্পষ্ট থাকায় তাদের দ্বারা ততটা ক্ষতি হয়নি যতটা পরবর্তী দুই দলের দ্বারা হয়েছে।

স্বাধীনতার বিরোধিতায় বেরলভীরা

বেরলভী জামাতের প্রতিষ্ঠাতা আহমদ রেজা খান (মৃত ১৯২১) । যাকে তারা আ'লা হযরত, জামানার মুজাদ্দিদ ও ইমাম উপাধিতে আখ্যায়িত করে থাকে। তার ব্যক্তিগত জীবনাচার ও মিশন সম্পর্কে আলোকপাত না করে এখানে কেবল তৎকর্তৃক স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা ও ইংরেজ সরকারের অনুকম্পা লাভের কয়েকটি নমুনা তুলে ধরছি।

১. তিনি মির্জা আলী বেগ নামক জনৈক ব্যক্তির (১২৯৮ হিজরী) "ভারতবর্ষ 'দারুল হরব' নাকি 'দারুল ইসলাম" বিষয়ক একটি প্রশ্নসহ কয়েকটি প্রশ্নের জবাবে একটি পুস্তিকা রচনা করেন। নাম দেন 'ই'লামুল আ'লাম বিআন্না হিন্দুস্তান দারুল ইসলাম'। (অর্থঃ জ্ঞানীদের জন্য ঘোষণা, হিন্দুস্তান দারুল ইসলাম)। এতে তিনি লেখেন–'আমাদের মাজহাব অনুসারে হিন্দুস্তান 'দারুল হরব' নয় বরং নিশ্চিতভাবে 'দারুল ইসলাম'। শেষের দিকে লেখেন, 'হিন্দুস্তানের দারুল ইসলাম হওয়ার বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই'। এতে তিনি অভিযোগ করেন, মূলত যারা হিন্দুস্তানকে 'দারুল হরব বলেছে তাদের উদ্দেশ্য সুদকে হালাল করা। জঘন্যতম পাপ সুদ খাওয়াকে হালাল করার লালসায় তারা হিন্দুস্তানকে দারুল হরব বলেছেন। অতঃপর সুদের জঘন্যতা ও শাস্তির বিবরণ সম্বলিত কিছু হাদীস উল্লেখ করে আলোচনা সমাপ্ত করেন।

প্রশ্নে উল্লিখিত সন থেকে অনুমান হয় এটি উনবিংশ শতাব্দীর আশির দশকের ঘটনা। এর ভূমিকাতে তিনি লিখেছেন, এ দেশে ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান কোনরূপ বাধা-বিপত্তি ব্যতীত প্রকাশ্যে আঞ্জাম দেওয়া যায়। বরং ইংরেজ সরকার বিধর্মী হওয়া সত্ত্বেও এ সকল বিষয়ে ইসলামের বিধি-বিধান অনুযায়ীই বিচার করতে হয়। এটা বরং ইসলামের মহান শরীয়তের গর্ব করার মত শক্তি যে, অমুসলিম হওয়া সত্ত্বেও তাকে স্বীকার করে নিতে হয়। এ ছাড়া তিনি দশ পৃষ্ঠার আলোচনায় শুধু ফিকহের কিতাবে উদ্ধৃত দারুল হরব হওয়া না হওয়ার শর্তাবলীর আলোচনা উল্লেখ করেছেন।

উল্লেখ্য যে, এর কিছুকাল পূর্বে সত্তরের দশক ছিল ইংরেজদের দু'শো বছরের দুঃশাসনের সবচে' জঘন্যতম কাল। ৫৭ এর মুক্তিসংগ্রামের পর থেকে শুরু করে পুরো সত্তরের দশকজুড়ে ইংরেজরা দেশব্যাপী যে তাণ্ডব ও ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে ছিল, পৃথিবীর ইতিহাসে এর নজীর নিতান্তই কম। আর এ দশ-পনের বছরের মধ্যেই রেজভী সাহেব ইংরেজের তাণ্ডবলীলার সাক্ষী, আজাদী আন্দোলনের মুক্তিযোদ্ধাদের রক্তে ভেজা সেঁতসেঁতে মাটিতে বসেই একে 'দারুল ইসলাম' ইসলামের জন্য নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত রাষ্ট্র ঘোষণা করতেও এ মর্মে বই লিখে

জানান দিতে তাঁর কলম কী এতটুকু কাঁপেনি! অথচ তখনো মাল্টা, কালাপানিসহ ভারত ও বিশ্বের বহু যিন্দানখনায় মুক্তিকামী মুজাহিদ বাহিনী ইতিহাসের নির্মম জুলুম-নির্যাতনের মধ্যে মৃত্যুর প্রহর গুনছেন।

২. রেজভী সম্প্রদায়ের উল্লেখযোগ্য আলেম আব্দুল করীম সিরাজনগরী তার 'আহলে সুন্নত বনাম আহলে বিদআত' বইয়ে লেখেন, 'ইমাম আহমদ রেজা খান জীবনের শেষ দিকে ভারতীয় রাজনীতি এক নতুন মোড় নিয়েছিল। ১৯১৯ সনে ভারতবর্ষে খেলাফত আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল। পরবর্তী বৎসর ১৯২০ সনে আবার অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয়। আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খান বেরলভী (রা.) উক্ত আন্দোলনদ্বয়ের (শেষোক্ত আন্দোলনের) নীতিগত বিরোধিতা করেন। তিনি এ সম্পর্কে ১৯২০ সনে 'আল মাহাজ্জাতুল মু'তামানা ফী আয়াতিল মুম্‌তাহানা' নামীয় একখানা পুস্তক প্রণয়ন করেন। উক্ত পুস্তিকায় তিনি উপমহাদেশের কাফির ও মুশরিকদের সাথে সহযোগিতা করার ও তাদের সাথে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপন করার ভয়াবহ পরিণতির কথা উপমহাদেশের মুসলমানদেরকে স্মরণ করিয়ে দেন। তাঁর ভক্ত ও অনুসারীগণ "জামাতে রেজায়ে মুস্তফা" নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর 'অল ইন্ডিয়া সুন্নী কনফারেন্স' নামে আরেকটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন"। (পৃ. ২০৫ সূত্রে– প্রকৃত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ১৮১)

উপরিউক্ত উদ্ধৃতি রেজভী সাহেবের একান্ত অনুসারী ভক্ত সিরাজনগরী সাহেবের। এতেই স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা সুস্পষ্ট। উল্লেখ্য যে, খেলাফত আন্দোলন ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধপরবর্তী ইসলামী খেলাফতের শেষ চিহ্ন তুরস্কের উসমানী খেলাফত রক্ষার আন্দোলন। এবং এটি ও পরবর্তী অসহযোগ আন্দোলন ছিল ইংরেজ খেদাও আন্দোলন। উভয় আন্দোলনেই ভারতের সকল মুসলমান সবধরনের মতভেদ ভুলে দল-মত নির্বিশেষে অংশ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু তখনো তিনি এতে অংশও নেননি, চুপও থাকেননি; পরন্তু উল্টো এ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সকল আলেমকে 'গান্ধী ফেরকা' বলে আখ্যায়িত করে তাদের বিরুদ্ধে প্রচারণা ও ফতোয়াবাজী চালাতে থাকেন। অথচ হিন্দু-মুসলিম যৌথ আন্দোলনের ফলেই এক সময় ইংরেজরা এদেশ থেকে লেজ গুটাতে বাধ্য হয়। যদিও রেজভী সাহেব তা মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। অবশ্য (১৩৪০ হি.) ১৯২১ সালে রেজভী সাহেব ইন্তেকাল করেন। নতুবা হয়ত ৪২ ও ৪৭ সালে তাকে অতীতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতার জন্য ক্ষমা চাওয়া বা আবারো বিরোধিতা করে ইংরেজদের সাথে দেশত্যাগ ছাড়া আর কোন বিকল্প থাকত না।

ইংরেজ সরকারের পক্ষে এরূপ ফতোয়া জারির কারণে হয়ত বেরলভীরা ইংরেজ সরকারের বিভিন্ন রকম সহযোগিতাও পায়। যে সরকার কুরআন পুড়িয়ে ফেলে, তারাই আবার তাদের প্রশান্ত মনে সহযোগিতার দুয়ার খুলে দেয় কেন? কারণ তারা কুরআন পুড়িয়েও যে কাজ করতে সক্ষম হয়নি সে কাজ এদেরকে দিয়ে করানো সম্ভব। পুড়ানোর চাইতে বিকৃত করা তুলনামূলক বেশি ক্ষতিকর। তাই তাদের সহযোগিতার জন্য ইংরেজ সরকারই এদেশে বেরলভীদের প্রতারণার হাতিয়ার নবী প্রেমের বাহানার নামে 'ঈদে মীলাদুন্নবীর' জন্য সরকারী ছুটি ঘোষণা করে।

স্বাধীনতার বিরোধিতায় ভারতীয় আহলেহাদীস

অপরদিকে ভারতীয় আহলেহাদীস সম্প্রদায়ের মূল প্রতিষ্ঠাতা মূলত মাওলানা নযীর হুসাইন দেহলবী (১৮০৫-১৯০২)। যাকে তারা তাদের ভাষায় 'শাইখুল কুল ফিল কুল' (সর্বকালের সকলের সেরা বিদ্বান) বলে থাকে। [আহলেহাদীস আন্দোলন, আসাদুল্লাহ্ আল-গালিবকৃত পৃ.৩২১]

'শাইখুল কুলে'র স্বাধীনতা বিরোধিতার আলোচনায় যে বই থেকে আমি উদ্ধৃতি দিচ্ছি তা বাংলাদেশের বিখ্যাত আহলে হাদীস প্রকাশনী 'তাওহীদ পাবলিকেশন্স' থেকে প্রকাশিত (২০০৬ খৃ.) অধ্যাপক ড.মুহাম্মাদ মজীবুর রহমান লেখা জীবনী গ্রন্থ 'শাইখুল কুল ফিল কুল সাইয়েদ মিঞা মুহাম্মাদ নাযীর হুসাইন মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. থেকে। তিনি আজাদী সংগ্রামে মিঞা সাহেবের ভূমিকা শিরোনামে লেখেন, "১৮৫৭ সালের আজাদী সংগ্রামে কতিপয় প্রভাবশালী আলিম ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের ফতোয়া দেন। মিঞা সাহেব তাতে স্বাক্ষর করেননি। তিনি বলেন, জিহাদ ঘোষণার জন্য যে সমস্ত শর্তের প্রয়োজন সেই সমস্ত শর্ত বর্তমানে বিদ্যমান নেই। সম্রাট বাহাদুর শাহকেও তিনি বুঝাতেন যে, ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া তার পক্ষে ন্যায় সঙ্গত হবে না"। মোটকথা তিনি সে ফতোয়ার বিরোধিতা করেন।

অতঃপর তিনি আজাদী সংগ্রামের সময় ইংরেজদের বিভিন্ন রকমের সহযোগিতা করেছেন। এর কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ইংরেজরা ১৮৭৭ সালে তাকে একটি সার্টিফিকেট প্রদান করে। অধ্যাপক মজীবুর রহমান সার্টিফিকেটের অনুলিপি উল্লেখ করার পর লেখেন, 'এ ধরনের আরো বহু সার্টিফিকেট ইংরেজরা মিঞা সাহেবকে প্রদান করেন'। কিন্তু সে সার্টিফিকেটগুলো তাকে কেন দেয়া হয়েছিল এবং তিনি তাদের কী কী ধরনের সহযোগিতা করেছিলেন এর বিস্তারিত কোন উল্লেখ তিনি না করলেও ইংরেজদের দেওয়া চিঠি থেকে এর সুস্পষ্ট নমুনা পাওয়া যায়।

তিনি আরো লেখেন, ১৮৭০ সালের পর তিনি হজ্জে যাওয়ার সময় দিল্লীর ইংরেজ কমিশনার তার নিরাপত্তার জন্য দুটি পত্র তার হাতে দিয়ে দেন। একটিতে লেখা ছিল, "মৌলভী নযীর হুসাইন মিঞা সাহেব দিল্লীর একজন প্রথিতযশা মুহাদ্দিস, মুফাসসির ও ক্ষণজন্মা আলিম। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের বিপদের সময় তিনি এই গভর্নমেন্টের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করেছেন। হজ্জব্রত উদযাপনকল্পে তিনি মক্কা যাইতেছেন। আমি আশা করি, প্রত্যেক ব্রিটিশ অফিসার তাহাকে সাহায্য করিবেন। এবং তাহার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিতে প্রস্তুত থাকিবেন। কেননা তিনি এই সাহায্য ও সহানুভূতি পাওয়ার সম্পূর্ণ যোগ্য ও উপযুক্ত ব্যক্তি। সুতরাং তাঁর প্রতি সার্বিক ও সামগ্রিকভাবে সাহায্য সহায়তার হাত প্রসারিত করা হোক এটাই আমার অন্তরের অন্তঃস্থিত কামনা ও অভিলাষ। (স্বাক্ষর–আই. ডিট্রিম লেল্ট ... ১৮৮৩ খৃ.)। দ্বিতীয় পত্রে মিঃ লিসেন্স জিদ্দায় অবস্থিত ব্রিটিশ কাউন্সিলের নামে দিয়েছিলেন। তাতে ব্রিটিশের প্রতি তার আনুগত্যের কথা লেখা ছিল। ... সুতরাং ব্রিটিশ কাউন্সিলের কর্তব্য হবে সর্বতোভাবে শত্রুতা হতে তাকে রক্ষা করা"।

দেশকে 'দারুল হরব' না বলে 'দারুল ইসলাম' বলা, ৫৭ এর আজাদী আন্দোলনে ইংরেজদের সহযোগিতা, ৭৭ এ সার্টিফিকেট পাওয়া, ৮৩ সালে হজ্জে গমনে ইংরেজ প্রদত্ত নিরাপত্তা ইত্যাদি থেকে বোঝা যায় ইংরেজ সরকারের প্রতি তার আনুগত্যে কোন ছেদ পড়েনি। বরং বোঝা যায় শেষ জীবন পর্যন্ত তিনি ইংরেজদের আনুগত্য প্রদর্শনে ও সহযোগিতায় কোনরূপ কসুর করেননি। তাই ইংরেজরা তাঁকে ইন্তেকালের পাঁচ বছর আগেও বিশেষ খেতাবে ভূষিত করে 'দায়' আদায় করেছে। মুজীবুর রহমান লেখেন, 'ব্রিটিশ সরকারে পক্ষ হতে মিঞা সাহেব ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ২২ শে জুন ১৩১৫ হিজরী মঙ্গলবার 'শামসুল উলামা' (বিদ্বানগণের সূর্য) খেতাব লাভ করেন'।

অধ্যাপক মুজীবুর রহমান স্বীকার করেছেন যে, ১৮৫৭ সালের আজাদী আন্দোলনের পর পাক-বাংলা-ভারতের মুসলিম জাতির মাঝে চরম বিপর্যয় ও দুর্যোগ নেমে এসেছিল। এবং আলেম সম্প্রদায়ও এ থেকে বাদ পড়েনি। (পৃ.৫৭) এতে লেখক একদিকে ৫৭ এর সংগ্রামকে অকপটে আজাদী আন্দোলন তথা মুক্তিসংগ্রাম বলে স্বীকার করেছেন। অতঃপর লিখেন, মিঞা সাহেবকেও এ আজাদী আন্দোলনে অংশগ্রহণের সন্দেহে কারাগারে ৯ দিন নজরবন্দী করে রাখা হয়। অতঃপর লেখেন, 'কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে কোন প্রমাণাদি না পেয়ে তাঁকে বেকসুর খালাস করে দেয়া হয়'।

মিঞা সাহেবের মতাদর্শের একান্ত অনুসারী ভক্ত জীবনীকারের উপরিউক্ত উদ্ধৃতিগুলো থেকে ভারতীয় আহলেহাদীসের মূলত প্রতিষ্ঠাতা তাদের ভাষায় 'শাইখুল কুল ফিল কুল' এর স্বাধীনতার বিরোধিতার বিষয়ে কোন অস্পষ্টতা

থাকার কথা নয়। আর তার অনুসারীগণও এর ব্যতিক্রম ছিল না। উদাহরণ স্বরূপ তাঁর এক খ্যাতনামা ছাত্র ও তার মতাদর্শের 'আহলেহাদীস' আন্দোলনের প্রাতিষ্ঠানিক রূপদাতা মূল প্রচারক মুহাম্মদ হুসাইন বাটালবীর বিষয়টা দেখা যেতে পারে।

মুহাম্মদ হুসাইন বাটালবী (মৃ. ১৯২০)। যাকে আসাদুল্লাহ আল-গালিব তার আহলেহাদীস আন্দোলন গ্রন্থে 'শামসুল উলামা', পাঞ্জাবের খ্যাতনামা আহলেহাদীস নেতা, মাসিক ইশা'আতুসসুন্নাহ্ এর মালিক ও সম্পাদক, মিঞা সাহেবের খ্যাতিমান ছাত্র ও নিজে অগণিত ছাত্রের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ইত্যাদি অভিধায় উল্লেখ করেছেন। যা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তিনি আহলেহাদীসের কত বড় নেতা ছিলেন। বস্তুত তিনিই বিভিন্ন নামে পরিচিত এ মতাদর্শের লোকদের জন্য 'আহলেহাদীস নামের ব্যবস্থা করেছেন। ইশা'আতুসসুন্নাহ নামক পত্রিকার মাধ্যমে আহলেহাদীস মতাদর্শের প্রসার ঘটিয়ে দ্বিতীয় জনকের স্থান দখল করেছেন। তিনিও ইংরেজদের সাথে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছেন। এবং তাদের সহযোগিতার কথা সরাসরি ঘোষণা করেছেন। যে কারণে তার আবেদনের প্রেক্ষিতেই ইংরেজ সরকার 'ভারতীয় আহলেহাদীসকে 'মুহাম্মদী, মুওয়াহহিদ, গাইরে মুকাল্লিদ ইত্যাদি বহু নামের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে আহলেহাদীস নাম লিখে দেয়। তিনি ইংরেজ সরকারের সবধরনের আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যা আহলেহাদীস লেখকরাও এড়িয়ে যেতে পারেন না। তাই তিনি 'শামসুল উলামা' খেতাবে ভূষিত হয়েছিলেন।

স্বয়ং ড. আসাদুল্লাহ্ আল-গালিব ইংরেজ বিরোধী জিহাদকে আহলেহাদীসের আন্দোলন বলে ইতিহাস বিকৃতি করতে যেয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে বাটালবী সাহেব ইংরেজ পক্ষাবলম্বনের কথা স্বীকার করে বলেন, 'মাওলানা মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালবী নিজের প্রচেষ্টায় ওয়াহাবী ও আহলে হাদিস এক নয় সেকথা ব্রিটিশ সরকারকে বুঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন। এর দ্বারা তিনি সাধারণ নিরীহ আহলেহাদীসদেরকে ইংরেজের জেল-জুলুম হ'তে বাঁচাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এর দ্বারা সমগ্র আহলেহাদীসকে ইংরেজের অনুগত প্রমাণ করার যে ব্যর্থ চেষ্টা কোন কোন মহল থেকে লক্ষ্য করা গেছে তা কোন ক্রমেই ঠিক নয়'। অতঃপর ড. গালিব মাওলানা বাটালবীকে আহলে হাদিসের উল্লেখযোগ্য কোন ব্যক্তি নয়, এবং তিনি ব্যতীত আর কেউ একে সমর্থন করেনি বুঝাতে গিয়ে লেখেন– 'মাওলানা বাটালবী ব্যতীত সমসাময়িক ও পরবর্তী যুগের কোন উল্লেখযোগ্য আহলেহাদীস উক্ত ভূমিকা সমর্থন করেননি'। (পৃ.২৭৫) অথচ বাটালবী ও মিঞা সাহেব দুজনই ছিলেন আহলেহাদীসের প্রাণপুরুষ ও প্রতিষ্ঠাতা। তারাই যদি ইংরেজের আনুগত্য স্বীকার করে স্বাধীনতার বিরোধিতা করেন। তবে কারা একে সমর্থন করেননি? তারা ব্যতীত আর কারা আহলেহাদীসের 'উল্লেখযোগ্য' ব্যক্তি?

অপর বিখ্যাত আহলেহাদীস আলেম মাওলানা নবাব ছিদ্দীক হাসান কান্নৌজী (১৮৩২-১৯০২)। তার বিষয়ে ড. গালিব এতটুকু লেখার সামর্থ্য পেয়েছেন যে, তিনি সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করলেও লেখনীর মাধ্যমে জিহাদের অনুপ্রেরণা দিতেন। অতঃপর তার জিহাদী প্রেরণার একটি উদাহরণ তুলে ধরেন এভাবে– যেখানে লেখা ছিল 'যে ব্যক্তি বাতিলের বিরুদ্ধে জিহাদ করল না, কিংবা জিহাদের সংকল্প করল না সে ব্যক্তি মুনাফিকের কাতারে গণ্য হবে'। এ অপরাধে তাকে ইংরেজ সরকার হত্যা করতে চেয়ে রাণীর খাতিরে কেবল ক্ষমতা থেকে বরখাস্ত করেই ক্ষান্ত রইল'। ড. গালিব জিহাদ আন্দোলন ও নবাব ছিদ্দীক হাসান খান অধ্যায়ে লিখার মত এরচেয়ে বেশি কিছু আর পাননি।

অথচ তিনিই লিখেছেন, যখন আজাদী আন্দোলনের সংগ্রামীরা পৃথিবীর নিকৃষ্টতম জুলুমের শিকার ঠিক তখন ১৮৬০ সালে তিনি ৭৫ টাকা বেতনে ইংরেজ অনুগত ভূপালের রাণীর চাকরী গ্রহণ করেন। অতঃপর ১৮৭১ সালে ব্রিটিশ অনুগত ভূপালের রাণীকে বিয়ে করেন। এবং ১৮৭২ সালে তিনি রাজ্যের সর্বোচ্চ সরকারী খেতাব 'নবাব ওয়ালাজাহ আমীরুল মুলক' উপাধি প্রাপ্ত হন। এবং দীর্ঘদিন ইংরেজদের অধীনে নবাবের দায়িত্ব পালন করেন। যদি তাই হয় তাহলে ইংরেজদের আনুগত্যের অবশিষ্ট আর রইল কী ?

অবশ্য ড. গালিব সাহেব লিখেছেন, ইংরেজরা তাঁকে আন্দোলন তো নয়ই, ইংরেজ বিরোধী জিহাদও নয় বরং জিহাদ সংক্রান্ত একটি বর্ণনা লেখার কারণে শাস্তিস্বরূপ বরখাস্ত করেছে'। কিন্তু ড. গালিব সাহেব নিজেই খানিক পূর্বে ৩৪৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, '১৮৮৫ সালের ২৬ শে আগস্ট তিনি উক্ত খেতাব ও নবাবের দায়-দায়িত্ব থেকে অবসর গ্রহণ করেন'। আমাদের প্রশ্ন যদি তিনি অবসর গ্রহণ করে থাকেন তাহলে ইংরেজরা তাকে 'বরখাস্ত করল' কথার অর্থ কী? আর তাঁর জিহাদটাই বা গেল কোথায়? আর যদি বরখাস্তই করা হয়ে থাকে তাহলে 'স্বেচ্ছা অবসর গ্রহণের' অর্থ কী?

বেরলভী ও আহলেহাদীসের তথাকথিত অবদান!

বিগত ২০/০১/২০১২ ইংরেজি তারিখে বাংলাদেশের একটি জাতীয় পত্রিকা দৈনিক ইনকিলাবের একটি সংবাদ আমাকে অবাক করে দেয়। শিরোনাম ছিল, 'চট্টগ্রামে আ'লা হযরত কনফারেন্স : উপমহাদেশকে ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তির প্রেরণা দেন আ'লা হযরত'। আহমদ রেযা বেরলভী সাহেবের ৯৩ তম মৃত্যু বার্ষিকীতে ইয়াউমে রেযা (আ'লা হযরত দিবস) উপলক্ষে আ'লা হযরত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর উদ্যোগে ১৯ জানুয়ারি আ'লা হযরত কনফারেন্স ২০১২ অনুষ্ঠিত

হয়। এতে বক্তারা বলেন, ‘উপমহাদেশকে ব্রিটিশ শাসনের কবল থেকে মুক্তির রূপরেখা পেশ করে তিনি গণমুখিতার দৃষ্টান্ত রাখার পাশাপাশি ইসলামের নামে চরমপন্থার বিরুদ্ধে লেখনী যুদ্ধ চালিয়েছেন’। বক্তারা বলেন, ‘চরমপন্থা ও নরমপন্থা দুটোই বর্জনীয়। আ'লা হযরতের কণ্ঠস্বর অন্যায় অবিচার ও ইসলামের নামে বিকৃত কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সব সময় সোচ্চার। বাতিল ও অপশক্তির কাছে মাথা নত না করে ঈমান আকীদার প্রশ্নে আপসহীন থাকাই আ'লা হযরতের জীবন দর্শন’। (দৈনিক ইনকিলাব, বৃহস্পতিবার, ২০/০১/২০১২)

আমরা অবাক হয়েছি, রেজভী সাহেব ইংরেজ শাসিত ভারতকে দারুল ইসলাম বলে প্রচার করলেন। জিহাদের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করে সবধরনের ইংরেজ বিরোধী সংগ্রামের বিরোধিতা করলেন। আমরণ এ আদর্শকে ধরে রেখে মৃত্যুর পূর্ব-মুহূর্তেও খেলাফত আন্দোলন ও ইংরেজ বিরোধী চূড়ান্ত অসহযোগ আন্দোলনকে হারাম ফতোয়া দিয়ে চরম বিরোধিতা করে গেলেন। মুজাহিদদেরকে ‘ওহাবী’ ‘কাফির’ ‘পথভ্রষ্ট’ ‘নবীজীর দুশমন’ ইত্যাদি বলা তার পেশা ছিল। তথাপি যারা বলেন, ‘তিনি উপমহাদেশকে ব্রিটিশ শাসনের কবল থেকে মুক্তির রূপরেখা পেশ করেছেন’ তারা কেবলই সুধারণার ভিত্তিতে একথা বলছেন, নাকি সত্যকে আড়াল করার হীন চেষ্টা? যদি তার অবস্থাই তাদের না জানা থাকে তাহলে এমন বেখবর গাফেল, যারা নিকট অতীতে তাদের ইমাম বলে কথিত ব্যক্তির জীবনের মিশন সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখে না তাদের থেকে কী আশা করা যায়! আর যদি জেনে শুনে বুঝেই সত্যকে আড়াল করার কোশেশ করে থাকেন, তাহলে তাদের এত বড় ইতিহাস বিকৃতি ও নির্জলা মিথ্যা বলার দুঃসাহস হয় কি করে? ধর্মীয় বিষয়ে তাদের প্রতি আলেম হিসেবে আস্থা রাখার কোন সুযোগ অবশিষ্ট আছে কী?

অবশ্য বর্তমান রেজভী ভাইদের মধ্যেও বারবারই আহমদ রেজা খান সাহেবের ‘চরিত্র ও আদর্শের’ হুবহু অনুসরণ পরিলক্ষিত হচ্ছে। প্রতিপক্ষকে ‘কাফের’ বলা তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। অশ্লীল ভাষায় গালমন্দ করা, নানারকম চ্যালেঞ্জবাজী করা ইত্যাদি তাদের এক ধরনের নেশা বলেই মনে হয়। বর্তমান সময়েও যখন বাংলাদেশের কতিপয় নাস্তিক ব্লগার সরকারের প্রশ্রয়ে নবীজী সা. কে ইতিহাসের নিকৃষ্টতম ভাষায় কটূক্তি করেছে আর দেশের কোটি কোটি মানুষ তাদের বিচার চাইছে, আন্দোলনে ফুঁসে উঠেছে, তখন নবীজীকে কটূক্তি করার দীর্ঘদিন পর, আমাদের দেশের রেজভী ভাইদের নিদ্রা টুটেছে। ধারণা করা হচ্ছিল বিলম্বে হলেও ‘আশেকে রাসূলদের শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছে। তারাও এবার নবীজীর চিরশত্রু কতিপয় কুখ্যাত ‘ব্লগারদের’ শাস্তি দাবি করবে। কিন্তু অবাক করে দেয়া এক সম্মেলনের মাধ্যমে তারা তাদের আপন রূপের প্রকাশ ঘটায়।

উল্টো যারা দীর্ঘদিন যাবত 'কুখ্যাত ব্লগারদের' শাস্তির দাবিতে জনমত তৈরি করে আসছিলেন হেফাজতে ইসলাম ও মাওলানা আহমদ শফী ও তাঁর অনুসারীবৃন্দ। এরা তাদেরই 'ফাঁসি' দাবি করে বসল। তাদের 'কাফির' ফতোয়া দিয়ে দিল। খোদ নাস্তিক্যবাদীদের সরাসরি পক্ষাবলম্বনকারীরাও যে সাহস করতে পারেনি, সে কাজ তারা তাদের পক্ষ হয়ে করে দিল ! নবীজীর দুশমনদের বিচারের দাবি যখন আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হচ্ছিল ঠিক সেই মুহূর্তে এই 'আশেকে রাসূলরা' সরকারের পক্ষপাতিত্ব করে নিকৃষ্ট উপমা সৃষ্টি করার পাশাপাশি এই জানান দিয়ে গেল, তাদের পূর্ববর্তী চরিত্রে কোন পরিবর্তন আসেনি।

অপরদিকে নিখিল ভারত স্বাধীনতা সংগ্রামে আহলেহাদীসদের অবদান বিষয়েও সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন ড. আসাদুল্লাহ আল-গালিব তাঁর আহলেহাদীস আন্দোলন গ্রন্থে। এ উদ্দেশ্যে তিনি তার উক্ত বইয়ের প্রায় শতাধিক পৃষ্ঠা মসিলেপন করেছেন। কিন্তু তার এ চেষ্টা সফল হবার ছিল না।

তিনি তাঁর আলোচনার সারাংশে লেখেন, 'পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, পাক-ভারত উপমহাদেশকে গোলামীর শৃঙ্খল হতে মুক্ত করার জন্য এবং একই সাথে কুরআন ও হাদীস ভিত্তিক নির্ভেজাল ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য দিল্লীর অলিউল্লাহ পরিবার ও তার পরে পাটনার ছাদিকপুরী পরিবারের যে অবিস্মরণীয় অবদান রয়েছে, ভারতবর্ষে তার কোন তুলনা নেই। জিহাদ আন্দোলন ও আহলেহাদীস আন্দোলন একই সাথে চালাতে গিয়ে একদিকে ব্রিটিশ শাসনশক্তির নিষ্ঠুরতম আচরণ, জেল-জুলুম, ফাঁসি, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, আন্দামান ও কালাপানির লোমহর্ষক নির্যাতন, অপরদিকে ঈর্ষাকাতর আলেমদের ও তাদের অন্ধ অনুসারীদের প্রদত্ত অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ও ভূমিকম্পসদৃশ মুসীবতসমূহ হাসিমুখে বরণ করে নেওয়ার মাধ্যমে ছাদিকপুরী পরিবার যে অনন্য দৃষ্টান্ত রেখে গেছে তা ভবিষ্যতের যে কোন আদর্শবাদী মুজাহিদদের জন্য স্থায়ী প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে'। (পৃ.৩১৫) এখানে তিনি স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত সুনিপুণভাবে পুরো জিহাদ-আন্দোলনকেই আহলেহাদীসদের নিজস্ব কীর্তি প্রমাণ করার প্রাণান্তকর চেষ্টা করেছেন।

কিন্তু বাস্তবতা হল এর সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ–

১. ভারতীয় আহলেহাদীসের মূল জনক হলেন তাদের ভাষায় 'শাইখুল কুল ফিল কুল' (সর্বকালের সেরা বিদ্বান) মিঞা নযীর হুসাইন সাহেব। তাই ড. গালিব সাহেব তার বইয়ে আহলেহাদীস যে কয়জন ব্যক্তির জীবনী আলোচনা করেছেন তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখ করেছেন তাঁর নাম। এবং এতে সবচে' বেশি তথ্যপূর্ণ, দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তাঁর শিষ্যরা কে কোন এলাকায় আহলেহাদীস

আন্দোলনে কী অবদান রেখেছেন তাও সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন। এরপরই উল্লেখ করেছেন ছিদ্দীক হাসান কান্নৌজীর কথা। তবে তাঁর আলোচনা তুলনামূলক অনেক ছোট।

অথচ সেই মাওলানা নযীর হুসাইনই ইংরেজ বিরোধী মুসলমানদের সবচে’ কঠিন যুদ্ধে ইংরেজদের পক্ষাবলম্বন করেছেন, ইংরেজ সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছেন এবং আমরণ পুরস্কৃতই থেকেছেন তিনি এবং তার শিষ্যরাও। যা আহলেহাদীস লেখক অধ্যাপক মুজীবুর রহমানের উদ্ধৃতিতেই পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। এমনকি ড. গালিবও কোথাও তাঁর জিহাদে সম্পৃক্ততার কথা প্রমাণ করতে না পেরে কৌশল করে বলেন, ‘প্রাসঙ্গিকভাবে আমরা বলতে পারি যে, আল্লামা ইসমাঈল শহীদ রহ. সশস্ত্র জিহাদ আন্দোলনের মাধ্যমে ভারত উপমহাদেশে তথা দক্ষিণ এশিয়ার সর্বত্র আহলেহাদীস আন্দোলনের যে জোয়ার সৃষ্টি করেন, পরবর্তীতে আল্লামা সাইয়িদ নযীর হুসাইন দেহলভী রহ. পরিচালিত তাদরিসী জিহাদ সেই জোয়ারকে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে।’ আমরা বুঝে উঠতে পারছি না যে, ইংরেজের বিরুদ্ধে জিহাদ করে শাহ ইসমাঈল রহ. ‘শহীদ’ হলেন, ন্যক্কারজনকভাবে সেই ইংরেজের পক্ষাবলম্বনকারী কী করে তার উত্তরসূরি হন ?! এ কারণেই কি গালিব সাহেব মিঞা সাহেবকে প্রদত্ত ইংরেজের খেতাবের কথা বলার সময় ‘সম্রাজ্যবাদী দখলদার ইংরেজ সরকার’ না বলে সুকৌশলে বলেন, ‘ভারত সরকার’ তাঁকে শামসুল উলামা খেতাব দেন ?

২. ড. গালিব সাহেবের বইয়ে দ্বিতীয় মহান কীর্তিমান ব্যক্তিত্ব ছিদ্দীক হাসান সাহেব রহ. ও তার ভাষায় পাঞ্জাবের খ্যাতনামা আহলেহাদীস শামসুল উলামা মাওলানা মুহাম্মদ হুসাইন বাটালবীর বিষয়েও ইংরেজবিরোধী জিহাদে অংশ গ্রহণের কোন সামান্য প্রমাণও দেখাতে পারেননি। উপরন্তু মাওলানা বাটালবীর জিহাদের বিরোধিতা করা, মুজাহিদীনদের ওহাবী (সন্ত্রাসী) ও কেবল নিজে নয় বরং তাদের ‘আহলেহাদীস সম্প্রদায়’ ওহাবী তথা যুদ্ধরত মুজাহিদদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং ইংরেজদের তাবেদার ইত্যাদি বলে ইংরেজকৃপা লাভের বিষয়টি গালিব সাহেব নিজেও স্বীকার না করে পারেননি। (পৃ.২৭৫) তবে তিনি এটাকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা ও ওজর হিসেবে আখ্যায়িত করার চেষ্টা করেছেন। পাশাপাশি বুঝাতে চেয়েছেন– বাটালবী আহলেহাদীসের বিশেষ কোন ব্যক্তি নয়, এবং তিনি ছাড়া আর কেউ এমন কাজ করেনি। অথচ দুটোই– সম্পূর্ণ অবাস্তব। যার প্রমাণ খোদ তার উক্ত বইতেই রয়েছে।

৩. তাছাড়া তিনি ইংরেজবিরোধী সংগ্রাম আহলেহাদীসেরই ফসল প্রমাণ করার জন্য শাহ অলিউল্লাহ পরিবার, শাহ ইসমাঈল শহীদ, সৈয়দ আহমদ শহীদ ও ছাদেকপুরী পরিবারে যে ব্যক্তিদের জিহাদের বিবরণ তুলে ধরেছেন তাদের মূলদের

কেউই আহলেহাদীস ছিলেন না। এদের প্রত্যেকের মাজহাবই হানাফী ছিল একথা তাদের বক্তব্য থেকে স্বয়ং গালিব সাহেব উল্লেখ করেছেন। যদিও তিনি এর নানারূপ ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন কিন্তু সবই ছিল বিভ্রান্তি। যা গালিব সাহেবের পুস্তক থেকে সহজেই অনুভব করা যায়। তিনি স্বীকার না করলেও তার আলোচনা থেকে ও অন্যান্য অনেকের বক্তব্য ও অনেক দলিলের দ্বারা এটা সুস্পষ্ট যে, নযীর হুসাইন দেহলবীই মূলত ভারতীয় আহলেহাদীসের মূল নির্মাতা। ভারতে আহলেহাদীস পক্ষ-বিপক্ষে প্রথমাবস্থায় তাকলীদ ও মাজহাব নিয়ে যে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল এবং এতে আহলেহাদীসের পক্ষে যত গ্রন্থ লেখা হয়েছে এর প্রায় সবগুলোই মাওলানা নযীর হুসাইন ও তাঁর শিষ্যদের লেখা যা ড. গালিব সাহেব মিঞা সাহেবের জীবনী আলোচনায় সবিস্তারেই তুলে ধরেছেন। তিনি তার ছাত্রদের এলাকা ভিত্তিক তালিকা পেশ করার ফাঁকে ফাঁকে তাদের লেখা গ্রন্থের নামও উল্লেখ করেছেন। এমনকি 'আহলেহাদীস' নাম প্রদানকারী মাওলানা বাটালবীও মিঞা সাহেবেরই ছাত্র।

কিন্তু বিষয়টা এত সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও ড. আসাদুল্লাহ আল-গালিব তার একটা গবেষণা কর্মে এমন ধূম্রজাল সৃষ্টি করে স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরো অবদানকেই নিজেদের ভূষণে পরিণত করার এ ব্যর্থ চেষ্টার কী প্রয়োজন ছিল?

পরিশেষে আমি আমার এ ক্ষুদ্র লেখায় আমাদের একটি স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাসকে বিকৃতির অপপ্রয়াস থেকে রক্ষা করার জন্য সচেতন পাঠক ও গবেষকদের কেবল দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছি। আপনারা আরো অগ্রসর হোন। সত্য আরো উজ্জ্বল আলো হয়ে আপনাদের কাছে ধরা দেবে। তখন বিভ্রান্তির কোন সুযোগ থাকবে না। এটা আমার বিশেষ কোন গবেষণা কর্মও নয়। শুধু একটু দৃষ্টিপাত বলা চলে। গবেষণা গবেষকদের জন্যই রইল। আর বিশেষত এতে আমি কাউকে খাটো করতে চাইনি। তদুপরি কোন শব্দ থেকে কেউ ভুল বুঝলে আমাকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে খাটিত্বের শ্লোগানধারী ভেজালের এ বাজারে হক চিনে সে পথে চলার তৌফিক দান করুন। পরস্পরিক বিবাদ ভুলে গিয়ে আল্লাহর দুশমনদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার তৌফিক দান করুন।

তথ্যসূত্র:

১. দেওবন্দ আন্দোলন ইতিহাস ঐতিহ্য অবদান, মাওলানা আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ ইয়াহইয়াহ্, মাকতাবাতুল ফাতাহ এর পরিবেশনায়, সাহারা কুড়িল কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, কুড়িল চৌরাস্তা,ঢাকা, ১২২৯।

২. مطالعة بريلويت للشيخ الدكتور خالد محمود

৩. মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ইতিহাস প্রসঙ্গ ইসলাম, শামসীর হারুনুর রশীদ, ডিসেম্বর-২০১২, ফোন–১৭২৬৮৫৬৬৬৯

৪. 'শাইখুল কুল ফিল কুল সাইয়্যেদ মিঞা মুহাম্মাদ নাযীর হুসাইন মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. – অধ্যাপক ড.মুহাম্মাদ মজীবুর রহমান রচিত। 'তাওহীদ প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স', ৯০ হাজী আব্দুল্লাহ্ সরকার লেন, বংশাল ঢাকা থেকে প্রকাশিত (২০০৬ খৃ.)।

৫. প্রকৃত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত পরিচিতি, মাওলানা নূরুল ইসলাম ওলীপুরী, নূর প্রকাশণী বন্দরবাজার সিলেট ২০১০খৃ.।

৬. দৈনিক ইনকিলাব, ২০/০১/২০১২

৭. إعلام الأعلام بأن هندوستان دار الإسلام لأحمد رضا خان البريلوي

৮. আহলেহাদীস আন্দোলন,

৯. تجليات صفدر للشيخ أمين صفدر رحمه الله تعالى

লেখক: মুহাদ্দিস, জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া তেজগাঁও ঢাক

ইন্টারনেট: দ্বীনী খিদমতের এক উর্বর ক্ষেত্র

মাওলানা ইউসুফ সুলতান

ইন্টারনেট আবিষ্কার

ইন্টারনেট আবিষ্কারকে গত শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার মনে করা হয়। হাজার মাইলের দূরত্ব ও সময়ের ব্যবধানসহ সবরকম বাধা দূর করে তথ্যের আদান-প্রদানকে সহজ ও গতিময় করতে এর বিকল্প নেই। ১৯৬০ সনে মার্কিন সামরিক বাহিনীর গবেষণা সংস্থা অ্যাডভান্সড রিসার্চ প্রজেক্ট্স এজেন্সি বা আরপা (ARPA) পরীক্ষামূলকভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কিছু বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণাগারের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলে। প্যাকেট সুইচিং পদ্ধতিতে তৈরি করা এই নেটওয়ার্ক আরপানেট নামে পরিচিত ছিল। এরই বাণিজ্যিক সংস্করণ ইন্টারনেট। ১৯৯০ এর পরের দিকে যার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। [সূত্র : উইকিপিডিয়া]

ইন্টারনেটের প্রাথমিক ব্যবহারটা ই-মেইল আদান-প্রদানেই অনেকটা সীমাবদ্ধ ছিল। একসময় ব্যবহারকারীরা নিজেদের পরিচিতি অন্যান্য সকল ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর কাছে তুলে ধরার প্রয়োজন অনুভব করে। জন্ম হয় ওয়েবসাইটের।

ইন্টারনেট আবিষ্কারের পরই শুরু হয় ব্যক্তিগত, সামাজিক, ব্যবসায়িক ও রাষ্ট্রীয় নানা প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট। ওয়েবসাইটকে সহজে “ইন্টারনেটভিত্তিক ঠিকানা” বলে ব্যক্ত করা যেতে পারে। একেকটি ওয়েবসাইটে একটি ডোমেইনের অধীনে হাজারো পাতার সমষ্টি হতে পারে। ডোমেইন হলো ওয়েব ঠিকানা হিসেবে ব্যবহৃত নামটি। বাস্তব পৃথিবীতে যেমন প্রত্যেকের বাড়ীর একটি হাউজিং নম্বর থাকে, যা দিয়ে তাকে চিহ্নিত করা যায়, ডোমেইন ঠিক সেরকম। যেমন, ইসলাম-ডট-কম একটি ডোমেইন। এর অধীনের হাজারো পাতার সমষ্টিতে একটি ওয়েবসাইট।

নানা রকম ওয়েবসাইটের একটি প্রকার ব্লগ। ব্লগ শব্দটি ওয়েব ও লগ শব্দদ্বয়ের সন্ধি। এর অর্থ অনলাইন দিনলিপি। কিন্তু বর্তমানে শুধু দিনলিপি নয়, বরং সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় ব্লগে স্থান পায়। ব্লগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো, নানা মতের মানুষ লেখক বা ব্লগারের লেখার ওপর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ও মতামত জানাতে পারে। যা আর কোনো গণমাধ্যমে সম্ভব নয়।

ওয়েব সাইটের সংখ্যা

২০১১ সনের একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী ইন্টারনেটে মোট রেজিস্ট্রিকৃত ডোমেইনের সংখ্যা ৫৫ কোটি। ২০০৮ এ যা ছিল মাত্র ১৮ কোটি বিশ লক্ষ। (সূত্রঃ staticbrain.com) আর একেকটি ডোমেইনের অধীনে থাকতে পারে হাজারো পাতা। তাই সর্বমোট পাতার সংখ্যা বলা মুশকিল।

১৯৯৫ সনের ডিসেম্বরে বিশ্বের মোট ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ছিল মাত্র ১ কোটি ৬০ লক্ষ, যা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার মাত্র ০.৪ শতাংশ। আর ২০১১ সনের মার্চ মাসে এ সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় দুই শত নয় কোটি পঞ্চাশ লক্ষে। যা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ৩০.২ শতাংশ। (সূত্র : internetworldstats.com)

২০১২ সনের একটি পরিসংখ্যানে এশিয়াতে মোট ইন্টারনেট ব্যবহারকারী দেখানো হয়েছে প্রায় ১০৭৭ মিলিয়ন বা প্রায় ১০৮ কোটি। যা ২০১০ এ ছিল ৮২৫ মিলিয়ন বা ৮৩ কোটি। ২০১০ এ বাংলাদেশে মোট ফেইসবুক ব্যবহারকারী ছিল প্রায় দশ লক্ষ। যা ২০১২ তে বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ৩৪ লক্ষে। আর একই সময়ে বাংলাদেশে মোট ইন্টারনেট ব্যবহারকারী প্রায় আশি লক্ষ। (সূত্রঃ internetworldstats.com)

উপরোক্ত পরিসংখ্যানগুলো খুব সহজেই বুঝিয়ে দেয় যে, ওয়েবসাইট ও ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা বৃদ্ধির হার যে কোনো গাণিতিক হারকেও হার মানায়। খোদ বাংলাদেশেও এই হার ঊর্ধ্বমুখী। যা আগামী বছরগুলোতে আরো দ্রুত বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। আগামীতে একেকজন মোবাইল ব্যবহারকারীই হবেন একেকজন ইন্টারনেট ব্যবহারকারী।

বাংলা ভাষায় ব্লগ

সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় অনলাইনে প্রথম ব্লগ চালু হয় ২০০৫ এ। ২০০৬ থেকে মোটামুটি তা জনপ্রিয়তা লাভ করতে শুরু করে। বাংলা ভাষায় ব্লগ চালু হওয়ার পর তা মূলত বিভিন্ন সাংবাদিক, মিডিয়াকর্মী, নবীন কবি, বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্রদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

তবে বাংলা ব্লগ ইতিহাসের শুরু থেকেই ইসলাম বিদ্বেষী লেখার দৌরাত্ম্য লক্ষণীয়। জনপ্রিয়তা ও হিট (ব্লগের ভিজিট সংখ্যা) বাড়ানোর জন্য অনেকেই তখন ইসলাম বিরোধী ব্লগ লেখা শুরু করে। দেখা যায়, গঠনমূলক কোনো লেখা দিলে তাতে মন্তব্য পাওয়া যায় হাতে গোনা কয়েকটি। আর ইসলাম বিরোধী ব্লগ লিখলে তাতে মন্তব্য-উত্তর ও নানা তর্ক-বিতর্ক মিলিয়ে মন্তব্য ছাড়িয়ে যায় শতককে।

এভাবেই জন্ম হয় বেশ কিছু তরুণ স্বঘোষিত নাস্তিকের। যারা নিজেদের নাস্তিক পরিচয় দিয়ে তৃপ্তি পায় এবং নাস্তিকতার আড়ালে মূলত ইসলামের কুৎসা রটায়। বিশেষ করে ইসলামের নবী মুহাম্মাদ সা. এঁর পারিবারিক জীবন নিয়ে যাচ্ছেতা লিখতে থাকে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্লগগুলোর সঞ্চালকদের এসব লেখার বিষয়ে তেমন কোনো পদক্ষেপ নিতে দেখা যায় না। তা হয়ত তাদের ব্লগে হিট বাড়ানোর জন্য, নতুবা নিজ মতাদর্শের অভিন্নতার জন্য।

নব্য নাস্তিক পরিচয়ধারী এসব ব্লগাররা পরবর্তীতে আরো নতুন কিছু বাংলা ব্লগ সাইট খুলে। এবং এগুলোর কয়েকটি শুধু ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে অশ্লীলতা ছড়ানোর জন্যই। সেসব সাইটে আজ থেকে বছর তিনেক আগে নবীজী সা. কে অপমান করে প্রকাশ করে অশ্লীল কমিক ই-বই। যেগুলো বছরের পর বছর পড়া হয় ও ডাউনলোড করা হয়।

এছাড়া অন্য ব্লগগুলোতেও তুলনামূলক ইসলাম বিরোধী লেখা বেশি প্রকাশ হয়। যারা এসবের বিরুদ্ধে কথা বলেন, তাদেরকে অনেক সময় সঞ্চালকবৃন্দ ব্যান (ব্লগ বা মন্তব্য প্রকাশ করার অধিকার হরণ) করেন। মুক্তচিন্তা ও বাক স্বাধীনতার ছায়াতলে এসব নাস্তিকদের সহযোগিতা করে যান।

আর যখন এগুলোর কোনো উত্তর দেয়া হয়, তখন একের পর এক অশ্লীল গালাগালি করে উত্তরদাতাকে হেনস্থা করা হয়। এবং “ছাগু” সহ বহু অশ্লীল উপাধি দেয়া হয়। ফলে এক শ্রেণীর পাঠক, যারা নীরবে পাঠ শেষে চলে যান, তারা হৃদয়ে সম্পর্কে যান ইসলাম নিয়ে অনেক সন্দেহ। ধীরে ধীরে এসব সন্দেহ তাদেরকে ঈমান ছাড়া করে।

ইন্টারনেটে ইসলাম বিদ্বেষ

ইন্টারনেটে ইসলাম বিদ্বেষ নতুন নয়। প্রায় আট-দশ কিছু একটা খুঁজতে গিয়েই একদিন আলী সীনা নামের এক ব্যক্তির ওয়েবসাইটের সাথে পরিচিত হই। নিজেকে তিনি এক্স মুসলিম বা পূর্বে মুসলিম ছিলেন বলে দাবী করেন এবং আরো দাবী করেন যে, তিনি পরবর্তীতে খ্রিস্টান হয়ে গেছেন ইসলামের প্রতি নিরুৎসাহী হয়ে। ফেইথফ্রীডম বা মুক্তবিশ্বাস নামে তার নিজস্ব একটি ওয়েবসাইট আছে। নিজেকে আরবের বাসিন্দা বলেও দাবী করেন তিনি।

তার সেই সাইটটিতে মুসলিমদের প্রতি মোট এগারো কি বারোটি প্রশ্ন ছুড়ে দেয়া ছিল। সবগুলোই প্রিয় নবীজীর সা. জীবনকে কেন্দ্র করে। রাসূলের সা. বিভিন্ন

বিবাহ এবং উম্মাহাতুল মুমিনীন রা. নিয়ে ছিল প্রশ্নগুলো। সাইটের ব্যানারে লেখা আছে, “যদি কোনো মুসলিম আমার প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন, তাহলে আমি আমার সাইট মুছে ফেলব”। আপাতদৃষ্টিতে যা খুব নিরীহ একটি ব্যানার ও আবেদন।

আলী সীনার প্রশ্নের জবাবে ইংরেজি ও আরবীতে বেশ কয়েকটি ওয়েবসাইট হয়েছে এবং অনেক আলেম-উলামা তার প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়েছেন। কিন্তু তার একই কথা, উত্তর যথার্থ হয়নি। অনেকটা “বিচার মানি, তালগাছ আমার” এর মত। এমনকি তাকে সরাসরি বাহাসে আসতেও আহ্বান জানানো হয়েছে। সে রাজী হয়নি। তাকে ফোনে বা অনলাইনে কথা বলতে আহ্বান করা হয়েছে। সেটাতেও সে রাজী হয়নি। পরবর্তীতে ডা.জাকির নায়েকও তাকে কনফারেন্সে আহ্বান করেছেন। কিন্তু তাতে সে রাজী হয়নি। মূলত আলী সীনার নাম আসল কিনা, তাও সে কখনো স্পষ্ট করেনি।

এর অনেকদিন পর বিভিন্ন ওয়েবসাইটে তার বিভিন্ন লেখা থেকে সংগৃহীত প্রমাণ দেখতে পাই যে, সে আসলে একজন ইহুদী, যে কখনোই মুসলিম ছিল না। ২০০৮ এ ইসরাইলের জেরুজালেম পোস্ট নামের সংবাদপত্র তার একটি সাক্ষাৎকার ছাপে। যেখানে সে বলে, “ইসলামকে সংস্কার করার একমাত্র উপায় হলো, কুরআনকে নিক্ষেপ করা, এর নব্বই শতাংশই নিক্ষেপ করা উচিৎ। আপনাকে ইসলামের ইতিহাসকেও ছুড়ে ফেলতে হবে, আর সীরাতকে ছুড়ে ফেলতে হবে পুরো একশত ভাগ।” [সূত্রঃ Jerusalem Post, 2008]

মূলত মুসলিমদের মাঝে দ্বীন নিয়ে নানাবিধ সন্দেহ ঢুকিয়ে দেয়ার জন্যই এ কাজ করছে সে। বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না যে, আলী সীনা কোনো ব্যক্তি নয়, আলী সীনা একটি গ্যাং। ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করাই যাদের লক্ষ্য।

অবশ্য আলী সীনা ব্যক্তি বা গ্যাং যা-ই হোক, তারা একা নয়। সম্প্রতি সেন্টার অফ আমেরিকান প্রোগ্রেস নামের একটি বেসরকারি আমেরিকান গবেষণা সংস্থার রিপোর্টে উঠে আসে আরো ভয়াবহ তথ্য। “দ্যা রুটস অফ ইসলামোফোবিয়া নেটওয়ার্ক ইন আমেরিকা” বা “আমেরিকায় ইসলামবিদ্বেষী নেটওয়ার্কের গোড়া” শিরোনামে তারা শতাধিক পৃষ্ঠার একটি গবেষণা প্রকাশ করে।

এতে উঠে আসে যে, আমেরিকার বিভিন্ন দাতব্য প্রতিষ্ঠান প্রতি বছর বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার অনুদান প্রদান করে কিছু গবেষণা সংস্থাকে। যাদের একমাত্র কাজই হলো ইসলাম বিদ্বেষ ছড়ানো। এসব সংস্থার গবেষণা দলে রয়েছে স্কলার, সম্পাদক ও প্রচারক। বিধর্মী নারী পুরুষের সমন্বিত স্কলারবৃন্দ ইসলামের

কুরআন-হাদীস অধ্যয়ন করে ইসলাম বিরোধী তথ্য বানিয়ে থাকে। সম্পাদক টিমের হাতে সম্পাদনা হয়ে প্রচার টিমের মাধ্যমে সেগুলো প্রচার পায়। এই টিমে বেশ কয়েকজন মিস-ইনফরমেশন-এক্সপার্ট বা ভুল তথ্যবিশারদ রয়েছে, যারা এ রকম ভুল তথ্য তৈরি করে থাকেন।

বিশ্বের নানা জায়গায় কোনো দুর্ঘটনা হলেই তারা সেগুলো মুসলিমদের ওপর চাপিয়ে সংবাদ তৈরি করে। তাদের নেটওয়ার্কে কিছু বড় বড় সংবাদ মাধ্যম আছে। তারা সেগুলো প্রকাশ করে। আবার তাদের সাথে আমেরিকার বিভিন্ন পার্টির কিছু সংসদ সদস্যও আছে। যারা সেগুলো নিয়ে সংসদেও ঝড় তোলেন। আবার কিছু তৃণমূল সংগঠন আছে, মানবাধিকার সংগঠনের মতো। তারা সেসব ভুল তথ্যগুলো সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেন। সাথে কিছু ধর্মীয় সংগঠনও এসব তথ্য ব্যবহার করে ধর্মীয় আবেগকে ইসলামের বিরুদ্ধে উস্কে দেয়।

একই তথ্য যখন বিশ্বের বড় বড় মিডিয়ায় প্রকাশ পায়, বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত দেশের পার্লামেন্টে আলোচিত হয়, সেখানকার মানবাধিকার ও ধর্মীয় সংগঠনগুলো উচ্চারণ করে, তখন বহু মিথ্যাও সাধারণ মানুষের কাছে সত্য হয়ে উঠে। আর বিশ্বের তাবৎ মিডিয়া লুফে নেয় সেসব সংবাদ। তৈরি হয় ইসলামের প্রতি চরম বিদ্বেষ।

আমেরিকাভিত্তিক এই গবেষণা সংস্থাটি রিপোর্টের শেষে উল্লেখ করে যে, সাম্প্রতিক সময়ে ইসলামবিদ্বেষ আমেরিকার নাগরিকদের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার খাতিরেই তারা এ বিষয়ে গবেষণা করে প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য, গবেষণা টিমটি কোনো মুসলিমদের নয়। (সূত্রঃ americanprogress.org)

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, বাংলা ভাষায় যারা ইন্টারনেটে ইসলামবিদ্বেষ ছড়ায়, তারা কোনো না কোনোভাবে এদের সাথে সম্পৃক্ত। বহু লেখকের প্রোফাইলে গিয়ে আলী সীনার সাথে সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়। তাদের লেখাগুলোই অনুবাদ করে বাংলায় তারা প্রকাশ করে মাত্র।

ইন্টারনেটে নাস্তিকতার মোকাবেলা করার জন্য আমাদের করণীয়

বাংলাদেশে মুসলিমদের মধ্যে যারা ধার্মিক, নাস্তিকদের প্রচার সাধারণত তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারে না। তবে যারা সাধারণ মুসলিম, নাস্তিকদের লেখা তাদের সংশয়বাদী করে তোলে। সংশয় থেকে ধীরে ধীরে ঈমানহীনতা তৈরি হয়। নাস্তিকদের যেসব লেখা অশ্লীল গালিগালাজ, সেগুলো সাধারণত তেমন

ক্ষতিকারক নয়। তবে যেগুলো কুরআন-হাদীসের সূত্রসহ দেয়া হয়, সেগুলো সাধারণ মুসলিমদের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। যখন তারা দেখে যে, এসবের কোনো উপযুক্ত উত্তর দেয়া হয় নি, তখন তারা ভাবতে শুরু করে যে, নাস্তিকদের দাবীগুলোই সত্য।

এ ক্ষেত্রে উলামায়ে কেরামের অবদানের কোনো বিকল্প নেই। নাস্তিকদের রেফারেন্সগুলো মূলত আগপাছ বাদ দিয়ে বা মাঝ থেকে তুলে ধরা। যেগুলো কেবল উলামায়ে কেরাম উত্তর দিতে পারেন। তাই অনলাইনে ব্লগসমূহে উলামায়ে কেরামের ব্যাপক অংশগ্রহণ এখন সময়ের দাবী।

অনলাইনে ব্লগ লেখা এবং অনাগত অনলাইনের নানা ফিৎনা বুঝা ও মোকাবেলা করার জন্য তাই উলামায়ে কেরামকে প্রযুক্তি বিষয়ে যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। এ ছাড়া যে কোনো ফিৎনার মূল জানা ও পড়াশোনার জন্য ইংরেজির কোনো বিকল্প নেই।

তাই মাদরাসার নেসাবে কম্পিউটার শিক্ষা ও ইংরেজি কথন, লিখন ও বুঝার যোগ্যতা অর্জন হয় এমন বিষয় সংযোজন করা অতীব প্রয়োজন। কওমী মাদরাসাসমূহের বোর্ডগুলো এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নিলে বিষয়টা সহজ হতে পারে। সংস্কার কঠিন হতে পারে, কিন্তু সংযোজন তেমন কঠিন নয়।

প্রতিটি মাদরাসায় একটি কম্পিউটার ল্যাব ও ইন্টারনেট সংযোগ থাকা উচিৎ। মাদরাসার নিজস্ব ওয়েবসাইট থাকা উচিৎ। ওয়েবসাইটে ছাত্র, উস্তাদ সবাই লেখা প্রকাশ করবে। এছাড়া উস্তাদদের বয়ান, প্রকাশিত বই ইত্যাদিও আপলোড করা হবে। ফতোয়া বিভাগগুলো অনলাইনে ফতোয়া দিবে। তাহলে সাধারণ মুসলিমরা ব্যাপকভাবে উপকৃত হবেন।

এছাড়া লেখক, মাওলানা, মুহাদ্দিস, মুফতী, খতীব, বক্তা ও ওয়ায়েয প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ওয়েবসাইট থাকা উচিৎ। আরবের প্রায় প্রত্যেক আলেমেরই ব্যক্তিগত ওয়েবসাইট আছে। নাস্তিকদের অপরাধের জবাবে গণআন্দোলন একটি সচেতনতার শুরু হতে পারে। কিন্তু তা বাস্তবে রূপায়ণ করতে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির কোনো বিকল্প নেই।

বাংলা ভাষায় ইসলামিক ওয়েবসাইটের সূচনা

বাংলা ভাষায় ইসলামিক ওয়েবসাইটের শুরু কবে হয়েছে তা বলা কঠিন। Islamhouse.com এর বাংলা বিভাগটাকেই সবচেয়ে পুরনো বাংলা ইসলামিক সাইট বলে মনে হয়। তবে Islam.com.bd -এর রেজিস্ট্রেশন হয় ২০০৬ এ।

ডট বিডির যাত্রা তখন প্রথম দিকে। এরও আগে ২০০৫ এ রেজিস্ট্রেশন করা হয় banglakitab.com সাইটটি। যাতে বিভিন্ন ইসলামিক বই স্ক্যান করে আপলোড করা হত, এখনও করা হয়। জনপ্রিয় ইসলামিক ম্যাগাজিন মাসিক মদীনার সাইট mashikmadina.com এর রেজিস্ট্রেশন হয় ২০০১ এ। ওয়েব আর্কাইভে দেখা সে সময়ের সাইটটিকে বেশ মানসম্মত বলেই মনে হয়। অবশ্য বর্তমানে ডোমেইনটি হাতছাড়া হয়ে গেছে। মাসিক মদীনার সাইটের আগে আর কোনো বাংলা ইসলামিক সাইটের অস্তিত্ব নজরে আসেনি। [সূত্র : who.is Ges web.archive.org]

ইন্টারনেট ইসলাম প্রচারের উর্বর ক্ষেত্র কেন?

ইন্টারনেটে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রটি খুব উর্বর। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে। ধরা যাক, কোনো সম্মানিত খতীব সাহেব মসজিদে জুমার বয়ান করছেন। তাঁর বয়ান সর্বোচ্চ এক হাজার মানুষ শুনলেন। এই শ্রোতারা মসজিদ থেকে বের হওয়ার পর অনেকেই হয়ত ভুলে যাবেন কী আলোচনা হয়েছে। কিংবা অন্যকে এ বিষয়ে জানাতে চাইলেও জানানোর সঠিক পথ পাবেন না।

খতীব সাহেব যদি এই একই বয়ান পেশ করার সময় রেকর্ড করে নেন, পরবর্তীতে নিজস্ব ওয়েবসাইটে তা প্রকাশ করেন, তাহলে তা পৌঁছে যেতে পারে অসংখ্য মানুষের কাছে। এবং বয়ানের আবেদন বেঁচে থাকবে বছর বছর। “অসংখ্য” বলতে হল এ জন্য যে, আসলেই তা সংখ্যায় সীমাবদ্ধ করা সম্ভব নয়।

ধরুন, খতীব সাহেবের বয়ানটি তার ওয়েবসাইট থেকে এক ভাই শুনলেন। তার ভালো লাগল। তিনি তার ফেইসবুকে তা শেয়ার করলেন। কিংবা কেবল লাইক দিলেন। তার বন্ধু শত শত। তাদের মধ্যে কারো পছন্দ হলো। তিনিও লাইক দিলেন বা শেয়ার করলেন। তার বন্ধুদের কারো আবার পছন্দ হয়ে গেল। এভাবে এটা ঠিক কত হাজার বা লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে, তা ঠিক হিসাব করা সম্ভব নয়।

এটা তো শুধু ফেইসবুকের কথা বলা হলো। ফেইসবুকের শেয়ারকারীদের মাঝে কারো পছন্দ হলে তিনি তা ইউটিউবে আপলোড করে দিবেন। ইউটিউব যেহেতু গুগলের প্রতিষ্ঠান, তাই সার্চ রেজাল্ট বা ইন্টারনেটে কোনো বিষয় খোঁজার ফলাফলে ইউটিউবের ফলাফলগুলো অগ্রাধিকার পায়। উদাহরণস্বরূপ খতীব সাহেবের বয়ানের বিষয় ছিল “এপ্রিল ফুল”। তো, বয়ানটি ইউটিউবে আসার পর কেউ গুগলে খুঁজলে তা প্রথম দিকে চলে আসবে।

ইউটিউব থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে যে কোন ফাইল কপি করে নেয় শত শত ওয়েবসাইট। ইউটিউবে কোনো কিছু আসা মানে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে আরো শত শত ওয়েবসাইটে চলে যাবে। খতীব সাহেবের ফেইসবুক যদি টুইটারে সংযুক্ত থাকে, তাহলে তা টুইটারেও একইভাবে ঝড় তুলবে। এপ্রিল ফুলের এই বার্তা পৌঁছে যাবে আরো লক্ষ মানুষের কাছে। গণমাধ্যমকর্মীদের কাছেও।

ফেইসবুক-টুইটার থেকে কোনো পছন্দকারী আবার তা কোনো ব্লগে প্রকাশ করবেন। এভাবে তা আবার পৌঁছে যাবে অসংখ্য ব্লগ পাঠকের কাছে। খতীব সাহেব যদি লিংকডইন ব্যবহার করে থাকেন, তাহলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফেইসবুক-টুইটার হয়ে তা লিংকডইনেও পোস্ট হয়ে যাবে। পৌঁছে যাবে বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের পেশাজীবীদের কাছে। এভাবে এক বছরেই তা শেষ হবে না; বরং প্রতি বছর যখনই এপ্রিল ফুলের তারিখ ঘনিয়ে আসবে, আবারও তা সচল হয়ে এভাবে ঘুরবে চক্রের মাধ্যমে।

এর কারণ হলো, মানুষ এখন অনলাইনেই বেশি পড়তে পছন্দ করেন। বিশেষ করে নিজের বন্ধু বা আত্মীয় কোনো লেখা বা লিংকে লাইক বা পছন্দ করলে প্রত্যেকেই তা পড়তে আগ্রহী হন। এটাই সামাজিক গণমাধ্যম বা সোশাল মিডিয়ার শক্তি। আর এ কারণেই ইন্টারনেটের জনপ্রিয়তা এত তুঙ্গে। ফেইসবুক-টুইটারের এই অনলাইন চক্রের মাধ্যমে যে কোনো বার্তা মুহূর্তেই পৌঁছে দেয়া সম্ভব বিশ্বের যে কোনো গণমাধ্যমের কাছে। এভাবে বিশ্বকে খুব সহজেই জানিয়ে দেয়া যায় প্রকৃত সত্য। আর দ্বীনের খিদমত করা যায় কল্পনাতীতভাবে।

কিছু ইসলামী ওয়েবসাইট

ইন্টারনেটের বিশাল এ ময়দানে খিদমাতের আরো অসংখ্য ক্ষেত্র বিদ্যমান। বাস্তব পৃথিবীতে আমরা কোনো খিদমতের চিন্তা করলে নানা সীমাবদ্ধতা সামনে চলে আসে। কিন্তু ইন্টারনেটে সেগুলো খুব সহজেই বাস্তবায়ন করা সম্ভব। পৃথিবীর নানা দেশ থেকে পরিচালিত কয়েকটি ইসলামী ওয়েবসাইটের কিছু খিদমত এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে।

ক. Askimam.org এই ওয়েবসাইটটি সাউথ আফ্রিকার মাদরাসা ইনয়ামিয়াহ কর্তৃক পরিচালিত। মুফতী ইবরাহীম দেসায়ী দেওবন্দী দা.বা. এর তত্ত্বাবধান করছেন। ২০০৪ এ শুরু হওয়া এই ওয়েবসাইটটি মূলত ফাতওয়ার ওয়েবসাইট। দারুল ইফতা থেকে প্রতিদিনই বেশ কিছু প্রশ্নের দালীলিক উত্তর প্রদান করা হয় এখানে। ইংরেজি ভাষায় কুরআন-সুন্নাহর দলীলসহ হানাফী ফিক্বহের দলীল নির্ভর এই ওয়েবসাইটের উত্তরগুলো পৃথিবীর সব ফিক্বহের

অনুসারীদের কাছেই জনপ্রিয়। সাইটটিতে ইংরেজি ভাষায় আকিদা, সালাত, সাওম, হজ্জ, যাকাত, ব্যবসা-বাণিজ্য, পারিবারিক বিষয়, ইসলামের ইতিহাস, সীরাত ইত্যাদি নানা বিষয়ে হাজার হাজার উত্তর রয়েছে।

খ. darulifta-deoband.org এই সাইটটি দারুল উলূম দেওবন্দের দারুল ইফতার ওয়েবসাইট। ২০০৬ এ প্রতিষ্ঠিত এ ওয়েবসাইটটিতে আরবী, উর্দু ও ইংরেজিতে হাজারো ফাতওয়া রয়েছে।

গ. islamhouse.com সাইটটি ২০০০ সনে প্রতিষ্ঠিত। পৃথিবীর প্রায় ৫০ টি ভাষায় ইসলামী প্রবন্ধ-নিবন্ধ, বই, অডিও, ভিডিও ও ফাতওয়া আপলোড করা হয় এতে। সাইটটিতে হাজার হাজার পেইজ রয়েছে। এবং প্রতি বছরই শত শত মানুষ সাইটটির মাধ্যমে মুসলিম হয় বলে বছর শেষে বার্ষিক প্রতিবেদনে জানানো হয়।

ঘ. dorar.net সাইটটি ইসলামী জ্ঞানের বিশ্বকোষের মতো। এতে আকিদা ফিক্বহ সুন্নাহ তারীখ বিভিন্ন মিলাল দ্বীন ও ফিরাক ইত্যাদি বিষয়ে শত শত প্রবন্ধ ও বই রয়েছে। হাদীস খুঁজতে দেয়া হলে পূর্ণ সূত্রসহ চলে আসে। এমন আরো নানাবিধ সুবিধা নিয়ে সাইটটি সাজানো।

এছাড়া আরো হাজারো ওয়েবসাইট আছে, যেগুলোতে বিভিন্নভাবে ইসলামের খিদমত করা হচ্ছে। ইন্টারনেটভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম, রেডিও, অডিও-ভিডিও সাইট, কুরআন-সুন্নাহ-ফিক্বহসহ নানা বিষয়ভিত্তিক আলোচনা ফোরাম, আলেমদের ব্যক্তিগত ওয়েবসাইট ইত্যাদির মাধ্যমে দ্বীনী খিদমত আঞ্জাম দেয়া হচ্ছে।

প্রিয় পাঠকদেরকে sultan.org/a সাইটটির সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে চাচ্ছি। এতে বিভিন্ন বিষয়ে ইসলামী ওয়েবসাইটের সূচী দেয়া আছে। সাইটগুলো ভিজিট করলে ইন্টারনেটভিত্তিক দ্বীনী খিদমতের পরিকল্পনা করতে সুবিধা হবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এই নিয়ামত কাজে লাগিয়ে দ্বীনী খিদমত করার তাওফীক দিন। আমীন।

লেখক: নায়েবে মুফতী, জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ ঢাকা

প্রতিকূলতা সত্ত্বেও থেমে নেই ইসলামের প্রসার

জহির উদ্দিন বাবর

‘জেমস’ যে সময় আমেরিকান সেনাবাহিনীতে যোগ দেন তখন উপসাগরীয় যুদ্ধ চলছিল। তাকে আমেরিকানদের সঙ্গে সৌদি আরবে পাঠিয়ে দেয়া হয়। কোনো মুসলিম দেশে এটাই ছিল জেমসের প্রথম সফর। একদিন জেমস তার কয়েক সহকর্মীর সঙ্গে ছাউনি থেকে শহরে যান। তারা এক দোকানে গিয়ে কেনাকাটা করতে লাগলেন। এ সময় পাশের মসজিদ থেকে আজানের সুর ভেসে এলো। মুসলিম দোকানদার জেমসকে বললেন, ‘আপনি একটু পরে আসুন, এখন আমি দোকান বন্ধ করে দিচ্ছি। কারণ আজান হয়ে গেছে।’ একথা শুনে জেমস খুব বিস্মিত হলেন। তিনি বললেন, ‘কেনাকাটা তো শেষ, শুধু হিসাবটুকু বাকি।’ কিন্তু দোকানদার অনড়, বললেন: ‘আজান হয়ে গেছে, নামাজের পর সবকিছু হবে।’ জেমসের আজান এবং নামাজ সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না। তিনি ভাবলেন, এটা কেমন বিষয়, একটি মাত্র আওয়াজ শুনে সব বেচাকেনা বন্ধ করে দিয়েছে।

তার মাথায় প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে, ‘ওই আওয়াজের মধ্যে এমন কী শক্তি আছে যা ওই দোকানীকে কয়েক মিনিট দেরি করতে দেয়নি?’ কিন্তু শত ভেবেও তিনি কোনো কূলকিনারা করতে পারলেন না। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর জেমস দেশে ফিরে গেলেন। তবে তার মাথায় বারবার ওই প্রশ্নটি ঘুরপাক খাচ্ছিল। এ প্রশ্নের সন্ধান পেতে তিনি ইসলাম সম্পর্কে পড়াশোনা শুরু করলেন। তিনি প্রথমে একত্ববাদ সম্পর্কে পড়লেন। পরে ইসলামে সাম্যের দৃষ্টান্ত সম্পর্কে জানলেন। তিনি ছিলেন আফ্রিকান বংশোদ্ভূত। আমেরিকান সমাজে সাদা আর নিগ্রোদের পার্থক্য ভালোভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন তিনি। এজন্য ইসলামের সাম্যের চিত্র তার মধ্যে দারুণ প্রভাব ফেলে। তিনি পড়াশোনার গণ্ডি আরো বাড়িয়ে দিলেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই জেমস থেকে ‘আবদুল্লাহ’ নাম ধারণ করে মুসলমান হয়ে গেলেন।

ইসলাম গ্রহণের পর আব্দুল্লাহ নিজেকে ইসলামের জন্য পুরোপুরি ওয়াকফ করে দিলেন। তিনি কুরআন-হাদীস শিখে এমন আদর্শ মুসলমান হয়ে ওঠেন যাকে দেখে মুসলমানরা ঈর্ষা করে। এ ধরনের ঘটনা একটি নয়, অহরহ ঘটছে। এর দ্বারা প্রমাণ মিলে গতানুগতিক মুসলমানদের চেয়ে নওমুসলিমরা ধর্মকর্মে অনেক এগিয়ে। তাদের ওঠবস ও চলাফেরা সবকিছুই পুরোপুরি ইসলাম অনুযায়ী। তাদেরকে দেখে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়। তাদের আমল-আখলাক দেখে

অনেকেই ইসলামে দীক্ষিত হচ্ছেন। কারণ, আশেপাশের হতাশাগ্রস্ত লোকেরা যখন অনুসন্ধান করে পায় ইসলামই একমাত্র তাদের প্রশান্তির ঠিকানা তখন এ পথের যাত্রীসংখ্যা বাড়তে থাকে। মুসলমানদের এই প্রসার দেখে খৃস্টান বিশ্বও উদ্বিগ্ন। খবরে প্রকাশ, সম্প্রতি খৃস্টজগতের কেন্দ্র ভ্যাটিকান সিটিতে ২১ দিনের এক সম্মেলনে একটি ভিডিও প্রদর্শন করা হয়। ওই ভিডিওতে দেখানোর চেষ্টা করা হয়, 'ইসলাম বিশ্বব্যাপী দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে।' আর 'ফ্রান্স মুসলমানদের দখলে চলে আসতে বেশি বাকি নেই।'

এই ভিডিও প্রচারের পর ভ্যাটিকান সিটিতে হুলুস্থূল পড়ে যায়। অনেকে এই ভেবে অস্থির হয়ে ওঠেন পৃথিবী তার প্রকৃতির দিকে ফিরে যাচ্ছে। কর্তৃত্বের সূর্য ডুবে যাচ্ছে। যারা যুগ যুগ ধরে মানুষকে অসার ধর্মের বলয়ে আবদ্ধ থাকতে বাধ্য করেছে তাদের মোহ ভেঙে গেছে। কৌতূহলী মানুষেরা আজ নিজেরাই সত্যানুসন্ধানে তৎপর। মানুষের মধ্যে জানার আগ্রহ যত বাড়ছে দিন দিন ইসলামের প্রতি তাদের আকর্ষণও বাড়ছে। তারকা ব্যক্তিদের ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় নেয়ার ঘটনা আমরা প্রায়ই শুনি। চলমান শতাব্দীর শুরু থেকেই বিভিন্ন ধর্মের লোকদের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে জানার ব্যাপক আগ্রহ লক্ষ্য করা গেছে। বিশেষত পশ্চিমা বিশ্বের হতাশাগ্রস্ত তরুণ শ্রেণীর মধ্যে ইসলাম গ্রহণের প্রবণতা বেশি। পার্থিব প্রাপ্তির ষোলকলা পূর্ণ হওয়ার পরও যখন তারা হতাশার চাদরে আচ্ছাদিত তখন ইসলামই তাদের একমাত্র শান্তির শেষ ঠিকানা। সব দ্বিধা-সংশয় রেখে শান্তিময় এই ঠিকানায় যারা আশ্রয় নিতে পারেন তারা সত্যিই সৌভাগ্যবান। আর যারা সত্যকে জানার পরও গতানুগতিকতা ও প্রথার চোরাবালিতে আটকা পড়ে শান্তির আশ্রয়ে আশ্রিত হতে সঙ্কোচ বোধ করেন হতাশা ও খেদ নিয়েই তাদের চলে যেতে হয় দুনিয়া থেকে। মূলত যাদের জন্য হেদায়েত নির্ধারিত তারাই সত্যকে খুঁজে বের করে তা অকপটে গ্রহণ করেন। আর যাদের অন্তরে ভ্রষ্টতার তিলক আঁটা তারা তো সত্যকে জানার ও উপলব্ধি করার পরও পড়ে থাকবে যোজন যোজন দূরে।

এ তো গেল ইসলাম প্রসারের ইতিবাচক খবর। এর বিপরীতে প্রতিকূলতার খবরও কিন্তু কম না। ইসলামের ধারক-বাহকরা নিগৃহীত হওয়া এবং ইসলাম নিশ্চিহ্নের চেষ্টার ঘটনা প্রতিদিনই ঘটছে। মূলত বর্তমান সময় এবং বিশ্ব প্রেক্ষাপটে সবকিছুই ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য প্রতিকূল। শত প্রতিকূলতার মাঝেও যখন কোথাও ইসলাম ও মুসলমানদের জাগরণমূলক সংবাদ পাওয়া যায় তখন ভালো লাগে। প্রত্যেক মুসলমানের কাছেই এই ভালো লাগাটা কাঙ্ক্ষিত।

স্বস্তি ও সম্মানের সঙ্গে বাস করতে পারাই আজকের মুসলমানদের জন্য বড় পাওয়া। কিন্তু সারা বিশ্বে আজ এটারই সবচেয়ে বড় অভাব। যেসব দেশে মুসলমানরা সংখ্যালঘু সেখানে যেমন এই অভাবটুকু বোধ হচ্ছে, তেমনি ব্যতিক্রম নয় সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশগুলোও। মুসলিম দেশগুলোতেও আজ ইসলাম ও আদর্শিক ধারাটি উপেক্ষা ও অবজ্ঞার শিকার। বংশীয় সূত্রে মুসলমানিত্বের পরিচয় ধারণ করেছেন আজকের বেশির ভাগ মুসলমান। ব্যক্তি, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামের ছাপ থাকার কোনো প্রয়োজন বোধ করেন না তাদের অধিকাংশই। তথাকথিত উদার ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার ধারক মুসলমানরা নিজেদের ঈমানের মৌলিকত্ব নষ্ট হলেও তা নিয়ে তেমন ভাবিত না। এমনকি স্যেকুলার সমাজ ও রাষ্ট্রের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে গিয়ে অনেকেই নিজের অজান্তেই ইসলামের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন।

আজকের যুগে ইসলাম ও মুসলমানদের ওপর বাইরের আক্রমণ যতটা না আসছে তার চেয়ে বেশি ক্ষতি হচ্ছে ঘরের শত্রু বিভীষিকায়। মুসলমানের ঘরে জন্ম নিয়ে, মুসলিম নাম ধারণ করে অনেকেই দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছেন ইসলামবিরোধী কার্যক্রম। আশঙ্কাজনক বিষয় হচ্ছে, এটাকে তারা ইসলামপরিপন্থী মনে করছে না। সুতরাং তা থেকে ফিরে আসার আপাত কোনো সম্ভাবনা নেই। পশ্চিমা বিশ্ব ইসলামকে ঘায়েল করার জন্য এমন কোনো কাজ নেই যা করছে না। তাদের অনেক টার্গেট বাস্তবায়ন করছেন খোদ মুসলমানেরা। এমন কোনো মুসলিম দেশ পাওয়া যাবে না যার আভ্যন্তরীণ অবস্থা স্বস্তিদায়ক। আজকের মুসলমান নিজেরাই নিজেদের সবচেয়ে বড় শত্রু। নিজেদের মধ্যেই চলছে সংঘাত, সংঘর্ষ। একজন অন্যজনকে কেন মারছে সেটা নিজেও জানে না। এভাবে ক্রমেই দুর্বল হয়ে যাচ্ছে ঈমানী চেতনার পারদ। তবে আশার কথা হলো, ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকেই ফিনিক্স পাখির মতো জেগে ওঠে ইসলাম। দেড় হাজার বছরের ইতিহাস তাই বলে।

লেখক: সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ইসলামী লেখক ফোরাম

উম্মাহাতুল মু'মিনীন

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

উম্মাহাতুল মু'মিনীন অর্থ হলো মুসলমানদের মাতাগণ। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে রাসূল সা. এর স্ত্রীগণকে 'মুসলমানদের মা'' বলে ঘোষণা দিয়েছেন। ফলে তারা উম্মাহাতুল মু'মিনীন উপাধিতে খ্যাত হয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা সুরা আহযাবের ৬ নং আয়াতে ঘোষণা করেন "নবী সা. মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিক নিকটতম আর নবী পত্নীগণ তাদের মাতা"।

সুতরাং নিজ মাতার ন্যায় তাদেরকেও ভক্তি ও সম্মান করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জরুরী। নিজ মাতার ন্যায় তাদের সাথেও বিবাহ হারাম। তবে তাদের সাথে পর্দা করা ফরজ। যদিও নিজ মাতার সঙ্গে পর্দার বিধান নেই। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন- যদি তোমরা তাদের নিকট কিছু চাও তাহলে পর্দার আড়াল থেকে চাও। [সূরা আহযাবঃ ৫৩] রাসূল সা. এর এগারজন স্ত্রী ছিলেন। তাদের মধ্য থেকে দুজন নবী সা. এর তিরোধানের সময়ও জীবিত ছিলেন। নিম্নে উম্মাহাতুল মু'মিনীনের পরিচয় তুলে ধরা হলো।

হযরত খাদীজা বিনতে খুওয়ায়লিদ রা.

রাসূল সা. সর্বপ্রথম খাদীজা রা. কে বিবাহ করেন। রাসূল সা. এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পনের বছর পূর্বে এ বিবাহ সংঘটিত হয়। প্রথমে তিনি খাদীজা রা. এর ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা করতেন। তখন রাসূল সা. এর চরিত্র মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে খাদীজা রা. তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। খাদীজা রা. আরবের সম্ভ্রান্ত মহিলাদের অন্যতম ছিলেন। তাঁকে সকল বিষয়ে সহযোগিতা করতেন।

নবীজী সা. হেরা গুহায় অবস্থানকালে সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে খাদীজা রা. সেখানে খাদ্য পানীয় নিয়ে উপস্থিত হতেন। নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্ব থেকে শুরু করে মক্কী জীবনের তথা সংকটময় দশটি বছর পর্যন্ত অকল্পনীয় ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে তিনি রাসূল সা. কে চরম মমতায় আগলে রেখেছেন। তাঁর উপর যেন কোন বিপদ-আপদ না আসতে পারে সে জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন। এসব কাজ করার ক্ষেত্রে তার পক্ষ থেকে কোন অমনোযোগিতা প্রকাশ পায়নি। স্বামীর প্রতি কোন ধরনের অভিযোগও উত্তোলন করেননি। বরং এর মাঝে তিনি খুঁজে পেতেন মহা আনন্দ ও শান্তি। যেন তিনি অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা দেখতে পাচ্ছিলেন যে, তার এই মহান স্বামীর দ্বারা আল্লাহ মানব জাতির বিশাল কল্যাণের কোন পথ সুগম করছেন।

রাসূল সা. কে যেমন আল-আমীন ডাকা হতো তেমনি খাদীজা রা. কেও তার সততার কারণে মানুষ তাহেরা বা পবিত্র বলে ডাকত। তিনি রাসূল সা. কে ভালো বাসতেন। রাসূল সা.ও তাকে আন্তরিকভাবেই ভালোবাসতেন। তাইতো নবুওয়াতের দশম বর্ষ তথা হিজরতের তিন বছর পূর্বে রমজান মাসে খাদীজা রা. ইন্তেকাল করলে রাসূল সা. পুরোপুরি ভেঙ্গে পড়েন। যার কারণে তিনি এ বছরটিকে ‘আমুল হুযন’ বা ‘দুশ্চিন্তার বছর’ নামে নামকরণ করেন। ইন্তেকালের সময় খাদীজা রা. এর বয়স হয়েছিল পঁয়ষট্টি বছর । আর রাসূল সা. এর বয়স তখন পঞ্চাশ। সে সময় পর্যন্ত জানাযার বিধান বিধিত হয়নি বিধায় রাসূল সা. মাগফিরাতের দোয়া করে নিজ হাতে এই সৌভাগ্যবান নারীকে দাফন করেন।

হযরত সাওদা বিনতে যাম‘আ রা.

হযরত সাওদা রা.ও একজন প্রৌঢ়া মহিলা ছিলেন। কিন্তু ধৈর্যশীল ও নরম মেজাজের অধিকারিণী ছিলেন। খাদীজা রা. এর পর রাসূল সা. এর ঘর সংসার পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি খুব ধৈর্য ও কর্তব্য নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। তার দান দক্ষিণার কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হযরত ওমর রা. এর শাসনামলের শেষের দিকে সম্ভবত ২২ হিজরীতে হযরত সাওদা রা. ইন্তেকাল করেন।

হযরত আয়েশা বিনতে আবূ বকর সিদ্দীক রা.

হযরত আয়েশা রা. ছিলেন প্রখর মেধার অধিকারিণী। তিনি রাসূল সা. এর সাহচর্যে থেকে অনেক বড় জ্ঞান ভাণ্ডারের মালিক হয়েছিলেন। হাদীস গ্রন্থ সমূহে তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা চার হাজারেরও বেশী। রাসূল সা. এর স্ত্রীদের মাঝে তিনিই একমাত্র কুমারী ছিলেন। নবুওয়াতের দশম বর্ষের শাওয়াল মাসে রাসূল সা. এর সাথে তাঁর বিবাহ হয় এবং হিজরতের পর নয় বছর বয়স থেকে তিনি রাসূল সা. এর সাথে ঘর সংসার শুরু করেন। রাসূল সা. এর তিরোধানের সময় তার বয়স আঠার। এর পর তিনি আরো আটচল্লিশ বছর বেঁচে ছিলেন। ছেষট্টি বছর বয়সে হিজরী ৫৭ সনে তাঁর ইন্তেকাল হয়।

হযরত হাফসা বিনতে উমর রা.

রাসূল সা. এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পাঁচ বৎসর পূর্বে হাফসা রা. এর জন্ম হয়। বদর যুদ্ধের পর পরই তিনি বিধবা হয়ে গেলে রাসূল সা. তাঁকে বিবাহ করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ। অধিকাংশ সময় রোজা রাখতেন। তিনি ছিলেন সৎসাহসী ও বিচক্ষণতার অধিকারিণী একজন মহিলা। পবিত্র কুরআন সংরক্ষণে তাঁর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। হযরত মুয়াবিয়া রা. এর খিলাফতকালে ৪৫ হিজরীর শাবান মাসে তেষট্টি বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন।

উম্মুল মাসাকীন যয়নব বিনতে খোযায়মা রা.

তিনি ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ আবদুল্লাহ ইবনে জাহশের স্ত্রী। আবদুল্লাহ ইবনে জাহশ তৃতীয় হিজরীর ওহুদ যুদ্ধে শহীদ হলে রাসূল সা. তাঁকে বিবাহ করেন। বিবাহের দুই-তিন মাস পরই ৪র্থ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। রাসূল সা. নিজে তার জানাযা পড়ান এবং জান্নাতুল বাকীতে কবরস্থ করেন।

উম্মে সালমা হিন্দ বিনতে আবূ উমাইয়া রা.

উম্মে সালমা রা. ছিলেন আব্দুল্লাহ বিন আবদুল আসাদের স্ত্রী। বদর যুদ্ধের পর তাঁর স্বামী মারা গেলে পাঁচটি শিশু সন্তান নিয়ে তিনি অসহায় হয়ে পড়েন। তখন রাসূল সা. তাঁকে বিবাহ করেন। এবং তাঁর সন্তানদেরকে যথাস্নেহে লালন পালন করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও বিচক্ষণ। তার বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৩৭৮। তিনি একজন উঁচু স্তরের কবি প্রতিভার অধিকারিণী ছিলেন। তাঁর অনেক কবিতা আরবী সাহিত্য ভাণ্ডারে সংরক্ষিত আছে। উম্মুল মু'মিনীনদের মাঝে তিনিই সর্বাধিক বয়স পেয়েছিলেন। ৬৩ হিজরীর পর চৌরাশি বৎসর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন।

হযরত যয়নব বিনতে জাহশ রা.

তিনি ছিলেন রাসূল সা. এর ফুফাতো বোন। তিনিও ছিলেন একাধিক সন্তানের জননী। স্বামী পরিত্যক্তা। রাসূল সা. তাকে বিবাহ করে আশ্রয় দেন এবং তাঁর সন্তানের লালন পালন করেন। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে রাসূল সা. এর সাথে তার বিবাহ হয়। বিশ হিজরীতে তিপ্পান্ন বৎসর বয়সে তিনি মদীনায় ইন্তেকাল করেন। উমর রা. তার জানাযা পড়ান।

হযরত জুওয়ায়রিয়া বিনতে হারিস রা.

জুওয়ায়রিয়া রা. ছিলেন বনু মুস্তালিক গোত্রের সরদার হারিসের কন্যা। পঞ্চম হিজরীতে বনু মুস্তালিক যুদ্ধে তিনি মুসলমানদের হাতে বন্দি হলে রাসূল সা. তাঁকে আযাদ করে দিয়ে বিবাহ করেন। এ বিবাহের ফলে মুস্তালিক গোত্র মুসলমানদের মিত্রে পরিণত হয়। বিবাহের সময় তাঁর বয়স ছিল বিশ বছর। পঞ্চাশ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে পঁয়ষট্টি বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে দাফন করা হয়।

উম্মে হাবিবা বিনতে আবু সুফইয়ান রা.

হযরত উম্মে হাবিবা রা. ছিলেন মক্কার প্রসিদ্ধ সরদার আবু সুফইয়ানের কন্যা। আর আবূ সুফইয়ান ছিল কুরাইশদের নেতা। উম্মে হাবিবার স্বামী উবায়দুল্লাহ প্রথমে মুসলমান ছিল। কিন্তু পরে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে নেয়। তখন রাসূল সা. তাঁকে বিবাহ করেন। নাজ্জাশীর ওকালতিতে এ বিবাহ সংঘটিত হয়। এ বিয়ের পর আবু সুফইয়ান ইসলাম ও রাসূল সা. এর প্রতি নৈতিকভাবে অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়ে। বিবাহের সময় উম্মে হাবিবার বয়স ছিল চল্লিশ বছর। হিজরী ৪৪ সনে তিনি মদীনায় ইন্তেকাল করেন।

হযরত সাফিয়া বিনতে হোয়াই ইবনে আখতাব রা.

সাফিয়া রা. ছিলেন বনু নযীর গোত্রের সরদার হোয়াই ইবনে আখতাবের কন্যা। মদীনার এই ইয়াহুদী গোত্রটি ছিল মুসলমানদের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী বিরোধী দল। খায়বর যুদ্ধে সুফিয়ার স্বামী নিহত হয় এবং তিনি বন্দি হয়ে আসলে রাসূল সা. তাঁকে মুক্ত করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন। এ বিয়ের পর ইয়াহুদীদের পক্ষ থেকে শত্রুতা অনেকটা কমে আসে। পঞ্চাশ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে কবরস্থ করা হয়।

হযরত মায়মুনা বিনতে হারিস রা.

মায়মুনা রা. ছিলেন সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ে। তিনিও বিধবা এবং প্রৌঢ়া ছিলেন। রাসূল সা. তাকেই সর্বশেষ বিবাহ করেন। হযরত আব্বাস রা. এর মাধ্যমে এ বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। এ বিবাহের মাধ্যমে মক্কার বিশিষ্ট ব্যবসায়ীদের সাথে নতুন করে সম্পর্ক স্থাপন হয়। ৫১ হিজরীতে তাঁর ইন্তেকাল হয়। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. তাঁর জানাযা পড়ান।

লেখক: বিশিষ্ট কলামিস্ট, মালয়েশিয়া প্রবাসী

কওমী মাদরাসা শিক্ষা : শেকড়ের খোঁজে

মুফতী সালাহ্ উদ্দিন

সকল প্রশংসা আল্লাহর। তার নামেই নিবেদিত আমার জীবন, আমার মরণ। আমর শ্বাস-প্রশ্বাস ও অস্তিত্বের সকল স্পন্দন। সালাত ও সালাম রাসূল সা. এর উপর, যার পদতলে অর্পিত আমার হৃদয়ের সবটুকু ভালবাসা। আর তার পরিবার, সাহাবী ও অনুসারীদের প্রতি বর্ষিত হোক আল্লাহর অশেষ রহমত।

স্বাধীনভাবে জ্ঞান চর্চার যোগ্যতা আল্লাহ তায়ালা কেবল মানব জাতিকেই দান করেছেন। এ জ্ঞান চর্চার বৈশিষ্ট্যেই মানুষ সবার থেকে আলাদা, শ্রেষ্ঠ ও সম্মানের পাত্র। জ্ঞানের মহাত্মাকে সম্মান না জানিয়ে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বকে অস্বীকার করার কারণেই শয়তান আল্লাহর দরবার থেকে বিতাড়িত হয়।

তাছাড়া মানবজীবনের স্বাভাবিক বিকাশ ও পরিচালনার জন্য জ্ঞানের বিকল্প নেই। অন্য লক্ষ্য সৃষ্টির মাঝে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে জ্ঞান চর্চাই মানুষের একমাত্র আশ্রয়। জগতের প্রথম প্রতিযোগিতায় প্রথম মানুষ হযরত আদম আ. প্রতিযোগী হিসেবে যে সাফল্য অর্জন করেছেন, তা তো জ্ঞান চর্চার সুবাদেই।

আল কুরআনে মানবেতিহাসের এ প্রথম প্রতিযোগিতার কথা বর্ণিত হয়েছে সূরা বাকারার ৩১-৩২ নং আয়াতে– "আর আল্লাহ তায়ালা (আদম আ. ও সকল ফেরেশতার উপস্থিতিতে) বললেন, হে ফেরেশতারা! তোমাদের জানা থাকলে এই সব বস্তুর নামগুলো বলো? তারা বললো, হে পবিত্র সত্ত্বা,আপনি যা শিখিয়েছেন তা ছাড়া আমাদের তো আর কোন জ্ঞান নেই। আপনি তো মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়। তারপর আল্লাহ (আদম আ. কে) বললেন, হে আদম তুমি তাদেরকে এগুলোর নাম বলে দাও, তখন তিনি তাদেরকে সেগুলোর নাম বলে দিলেন।" [সূরা বাকারা: ৩১-৩২]

সে দিন থেকেই শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান হাতে শুরু হয় মানুষের জাগতিক পথ চলা। প্রজন্মের পর প্রজন্মের আগমন। একে একে অনেক মানুষ। মানুষের আধিক্যের স্বাভাবিক পরিণতিতে মতের আধিক্য। আর মতের আধিক্য মানেই চিন্তার বৈচিত্র্য। ভাবনার বৈষম্য। বিশ্বাসিক ভিন্নতা। পার্থক্যপূর্ণ জীবন দর্শন। শুদ্ধাশুদ্ধ নানান কৌশলে জীবনের পথে এগিয়ে চলা। পার্থিব এ জগৎ মানেই যেহেতু পরীক্ষাগার। সফলদের সত্যিকারের রূপ ও সামর্থ্য প্রমাণের সুবিস্তৃত মঞ্চ। বহুমুখী পরীক্ষার নানা রকম আয়োজন। দৃষ্টিনন্দন বিচিত্র বিভ্রান্তি জালের অবাধ বিস্তার। ইন্দ্রজালিক নানা ভয়ংকর সুন্দর ফাঁদের সমারোহ।

আকর্ষণীয় এমন জাগতিক রূপ-রসের আপাত সুস্বাদে নেশাগ্রস্থ হয়ে কেউ কেউ নয় অনেকেই যে উদভ্রান্ত হবে- এ প্রবণতা স্বাভাবিক। অনুচিত হলেও যৌক্তিক। এই যৌক্তিকতার সাথে একমত হয়েই আল্লাহ আমাদেরকে সঙ্গত ও সঠিক পথে চালিত হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। আল্লাহর পরীক্ষায় সাফল্যের প্রধান ও একমাত্র শর্ত আল্লাহর প্রভুত্বে চূড়ান্ত বিশ্বাস রাখার প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন। শুধু তাই নয় শিল্পিত আবরণের আড়ালে জগতের জটিল ধাঁধার ভয়ংকর হিংস্রতা এড়িয়ে সাফল্যের স্বপ্নিল পথে সাহসী পথচলা নিশ্চিত করতে হযরত নূহ, হযরত শীস এবং হযরত ইবরাহিম আ.সহ অসংখ্য মহামানবকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। যাদের প্রধান দায়িত্ব ছিল, পৃথিবীর মেকাপি নান্দনিকতায় বিভোর মানুষদেরকে প্রেমময় কৌশলে আসল গন্তব্য 'স্রষ্টার' প্রতি পথ নির্দেশ করা। অগ্রপথিক হয়ে সবাইকে নিয়ে স্রষ্টার ঘনিষ্ঠতায় আশ্রয় নেওয়া। একটি সম্পূর্ণ জাতি হিসাবে মানব জাতির প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকে খৃষ্ট শতাব্দীর সূচনাকাল পর্যন্ত প্রতিটি জাতির জন্যই আল্লাহ তায়ালা একেকজন নির্দেশক পাঠিয়েছেন। কুরআনিক ভাষায় যাদেরকে আমরা নবী-রাসূল নামে ডাকি। এ ঐতিহাসিক বাস্তবতার কথা বর্ণিত হয়েছে মহা পবিত্র কুরআনেও। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন- "প্রতিটি জাতির জন্যই আছে একজন পথ প্রদর্শক।" [সূরা রাআদঃ ৭]

স্রষ্টা আল্লাহর পক্ষ থেকে সৃষ্ট মানুষ জাতির প্রতি এই 'নির্দেশনা ও নির্দেশক'ই ছিল সবচেয়ে বড় অনুগ্রহের দান। এ কথার পেছনে বিভিন্ন দালিলিক বর্ণনা হয়তো উপস্থাপন করা যাবে। কিন্তু হযরত ঈসা আ. এর পর সাময়িকভাবে নবী-রাসূলদের আগমনের স্বাভাবিক ধারা বন্ধ থাকার পরিণতিতে মানব জাতি যে ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক ও বৈশ্বিক মহাবিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছিল তার একটি সাধারণ সরল চিত্রই এ অনুগ্রহের গুরুত্ব প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। হযরত ঈসা আ. এর প্রত্যাবর্তনের পর প্রায় পাঁচশত বছর পর্যন্ত আর কোন নবী রাসূল পৃথিবীতে আসেননি। সঙ্গত পরিণতিতেই ওয়াহিয়ে এলাহী তথা ঐশী নির্দেশনার অপার্থিব ফয়েজ থেকে বঞ্চিত হয়েছিল পাঁচ শতাব্দীর বিশ্ব। জগতের অস্থায়ী সৌন্দর্যের নেশায় আক্রান্ত হয়ে এলাহী নির্দেশনার লালন ও অনুশীলন থেকে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিল মানুষ। পার্থিব ভোগচিন্তা প্রধান উপজীব্য বানিয়ে নানামুখী উৎকর্ষ অর্জনে মনোযোগী হয়েছিল। বাহ্যিক বিবেচনায় তাতে কিছুটা সাফল্য হয়তো অর্জিত হয়েছিল। কিন্তু আত্মার প্রধান চাহিদা উপলব্ধি করে জীবনের সঠিক গন্তব্যের পথে এক পা সামনেও অগ্রসর হওয়া যায়নি; বরং মানবিক বৈশিষ্ট্যের বিলোপের সমানুপাতে দেখা দিয়েছে বহুমুখী বিশৃঙ্ক্ষলা। মানুষ হারিয়ে ফেলেছে মানুষের আসল পরিচয়। মনুষ্যত্বের সংকটে একাকার হয়ে গেছে মানুষ আর অমানুষ। ঐশী জ্ঞানের পুষ্টির অভাবে ধুঁকতে থাকা সমাজে আমূল ভেঙ্গে পড়ে মানবীয় সব সম্পর্কের বাঁধন।

অসাম্য, অপ্রেম আর উদ্ধত হিংস্রতাই হয়ে ওঠে ঐতিহ্যের প্রতীক। অনৈতিক নীতিহীনতাই জীবন যাত্রার একমাত্র নীতিতে পরিণত হয়। অশান্তির দূষিত হাওয়ায় বিষাক্ত হয়ে ওঠে মানুষের সমগ্র আবাসভূমি। প্রকৃতির অনাবিল সরলতা ছাপিয়ে উদ্ধত হয়ে ওঠে পশুত্বের সর্বগ্রাসী রুক্ষতা। পাশবিক চরিত্রে আশ্রিত মানব সমাজের অধঃপতন ঠেকে যায় অন্তহীন গভীরতায়। বৈষয়িক উন্নয়ন ও উৎকর্ষ অর্জনের সাফল্যের ধারা অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও প্রাচীন ও আধুনিক সকল ঐতিহাসিক নির্দ্বিধ কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন, খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী ইতিহাসের সর্ব নিকৃষ্টতম অধ্যায়। যে কলঙ্কদাগ মানুষের ইতিহাসকে শুধু কলুষিতই করেনি, পাঠের অযোগ্য অংশে পরিণত করেছে। যা আমাদের কাছে আজও আইয়ামে জাহিলিয়াত তথা মূর্খতার যুগ, অন্ধকারের যুগ বলে নিন্দিত, ঘৃণিত।

সমগ্র মানবজাতি যখন মারাত্মক ভারসাম্যহীনতার বহুমাত্রিক কাঁপুনিতে অস্থির, অনিয়মের নিষ্ঠুর কাঁটাতারে আটকে পড়ে অস্তিত্ব যখন শেষ স্পন্দনটি হারানোর অপেক্ষায়; ঠিক তখনই সবচেয়ে প্রয়োজনীয় মুহূর্তে আল্লাহ তায়ালা মানব জাতির সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ও সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামতটি দান করেন। কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মানুষের জন্য চূড়ান্ত ঐশী নির্দেশনা মহা পবিত্র আল কুরআনসহ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ রাহবার সার্বিক বিবেচনায় সর্বোৎকৃষ্ট মহামানব হযরত মুহাম্মাদ সা. প্রেরিত হন। যে চিরন্তন নির্দেশনা সর্বপ্রথম ঘোষণা করা হয়, "পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্তপিণ্ড থেকে।" [সূরা আলাক : ১-২]

আয়াত দুটির নাযিলের সময় ও বর্ণনা ধারার মাঝ দিয়ে আল্লাহর প্রভুত্বে বিশ্বাস সমৃদ্ধ জ্ঞানের অপরিহার্যতা অত্যন্ত প্রকটভাবে ফুটে উঠেছে। সাথে সাথে আল্লাহ বুঝিয়ে দিয়েছেন, মানুষের উদ্ভাবিত কোন কৌশলেই স্রষ্টা নির্দেশিত গন্তব্যে পৌঁছা সম্ভব নয়। কাজেই মানুষের সামগ্রিক উৎকর্ষ উত্তীর্ণ মাত্রায় গতিশীল রেখে স্রষ্টার নৈকট্য অর্জনের প্রয়োজনে এলাহী নির্দেশনা তথা ইলমে ওয়াহীর বিকল্প কোন আশ্রয় নেই। আশ্রয় খোঁজারও সুযোগ নেই।

ঐশী নির্দেশনা তথা রেসালাত প্রাপ্তির পর রাসূল সা. এর উপর প্রধানত তিনটি দায়িত্ব অর্পিত হয়।

১. আল্লাহর যাবতীয় বাণী-নির্দেশনা অবিকৃতভাবে উম্মতের কাছে উপস্থাপন করা।
২. এসব বাণীর মর্মকথা ও আবেদন স্পষ্ট করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দান করা।
৩. যাবতীয় নির্দেশনার ব্যবহারিক অবকাঠামো প্রদর্শন করা।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আল্লাহ তায়ালা আল কুরআনে ইরশাদ করেন, "তোমরা সালাত কায়েম কর।" [সূরা আনআম: ৭২] রাসূল সা. এ ঐশী বাণী পাওয়ার পর প্রথমে তা সাহাবীদের নিকট তিলাওয়াত করে শুনান। আর সাহাবীগণও তা

আত্মস্থ করেছেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি সাহাবীদের কাছে এ সালাত সম্পর্কে বিভিন্ন নিয়ম-কৌশল-পন্থা বর্ণনা করে সালাত এর সংক্ষিপ্ত রূপটাকে বিস্তৃতভাবে উপস্থাপন করেছেন। সালাতের বিভিন্ন বিধি-বিধান বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'নামাযের মধ্যে জাগতিক কোন কথা বলা উচিত নয়, নামায হচ্ছে তাকবীর তাসবীহ ও কুরআন পাঠ' [সহিহ মুসলিমঃ ১/৩৮১; আবু দাউদঃ ১/২৪৪] এ হাদীসে সালাতে সূরা ফাতেহা পাঠের অপরিহার্যতার বিধান বর্ণিত হয়েছে। অন্য একটি হাদীসে এসেছে- "যখন 'ফা সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আযীম' আয়াতটি অবতীর্ণ হল, তখন রাসূল সা. সাহাবীদের বললেন, তোমরা এটাকে তোমাদের রুকুর মাঝে পাঠ কর। আর যখন 'সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা' নাযিল হয় তখন তিনি বলেন, তোমরা এটিকে তোমাদের সিজদায় পড়।" [সুনানে আবু দুাউদঃ ১/১২৬]

উল্লেখিত হাদীসের মত অনেক হাদীসের মাধ্যমে রাসূল সা. সালাতের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান বর্ণনা করেছেন। শুধু বিধান বর্ণনা করেই তিনি ক্ষান্ত হননি; বরং রিসালাতের পূর্ণ দায়িত্ব মোতাবেক সালাতের ব্যবহারিক শিক্ষাও সাহাবীদের দান করেন। সালাতের সম্পূর্ণ অবকাঠামো প্রদর্শন করার পর তিনি ঘোষণা করেন, "তোমরা আমাকে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখেছ ঠিক সেভাবেই সালাত আদায় কর।" [বুখারী, হাদীসঃ ৭২৪৬]

এভাবেই রাসূল সা. তিন স্তর বিশিষ্ট পদ্ধতিতে রিসালাতের মহান দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন। আর কথা-কর্ম, চিন্তা-বিশ্লেষণ, আচরণ ও সমর্থন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে অনুদিত হয়েছে ঐশী নির্দেশনার পরিপূর্ণ আবেদন। এজন্যই রাসূল সা. এর সমৃদ্ধ চরিত্র সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তরে হযরত আয়েশা রা. বলেন, "কুরআনের বিশ্লেষিত দৃশ্যরূপই ছিল তার চরিত্র।" [মুসনাদে আহমাদ, হাদীসঃ২৫৮১৩], তবে মহাগ্রন্থ আল কুরআন ও কুরআনের সম্পূর্ণ চাহিদার আদলে প্রতিষ্ঠিত নববী চরিত্রের প্রভাব ও প্রয়োজনীয়তা একটি বিবেচ্য বিষয়। সে ক্ষেত্রে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর দিকে একটু নজর দিলেই আমরা দেখতে পাব, পঞ্চম শতাব্দীর অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবী কুরআনের অপার্থিব নূরের রৌশনীতে কী দারুণ ঔজ্জ্বল্যে উদ্ভাসিত হয়েছিল। জীবনের বহুমুখী জটিলতায় আক্রান্ত, হিংস্র, হতাশ মানুষগুলো জগতশ্রেষ্ঠ সোনার মানুষে পরিণত হয়েছিল কুরআন চর্চার সুবাদেই। বসবাসের অযোগ্য একটি মানব সমাজ কুরআন তথা ইসলামী শিক্ষার যাদুকরী ছোঁয়ায় রূপান্তরিত হয়েছিল অভাবনীয় সুখসমৃদ্ধ ও যে কোন মানুষের প্রত্যাশিত ঠিকানায়। ব্যক্তির সমাজ ও মানস জগতে ইলমে ওয়াহীর ইতিবাচক প্রত্যক্ষ প্রভাবের কারণেই খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্ধকে বিশ্ব ইতিহাসের 'স্বর্ণযুগ' বলে চিহ্নিত করা হলে মুসলিম-অমুসলিম কোন ঐতিহাসিকই দ্বিমত পোষণ করেন না।

খৃষ্টপূর্বকালে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অঞ্চল, জাতি, প্রজন্মসহ বিচিত্র বিবেচনায় নবীদের প্রেরণ করতেন। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ সা. আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ রাসূল হওয়ায় আর কোন নবী আসার সুযোগ নেই। অথচ নবী পরবর্তীকালেও মানুষকে আল্লাহর পথে আহবান করা ও তার পথনির্দেশ করার প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান। এ প্রয়োজনের প্রেক্ষিতেই সর্বকালের, সবস্থানের, সকল মানুষের জন্য সমান ও পূর্ণভাবে উপযোগী চিরন্তন আল-কুরআনের প্রতিটি বাণী সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার মহান দায়িত্ব বর্তায় উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ জামাআত আসহাবে রাসূলের উপর। নববী ইলম ও ফয়েজের নিরঙ্কুশ উত্তরাধিকারী উলামায়ে কেরামের উপর। এ মর্মে রাসূল সা. এর স্পষ্ট নির্দেশ “একটি আয়াত হলেও আমার পক্ষ থেকে তোমরা পৌঁছিয়ে দাও।” [বুখারী, হাদীসঃ ৩৪৬১]

সাহাবায়ে কেরাম রা. রাসূল সা. এর এ আদেশ পালনে সর্বোচ্চ ঐকান্তিকতায় তাদের সামর্থ্যের সবটুকু ব্যয় করেছেন- একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কারণ ঐশী নির্দেশনায় পুষ্ট ইসলামের আদর্শের প্রতি মানুষকে ডাকতে গিয়ে তারা যে ত্যাগ-তিতিক্ষা বরণ করেছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তার কোন নজির নেই। সাহাবায়ে কেরামের পদাঙ্ক অনুসরণ করে একমাত্র উত্তরাধিকারী হিসাবে পরবর্তী প্রতিটি যুগের আলেমগণই ইলমে ওয়াহী ধারণ করেছেন এবং বিতরণ করেছেন। এ কাজে তাঁদের একনিষ্ঠতা ও নিবেদনের মাত্রা ছিল সর্বোচ্চ মানের।

অসংখ্য হাদীস গ্রন্থের অনবদ্য সংকলন, অগণিত তাফসির গ্রন্থসহ ইলমে দ্বীনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে রচিত গ্রন্থের সুবিশাল সমারোহই তাদের অবদানের নির্বাক সাক্ষী। তাছাড়া ইতিহাসের প্রতিটি পরিচ্ছেদে অসংখ্য ইসলামিক স্কলারের উজ্জ্বল উপস্থিতিও আলোচ্য প্রসঙ্গে তাদের ভূমিকার কথা স্পষ্ট করে তোলে।

ঐতিহাসিক বাস্তবতার কারণেই আল্লাহ তাঁর স্মরণকে পার্থিব জীবনে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে চিহ্নিত করেছেন। আল্লাহর নির্দেশনাই মানব জীবনে প্রকৃত সাফল্যের প্রধান নিয়ামক- এ কথাটি প্রতিটি মানুষের মগজ ও হৃদয়ে গেঁথে দেয়ার লক্ষ্যে আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, “পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়আশয় থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল আল্লাহর জিকির” [সূরা আনকাবূতঃ ৪৫]

শুধু তাই নয়, রাসূল সা. এ জিকিরকেই পৃথিবীর অস্তিত্ব রক্ষার প্রধান উপাদান হিসাবে বর্ণনা করেছেন। ইরশাদ হয়েছে “‘আল্লাহ, আল্লাহ’ বলতে থাকে এমন একজন লোক পৃথিবীতে থাকলেও কিয়ামত সংঘটিত হবে না।” [মুসলিম, হাদীসঃ ২৩৪] এই আল্লাহ আল্লাহ বলা, আল্লাহর নির্দেশনা মেনে চলার পূর্ব শর্ত হল পৃথিবীতে ইলমে ওয়াহীর অব্যাহত চর্চা বিদ্যমান থাকা। কারণ কোন বিষয়ে ইলমের অস্তিত্ব না থাকলে বাস্তবিক কর্মে তার প্রতিফলন আশা করা চরম

নির্বুদ্ধিতা বা নিরেট কল্পনা বিলাস ছাড়া আর কিছু নয়। ইলমে ওয়াহীর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ মানব জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অন্যতম প্রধান কর্ম বলেই এর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরকে রাসূল সা. শ্রেষ্ঠ মানুষ বলে আখ্যায়িত করেছেন। হাদীসে নববীতে তিনি ইরশাদ করেন, " তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সেই যে কুরআন শিক্ষা লাভ করে এবং তা শিক্ষা দেয়।" [বুখারী, হাদীসঃ ৫০২৭]

তাছাড়া মানবজাতির জন্য হেদায়াতরূপে অবতীর্ণ ইলমে ওয়াহী যেহেতু মানুষকে জান্নাতগামী করার নির্দেশনা, তাই ইলমে ওয়াহী অর্জনের প্রতিটি পদক্ষেপকে জান্নাতমুখী পথযাত্রা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। রাসূল সা. ইলমে ওয়াহীর শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে বলেন, "যে ইলমের অনুসন্ধিৎসা নিয়ে পথযাত্রা শুরু করে আল্লাহ তার (এ ইলম অর্জনের চাহিদা ও প্রাথমিক প্রয়াসের) জন্য জান্নাতের পথ সুগম করে দেন। [মুসলিম, হাদীসঃ ২৬৬৯]

ঐতিহাসিক বাস্তবতা ও প্রামাণিক বিশ্লেষণ শেষে গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও মর্যাদার বিবেচনায় নিঃসন্দেহে বলা যায়, ইলমে ওয়াহীর শিক্ষা ও শিক্ষা প্রদানই হলো জগতের সবচে' মহৎ কর্ম। ভারসাম্য রক্ষার এবং ব্যক্তির উভয় জাগতিক কল্যাণ সাধনে যা সর্বতোভাবে সক্রিয় ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

এ ঐশী শিক্ষার প্রথম শিক্ষক ছিলেন রাসূল সা.। যিনি ঐশী শিক্ষা তথা দ্বীনী ইলমের শিক্ষক হতে পেরে গর্বভরে উচ্চারণ করেছেন, "নিশ্চয়ই আমি শিক্ষকরূপে প্রেরিত হয়েছি।" [সুনানে দারেমী, হাদীসঃ ৩৬১]

রাসূল সা. ও তার পরবর্তী কয়েক শতাব্দী যাবৎ শিক্ষকভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল বলে সাহাবায়ে কেরামের কাছে ভিন্ন ভিন্নভাবে সুহবত গ্রহণের মাধ্যমে তাবেঈনে কেরাম ইলমে দ্বীন শিক্ষা করেন। শিক্ষকভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামোতেই মক্কায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, মদীনায় হযরত উবাই ইবনে কাআব, ইরাকে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ও ইয়ামানে আবু মুসা আশআরী রা. সহ অনেক সাহাবী ইলমে দ্বীনের শিক্ষা প্রদান করেন। তাবেঈন ও তাবে তাবেঈনের যুগসহ প্রায় খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এ পদ্ধতিতেই চলে ইলমে দ্বীনের শিক্ষা কার্যক্রম। আর এ শিক্ষা ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু ছিল মসজিদ। অবশেষে একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আফগান শাসক সুলতান মাহমূদ কর্তৃক গজনীতে ইলমে দ্বীনের শিক্ষা-দীক্ষার জন্য মসজিদসংশ্লিষ্ট একটি আলাদা গৃহ নির্মাণ করেন। ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে যা ছিল প্রথম মাদরাসা। অবশ্য প্রসিদ্ধ মতানুসারে একাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে বাদশাহ নিজামুল মুলক তুশী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'মাদরাসায়ে নিজামিয়াকে' সর্বপ্রথম মাদরাসা বলে গণ্য করা হয়। মাদরাসা প্রতিষ্ঠার সাথে সাথেই মূলত শিক্ষকভিত্তিক শিক্ষাকাঠামো পরিবর্তিত প্রাতিষ্ঠানিক

শিক্ষা ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হয়। শিক্ষা ব্যবস্থার এ প্রাতিষ্ঠানিক রূপরেখা সবার কাছে সমাদৃত ও জনপ্রিয় হয়ে উঠলে দ্বাদশ শতাব্দীতে মাদরাসা প্রতিষ্ঠার ব্যাপক বিস্তার ঘটে। একই কারণে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুর দিকে উপমহাদেশেও মাদরাসা প্রতিষ্ঠার ধারা শুরু হয়। এবং এত দ্রুত ও বেশি মাত্রায় বিস্তার লাভ করে যে, শতাব্দীর প্রথমার্ধ শেষে শুধু দিল্লিতে এক হাজারেরও বেশি মাদরাসা পাওয়া যায়। এ সব প্রতিষ্ঠানে ইলমে ওয়াহীর আলোক পুষ্ট মনীষীগণ শুধু জ্ঞান আহরণের ও বিতরণের কাজেই ব্যস্ত ছিলেন না; বরং সমাজে, রাষ্ট্রে এমনকি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যে কোন ষড়যন্ত্রের বিপরীতে রুখে দাঁড়ান। এমনকি ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে পরাজয়ের মধ্য দিয়ে ইংরেজদের কাছে বাংলার স্বাধীনতা হাত ছাড়া হয়ে গেলেও ইলমে ওয়াহীর চেতনাসিদ্ধ আলিমগণ দমে যাননি, হতাশ হননি। বরং বিভিন্নসময় নির্যাতক সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়েছেন, প্রতিরোধী হয়েছেন। হযরত শাহ আব্দুল আজিজ র., সাইয়েদ আহমদ শহীদ র. সাইয়েদ ইসমাঈল শহীদ র., হাজী শরীয়তুল্লাহ র., হাজী নেছার আলী উরফে তিতুমীর র., শাইখুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান র., শাইখুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানী র., উবাইদুল্লাহ সিন্ধী র. এর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। যাদের বাদ দিয়ে বাংলার মুক্তির সম্পূর্ণ ইতিহাস রচনা করা সম্ভব নয়। তাছাড়া ইংরেজ শাসকদের অবৈধ হস্তক্ষেপে ঐতিহ্যময় মাদরাসাশিক্ষার ধারা ব্যাহত ও বন্ধ হয়ে গেলে জাগতিক ও মানসিক নানা জটিলতায় আক্রান্ত জাতির মুক্তির লক্ষ্যে ঐশী ইলমের মারকাজ রূপে ১৮৬৬ সালে ভারতের দেওবন্দে প্রতিষ্ঠিত হয় দারুল উলূম দেওবন্দ। তারপর শতাব্দীর শেষ দিকে বাংলাদেশে ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ঢাকা ও চট্টগ্রামে অভিন্ন উদ্দেশ্যে গড়ে ওঠে বেশ কিছু মাদরাসা। যেসব প্রতিষ্ঠান ছিল স্বাধীনতা চেতনার সূতিকাগার। যাবতীয় বন্দিত্ব অবক্ষয় থেকে এ জাতিকে পরিত্রাণ দেওয়ার নিয়তে সক্রিয় ছিল এ সব প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নকরা ইলমে ওয়াহীর আলোকে প্রদীপ্ত মানুষগুলো। পরবর্তীতে অভিন্ন চেতনার আলোকে দেওবন্দী আদলে এদেশের সর্বত্র গড়ে ওঠে অসংখ্য মাদরাসা। যা আজ আমাদের কাছে কওমী মাদরাসা নামে পরিচিত। বর্তমানে কওমী মাদরাসা শিক্ষার সিলেবাস, শিক্ষা পদ্ধতি, এ শিক্ষায় শিক্ষিত আলেম সমাজের জীবন চরিত্র, কর্মনীতি ও উম্মাহর প্রতি দরদী নিবেদন দেখে নির্দ্বিধায় বলা যায়, চৌদ্দশ বছর আগে রাসূল সা. নানামুখী ফেতনার হাত থেকে রক্ষা করে ইলমে ওয়াহীর আলোকে মানবজাতিকে আল্লাহমুখী করার যে গুরু দায়িত্ব আলিম সমাজের উপরে অর্পণ করেছিলেন। কওমী মাদরাসার যাবতীয় কার্যক্রম সে মহান দায়িত্ব পালনেরই একটি সমন্বিত প্রয়াস।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, ইসলামে বিশুদ্ধ ও সমৃদ্ধ শিক্ষার প্রধান কেন্দ্রভূমি এসব কওমী মাদরাসা আদর্শিক বৈশিষ্ট্যের কারণেই শয়তানী শক্তির শ্যেন দৃষ্টির শিকার।

ইসলামী চেতনার প্রধান মারকাজ এসব প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জনমনে বিভ্রান্তি ছড়ানোর নিকৃষ্ট মানসে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় নানা অসত্যের অপপ্রচার তাদের ঘৃণ্য মানসিকতারই বহিঃপ্রকাশ। তাছাড়া সরকার যন্ত্রের বিভিন্ন অংশে ঢুকে পড়া ইসলাম বিরোধী দালাল-নাস্তিকদের অসৎ পরামর্শে সরকারও কওমী মাদরাসার সাথে বিমাতৃসুলভ আচরণ করছে যা কোনভাবেই প্রত্যাশিত নয়, গ্রহণযোগ্যও নয়।

সতর্ক হওয়া প্রয়োজন যে, ইদানীং কওমী মাদরাসার কিছু ছাত্র-শিক্ষকও বাতিল শক্তির অপপ্রচারে প্রভাবিত হচ্ছেন। আধুনিক জ্ঞানপাপীদের অন্তঃসারশূন্য নানা যুক্তি প্রশ্নে তাদের মনেও সমাজে কওমী মাদরাসা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে অযথা সন্দেহ সৃষ্টি হচ্ছে। বোধ করি, ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের হৃদপিণ্ডে ইলাহী আদর্শ ও নৈতিকতার অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে মানুষের ব্যক্তিক ও সামষ্টিক জীবন ভারসাম্যপূর্ণ ও সাফল্যমণ্ডিত করার পেছনে একমাত্র দ্বীনী শিক্ষাই যে প্রধান ভূমিকা রাখছে সে সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণার অভাবেই অনাকাঙ্ক্ষিত এ ব্যাধির সংক্রমণ হচ্ছে। সবশেষে কওমী মাদরাসা শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট ও এর বিরোধিতায় বিভোর উভয় পক্ষকে বলতে চাই, নিজেদের স্বার্থেই এ শিক্ষা স্বযত্নে লালন করুন। অন্যথায় পৃথিবীতে অচিরেই নেমে আসবে আরেকটি অন্ধকার যুগ। যার অশুভ প্রভাব থেকে আমরা কেউই মুক্ত থাকতে পারব না।

লেখক: মুহতামিম ও শাইখুল হাদীস, জামিয়া দারুল উলূম আল ইসলামিয়া দিলুরোড ঢাকা

এক জীবন্ত কিংবদন্তী

শাইখুল ইসলাম আল্লামা আহমদ শফী দা. বা.

মাওলানা মাহফুজুর রহমান

তাগুতী শক্তির বিরুদ্ধে গর্জে উঠা সমুদ্রের ন্যায় উত্তাল, নববী আদর্শের প্রতীক, হেদায়েতের পথ প্রদর্শনে সর্বপ্রকার অপশক্তির বিরুদ্ধে নির্ভীক। তিনি হলেন শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. এর বিশিষ্ট খলীফা হযরতুল আল্লাম শাহ আহমদ শফী দা.বা.। শৈশব, কৈশোর, তারুণ্য, যৌবন ও বার্ধক্যের বর্ণাঢ্য জীবনসফরে যিনি একজন সফল পুরুষ। ইলম-আমল, তালীম-তরবিয়ত, তাযকিয়া-তাসাওউফ, দাওয়াত-সিয়াসাতসহ কল্যাণকর প্রতিটি অঙ্গনে যার অসামান্য অবদান, দেশের প্রথম শ্রেণীর উলামায়ে কেরামের যিনি শিরোমণি, আপামর জনসাধারণের অন্তরের মণিকোঠায় যার স্থান তিনিই শাইখুল ইসলাম আল্লামা আহমদ শফী দা.বা.।

এই বুযুর্গ হিজরী ১৩৫১ মোতাবেক ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত রাঙ্গুনিয়া থানার শিলক গ্রামের সম্ভ্রান্ত ও ঐতিহ্যবাহী দ্বীনদার পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। হযরতের পিতার নাম বরকত আলী এবং মাতার নাম মেহেরুন্নেছা।

শিক্ষাজীবন

আনন্দের বার্তা নিয়ে মাতৃকোল আলোকিত করার পর হযরতের পিতা মাতা সন্তানকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাদের নয়নমণি হবে পথ হারাদের পথের দিশা, হেদায়েতের মশালবাহক, উম্মতের রাহবার, দ্বীনের ধারক-বাহক। এই মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে শৈশবেই তারা তাঁকে কুরআন শিক্ষা লাভের জন্য জনাব মৌলভী হাফিজুর রহমান রহ. এর নিকট প্রেরণ করেন। এরই সাথে সাথে তার প্রাথমিক সাধারণ শিক্ষাও সমাপন হয়। এরপর সরফভাটা মাদরাসায় ভর্তি হন।

প্রখর মেধা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার অধিকারী হওয়ায় স্বল্পসময়ে কুরআনে কারীমের তেলাওয়াতসহ প্রাথমিক শিক্ষা কৃতিত্বের সাথে সমাপন করেন। এরপর এই প্রতিভাবান বালক দ্বীনী এলেম অর্জনের অদম্য স্পৃহা নিয়ে ছুটে যান ঐতিহ্যবাহী দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল-জামিয়াতুল আরাবিয়া আল-ইসলামীয়া জিরি মাদরাসায়। সেখানে প্রায় ০৬ মাস অধ্যয়নের পর ব্রিটিশ জার্মানের রণদামামা বেজে ওঠে। তখন তিনি জনাব হাফেজ ইমতিয়াজ সাহেবের সহায়তায় ১০ বছর

বয়সে ১৩৬১ হিজরীতে উপমহাদেশের ২য় বৃহত্তম দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারীতে ভর্তি হন। ইতোমধ্যে তার পিতা-মাতা তাকে চিরদিনের জন্য এতিম করে মহান রাব্বুল আলামীনের ডাকে সাড়া দিয়ে পরপারে পাড়ি জমিয়েছেন।

মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদরাসায় তিনি যে সকল বিজ্ঞ আসাতিযায়ে কেরামের পাঠ গ্রহণে ধন্য হন, তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন, প্রখ্যাত সমাজ সংস্কারক উপমহাদেশের ইসলামী আইন বিশারদ মুফতীয়ে আজম হযরত মাওলানা ফয়জুল্লাহ রহ., শাইখুল হাদীস আল্লামা সুফি আবদুল কাইয়ুম রহ., শাইখুল আদব আল্লামা মুহাম্মদ আলী নিজামপুরী রহ. ও শায়খ আল্লামা আবুল হাসান রহ.।

উচ্চতর শিক্ষা

দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদরাসায় মিশকাত, জালালাইন শরীফ, কাজী মুবারক ইত্যাদি কিতাব অধ্যয়ন শেষে সকল প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতার পাহাড় ডিঙ্গিয়ে সত্য ন্যায়ের উৎস সন্ধানে ব্যাকুল হয়ে ইলমে হাদীস ও ইলমে তাফসীরের উচ্চতর জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে ১৩৭১ হিজরীতে তিনি ছুটে যান উপমহাদেশের ইসলামী শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র মাদারে ইলমে নববী, ঐতিহ্যবাহী দারুল উলূম দেওবন্দে। সেখানে তিনি দাওরায়ে হাদীস, তাফসীর ও ফুনূনাতে আলিয়া বিভাগে অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন।

দারুল উলূম দেওবন্দে তিনি যে সকল মহা-মনীষীগণের সংশ্রবে ধন্য হন, তাদের শীর্ষ তালিকায় রয়েছেন শাইখুল আরব ওয়াল আযম আওলাদে রাসূল, বিশ্ববরেণ্য মুহাদ্দিস, 'ইংরেজ খেদাও' আন্দোলনের অগ্রসেনানী, মুজাহিদে আজম আল্লামা হুসাইন আহমদ মাদানী রহ.। দেওবন্দে অধ্যয়নরত অবস্থায়ই হযরত আল্লামা আহমদ শফী দা.বা. এই মহা মনীষীর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করত খেলাফত প্রাপ্ত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি তাঁর কাছে বুখারী শরীফের দরস গ্রহণ করেন। এছাড়া শাইখুল আদব হযরত আল্লামা এজায আলী রহ. এর কাছে তিনি তিরমিযী শরীফ ও আবু দাউদ শরীফের দরস গ্রহণ করেন। মুসলিম শরীফ এবং ফুনূনাতে আলিয়ার দরস নেন হযরত মাওলানা ইবরাহীম বলিয়াভী রহ. থেকে। আর ত্বহাবী শরীফ, মুয়াত্তা মুহাম্মদ ও মুয়াত্তা মালেকের দরস গ্রহণ করেন যথাক্রমে মাওলানা মুবারক রহ. মাওলানা জহিরুল হাসান ও মাওলানা জলিল আহমদ থেকে। এছাড়া অপরাপর আসাতিযায়ে কেরাম থেকে অন্য কিতাবাদীর দরস নেন। এই মহা মনীষী লাগাতার চার বৎসর নিরবচ্ছিন্ন মেহনত, মুজাহাদা ও

অধ্যয়ন এবং যুগশ্রেষ্ঠ বুযুর্গ আসাতিযায়ে কেরামের খেদমত ও সবিনয় অনুসরণের মাধ্যমে হাদীস, তাফসীর ও ফিকহ শাস্ত্রসহ গুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয়ে পূর্ণ পাণ্ডিত্য অর্জন করত স্বীয় মুরশিদের ইলমী ও আমলী প্রতিনিধি হয়ে নিজ মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তন করেন।

কর্মজীবন

শিক্ষাজীবন সমাপ্তির পর হযরতুল আল্লাম শাহ আহমদ শফী দা.বা তার পরম শ্রদ্ধাভাজন উস্তাযে মুহতারাম দারুল উলূম মুঈনুল ইসলামের তৎকালীন মুহতামিম আল্লামা শাহ আব্দুল ওয়াহহাব রহ. এর সাক্ষাতে মিলিত হন। তিনি হযরতের প্রখর মেধা, তীক্ষ্ণ বোধশক্তি, সততা, উদারতা, আত্মত্যাগ, ইখলাস, আমল-আখলাক, ইলমী যোগ্যতা ও দায়িত্ব সচেতনতা সম্পর্কে পূর্ব থেকেই অবগত ছিলেন। এছাড়া দীর্ঘদিন পর সাক্ষাত কালে তার বিনয়-নম্রতা, বুদ্ধিদীপ্ত দৃষ্টিভঙ্গি তাকে আরো বিমোহিত করে। ফলে তিনি হযরতকে মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদরাসার শিক্ষক পদে নিয়োগ প্রদান করেন। এখান থেকেই এই মহা মনীষীর বর্ণাঢ্য কর্মজীবনের সূচনা। অতি অল্প সময়েই তার অধ্যাপনার সুখ্যাতি সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। সারাদেশ থেকে ছুটে আসতে শুরু করে ইলম পিপাসী অসংখ্য উলামায়ে কেরাম ও তালেবানে ইলম।

কিতাবী ইলমের পাশাপাশি রুহানী খোরাক অর্জন করতেও তার কাছে ভিড় জমাতে শুরু করে অসংখ্য উলামায়ে কেরাম। এমনভাবেই তার থেকে প্রবাহিত হতে থাকে তালীম ও তাযকিয়া নামের দুটি অমিয় ঝর্ণাধারা।

হিজরী বর্ষপঞ্জিতে তখন ১৪০৭ সাল। দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারীতে তৎকালীন পরিচালক হাফেজ কারী আল্লামা হামেদ সাহেব ইন্তেকাল করেন। এমতাবস্থায় জামিয়ার সর্বোচ্চ মজলিশে শুরার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ক্রমে জামিয়া পরিচালনার গুরু দায়িত্ব অর্পিত হয় বর্তমান স্বনামধন্য মুহতামিম হযরতুল আল্লাম শাহ আহমদ শফী দা.বা. এর উপর। হযরতের সুদক্ষ পরিচালনায় অদ্যাবধি জামিয়া সুচারুরূপে পরিচালিত হয়ে আসছে। জামিয়ায় বর্তমানে অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, ইলমী ও আমলী তথা চতুর্মুখী উন্নয়নের যে জোয়ার প্রবাহমান তাতে হযরতের অবদান অপরিসীম। জামিয়ার ক্রমবর্ধমান উন্নতি-অগ্রগতি হযরতের দায়িত্ব সচেতনতারই পরিচায়ক।

জামিয়ার নজির বিহীন সম্প্রসারণ ও সংস্কারসহ তালেবানে ইলমদের আবাসন সংকট নিরসনে যে সকল ভবন নির্মিত হয়েছে তা হযরতের সফল উদ্যোগ ও নিরলস প্রচেষ্টার ফসল।

তাছাড়া হযরতের সুদক্ষ পরিচালনায় ১৯৯৫ সালে জামিয়া প্রতিষ্ঠার শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে 'শতবার্ষিকী দস্তারবন্দী মহা-সম্মেলন' সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ২০০২ ইং সালে তারই তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয় সপ্তবার্ষিক মহা-সম্মেলন। তাছাড়া হযরতের ইলমী-অনুরাগ ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে জামিয়ার শিক্ষা বিভাগের উচ্চতর কিরাত ও তাজবিদ বিভাগ, উচ্চতর হাদীস গবেষণা বিভাগ, আরবী-বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কম্পিউটার বিভাগ, দারুল মুতালা'আ, মাসিক মুঈনুল ইসলাম এর নিয়মিত প্রকাশনা, মজলিশে ফিকহিল ইসলামী, সাপ্তাহিক মজলিস ও ফাতাওয়ায়ে দারুল উলুমের প্রকাশ চলমান রয়েছে। জামিয়ার সকল ছাত্র-শিক্ষকের জন্য তিনি বটবৃক্ষ-স্বরূপ যা প্রখর রোদের খরতাপে তার আশ্রিতকে শীতল ছায়া প্রদান করে।

ইলমের সুবিস্তীর্ণ খেদমতের পাশাপাশি হযরত সমাজ ও রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামী আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সদা সচেতন। দেশবাসীর মাঝে ধর্মীয় মূল্যবোধ টিকিয়ে রাখেতে তার অবদান অপরিসীম।

বর্তমানে তিনি সর্বোচ্চ উলামা পরিষদ বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ কওমি মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যানের গুরুদায়িত্ব অত্যন্ত সুচারুরূপে পালন করে যাচ্ছেন। ইসলাম ও মুসলমানদের যে কোন ধরনের সমস্যায় তিনি তাদের পাশে দাঁড়াতে কখনও কুণ্ঠাবোধ করেননি। ইসলামী নেতৃবৃন্দকে তিনি সৎপরামর্শসহ নানাভাবে সর্বদা সহযোগিতা করে আসছেন বহু পূর্ব থেকেই।

তার খেদমত শুধু দেশে নয় বরং বিদেশেও তার ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছে। ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, দুবাই, আরব-আমিরাত ও সৌদিআরবসহ সমগ্র বিশ্বে তার ছাত্রসংখ্যা লক্ষাধিক। তার পাণ্ডিত্য ও বিনয়ে বিমুগ্ধ হয়ে হারামাইন শরীফাইন এর ইমামগণ তাকে শায়খ বলে সম্বোধন করে থাকেন। এছাড়াও তিনি ২০০৫ সালে জাতীয় সিরাত কমিটি কর্তৃক 'শ্রেষ্ঠ ইসলামী ব্যক্তিত্ব' হিসাবে ভূষিত হন।

আধ্যাত্মিকতা

যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার নিকট মাকবুল সেই প্রকৃতপক্ষে সফলকাম। যোগ্যতাবলে হয়তো মানুষ দুনিয়ার বুকে কিছু না কিছু যশ ও ধন সম্পদের মালিক হতে পারে। কিন্তু মহান আল্লাহ তায়ালার দরবারে মাকবুল না হলে তাকে সঠিক অর্থে সামগ্রিকভাবে সফল আখ্যায়িত করা যায় না।

আমাদের সকল আঁকাবিরদের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা 'কাবেলিয়্যাত' তথা যোগ্যতা ও 'মাকবুলিয়্যাত' তথা গ্রহণযোগ্যতা অনুপম এই উভয় গুণেরই সন্নিবেশ

ঘটিয়েছিলেন। আর মাকুবলিয়্যাত অর্জনের পূর্ব শর্ত হলো মাকবুল ব্যক্তির সাহচর্য। কারণ 'সঙ্গ গুণে রঙ্গ ধরে'। হযরত মাওলানা শাহ আহমদ শফী দা.বা. এমনই এক ব্যক্তিত্ব যার মধ্যেও পূর্বোক্ত উভয়গুণ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান রয়েছে। হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. এর সোহবত প্রাপ্ত এই আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব নিজ কর্মময় জীবনের হাজারো ব্যস্ততা সত্ত্বেও গড়ে তুলেছেন সমৃদ্ধ আধ্যাত্মিক জগৎ। যাতে তার সাথে রয়েছে তারই সুযোগ্য পাঁচ শতাধিক খুলাফায়ে কেরাম ও অসংখ্য মুরিদ-ভক্ত ও অনুরক্তবৃন্দ। এ সুবাদে দেশের রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে এ উদ্দেশ্যে ইসলাহী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। যাতে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ছুটে আসেন খোদা প্রেমিকদের কাফেলা।

সত্যিকার বলতে হযরতের পবিত্র ব্যক্তি জীবনই হেদায়াতের এক অনুপম দিশা। তার আচার-আচরণ, চলাফেরা, লেনদেন, মুআমালা-মুআশারা, আদব-আখলাক, স্বভাব-চরিত্র, রিয়াজাত-মুজাহাদা, যিকির-আযকারসহ যাবতীয় অবস্থা নববী সুন্নতের আলোকে উদ্ভাসিত ছিল।

রচনাবলী

বহুভাষায় পাণ্ডিত্যের অধিকারী হওয়ায় দেশি-বিদেশি অসংখ্য মানুষ তার লেখনী দ্বারা উপকৃত হচ্ছেন। শীর্ষস্থানীয় হাদীস গ্রন্থ সহীহ আল বুখারীর ব্যাখ্যা-গ্রন্থসহ হাদীস, তাফসীর, আকাঈদ, তাসাওউফ, তাবলীগ ও সমাজ সংস্কার বিষয়কসহ বহু গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন। যা পাঠক ও বিশেষজ্ঞ মহলে বিপুল গ্রহণযোগ্যতায় সমাদৃত হয়েছে। তার রচানবলীর শীর্ষস্থানে রয়েছে,

উর্দু ভাষায়ঃ ১. আল বায়ানুল ফাসিল বাইনাল হক্কি ওয়াল বাতিল ২. আল হুজাজুল কাতিয়াহ লিদাফয়িন নিহাজিল খাতিয়াহ, ৩. আল-খাইরুল কাসীর ফি উসুলীত তাফসীর ৪. ইসলাম ওয়া সিয়াসাত, ৫. ইজহারে হাককীত ৬. ফুয়ূজাতে আহমদিয়া ৭. বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফয়জুল জারী এবং মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ইত্যাদি।

বাংলা ভাষায়ঃ হক ও বাতিলের চিরন্তন দ্বন্ধ ২. ইসলামী অর্থব্যবস্থা ৩. ইসলাম ও রাজনীতি ৪. ইজহারে হাকীকত বা বাস্তব দৃষ্টিতে মওদূদী মতবাদ, ৫. তাকফীরে মুসলিম বা মুসলমানকে কাফের বলার পরিমাণ ৬. সত্যের দিকে করুণ আহবান ৭. ধুমপান কি আশীর্বাদ না অভিশাপ ৮. একটি সন্দেহের অবসান ৯. একটি গুরুত্বপূর্ণ ফতোয়া ১০. তাবলীগ একটি অন্যতম জিহাদ ১১. ইসমতে আম্বিয়া ও

মিয়ারে হক ১২. বায়আতের হাকীকত। এছাড়াও উর্দু এবং বাংলা ভাষায় হযরতের আরো অনেকগুলো মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে।

দেশ ও জাতির এই মহা দুর্যোগে, ইয়াহুদী-নাসারা ও ব্রাক্ষ্মণ্যবাদী, সাম্রাজ্যবাদীদের প্রত্যক্ষ মদদে শাহবাগী নাস্তিক-মুরতাদরা যখন দেশে বাম বা রাম রাজ্য কায়েমের দিবাস্বপ্ন দেখতেছিল। আল্লাহ-রাসূল, নামাজ-রোজাসহ গোটা ইসলামকে ব্যঙ্গ ও কটূক্তি করা শুরু করেছিল। আর সরকারও যেন ছলে-বলে-কৌশলে তাদের কাছে আত্মসমর্পণের নাটক মঞ্চস্থ করে পূর্ণ স্যেকুলার রাষ্ট্র কায়েমের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে শাইখুল ইসলাম মাদানী রা. এর যোগ্য উত্তরসূরি আল্লামা শাইখুল ইসলাম আহমদ শফী দা. বা. হেফাজতে ইসলামের নামে গোটা দেশে একটি ঈমানী পুনর্জাগরণের বিপ্লব সংগঠিত করেছেন। গত ৬ এপ্রিল, ২০১৩ইং ঢাকা অভিমুখে লংমার্চ করে শাপলা চত্বরে বিশ লক্ষাধিক লোকের স্মরণ কালের বৃহত্তম সমাবেশ করেন। উক্ত সমাবেশ হতে ইসলামের পূর্ণ হেফাজতের লক্ষ্যে ঐতিহাসিক ১৩ দফার ঘোষণা দেন এবং এই ১৩ দফা দাবী আদায়ে সারাদেশে বহু বিভাগীয় সম্মেলন ও ৫ই মার্চ ঢাকা অবরোধের ঘোষণা দিয়ে তা বাস্তবায়ন করেন।

ইলম, আমল ও আধ্যাত্মিকতার প্রাণপুরুষ, নববী আদর্শের প্রতিচ্ছবি, বিদগ্ধ আলেমে দ্বীন, যুগশ্রেষ্ঠ বুযুর্গ হযরতুল আল্লাম শাহ্ আহমদ শফী দা.বা. কে পেয়ে গোটা জাতি আজ গৌরবান্বিত। মানবতা ও নীতি-নৈতিকতা অবক্ষয়ের এই যুগে নববী আদর্শে উজ্জীবিত এই সাহসী পুরুষের সমাজ সংস্কারের উদ্যোগে জাতি তার কাছে চির ঋণী। নানা প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলায় ও দোদুল্যমান অবস্থায় সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে উলামায়ে কেরাম তার কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ। আমরা তার বরকতময় ও সুদীর্ঘ জীবন কামনা করি। আমীন।

লেখক: মুহাদ্দিস, জামিয়া দারুল উলূম আল ইসলামিয়া দিলুরোড ঢাকা

রাসূল সা. এর অবমাননার ভয়ানক শাস্তি

মুফতী ইবরাহীম হাসান

পৃথিবীকে ঘোর অমানিশা থেকে মুক্ত করে হিদায়াতী নূরে নূরান্বিত করেছেন যিনি, মানুষের নৈতিক অবক্ষয়ের চরম বিপর্যয় রোধ করে উসওয়াতুন হাসানা'র মাধ্যমে উত্তম জীবনাদর্শ ও অনুপম তাহযীব-তামাদ্দুন প্রতিষ্ঠা করেছেন যিনি, বঞ্চিত ও নিপীড়িত মানবতার মুক্তি সাধন করে সর্বব্যাপী মানবাধিকার সু-প্রতিষ্ঠা করেছেন যিনি, তিনি হলেন বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব, সর্বশেষ নবী ও রাসূল, রাহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ সা.।

সুতরাং বর্তমান সংঘাতপূর্ণ পৃথিবী ও বিপন্ন মানবতাকে বাঁচাতে, বিশেষ করে রক্তাক্ত, অত্যাচারিত ও নির্যাতিত জনপদকে বাঁচাতে হলে, রাসূল সা. কে আল্লাহর পর সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক মর্যাদা প্রদান করে সকল বিতর্কের ঊর্ধ্বে রেখে মানহানিকর কথা ও বক্তব্য থেকে বিরত থেকে তাঁর মহান চরিত্র ও আদর্শের অনুসরণ ও অনুকরণের বিকল্প কোন পথ নেই। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে উক্ত প্রসঙ্গে যৎসামান্য আলোচনার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

নবীজী সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী

আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ সা. কে সারা বিশ্বের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছেন, মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন- হে রাসূল! আমি আপনাকে সমগ্র জগতের জন্য "রহমত" রূপেই প্রেরণ করেছি [সূরা হজ্ব : আয়াত : ১০৭] । তিনি এ বিশ্ব সৃষ্টির ব্যাপারে, এর বিদ্যমান থাকার ব্যাপারে এবং এর বিলীন হওয়ার ব্যাপারে সর্বক্ষেত্রেই রহমত। তেমনিভাবে তিনি মুমিন কাফির, আস্তিক-নাস্তিক সকলের জন্যই রহমত স্বরূপ। হাদীসে কুদসীতে আল্লহ তায়ালা ইরশাদ করেন, হে নবী! যদি আপনাকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য না থাকত, তবে বিশ্ব সৃজন হতো না। এই ভূ-মণ্ডল, নভোমণ্ডল এবং এতদুভয়ের যাবতীয় বস্তুর সৃষ্টি রাসূলে কারীম সা. এর সৃষ্টির বরকতমণ্ডিত। তাঁর নূরে রহমত বর্ষিত করেই এ সবকিছু সৃষ্টি করা হয়েছে। সর্বপ্রথম মহান আল্লাহ মহানবী সা. এর নূরকে সৃষ্টি করেন। [মুসান্নাফু আবদির রাজ্জাক] তারপর সেই নূরকে কেন্দ্র করে অন্যান্য সকল কিছু, তথা আসমান, জমিন, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, আলো-বাতাস, সমস্ত জীন-ইনসান, এক কথায় সমগ্র জগতের সৃষ্টি হয়। [ইবনে আসাকির]। ঊর্ধ্বজগতে হযরত আদম আ. এর আবির্ভাবের অনেক আগেই প্রিয় নবী সা. এর নবুওয়াতের

মাধ্যমে নবুওয়াতের ধারাবাহিকতার সূচনা হয় এবং তাঁর দ্বারাই পৃথিবীতে নবী আগমনের সমাপ্তি ঘটে। রাসূলে কারীম সা. ইরশাদ করেছেন- “আমি নবী রাসূলগণের প্রথম এবং নবী-রাসূলগণের শেষ। এতে আমার কোন গর্ব নেই।” অর্থাৎ সৃষ্টির ব্যাপারে নবীদের মধ্যে আমি সর্বপ্রথম। আর আবির্ভাবের ব্যাপারে আমি সবার শেষে। সুতরাং তিনি বিশ্ব জগতের প্রতিটি বস্তুর সৃষ্টির ক্ষেত্রে রহমত।

হাদীস শরীফের বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, দুনিয়া চলার কুদরতী ব্যবস্থাপনা ততদিন অব্যাহত থাকবে যতদিন আল্লাহ তায়ালার ইবাদত ও যিকির আযকার দুনিয়াতে বিদ্যমান থাকবে। যে দিন দুনিয়াতে একজন মানুষও আল্লাহর নাম নেয়ার মতো থাকবে না, সেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে। [মুসলিম শরীফ] দুনিয়ার বুকে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী ও যিকির-আযকার বিদ্যমান রয়েছে রাসূলে কারীম সা. এর দ্বীনী দাওয়াত ও মেহনতের বদৌলতে। তিনি কাফিরদের অসহনীয় জুলুম-অত্যাচার সহ্য করে দ্বীনের প্রচার কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। তারই ফলশ্রুতিতে সে সময় হাজার হাজার মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেন। তাদের মাধ্যমে দাওয়াতের সিলসিলায় লক্ষ-কোটি মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সেই ধারায় ইসলাম আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে। আর বিশ্বের আনাচে-কানাচে ইসলাম পৌঁছে সর্বত্র আল্লাহর যিকির জারী রয়েছে। সুতরাং বিশ্বজগত বিদ্যমান থাকার ক্ষেত্রেও রাসূলুল্লাহ সা. রহমত।

রাসূল সা. ছিলেন সৃষ্টির সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বশ্রেষ্ঠ নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী। রাসূলের সা. চরিত্র সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন- “হে নবী। নিঃসন্দেহে আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী [সূরা কলমঃ ৪] রাসূল সা. এর আদর্শই একমাত্র অনুকরণীয়, অন্যসব আদর্শ ও মতবাদ বাতিল, এ মর্মে আল কুরআনে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে-“নিশ্চয় তোমাদের জন্যে মহানবী সা.-এর জীবনে রয়েছে মহান আদর্শ।” [আহযাবঃ ২১] আর এই আদর্শকে বিশ্ববাসীর সম্মুখে তুলে ধরার বাস্তব ব্যবস্থা করেছেন আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন। বর্ণনা করেছেন মহানবী সা. এর গুণাবলী, দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং তাঁর পদমর্যাদার কথা। উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত আয়াতে “উসওয়াতুন হাসানা” শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে-উত্তম নমুনা- মহান আদর্শ, সমগ্র কুরআনে বহু নবী-রাসূলের আলোচনা এবং বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে, তবে সকল নবীর জীবনকে সর্বকালের মানুষের জন্য পরিপূর্ণ আদর্শরূপে ঘোষণা করা হয়নি। যেহেতু মহানবী সা. শেষ নবী, নবুওয়াত ও রেসালাতের যাবতীয় গুণাবলী পরিপূর্ণতা লাভ করেছে মহানবী সা.এর মধ্যে। তাই তাঁর যামানা থেকে কেয়ামত পর্যন্ত সমগ্র বিশ্ববাসীর নিকট মহানবী সা. ই একমাত্র আদর্শ।

রাসূল সা. খাতামুন নাবিইয়ীন, অর্থাৎ নবুওয়াতের পরিসমাপ্তি। কোন জিনিসের পরিসমাপ্তির অর্থ হলো তাকে তার সর্বশেষ সীমায় পৌঁছিয়ে দেয়া যেন এরপর আর কোন স্তর অবশিষ্ট না থাকে। অতএব, খতমে নবুওয়াতের অর্থ এই যে, নবুওয়াত তার সর্বশেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে, এরপর আর কোন স্তর অবশিষ্ট রয়নি। যেহেতু মহানবী সা. খাতামুন নাবিইয়ীন। তাই দুনিয়ার সকল নবীর সকল গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন তিনি একা, আর কেয়ামত পর্যন্ত এই পর্যায়ে যত গুণের প্রয়োজন হবে সেগুলোর বিপুল সমাবেশও ঘটেছিল মহানবী সা. এর মধ্যে।

রাসূল সা. সিরাজাম মুনীরা বা উজ্জ্বল প্রদীপ। প্রিয় নবী হযরত রাসূলে কারীম সা. কে উজ্জ্বল প্রদীপ বলার তাৎপর্য এই যে, আমরা দেখি একটি প্রদীপ থেকে আরও অগণিত প্রদীপ প্রজ্বলিত হয়, এমনভাবে প্রিয় নবী সা. হেদায়াতের যে আলো বহন করে এনেছেন এবং বিতরণ করেছেন তা এত ব্যাপক যে কেয়ামত পর্যন্ত হেদায়েতের এই আলো বিতরণ করা হবে এবং অগণিত আলোর সন্ধানী এই প্রদীপ থেকে আলো আহরণ করবে। বস্তুত বিগত দেড় হাজার বছর যাবত এই বিশ্বের বুকে জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে যে সাধনা অব্যাহত রয়েছে, তার অধিকাংশই প্রিয় নবী সা. কে কেন্দ্র করে। তিনি নিজেই ইরশাদ করেছেন, আদি ও অন্তের জ্ঞান আমিই প্রাপ্ত হয়েছি।

মূলত যেভাবে সূর্য ভুবন উজ্জ্বলকারী এবং সারা বিশ্বে আলো বিকিরণের দায়িত্ব তার প্রতি অর্পিত, ঠিক তেমনিভাবে প্রিয় নবী সা. সমগ্র বিশ্ববাসীর নিকট প্রেরিত এবং সমগ্র বিশ্ববাসীর নিকট হেদায়েতের আলো পৌঁছানোর দায়িত্বও তাঁর প্রতি অর্পিত। পবিত্র কুরআনেই রয়েছে এর ঘোষণা। ইরশাদ হয়েছে, হে নবী আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্বমানবের জন্যে সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছি। পবিত্র কুরআনে আরো ইরশাদ হয়েছে, হে রাসূল! আপনি ঘোষণা করুন, হে বিশ্ববাসী! আমি তোমাদের সকলের নিকট আল্লাহ পাকের প্রেরিত রাসূল। এমনভাবে রাসূল সা. এর মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে সমাসীন হওয়ার অসংখ্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

রাসূলে কারীম সা. এর বিশেষ একটি মর্যাদা হলো, কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তায়ালা যত নবীকে ডাক দিয়েছেন তাঁদের নাম ধরেই ডাক দিয়েছেন। যেমন- ইয়া আদম, ইয়া ইবরাহীম, ইয়া মুসা, ইয়া নুহ, কিন্তু রাসূলে কারীম সা. কে পুরো কুরআনে কোথাও ইয়া মুহাম্মাদ বলে নাম ধরে ডাকা হয়নি। তাঁকে ইয়া আইয়ুহান নাবিয়্যু, ইয়া আইয়ুহার রাসূল ইত্যাদি বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

আখিরাতে রাসূলুল্লাহ সা. অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবেন। এ প্রসঙ্গে রাসূলে কারীম সা. ইরশাদ করেন, আমি কিয়ামত দিবসে আদম সন্তানদের সর্দার। এতে

আমার কোনো অহংকার নেই। তিনি আরো ইরশাদ করেন- "কিয়ামতের দিন আমিই সর্বপ্রথম কবর থেকে উঠে আসবো- যখন জমিন বিদীর্ণ হবে। এতে আমার কোনো অহংকার নেই। তিনি আরো বলেন, আমিই প্রথম সুপারিশকারী এবং আমার সুপারিশই সর্বপ্রথম কবুল করা হবে। এতে আমার কোনো গর্ব নেই। [সহীহ মুসলিম] তিনি আরো বলেন, মাকামে মাহমুদ (বেহেশতের বিশেষ সম্মানিত ও প্রশংসিত স্থান) কেবলমাত্র এক ব্যক্তিই লাভ করবে। আশা করি, আমিই হবো সেই ব্যক্তি। [তিরমিযী] এমনভাবে আরো অনেক হাদীসে নবীজী সা. সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী হওয়ার বিষয় উল্লেখ রয়েছে।

রাসূল সা. যেহেতু উপরোক্ত কারণে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী, আল্লাহর পরেই তাঁর মর্যাদার স্থান, তাই নবীজীকে আল্লাহ তায়ালার পরে সর্বাপেক্ষা বেশী মহব্বত করতে হবে, ভালবাসতে হবে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, নবী মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর। [আহযাবঃ ৬] অর্থাৎ নবী প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি সমগ্র দুনিয়াবাসী থেকে অধিক দয়ালু। সুতরাং প্রত্যেক মুমিনের মধ্যে রাসূল সা. এর ভালোবাসা সর্বাপেক্ষা অধিক হতে হবে। যেমনটি হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, তোমাদের কেউ ততক্ষণ পূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ তার অন্তরে আমার ভালোবাসা আপন পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে ও সকল মানুষ অপেক্ষা অধিক না হবে। [বুখারী, মুসলিম]

পবিত্র কুরআনে প্রিয় নবী সা. এর আদব রক্ষা করার নিমিত্তে, আদেশ প্রদান করা হয়েছে যে, কোন অবস্থাতেই যেন রাসূলুল্লাহ সা. এর দরবারে উচ্চস্বরে কথা না বলা হয়। ইরশাদ হয়েছে, হে মুমিনগণ! প্রিয় নবী সা. এর সম্মুখে উচ্চস্বরে কথা বলো না। [হুজুরাতঃ ২] এমনিভাবে নবীজী সা. এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, যেন তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তাঁকে সাহায্য কর এবং তাঁর সম্মান কর, তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর। [সূরা ফাতাহঃ ৯]

পবিত্র কুরআন একথাও ঘোষণা করেছে, যদি তাঁর প্রতি আদব ও সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে কোন প্রকারের ত্রুটি হয়, তাহলে জীবনের যাবতীয় সৎ কাজ বাতিল বলে গণ্য হবে। কুরআনের ভাষায়, তোমরা আল্লাহর রাসূলকে এভাবে ডাক দিও না, যেভাবে একে অন্যকে ডাক দিয়ে থাকে, এতে তোমাদের যাবতীয় সৎকাজ বাতিল হয়ে যাবে, অথচ তোমরা কিছুই জানতে পারবে না। [হুজরাতঃ ২] দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানে তাঁর মর্তবার কথা কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে।

রাসূল সা. কে অবমাননা করা ও কষ্ট দেওয়ার ভয়াবহ শাস্তি

যারা আল্লাহর রাসূল সা. কে কোন প্রকার কষ্ট দিবে, অবমাননাকর মন্তব্য করবে। তাদের জন্য কঠোর শাস্তির ওয়াদা রয়েছে। পবিত্র কুরআনের ইরশাদ, নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও রাসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত করেন এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। [আহযাব : ৫৭] উক্ত আয়াতের আলোকে তাফসীরে মাআরিফুল কুরআনে উল্লেখ আছে, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সা. কে কোন প্রকার কষ্ট দিবে, তাঁর ব্যক্তিত্ব বা গুণাবলী ও চরিত্রে কোন দোষত্রুটি বের করবে, সরাসরি বা ইঙ্গিতে তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে। সে দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর অভিশাপে নিপতিত হবে।

রাসূল সা. কে অবমাননাকারী কতিপয় অভিশপ্ত

কা'ব ইবনে আশরাফকে হত্যাঃ হযরত কা'ব ইবনে মালিক রা. বর্ণনা করেন, কাব ইবনে আশরাফ বড় উঁচু মাপের কবি ছিল। রাসূলুল্লাহ সা. এর বিরুদ্ধে কুৎসামাখা কবিতা রচনা করত। সে কবিতার মাধ্যমে কাফেরদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে উদ্বুদ্ধ করত। মুসলমানদেরকে নানাভাবে কষ্ট প্রদান করত। রাসূলুল্লাহ সা. তার অত্যাচারের জবাবে নীরবে ধৈর্যধারণ ও নীরবতা অবলম্বনের আদেশ দিতেন। কিন্তু যখন তার দুষ্টুমির মাত্রা অত্যধিক বেড়ে গেল এবং ধৈর্যধারণের সীমা অতিক্রম করে গেল তখন তিনি তাকে হত্যার আদেশ প্রদান করেন। অতঃপর মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা তাকে হত্যা করেন। উল্লেখ্য যে, ক'াব ইবনে আশরাফকে যে সকল কারণে হত্যার নির্দেশ দেয়া হয় তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সা. এর প্রতি অশালীন ও অশোভন বাক্য প্রয়োগ, তাঁর বিরুদ্ধে নিন্দা ও কুৎসাপূর্ণ কবিতা প্রণয়ন এবং তাঁর শানে বেয়াদবীপূর্ণ নোংরা ভাষার ব্যবহার। [সীরাতে মুস্তফা]

আবু রাফে-এর নিধনঃ আবু রাফে ছিল বেশ সম্পদশালী ইয়াহুদী ব্যবসায়ী। তার প্রকৃত নাম ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে আবিল হুকাইফ, খায়বারের নিকটে এক দুর্গে সে বসবাস করত। নবী কারীম সা. এর ঘোরতর শত্রু ছিল। হুযুর সা. এবং মুসলমানদেরকে নানাভাবে নির্যাতন ও উৎপীড়ন করত। আবু রা'ফে ছিল কা'ব ইবনে আশরাফের ইসলাম বিরোধী সকল কাজে সহযোগী ও একান্ত সহচর। নবীজী সা. এর নির্দেশে তাকেও আব্দুল্লাহ ইবনে আতীকের নেতৃত্বে সাহাবায়ে কেরামের ছোট একটি জামাত কৌশলে হত্যা করে। [সীরাতে মুস্তফা]

জনৈক ব্যক্তির বেয়াদবির পরিণামঃ হযরত সলিমাহ বিন আকওয়া রা. সূত্রে বর্ণিত, এক ব্যক্তি হুজুর সা. এর সামনে বাম হাতে খাবার খাচ্ছেন। নবীজী তাকে সতর্ক

করতে গিয়ে বললেন, ডান হাতে খাও। হুজুর সা. এর এ নির্দেশ শুনে ঐ ব্যক্তি উত্তরে বলল, আমি ডান হাতে খেতে পারি না। সে অহংকারবশত এ উত্তর দিয়েছিল। উত্তরে হুজুর সা. বললেন। ভবিষ্যতে তুমি কখনও ডান হাতে খেতে পারবে না। নবীজীর সাথে তার এ বেয়াদবির পরিণাম এই ছিল যে এরপর বাকী জীবন তার ডান হাত মুখ পর্যন্ত উঠাতে পারেনি। [মুসলিম শরীফ]

পরিশেষে বলতে হয়, রাসূল সা. কে যথাযথ মর্যাদা প্রদান করত পরিপূর্ণভাবে মেনে চলতে যদি আমরা ব্যর্থ হই, তাহলে পার্থিব জীবনে যেমন রয়েছে লাঞ্ছনা, তেমনি আখিরাতের জীবনেও রয়েছে ভয়ানক শাস্তি। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, সেদিন (কিয়ামতের ময়দানে) জালিমরা হাত কামড়াতে কামড়াতে বলবে- হায় আফসোস! কতই না ভালো হতো যদি আমরা রাসূলের সা. অনুগত হয়ে তাঁর দেখানো পথে চলতাম।"। [ফুরকান-২৭] অতএব, আসুন ইসলামের মর্যাদা সমুন্নত রাখি ও নাস্তিক ব্লগারদের আল্লাহ, রাসূল ও ইসলাম সম্পর্কে অবমাননাকর সকল বক্তব্য ও পদক্ষেপ ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ করি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন।

লেখক: মুহাদ্দিস, জামিয়া দারুল উলূম আল ইসলামিয়া দিলুরোড ঢাকা

কিছু প্রয়োজনীয় মাসায়িল

মাওলানা আবু সায়েম

মৃত ব্যক্তির সাতদিনা, একুইশা ও চল্লিশা পালন

প্রশ্নঃ আমাদের এলাকায় মৃতের রুহের মাগফিরাত কামনার উদ্দেশ্যে তিনদিনা, সাতদিনা, একুইশা ও চল্লিশা ইত্যাদি তারিখে কুরআন খতম, মিলাদ ও দোয়ার অনুষ্ঠান করা হয় এবং তদ-সঙ্গে জাঁক-জমকভাবে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়, যা বাহ্যিক দৃষ্টিতে দৃষ্টিপাত করলে বুঝা যায় না যে, রুহের মাগফিরাত না বিবাহের অনুষ্ঠান। এ ধরনের অনুষ্ঠানে আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, গ্রামবাসী ও এলাকার বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিবর্গ, যেমন চেয়ারম্যান, মেম্বার পার্টির নেতাসহ সবাইকে দাওয়াত করা হয়। এমনকি অনুষ্ঠানের দিন-ক্ষণ পর্যন্ত পেপারিং করা হয়। যা আমাদের আঞ্চলিক ভাষায় তামদারী, মজলিস, বেপার, ফয়তা মিদুনী ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। যে এলাকাতে যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন, উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন।

এক শ্রেণীর আলেম এ ধরনের অনুষ্ঠানগুলো যথারীতি করে যাচ্ছেন। আরেক শ্রেণীর আলেম এ ব্যাপারে চুপ, ভাল-মন্দ কিছুই বলেন না। আরেক শ্রেণীর আলেম এই অনুষ্ঠানগুলোকে বিদআত এবং নাজায়েয বলে থাকেন। এতে আম সাধারণ বিভ্রান্ত হচ্ছে। কোনটা সঠিক আর কোনটা ভুল পার্থক্য করতে পারছে না। মুফতীয়ানে কেরাম ও উলামায়ে কেরামের নিকট নিবেদন এই যে, উল্লেখিত প্রশ্নে যে পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে তা শরীয়ত-সম্মত কিনা? এবং সঠিক পদ্ধতি কোনটা তা জানালে আমরা বিভ্রান্তির বেড়াজাল হতে বাহির হয়ে সঠিক পদ্ধতি জেনে আমল করার জন্য সচেষ্ট থাকব।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তির মাগফিরাতের জন্য দোয়া করা এবং বিভিন্ন নফল ইবাদত যেমন, দান-সদকা, তাসবীহ-তাহলীল, কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি করে তার সওয়াব মৃতকে পৌঁছানো গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল। যা হাদীস শরীফের বহু দলীল দ্বারা প্রমাণিত। তবে এটি একটি ব্যক্তিগত আমল। কোন দিন-তারিখ ও আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই যখন ইচ্ছা তখনই এ আমল করা যায়। কিন্তু বর্তমানে এই সহজ আমলটিকে আনুষ্ঠানিক রূপ দান করে অনেক ক্ষেত্রেই তাকে সওয়াবের পরিবর্তে গুনাহের কাজে রূপান্তর করা হয়ে থাকে।

এক. তিনদিনা, সাতদিনা, একুইশা, চল্লিশা এ সকল নামে এ অনুষ্ঠান যথাক্রমে মৃত্যুর ৩য়, ৭ম, ২১ ও ৪০ তম তারিখে করাকে জরুরী মনে করা হয়। বা

কমপক্ষে এরূপ ধারণা রাখা হয় যে, এ তারিখগুলোর বিশেষত্ব রয়েছে। অথচ শরয়ী দলীল প্রমাণ ছাড়া বিশেষ দিন-তারিখকে নির্ধারণ করে নেওয়া বিদআত ও নাজায়েয।

দুই. ঈসালে সওয়াবের প্রচলিত এ পন্থায় আরেকটি বড় আপত্তিকর দিক হল এই যে, এতে যিয়াফত তথা আড়ম্বরপূর্ণ দাওয়াত অনুষ্ঠানকেই ঈসালে সওয়াবের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। অথচ শরীয়তে আনন্দের মুহূর্তে যিয়াফত আয়োজনের কথা আছে মুসিবতের মুহূর্তে নয়। হাদীস শরীফে এসেছে, হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ আল-বাজালী রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«كُنَّا نَعُدُّ الاجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنِيعَةَ الطَّعَامِ بَعْدَ دَفْنِهِ مِنَ النِّيَاحَةِ»

(أخرجه أحمد برقم ٦٩٠٥، وابن ماجه في سننه برقم ١٦١٢، والطبراني في المعجم الكبير برقم ٢٢٧٩، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ٥٣/٢: هَذَا إِسْنَاد صَحِيح رجال الطَّرِيق الأولى على شَرط البُخَارِيّ وَالطَّرِيق الثَّانِيَة على شَرط مُسلم)

অর্থঃ আমরা (সাহাবীগণ) দাফনের পর মৃতকে কেন্দ্র করে সমবেত হওয়া ও খাবারের আয়োজন করাকে 'বিলাপ' বলে গণ্য করতাম [মুসনাদে আহমাদ, হাদীসঃ ৫৯০৪, ইবনে মাজাহ, হাদীসঃ ১৬১২]। আর 'বিলাপ' করা শরীয়তে বড় ধরনের গর্হিত একটি কাজ।

কোন দিন-তারিখ নির্ধারণ না করে গরীব-মিসকিনদেরকে খাবার খাওয়ানোও ঈসালে সওয়াবের একটি বৈধ পন্থা। কিন্তু এমন যিয়াফতের আয়োজন করা যাতে সমাজের নেতৃস্থানীয় ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদেরকে প্রাধান্য দেওয়া হয় এটি আদৌ ঈসালে সওয়াবের গ্রহণযোগ্য পন্থা নয় ।

তিন. হাফেজদের দ্বারা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কুরআন খতম করা হয়। অথচ এ ক্ষেত্রে কুরআন পড়ার বিনিময় দেওয়া-নেওয়া নাজায়েয ।

চার. অনেক ক্ষেত্রেই এর ব্যয়ভার নির্বাহ করা হয় মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া এজমালি সম্পদ থেকে, ওয়ারিশদের মাঝে কোন নাবালেগ থাকলেও তার সম্পদ বাদ দেওয়া হয় না। অথচ নাবালেগের সম্পদ তার অনুমতি নিয়েও খরচ করা নাজায়েয। তেমনি বালেগ ওয়ারিশদের ক্ষেত্রেও এটা লক্ষ রাখা হয় না যে, তাদের স্বতঃস্ফূর্ত অনুমতি আছে কিনা ।

পাঁচ. এ ধরনের অনুষ্ঠান অনেক ক্ষেত্রেই লোক দেখানোর জন্য বা সামাজিক রেওয়াজে প্রভাবিত হয়ে করা হয়। এটাও নাজায়েয।

শরীয়ত-বিরোধী এ জাতীয় আরও কর্মকাণ্ড এসব অনুষ্ঠানে হয়ে থাকে। ফলে এর দ্বারা মৃত ব্যক্তির উপকার হওয়া তো দূরের কথা, উল্টো ব্যবস্থাকারীগণ গুনাহের ভাগী হয় ।

সুতরাং ঈসালে সওয়াবের প্রশ্নোক্ত পন্থা সম্পূর্ণরূপে পরিহারযোগ্য। মৃতের মাগফিরাত কামনা ও তাকে সওয়াব পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগতভাবে দান-সদকা, কুরআন তেলাওয়াত, জিকির-আজকার ও নফল ইবাদত করে মৃতের জন্য এসবের সওয়াব পৌঁছে দেওয়া উচিত এবং নির্দিষ্ট কোন দিন-তারিখের অপেক্ষা না করে নিজ নিজ তাওফিক অনুযায়ী এগুলো মাঝে মধ্যেই করা দরকার ।

[আরও দেখুনঃ মুসনাদে আহমাদ, হাদীসঃ ১৫৫২৯; মুসনাদুল বাযযার, হাদীসঃ ২৩২০; রাদ্দুল মুহতার ২/২৪০; বাযযাযিয়া ১/৮১]

সুন্নতে খতনা অনুষ্ঠান পালন

প্রশ্নঃ আমাদের সমাজে বাচ্চাদের খতনা উপলক্ষে লোকজনদেরকে দাওয়াত করে খাওয়ানোর প্রচলন আছে। এ প্রচলনটি কতটুকু শরীয়ত-সম্মত? এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের আমল কী ছিল? মাযহাব চতুষ্টয়ে এ অনুষ্ঠানকে কেউ অবৈধ বলেছেন কিনা? যদি কেউ এই অনুষ্ঠান করে বা তাতে অংশগ্রহণ করে তাহলে তার গুনাহ হবে কি না? সঠিক তথ্যসহ সবিস্তারে জানানোর অনুরোধ রইল ।

উত্তরঃ খতনা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত। এ হুকুমকে কেন্দ্র করে খানা বা দাওয়াতের আয়োজন করা শরীয়তের কোন বিধান নয়। এতে ভিন্ন কোন সওয়াবও নেই। এটি অন্যান্য সাধারণ দাওয়াতের মতই একটি দাওয়াত। আর মানুষকে খাবার খাওয়ানো একটি প্রশংসনীয় বিষয়, যদি তা হয় শরীয়তের গণ্ডির ভিতর থেকে। কিন্তু বর্তমানে এ প্রশংসনীয় কাজটির সাথে বিভিন্ন মনগড়া ও শরিয়ত-বিরোধী রসম-রেওয়াজ সংশ্লিষ্ট করে এটিকে বরবাদ করে দেওয়া হয়েছে ।

আজকাল এ ধরনের দাওয়াতের যারা ব্যবস্থা করে থাকে তাদের অনেকেরই উদ্দেশ্য থাকে আমন্ত্রিত মেহমানদের থেকে বেশির থেকে বেশি উপঢৌকন লাভ করা। আবার অনেকে দাওয়াত করাকে জরুরী ভেবে বা সামাজিকতা রক্ষার চাপে নিজের সামর্থ্য না থাকা সত্ত্বেও ধার-কর্য করে দাওয়াতের ব্যবস্থা করে থাকে। এ ছাড়া সাধারণত এ ধরনের দাওয়াতি অনুষ্ঠানে বেপর্দাবস্থায় গায়রে মাহরাম নারী-পুরুষদের সমবেত হওয়া, ছবি তোলা, বেপর্দা মহিলাদের ভিডিও করা, গান-বাদ্য করা ও সময় অপচয়ের মত কবিরা গুনাহসমূহ তো হতেই দেখা যায় ।

যদি উপরোক্ত গর্হিত ও শরীয়ত-বিবর্জিত কর্মকাণ্ড থেকে বেঁচে থেকে এবং পৃথক কোন সুন্নত বা মুস্তাহাব আমল মনে না করে খতনার পর দাওয়াতের আয়োজন করা হয়, তবে সেটি নাজায়েয হবে না। এটিই মাজহাব চতুষ্টয়ের মতামত। কোন কোন সাহাবী থেকে এ ধরনের দাওয়াত খাওয়ানোর বর্ণনা হাদীসে রয়েছে। তবে এ দাওয়াতকে বড় অনুষ্ঠানের রূপ দিয়ে এত ব্যাপক করা যাবে না যে, অন্যরা একে জরুরী ভাবে বা কেউ না করলে তাকে মন্দ ভাবে। বিশেষকরে সমাজের অনুকরণীয় ব্যক্তি-বর্গদেরকে এ বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে।

أخرج الإمام البخاري في الأدب المفرد في باب الدعوة في الختان برقم ١٢٤٦: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ قَالَ: خَتَنَنِي ابْنُ عُمَرَ أَنَا وَنُعَيْمًا، فَذَبَحَ عَلَيْنَا كَبْشًا، فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَإِنَّا لَنَجْذَلُ بِهِ عَلَى الصِّبْيَانِ أَنْ ذَبَحَ عَنَّا كَبْشًا. وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ١٧١٧٠ في باب من كان يطعم في العرس والختان. وإسناده حسن.

وأخرج الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ١٧١٦٦ في الباب المذكور : عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ «يُطْعِمُ عَلَى خِتَانِ الصِّبْيَانِ». وذكره ابن عبد البر أيضا في الاستذكار ٣٥٤/١٦، وإسناده حسن.

وأخرج الإمام أحمد في مسنده برقم ١٧٩٠٨ : عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: دُعِيَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ إِلَى خِتَانٍ، فَأَبَى أَنْ يُجِيبَ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: «إِنَّا كُنَّا لَا نَأْتِي الْخِتَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نُدْعَى لَهُ». وفي هامش المسند للشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف، لكن في هامش المسند للشيخ أحمد شاكر : إسناده حسن.

وأخرج الطبراني في الأوسط برقم ٣٩٤٨ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «الْوَلِيمَةُ حَقٌّ وَسُنَّةٌ فَمَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَالْخُرْسُ وَالْإِعْذَارُ وَالتَّوْكِيرُ أَنْتَ فِيهِ بِالْخِيَارِ» قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي وَاللَّهِ لَا أَدْرِي مَا الْخُرْسُ وَالْإِعْذَارُ وَالتَّوْكِيرُ؟ قَالَ: «الْخُرْسُ: الْوِلَادَةُ، وَالْإِعْذَارُ: الْخِتَانُ، وَالتَّوْكِيرُ: الرَّجُلُ يَبْنِي الدَّارَ، وَيَنْزِلُ فِي الْقَوْمِ فَيَجْعَلُ الطَّعَامَ، فَيَدْعُوهُمْ، فَهُمْ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءُوا أَجَابُوا، وَإِنْ شَاءُوا قَعَدُوا». ذكره الحافظ في فتح الباري ١٣٨/٩، ١٥٠/٩ وقال فيه : ظاهر سياقه

الرفع و يحتمل الوقف. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٨٠/٤ : قلْتُ: فِي الصَّحِيحِ طَرَفٌ مِنْهُ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ التَّيْمِيُّ وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ، وَغَيْرُهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ. و في هامش مجمع البحرين ٣٢٦/٣: إسناده ضعيف لضعف يحيى.

و أخرج البيهقي في سننه ٢٦٨/٧: " عن أبي مسعود أن رجلا صنع طعاما، فدعاه، فقال: أ في البيت صورة؟ قال: نعم، فأبى أن يدخل حتى تكسر الصورة." قال الحافظ في فتح الباري ١٥٨/٩: و سنده صحيح. و فيه قال ابن بطال : فيه أنه لا يجوز الدخول في الدعوة يكون فيها منكر مما نهى الله ورسوله عنه.

أقول -العبد الراقم -: قد اتَّضَحَ من النُّصوص المذكورةِ : أن الصَّحابةَ رضي الله عنهم كانوا يَعدُّوْنَ الدعوةَ في الخِتان من الأمور المُباحَةِ الْمُخَيَّرةِ، التي لا يُكرَهُ تركُها، ولايُسْتَحبُّ فِعلُها، بشرطِ التَّخلِّيْ عن البِدَعِ والمُنْكراتِ، كما هو مُصرَّحٌ به في حديث أبيْ هريرة، ولذا قام بهَا بعضٌ منهم كابن عُمرَ رضي الله عنهما، ورَفَضَهَا بعضٌ، كعُثمانَ بن أبي العَاص رضي الله عنه، و به قَال الفُقَهَاءُ المالكيَّةُ والحَنَفيَّةُ، وأمَّا الشافعيَّةُ والحَنابِلة، فقالوا بالاسْتِحْبابِ كما يَبْدو ذلك من المراجِع التَّالِية:

[দেখুন, মালিকী মাযহাব: মাওয়াহিবুল জালিল ৫/২৪২; আয্-যখীরা 8/8৫০; হানাফী মাযহাব: খুলাসাতুল ফাতাওয়া 8/৩৫৮; বায্-যাযিয়া ৩/৩৬8; হিন্দিয়া ৫/৩8৩; ইলাউস সুনান ১১/১৩; রদ্দুল মুহতার ৬/৩8৭; হাম্বলী মাযহাব: আল মুগনী ১০/২০৭; আল কাফী ৩/১২০; আশ শরহুল কাবীর 8/৩৩৯; আল ইনসাফ ৮/৩২০; শাফিয়ী মাযহাব: আল মাজমূ ১৮/৭৫; আল মিনহাজ ৯/২৩৩; হাশিয়াতুশ শিরওয়ানী আলা তুহফাতিল মুহতায ৯/88৯; মুখতাসারুল মুযানী ৫/২৮২; রাওযাতুত তালিবীন ৭/৩৩২; মুগনিল মুহতায ৩/৩১১; যাদুল মুহতায ৩/৩১২; আল ফিকহুল আম: মুহাল্লা ৯/২৩; ফিকহুস সুন্নাহ ২/৫৬২; আল মাদখাল ৩/২৯২; মাজমুআতুল ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়া ৩২/২০৬; উলামায়ে হিন্দের মতামত: ইসলাহুর রুসুম ৬২; ইমদাদুল ফাতাওয়া 8/২৩৯; কিফায়াতুল মুফতী ৯/৭৩, ৬৫, ৮8, ৮৫; মাহমুদিয়া ১১/৩8২; ইমদাদুল মুফতীন ২০১-২০২; খাইরুল ফাতাওয়া ৫৫8; ফাতাওয়া উসমানী ১২০; আহসানুল ফাতাওয়া ৮/১৫৫]

ডাক্তারদের জন্য ফিজিশিয়ান সেম্বল (**Physician Symbol**) গ্রহণ ও বিক্রয়

প্রশ্নঃ যথাবিহিত সম্মান-পূর্বক আরজ এই যে, আমি একজন ঔষধ ব্যবসায়ী আমি দীর্ঘদিন যাবত বিভিন্ন অভিজ্ঞ ডাক্তারদের সংস্পর্শে থেকে ঔষধ বিক্রয়ের পাশাপাশি অনেক বিষয়ের পারদর্শিতা অর্জন করেছি। যার ফলে অনেক সাধারণ গ্রাম্য ব্যক্তিরা আমার নিকট হতে ঔষধ নিয়ে যায়। বিভিন্ন ঔষধ কোম্পানির নিয়ম হল, ঔষধের বিক্রয় বৃদ্ধি করার জন্য ডাক্তারদেরকে বিনামূল্যে কিছু ঔষধ দিয়ে থাকে। যে কোম্পানি ডাক্তারকে বিনামূল্যের ঔষধ বেশি প্রদান করে ডাক্তার ব্যবস্থাপত্রে ঐ কোম্পানির ঔষধ লিখে দেয়।

প্রশ্ন হল, কোন কোম্পানি যদি বিনামূল্যের ঔষধগুলো এমন ব্যক্তিকে দেয় যে ডাক্তারের পাশাপাশি ঔষধও বিক্রয় করে, যাতে কোম্পানির ঔষধ বেশি বিক্রয় হয় এবং তাদের লক্ষ্যমাত্রাও পূর্ণ হয়। তাহলে এ বিনামূল্যের ঔষধ নেওয়া শরীয়ত-সম্মত হবে কিনা?

উত্তরঃ ডাক্তারদের কর্তব্য হল, রোগীর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তার জন্য সর্বাধিক উপযোগী ঔষধ নির্বাচন করা। এক্ষেত্রে ডাক্তারের সর্বোচ্চ বুদ্ধি-বিবেচনা অনুযায়ী রোগীর জন্য যে কোম্পানির ঔষধ অধিক উপযোগী মনে হবে তাই ব্যবস্থাপত্রে লিখা। কিন্তু কোন কিছুর বিনিময়ে কোন নির্ধারিত কোম্পানির ঔষধ প্রেসক্রিপশন করার চুক্তি নাজায়েয এবং এধরনের চুক্তি করে কোন কিছু গ্রহণ করা ডাক্তারদের জন্য উৎকোচের শামিল। চাই তা ফিজিশিয়ান সেম্বলের নামেই হোক না কেন। আর এ কথা বলাই বাহুল্য যে, কোন কোম্পানির ঔষধ রোগীর জন্য অনুপযোগী হওয়া সত্ত্বেও তা প্রদান করা রোগীর সাথে চরম খিয়ানতের বহিঃপ্রকাশ।

অবশ্য ঔষধ কোম্পানিগুলোর পক্ষ থেকে যে ফিজিশিয়ান সেম্বল ডাক্তারদেরকে দেওয়া হয় বিনিময় বা উৎকোচ হিসাবে না হলে সেগুলো গ্রহণ করা ডাক্তারদের জন্য জায়েয। তবে ফিজিশিয়ান সেম্বল যেহেতু ফ্রি বিতরণ করে রোগীদের উপর প্রয়োগের মাধ্যমে ডাক্তারদের অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য দেওয়া হয়। এবং তা বিক্রি নিষিদ্ধ থাকে, তাই ডাক্তারের জন্য তা বিক্রি করা জায়েয হবে না, বরং ডাক্তার যে রোগীর জন্য ঔষধটি সমীচীন মনে করবে তাকে ঔষধটি ফ্রি প্রদান করবে।

[দেখুনঃ মুসনাদে আহমাদ, হাদীসঃ ২২৩৯৯; সুনানে তিরমিযী, হাদীসঃ ১৩৩৭; মুস্তাদরাকে হাকিম ৪/১০২; মাজমাউয যাওয়াইদ ৪/১৯৯; আল মিসবাহুল মুনির ১২০; রদ্দুল মুহতার ৫/৩২৬; মাজাল্লাতুল আহকাম, মাদ্দাঃ ১৪৭৯, ১৫১৩; আল-মুগনী ৫/৭৬]

কুইজ প্রতিযোগিতার বিধান

প্রশ্নঃ আমাদের একটি পাঠাগার আছে। পাঠাগারের উদ্যোগে প্রতি বছর জ্ঞান চর্চার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকার প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এর মধ্যে কুইজ প্রতিযোগিতা অন্যতম। এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে হলে পাঠাগারের পক্ষ থেকে ছাপানো একটি প্রশ্নপত্র ক্রয় করতে হয়। প্রতিযোগীকে প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর চিহ্নিত করে জমা দিতে হয়। পাঠাগার কর্তৃপক্ষ যাদের উত্তর সঠিক হয়েছে তাদের মধ্য থেকে ১৫/২০ জনকে লটারির মাধ্যমে নির্বাচন করে পুরস্কৃত করেন। শরীয়তের দৃষ্টিতে এ প্রতিযোগিতার বিধান কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তরঃ বৈধ জ্ঞান চর্চার উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা প্রশংসনীয় কাজ। সঠিক উত্তরদানকারীদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে লটারির মাধ্যমে নির্বাচন করে পুরস্কৃত করাও বৈধ। তবে পুরস্কারের ব্যবস্থা করার জন্য প্রতিযোগীদের থেকে কোন বিনিময় বা ফি গ্রহণ করা যাবে না। এমন কি ফরম বিক্রির নামেও না। তাই প্রশ্নোল্লেখিত কুইজ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেও পুরস্কারের ব্যবস্থা যদি প্রতিযোগীদের টাকা দ্বারা না করা হয়; বরং উদ্যোগতারাই অন্যভাবে তার ব্যবস্থা করে থাকে এবং কারো থেকে চাপ প্রয়োগ করে বা লজ্জায় ফেলে চাঁদা না নেওয়া হয় আর কুইজপত্রের দাম স্বাভাবিক, যেমন ২/৩ টাকা রাখা হয় তাহলে বিষয়টি জায়েয বলে গণ্য হবে।

[দেখুনঃ সূরা মায়িদাহ ৯০; মাআলিমুস সুনান, হাদীসঃ ২৪৬৯; বুহুস ফি কাযায়া ফিকহিয়্যাহ ২/২২৯; আহকামুল কুরআন, থানুবী রহ. ৪/১১; হিদায়া ফতহুল কাদীরসহ ৩/৩৩২]

আত্মহত্যাকারী ব্যক্তির জানাযার নামায

প্রশ্নঃ কিছু দিন পূর্বে আমাদের এলাকার ১৭ বছর বয়সের এক ছেলে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করলে তার জানাযার নামায পড়া নিয়ে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। কিছু লোক তার জানাযা নিয়ে আপত্তি তুলে জানাযায় অংশগ্রহণ করেনি। আত্মহত্যাকারীর জানাযার নামায পড়ার ক্ষেত্রে শরিয়তের নির্দেশনা কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তরঃ আত্মহত্যা করা বড় গুনাহের কাজ। তবে মুসলমান আত্মহত্যাকারী ব্যক্তির জানাযা নামায পড়তে হবে। অবশ্য আত্মহত্যাকারীর জানাযায় সমাজের শীর্ষ অনুকরণীয় ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত না হয়ে সাধারণ লোকজন দ্বারা তার জানাযা ও কাফন-দাফনের কাজ সম্পন্ন করে নেওয়া ভাল।

[দেখুনঃ সহীহ মুসলিম হাশিয়া নববীসহ ১/৩১৪; সুনান নাসাঈ ১/২১৫; নাইলুল আওতার ২/৭৭; বযলুল মাজহুদ ৪/২০২; ফতহুল মুলহিম ২/৫১২; মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা ৩/২৩০; মাজমাউল আনহুর ১/২৮১; আল মুহিতুল বুরহানী ৩/৮৩; তাতারখানিয়া ২/১৬২; ফাতহুল কাদির ২/১০৯; বাহরুর রাইক ২/২০০; খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/২১৭; খানিয়া ১/১৮৬; বায্-যাযিয়া ৪/৭৮; তাবইনুল হাকাইক ১/২০৫; আল কিফায়া ২/১১০; আন নাহরুল ফায়েক ১/৪০৯; ফাতওয়ান নাওয়াযিল ৮৭; শরহুন নুকায়া ১/৩৩৭; শরহুল মুনইয়া ৫৯১; রদ্দুল মুহতার ২/২১১; হিন্দিয়া ১/১৬৩; হাশিয়াতুত তাহতাবী আলাদ দুর ১/৩৭৩]

লেখক: মুহাদ্দিস, জামিয়া দারুল উলূম আল ইসলামিয়া দিলুরোড ঢাকা

জবানের দুটি গুনাহ : গীবত ও পরনিন্দা

মুফতী আবু বকর সাদী

তোমরা আল্লাহর নিয়ামতসমূহ গণনা করে শেষ করতে পারবে না। [সূরা ইবরাহিম:৩৪]

শারীরিক ও জাগতিকভাবে আমরা ইলাহি নেয়ামতের যে বিস্তৃত চাদরে আবরিত তার সংখ্যা সীমানা প্রান্ত কোন কিছু জানা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। অগণিত নেয়ামতের মাঝে গুরুত্বপূর্ণ ও অন্যতম একটি নিয়ামতের নাম জিহ্বা।

যার সাহায্যে আমরা আমাদের মনের ভাব প্রকাশ করি। মনের গভীরে কল্পিত চিত্রকে অন্যের কাছে ফুটিয়ে তুলি। একে অন্যের সাথে ভাবের আদান-প্রদান করি। নিজেদের মাঝে ভাগাভাগি করি যত সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, হাসি-কান্না। মহান আল্লাহর প্রশংসা স্তুতিও এ জিহ্বা দ্বারাই করি। যার জিহ্বা সচল নয়, যাকে আল্লাহ বাকশক্তি দেয়নি সেই বুঝে এই জিহ্বার মূল্য কত? মনের কোন ভাব প্রকাশে তার নির্বাক ব্যাকুলতায় সুতীব্র হয়ে ওঠে জবানের প্রয়োজনীয়তা। তা ছাড়া ব্যবহারিক বিবেচনায় জিহ্বা অসামান্য গুরুত্বের দাবি রাখে। জিহ্বার সংযত ও অসংযত ব্যবহারের উপর মানব জীবনে সাফল্য-ব্যর্থতা যেহেতু অনেকাংশেই নির্ভরশীল। তাই জিহ্বার ব্যবহারের ক্ষেত্রে সবসময় সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন অত্যন্ত জরুরী।

জিহ্বার সঠিক ব্যবহার

আল্লাহ তায়ালা জিহ্বাকে আমাদের নিকট আমানত হিসেবে দান করেছেন। এটির মালিকও তিনি। আমি এর প্রকৃত মালিক না। তাই এটি ব্যবহারে আমাকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রতি। আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন এমন কোন ক্ষেত্রে এই জিহ্বাকে ব্যবহার করা যাবে না। জিহ্বার ব্যবহার হওয়া চাই আল্লাহর সন্তুষ্টিতে। জিহ্বা সদাসিক্ত রাখতে হবে কুরআন তিলাওয়াতে আল্লাহর জিকির ও দুয়া-দরূদে। হাদীস শরীফে এসেছে-

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন- যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে তার উচিত সে যেন উত্তম ও ভাল কথা বলে অথবা (ভালা কথা বলতে না পারলে) চুপ থাকে। [বুখারী, হাদীসঃ ৬৬৪৬]

জিহ্বার ব্যবহারের ক্ষেত্রে যত্নশীল হতে হবে। সতর্কতার সাথে কথা বলতে হবে। ভেবে চিন্তে মুখ খুলতে হবে। জিহ্বা যেন বেপরোয়া ও লাগামহীন না হয়ে যায় সেদিকে সচেতন দৃষ্টি রাখতে হবে। কারণ লাগামহীন একটি মন্দ কথা আমার জীবন ধ্বংস করে দিতে পারে। আমাকে জাহান্নামের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করতে পারে। এই মর্মে আল্লাহর নবী সা. ইরশাদ করেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ، مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا، يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ المَشْرِقِ»

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ সা. কে আমি বলতে শুনেছি: কোন মানুষ চিন্তা-ভাবনা ছাড়া এমন বাক্য মুখে বলে ফেলে যা তাকে জাহান্নামের এত গভীরে নিক্ষেপ করে যার দূরত্ব পূর্ব ও পশ্চিমের সমান। [বুখারী, হাদীস: ৬৪৭৭]

একটু ভাবার বিষয় জিহ্বা অঙ্গ হিসেবে ছোট হলেও তার ক্ষতিটা কত মারাত্মক, তার অশুভ পরিণতি কত ভয়াবহ। আবার এই জিহ্বার সুন্দর ব্যবহার, উত্তম পরিণতি কত মূল্যবান ও দামী তাও চিন্তার বিষয়। এই জিহ্বা দ্বারা কোন কাফের কালিমা পড়ার মাধ্যমে মুসলমান হয়ে যায়। স্থায়ী জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে চিরস্থায়ী শান্তি নিকেতন জান্নাতে ঠিকানা বানিয়ে নিতে পারে। তাই সদা সর্বদা জিহ্বার উত্তম ব্যবহারে যত্নবান হওয়া উচিত। আর এর অন্যায় প্রয়োগে সতর্ক ও রক্ষণশীল হওয়া বাঞ্ছনীয়। জিহ্বার সঞ্চালনে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, আমি কোন বিষয়ে কথা বলছি। বিষয় যদি আল্লাহ, নবী-রাসূল, ধর্ম, ইসলাম ও পরকাল বিষয়ক হয় তাহলে সীমাহীন শ্রদ্ধাবনত ও ভীতসন্ত্রস্ত হতে হবে। সজাগ দৃষ্টি রেখে জিহ্বাকে সঞ্চালন করতে হবে। এমন যেন না হয় যে অসাবধানতায় আমার মুখনিঃসৃত শব্দটি আমার ঈমান নামক মহান দৌলতকে বিনষ্ট করে দিল। হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত একটি হাদীসে রাসূল সা. ফিতনার সময় সম্পর্কে সতর্ক করে বলেন-

يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا

কোন ব্যক্তি ভোরে (ঘুম থেকে) উঠবে ঈমানদার অবস্থায় আর সন্ধ্যা করবে কাফের অবস্থায় আবার সন্ধ্যা করবে মুমিন অবস্থায় আর ভোরে উঠবে কাফের অবস্থায়। [মুসলিম, হাদীস: ১৮৬]

মহান আল্লাহপ্রদত্ত এই জিহ্বা নামক নিয়ামতকে আমরা যে সকল অন্যায় পথে ব্যবহার করি তন্মধ্যে একটি হল মিথ্যা কথা। আমরা কারণে অকারণে মিথ্যা বলে যাই। এর পরিণতি সম্পর্কে একটু চিন্তাও করি না। মিথ্যা বলা যে কবীরা গুনাহ তথা মহাপাপ তা যেন আমরা ভুলেই যাই। কাউকে গালমন্দ করাও জিহ্বার

নিন্দনীয় প্রয়োগ। আমরা অধীনস্থ, স্বজন এমনকি পিতা-মাতাকে গালমন্দ করি। জিহ্বার এই নিন্দনীয় প্রয়োগ থেকেও আমাদের সম্পূর্ণরূপে বেঁচে থাকতে হবে। কেননা গালমন্দ করাও মহাপাপ তথা কবীরা গুনাহ্। তাছাড়া গালমন্দ দ্বারা বংশীয় মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়। নিজের সম্মানের হানি হয়। গুজব বা মিথ্যা রটানোও জিহ্বার আরেকটি অপছন্দনীয় ব্যবহার। আমরা অনেক সময় কোন সংবাদ কিংবা ঘটনা যাচাই-বাছাই না করেই অন্যের নিকট তা প্রচারে ব্যস্ত হয়ে যাই। এ মর্মে আল্লাহর নবী সা. ইরশাদ করেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ»

রাসূলুল্লাহ সা. বলেন কোন ব্যক্তি মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য লোকমুখে শোনা কথা বলে দেয়াই যথেষ্ট। [মুসলিম:১/১০]

তাই যাচাই-বাছাইহীন গুজব রটানো ও লোকমুখে শোনা কথা বর্ণনা করা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকতে হবে। মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, মিথ্যা শপথ করাও জিহ্বার অন্যায় ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত। মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে অন্যের প্রতি জুলুম করা থেকে বেঁচে থাকতে হবে। মিথ্যা শপথ করার মাধ্যমে নিজেকে জাহান্নামের দিকে ঠেলে দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। জিহ্বার অন্যায় ব্যবহারের সবচেয়ে ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক দিক হচ্ছে গীবত ও পরনিন্দা। গীবত ও পরনিন্দা এতো মারাত্মক যে এগুলো আমাদের জীবনের সকল নেক আমলকে ক্রমান্বয়ে খেয়ে ফেলে যা আমরা টেরও পাই না। জীবনের জন্য যেমন কিছু কিছু নীরব ঘাতক রয়েছে তেমনি গীবত ও পরনিন্দা আমাদের নেক আমলের জন্য নীরব ঘাতক। এ দুটি বিষয় আমাদের জন্য যে পরিমাণ ক্ষতিকর আমরা এগুলো সম্পর্কে তার চেয়েও বেশী উদাসীন। তাই চলমান নিবন্ধে জিহ্বার এই ধ্বংসাত্মক দুটি বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার ইচ্ছা রাখি। পবিত্র গ্রন্থ আল-কুরআনে গীবত সম্পর্কে মহান আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন,

﴿ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ﴾

তোমরা একে অপরের গীবত করো না, তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করে? তোমরা তা ঘৃণা কর। [সুরা হুজরাত: ১২]

গীবতের ভয়াবহতা উপলব্ধির জন্য কুরআনের এই আয়াতটিই যথেষ্ট। কেননা এতে আল্লাহ তায়ালা গীবত করাকে মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করার সাথে তুলনা করেছেন। এই উপমায় একই সঙ্গে তিনটি নিন্দনীয় বিষয় রয়েছে। একটি

অপরটির চেয়ে ঘৃণ্যতর। প্রথমত মানুষের গোশত, জেনে বুঝে আমরা কখনো মানুষের গোশত খেতে পারব না। আমার স্বভাব ও রুচি এটাকে ভীষণ ঘৃণা করে। দ্বিতীয় বিষয়টি হলো- ভাইয়ের গোশত, কোন জ্ঞানসম্পন্ন মানুষকে যতই বাধ্য করা হোক না কেন তার পক্ষে নিজ ভাইয়ের গোশত খাওয়া কখনো সম্ভব হতে পারে না। ক্ষুধার যাতনায় মরণাপন্ন হলেও এমনকি প্রাণ যায় যায় মুহূর্তেও নিজ ভাইয়ের গোশত খাওয়াকে সকলেই অপছন্দ ও ঘৃণা করবে, তৃতীয় বিষয়টি হলো মৃত মানুষের গোশত। মানুষের গোশতই সকলের নিকট ঘৃণ্য বস্তু, তা যদি আবার মৃত মানুষের হয় তাহলে এর ঘৃণ্যতা কি পরিমাণ হতে পারে তা অনুমান করাও কঠিন।

ভাবনার বিষয়ঃ এতগুলো ঘৃণ্য বস্তুর উপমা সত্ত্বেও আমরা কিভাবে একে অপরের গীবতে লিপ্ত হয়ে যাই। নিজের স্বভাব ও রুচিবোধ সম্পূর্ণ নষ্ট করে ফেলি? আহ! এমন কঠিন উপমা সত্ত্বেও কি আমাদের চোখ খুলবে না? গাফলতের ঘুম ভাঙ্গবে না? অন্যের গীবত করাকে মৃত্যুর চেয়েও জঘন্য ও ভয়ংকর মনে করব না?

রাসূলুল্লাহ সা. এর সময়কালে দুজন মহিলা রোজা রেখে খুবই কাতর হয়ে পড়ল। তাদের অবস্থা মরণাপন্ন হয়ে দাঁড়াল। সাহাবায়ে কেরাম এদের সম্পর্কে রাসূল সা. কে অবগত করলেন। রাসূল সা. তাদের দুজনের নিকট একটি পাত্র পাঠিয়ে বলে দিলেন তারা যেন এতে বমি করে। উভয়ে বমি করার পর দেখা গেল গোশতের টুকরা ও তাজা রক্ত পড়ছে। এ দৃশ্য দেখে রাসূল সা. বললেন-তারা গীবত করেছে। গীবতের কারণেই তাদের এই দুরাবস্থা হয়েছে। অন্যের গীবত করা যে মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করা, একথার বাস্তবতা হিসেবেই হয়তো আল্লাহ তায়ালা এ ঘটনা ঘটিয়েছেন।

গীবতের সংজ্ঞা

গীবত থেকে বাঁচতে হলে প্রথমেই জানতে হবে গীবত কাকে বলে। গীবতের পরিচয় সম্পর্কে হযরত আবু হুরায়রা সূত্রে বর্ণিত, একজন সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন, গীবত কী? রাসূল সা. বললেন- গীবত হচ্ছে তুমি তোমার কোন ভাইয়ের পশ্চাতে তার সম্পর্কে এমন কোন দোষ আলোচনা করলে যা সে অপছন্দ করে। সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ যদি বাস্তবেই তার মাঝে সে দোষ থাকে (তবে কি গীবত হবে?) রাসূল সা. বললেন- যদি বাস্তবেই তার মাঝে সে দোষ থাকে তবে তো গীবত হবে আর যদি বাস্তবে তার মাঝে সে দোষ না থাকে তবে তা হবে বোহতান বা অপবাদ [আবু দাউদ, হাদীস ৪৮৭৪]

আল্লামা ইবনুল আসীর রহ. গীবতের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন-

أَنْ تَذْكُرَ الْاِنْسَانَ فِىْ غَيْبِهِ بِسُوْءٍ كَانَ فِيْهِ

অর্থাৎ কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তুমি তার দুর্নাম করলে যদিও তার মাঝে সে দোষ থাকে। গীবতের এ পরিচয় পাওয়ার পর আমরা আমাদের বৈঠক ও আলোচনার মজলিসগুলোর প্রতি একটু দৃষ্টি দিলে বুঝতে পারব আমাদের মাঝে কী পরিমাণ গীবতের প্রচলন রয়েছে। এ কবীরা গুনাহে আমরা কত মারাত্মকভাবে লিপ্ত রয়েছি। ছোট থেকে বড় কোন মজলিসই এ গীবত থেকে খালি না। দীর্ঘ সময়ে চলমান মজলিস তো দূরের কথা আমরা আমাদের স্বল্প সময়ের কোন মজলিসকেও গীবত থেকে রক্ষা করতে পারি না এবং এ নিয়ে আমরা কোন চিন্তা ফিকিরও করি না।

গীবতের ভয়াবহতা

গীবতের ভয়াবহতা ও শাস্তি সম্পর্কে হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَمَّا عُرِجَ بِي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمُشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ، فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ، قَالَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ، وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ

হযরত আনাস রা. বলেন, রাসূল সা. ইরশাদ করেন, যে রাতে আমাকে মিরাজে নিয়ে যাওয়া হলো তখন ঊর্ধ্বাকাশে আমি এমন একদল লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করি যাদের নখ ছিল তামার, তারা নিজেদের নখ দ্বারা নিজ চেহারা, বক্ষদেশ খামছে খামছে ছিড়ছিল। আমি হযরত জিবরাইল আ. কে জিজ্ঞাসা করলাম এরা কারা? তিনি বললেন, এরা ঐ সকল লোক যারা মানুষের গোশত ভক্ষণ করত অর্থাৎ গীবত করত এবং মানুষের ইজ্জতের উপর হামলা করত। [আবু দাউদ, হাদীসঃ ৪৮৭৪]

গীবত থেকে বুজুর্গগণের সতর্কতা

আল্লাহ ওয়ালাগণ তাদের বৈঠক ও মজলিসে গীবতের সকল দরজা বন্ধ করে রাখতেন যাতে করে তাদের মজলিসসমূহ গুনাহের মজলিসে পরিণত না হয়। তাদের সংশ্রবে আসা মানুষগুলো যেন গুনাহে লিপ্ত না হয়। তারা গীবত থেকে পরিপূর্ণরূপে বেঁচে থাকতেন। নিজের অনুসারী ও মুরীদদেরকেও গীবত থেকে

বাঁচার জন্য জোর তাগিদ দিতেন। বলখের বাদশাহ ইবরাহীম ইবনে আদহাম একবার কিছু লোককে নিজ বাড়িতে দাওয়াত করলেন। তাদের সামনে খানা পরিবেশন করা হলো। এদিকে দাওয়াতী মেহমানগণ খানা খেতে বসে এক ব্যক্তির গীবত শুরু করে দিল। এ অবস্থা দেখে ইবরাহীম ইবনে আদহাম বলে উঠলেন- পূর্বকালের লোকজন আগে মুখে রুটি দিত অতঃপর গোশত খেত। আর বর্তমান কালের লোকজন দেখছি আগে মুখে গোশত পুরছে অতঃপর রুটি খাচ্ছে। [তাযকেরাতুল আউলিয়া]

হযরত ওয়াহহাব বিন ওয়ার্দ রহ. বলেন, আমার নিকট গীবত থেকে বেঁচে থাকা স্বর্ণের পাহাড় সদকা করার চেয়েও উত্তম। হযরত শাকীক বলখী রহ. একদা তাঁর স্ত্রীকে বললেন, তুমি কি জান যে বলখের অনেক আলেম ও পরহেজগার দল সর্বদা নামায রোজা ইত্যাদি নেক অমল আমার জন্য জমা করছে। স্ত্রী বললেন তা কিভাবে। তিনি বললেন তারা সারারাত ইবাদত করে দিনভর রোজা রাখে আর অপরদিকে আমি শাকীকের গীবত করার মাধ্যমে তারা আমার গোশত ভক্ষণ করতে থাকে। সে হিসেবে তাদের সমস্ত নেকী আমি শাকীকের আমল নামায় জমা হওয়ার কথা। [আখলাকে সলফ]

অনেক বুযুর্গ থেকে একথা বর্ণিত আছে যে, যার একটি গীবত করা হয় তার অর্ধেক গুনাহ মাফ হয়ে যায়। হযরত হাসান বসরী রহ. যদি শুনতে পেতেন যে কেউ তার গীবত করেছে তাহলে তিনি গীবতকারীর নিকট প্লেট ভরে ফল, মিষ্টি ইত্যাদির হাদিয়া পাঠাতেন। আর বলে দিতেন যে, শুনেছি তুমি আমার উদ্দেশ্যে অনেক কষ্টে অর্জিত পুণ্য ও সওয়াবের উপঢৌকন পাঠিয়েছ। নিশ্চয় তোমার পাঠানো উপঢৌকন আমার এ হাদিয়ার চেয়ে দামী। হযরত আতা খোরাসানী রহ. বলেন যে, তোমরা গীবতকারীর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ো না। কেননা সে তোমার অজান্তে তোমার উপকার করেছে। [সীরাতুল আউলিয়া]

অনেক বুযুর্গ চলে গেছেন কিন্তু জীবনে কারো গীবত ও শেকায়াত করেননি, হযরত হাসান বসরী রহ. কারো গীবত করতেন না। ইমাম মুসলিম রহ. সম্পর্কেও জানা যায় যে, তিনি জীবনে কারো গীবত করেননি। ইমাম আযম আবু হানিফা রহ.ও জীবনে কারও গীবত শেকায়াত করেননি। হযরত আবুল্লাইস বুখারী রহ. মাত্র দুই দিরহাম সঙ্গে নিয়ে হজ্বের উদ্দেশ্যে বের হলেন। এ মর্মে শপথ করলেন যে, যদি বাড়ি ফেরা পর্যন্ত হজ্বের সফরে কোন এক মুহূর্তও আমি দোষ চর্চায় লিপ্ত হই তাহলে অবশ্যই উক্ত দুই দিরহাম আল্লাহর পথে দান করে দিব। দেখা গেল- তিনি হজ্বের সফর শেষে বাড়ি ফিরে আসলেন অথচ তার দিরহাম দুটি রয়ে গেল। অর্থাৎ তিনি এ দীর্ঘ সময়েও কারো গীবত করেননি। হযরত আবু হাফস্ কবীর রহ. বলেন, পূর্ণ এক রমযান মাস রোজা না রাখা এতটুকু জঘন্য নয় যতটুকু জঘন্য একজন লোকের গীবত করা [মুকাশাফাতুল কুলুব]

গীবত থেকে সকলকেই বাঁচতে হবে

গীবতের ভয়াবহতা চিন্তা করে আলেম ও সাধারণ মানুষ সকলকেই এ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা অত্যাবশ্যক। পূর্বকালে সাধারণত আলেমদের মজলিস থাকত গীবত মুক্ত। কিন্তু আজকাল সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা আলেমদের মজলিসও গীবত মুক্ত থাকছে না। শয়তান সুকৌশলে আলেমদের মজলিসেও গীবতের বিষ ছিটিয়ে দিয়েছে। আর আলেমগণও নিজেদের অসাবধানতায় সে বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছে। ফুযাইল বিন ইয়ায রহ. বলেন, আজকের আলেমদের মহৎ গুণ হচ্ছে গীবত। এরা একে অন্যের নিন্দা করে বেড়ায় যাতে সমকালীন অন্যান্য আলেম ইলম ও আমলে, তাকওয়া ও পরহেজগারিতে, মান ও সম্মানে তার চেয়ে প্রসিদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ না হয়ে যায়। [সীরাতুল আউলিয়া]

তাই জনসাধারণের তুলনায় আলেমদের এ ব্যাপারে আরো বেশি সতর্ক হতে হবে। ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সীরীন রহ. বলেন, কেউ যদি একথা বলে যে, অমুক অমুকের চেয়ে বড় আলেম তবে এটাও হারাম ও গীবতের পর্যায়ভুক্ত। অথচ আমরা অনেকে মনে করি শুধু স্বভাব-চরিত্রের দোষ বর্ণনার নামই গীবত বরং স্বভাব চরিত্রের দোষ বর্ণনা যেমন গীবত, তেমনি জ্ঞান, বিবেক, বুদ্ধি, পেশা, ধর্ম, শারীরিক গঠন, বংশ, পোশাক পরিচ্ছদ ইত্যাদি বিষয়ে দোষ বর্ণনাও গীবতের অন্তর্ভুক্ত। আমরা অনেকে নিজে গীবত করি না তবে অন্যের গীবত শুনি। আর মনে মনে ভাবি আমি কারো গীবত করি না। মনে রাখতে হবে, গীবত করা যেমন গুনাহ গীবত শুনাও গুনাহ। হাদীস শরীফে এসেছে-

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «مَنِ اغْتِيبَ عِنْدَهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ، وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى نَصْرِهِ، فَنَصَرَهُ، نَصَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ».

হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত রাসূল সা. ইরশাদ করেন, কারো নিকট কোন মুমিনের গীবত করা হলে কিংবা কোন দোষ চর্চা করা হলে যদি সে বাধা দেয়ার শক্তি রাখে এবং বাধা দেয় তাহলে মহান আল্লাহ তায়ালা তাকে উভয় জগতে সাহায্য করবেন। আর যদি বাধা দেয়ার শক্তি থাকা সত্ত্বেও বাধা না দেয় তাহলে দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ তায়ালা তাকে পাকড়াও করবেন। [মিশকাত, হাদীসঃ ৪৯৮০]

গীবত করা থেকে বিরত থাকার পাশাপাশি গীবত শোনা থেকেও বিরত থাকতে হবে। কেননা গীবত শোনাও হারাম। যে মজলিসে গীবত হচ্ছে শক্তি থাকলে তা বন্ধ করে দিতে হবে কিংবা আলোচনার বিষয় পালটিয়ে দেয়ার চেষ্টা করতে হবে। কথার প্রসঙ্গ পাল্টাতে না পারলে সে মজলিস থেকে উঠে চলে আসতে হবে। যেভাবেই হোক গীবত শোনা থেকে নিজেকে বাঁচাতে হবে।

গীবতের ক্ষতিসমূহ

গীবত দ্বারা মানুষ ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হযরত আবু কিলাবাহ রা. বলেন, গীবত অন্তরকে সত্য থেকে বিচ্যুত ও বিরাম করে দেয়, গীবতের ক্ষতি সম্পর্কে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল সা. বলেন-

إياكم والغيبة، فإن فيها ثلاث آفات، لا يستجاب له الدعاء، ولا يقبل له الحسنات، ويزداد عليه السيئات.

সাবধান তোমরা গীবত থেকে দূরে থেকো। কেননা গীবতের মধ্যে তিনটি বিপদ রয়েছে। গীবতকারীর দুআ কবুল করা হয় না, তার নেক আমলসমূহ কবুল করা হয় না। আর তার আমলনামায় গুনাহ বাড়তে থাকে। [খাযিনাতুর রিওয়ায়াত]

এ সম্পর্কে পূর্বে বর্ণিত ক্ষতিসমূহের পাশাপাশি এ হাদীসের আলোকে আমরা কয়েকটি মারাত্মক ক্ষতির কথা জানতে পারি-

এক. যারা গীবত করে তাদের দুআ কবুল হয় না, কেননা গীবতকারী সাধারণত অনুতপ্ত হয় না। ফলে তার প্রতি আল্লাহর রহমতও বর্ষিত হয় না, এভাবেই গীবতকারী বিশাল নেয়ামত থেকে বঞ্চিত থাকে।

দুই. গীবতকারীর সাওয়াব যার গীবত করা হয় তার আমলনামায় চলে যায়। হযরত আবু উমামা আল বাহিলী রা. বলেন, কিয়ামতের দিন কোন ব্যক্তি তার আমলনামায় প্রচুর নেকী দেখে বলবেন, হে আল্লাহ! আমিতো এত নেকী করিনি এগুলো কিভাবে আমার আমলনামায় যুক্ত হলো? আল্লাহ তায়ালা বলবেন, যারা তোমার গীবত করেছে তাদের সাওয়াব এসে তোমার আমলনামার সাওয়াবকে বাড়িয়ে দিয়েছে [আত-তারগীব ওয়াত তারহীব]

তিন. গীবতের কারণে অন্যায় ও পাপ কাজের পরিমাণ বেড়ে যায়।

চার. গীবতকারীর নেক আমলসমূহ কবুল হয় না। গীবত নেক আমলকে এত দ্রুত ধ্বংস করে দেয় যত দ্রুত কোন আগুন শুকনা বস্তুকে ধ্বংস করতে পারে না।

পাঁচ. গীবত করার দ্বারা সামাজিক যে বড় ক্ষতিটা হয়, তা হচ্ছে যার গীবত করা হলো তাকে সমাজে হেয়, অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করা হলো, যা ঐ ব্যক্তির জন্য মৃত্যুর চেয়েও কঠিন। কেননা অপমানের জীবন নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়। এ সকল ক্ষতির কথা বিবেচনা করে সকলকেই সব ধরণের গীবত থেকে বেঁচে থাকতে হবে। গীবত থেকে বিরত থাকার জন্য দৃঢ় মনোবল ও দুর্বার হিম্মত নিয়ে এখনই অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে হবে যে, আমি আর কখনো গীবত করব না।

পরনিন্দা

প্রায় গীবতের মতই জিহ্বার আরো একটি মারাত্মক গুনাহ হচ্ছে পরনিন্দা। পরনিন্দা আর গীবত প্রায় একই ধরণের। তবে সামান্য পার্থক্য রয়েছে। দু'ব্যক্তির মাঝে ঝগড়া সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একের দোষ অন্যের নিকট বলে বেড়ানোকে চোগলখোরি বা পরনিন্দা বলে। আর ঝগড়া সৃষ্টির উদ্দেশ্য ছাড়া একের দোষ অন্যের নিকট বর্ণনা করাকে গীবত বলে। এ পরিচয় দ্বারা বুঝা গেল যে, গীবত ও পরনিন্দার মাঝে অল্প পার্থক্য রয়েছে। যদিও কোন কোন বিশেষজ্ঞদের মতে এ দুয়ের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রহ. এর বক্তব্য দ্বারাও এ দুয়ের মাঝে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তিনি বলেন,

قُلْتُ الْغِيبَةُ قَدْ تُوجَدُ فِي بَعْضِ صُوَرِ النَّمِيمَةِ وَهُوَ أَنْ يَذْكُرَهُ فِي غِيبَتِهِ بِمَا فِيهِ مِمَّا يَسُوؤُهُ قَاصِدًا بِذَلِكَ الْإِفْسَادَ

পরনিন্দা বা চোগলখোরির কোন কোন পর্যায়ে গীবতও পাওয়া যায়। আর তা হলো কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার মাঝে বিদ্যমান কোন দোষ বর্ণনা করা যা তার কষ্টের কারণ হয়। আর এর উদ্দেশ্য হয় বিবাদ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা। [ফতহুল বারীঃ ১০/৪৭০]

এ বক্তব্য এবং পরনিন্দার সংজ্ঞা দ্বারা স্পষ্ট বুঝে আসে যে, পরনিন্দা গীবত থেকেও জঘন্য। কেননা এতে দুটি গুনাহ রয়েছে, একটি হলো গীবত আর অপরটি হচ্ছে বিশৃঙ্খলা ও বিবাদ সৃষ্টি করতঃ তাকে কষ্ট দেয়া। সুতরাং যেহেতু নামীমা বা পরনিন্দাতে দ্বিগুণ অপরাধ রয়েছে তাই এর শাস্তিও হবে দ্বিগুণ। পবিত্র কুরআনে পরনিন্দা সম্পর্কে মারাত্মক সতর্কবাণী এসেছে। আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের অবস্থা বর্ণনা করে বলেন, هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ অর্থাৎ "পশ্চাতে নিন্দাকারী একের কথা অন্যের কাছে লাগিয়ে ফিরে।" [সূরা আল-ক্বলামঃ ১১]

হাদীস শরীফেও পরনিন্দাকারী চোগলখোর সম্পর্কে কঠিন বাণী উচ্চারিত হয়েছে। রাসূল সা. বলেন, «لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَتَّاتٌ» অর্থাৎ চোগলখোর বা পরনিন্দাকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না [বুখারী, হাদীসঃ ৬০৫৬]

অন্য একটি বর্ণনায় 'নাম্মাম' শব্দ ব্যবহার হয়েছে 'ক্বাত্তাত' এবং 'নাম্মাম' এর অর্থ হচ্ছে চোগলখোর, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ অর্থাৎ প্রত্যেক পশ্চাতে ও সম্মুখে পরনিন্দাকারীর দুর্ভোগ। [সূরা হুমাযাহঃ ১]

অর্থাৎ এ ধরনের লোকদের শাস্তি হবে খুবই যন্ত্রণা দায়ক। উক্ত আয়াতে 'হুমাযাহ' অর্থ পশ্চাতে নিন্দাকারী আর 'লুমাযাহ' অর্থ সম্মুখে নিন্দাকারী। কুরআন হাদীসের বর্ণনা দ্বারা আমরা পরিষ্কার জানতে পারলাম যে, পরনিন্দা একটি জঘন্যতম অপরাধ। যার শাস্তি খুবই কঠিন। তাই সম্পূর্ণরূপে আমাদেরকে গীবত ও পরনিন্দা থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

গীবত ও পরনিন্দার উৎস

বিভিন্ন কারণে মানুষ গীবত ও পরনিন্দার মত ভয়াবহ দুটি অপরাধে লিপ্ত হয়ে যায়। যেমন, ক্রোধ ও রাগের বশবর্তী হয়ে মানুষ এ দুটি অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। যার প্রতি রাগান্বিত হয়েছে তাকে সমাজে হেয় প্রতিপন্ন করা এবং কষ্টে ফেলানোর জন্যই তা করে থাকে। কখনো গীবত এবং পরনিন্দা হয় অহংকারের কারণে। কেউ যেন আমার চেয়ে বড় ও শ্রেষ্ঠ না হতে পারে এজন্য আমি অন্যের গীবত ও নিন্দাবাদ করতে থাকি। কোন কোন সময় সম্মানের মোহে মানুষ গীবত ও পরনিন্দায় লিপ্ত হয়। অন্যের নিন্দাবাদ করে হেয় প্রতিপন্ন করতে পারলেই যেন আমি সম্মানের উঁচু আসনে সমাসীন হতে পারব। কখনো কখনো হিংসা বিদ্বেষ চরিতার্থ করার জন্য মানুষ গীবত ও পরনিন্দাকে হাতিয়ার হিসেবে ধারণ করে। যেন এর চেয়ে বড় ও কার্যকরী অস্ত্র আর নেই। তাই গীবত ও পরনিন্দার উৎসগুলো চিহ্নিত করে সে উৎস দমনের চেষ্টা করতে হবে। সবগুলো উৎসই মনের সাথে সম্পৃক্ত। প্রথমেই মনকে পরিশুদ্ধ করে মন থেকে এসব উৎস দূর করতে হবে। ক্রোধ, মোহ, গর্ব-অহংকার, হিংসা বিদ্বেষ ইত্যাদি মনের রোগগুলোকে চিরতরে ধ্বংস করতে হবে। তবেই গীবত ও পরনিন্দা থেকে বাঁচা আমাদের জন্য সহজ হবে।

জিহ্বাকে সংযত কর

গীবত থেকে বাঁচার সহজ পথ হিসেবে হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানুভী রহ. বলেন, তুমি অন্যের আলোচনা করা থেকেই বিরত থাকবে। অন্যের ভালোটাও উল্লেখ করতে যাবে না। কেননা শয়তান কোন এক সুযোগে খারাপের আলোচনায় লিপ্ত করে দিবে। তাই ভালোরও উল্লেখ প্রয়োজন নেই খারাপেরও প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ জিহ্বাকে সংযত রাখতে হবে। হ্যাঁ, যদি আলোচনা করতেই হয় এবং জিহ্বাকে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করতে পার তাহলে শুধু ভালোর আলোচনা কর। তারপরও পূর্ণ সজাগ থাকতে হবে যেন শয়তান কখনো ভুল পথে নিয়ে না যায়। জিহ্বাকে সংযত রাখার বিষয়ে রাসূল সা. ইরশাদ করেন,

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الجَنَّةَ»

হযরত সাহল ইবনে সাদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. ইরশাদ করেন- যে ব্যক্তি আমাকে দুটি জিনিসের নিশ্চয়তা দিবে আমি তাকে জান্নাতের গ্যারান্টি দিব। একটি হচ্ছে জিহ্বা আর অপরটি হচ্ছে লজ্জাস্থান। জিহ্বার নিশ্চয়তার অর্থ হচ্ছে জিহ্বাকে সব ধরনের ভুল ব্যবহার থেকে বিরত রাখবে। জিহ্বা দ্বারা কোন গুনাহ না করার নিশ্চয়তা দিবে। [সহীহ বুখারী, হাদীস: ৬৪৭৪]

এ হাদীসের মধ্যে রাসূল সা. জিহ্বার সংরক্ষণকে দ্বীনের অর্ধেক সংরক্ষণ সাব্যস্ত করেছেন। অন্য এক হাদীসে এসেছে,

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا النَّجَاةُ؟ قَالَ: «امْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ». «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ»

হযরত উকবা ইবনে আমের রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সা. কে বললাম ইয়া রাসূলুল্লাহ ! (জাহান্নাম থেকে) নাজাতের উপায় কি? উত্তরে রাসূল সা. তিনটি বাক্য বললেন- প্রথমটি হচ্ছে তুমি তোমার জিহ্বাকে নিজ আয়ত্তে রাখ। অর্থাৎ জিহ্বা যেন লাগামহীন হয়ে অন্যায়ে লিপ্ত না হয়। দ্বিতীয় বাক্য বললেন-তোমার ঘর যেন তোমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ বেশির ভাগ সময় ঘরেই বসে থাকবে। একান্ত প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হবে না। তৃতীয় বাক্যটি হচ্ছে তোমার গুনাহের জন্য আল্লাহর কাছে কাঁদবে। অর্থাৎ যদি তোমার দ্বারা কোন পাপ সংঘটিত হয় তাহলে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে কাঁদবে। [তিরমিযী, হাদীস: ২৪০৬]

এ হাদীসের তৃতীয় বাক্যটি দ্বারা বুঝে আসে যে, যখনই কোন গুনাহ হয়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর কাছে তওবা করে কান্নাকাটি করতে হবে। গীবত ও পরনিন্দা যেহেতু অনেক মারাত্মক গুনাহ তাই শয়তানের ধোঁকায় নফসের প্রতারণায় অসাবধানতায় যদি কখনো এ গুনাহ সংঘটিত হয়ে যায় তাহলে আল্লাহর কাছে ভীষণ লজ্জিত হতে হবে। কায়মনোবাক্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে কান্নাকাটি করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে যেহেতু এতে বান্দার হক বা অধিকার নষ্ট করা হয় তাই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছেও ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। সর্বদা আমাদেরকে তওবার ওপর থাকতে হবে। রাসূল সা. এর কোন গুনাহ না থাকা সত্ত্বেও তিনি অধিক পরিমাণে তওবা করতেন। হাদীসে এসেছে,

عَنِ الْأَغَرِّ الْمُزَنِيِّ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي، وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ، فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ»

নিশ্চয় আমি আল্লাহর নিকট দৈনিক একশবার ক্ষমা প্রার্থনা করি। [সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২৭০২]

সুতরাং আমাদের কী পরিমাণে ক্ষমা চাওয়া প্রয়োজন তা এ হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয়। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে জিহ্বা বা জবানের সব ধরনের গুনাহ থেকে রক্ষা করুন। বিশেষ করে জবানের দুটি ধ্বংসাত্মক গুনাহ গীবত ও পরনিন্দা সম্পর্কে সকলকে সতর্ক হওয়ার তাওফীক দান করুন।

লেখক: মুহাদ্দিস, জামিয়া দারুল উলূম আল ইসলামিয়া দিলুরোড ঢাকা

স্বাধীনতার মর্মার্থ : প্রেক্ষিত নারী অধিকার

মাওলানা শরীফুল ইসলাম

স্বাধীনতার অর্থ হচ্ছে স্ব-অধীনতা। নিজের অধীনে নিজে থাকাকে স্বাধীনতা বলে। অর্থাৎ অন্যের অধিকার ও হক নষ্ট না করে, নিজের মৌলিক অধিকার ও প্রাপ্তি পূর্ণরূপে পাওয়ার নিশ্চয়তাকে স্বাধীনতা বলে। পৃথিবীতে মানুষ দুই ধরনের পরাধীনতার শিকার হয়। এক. শক্তি ও ক্ষমতার পরাধীনতা। দুই. আদর্শ ও বিবেকশূন্যতার পরাধীনতা।

এই দ্বিতীয় প্রকার পরাধীনতা বাস্তবিক পক্ষে সবচেয়ে কঠিন ও নিষ্ঠুর। অথচ মানুষ যখন কোন ভিনদেশী শাসকের অধীন বা কোন ব্যক্তির ক্রীতদাস হয় শুধু তখনই নিজেকে পরাধীন মনে করে এবং এ থেকে মুক্তি পাওয়ার সংগ্রাম করে। কিন্তু আদর্শগতভাবে বা নীতিগতভাবে যে সে চরম পরাধীনতার মাঝে মৌলিক অধিকার বঞ্চিত হয়ে অধীনতার জিঞ্জিরে আবদ্ধ হয়ে আছে, তা সে গভীরভাবে চিন্তা না করার কারণে উপলব্ধিও করতে পারে না।

অন্ধ স্বার্থপরতা, সুনাম সুখ্যাতির আকঙ্ক্ষা ও দুনিয়াবি বস্তুর লোভ-লালসা মানুষকে পশু থেকে অধম করে তোলে। তার কোন স্বাধীনতা থাকে না। একটি পশু যেমন জ্ঞানহীন হওয়ার কারণে স্বাধীনতার স্বাদ উপভোগ করতে পারে না তেমনি একজন আদর্শ ও বিবেকবান মানুষ যখন আদর্শ বিবর্জিত জীবন যাপন করতে থাকে সেও পশুর মত পরাধীন হয়ে যায়। প্রকৃত স্বাধীন কোন ব্যক্তি অত্যাচার করতে, মিথ্যা কথা বলতে বা পরের হক নষ্ট করতে বা এই দুনিয়ার নশ্বর জিনিস লাভ করাকে উদ্দেশ্য বানাতে পারে না। তার অবস্থায় হয়ে যায় ঐ পশুর মত যাকে আল্লাহ্ বিবেক দিয়ে সৃষ্টি করেননি। তাই তার জীবন যাপনের কোন নিয়ম ও নীতি নেই। ঠিক সেভাবে একজন পশুপ্রকৃতির মানুষও স্ব-পরাধীন, আর এটাই হচ্ছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট পরাধীনতা।

স্বাধীনতা যেমন এই পৃথিবীতে আল্লাহ প্রদত্ত সর্বাধিক মূল্যবান সম্পদ ঠিক তেমনই স্ব-পরাধীনতাও সর্ব নিকৃষ্ট বস্তু। পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষের মৌলিক অধিকার তথা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা নিশ্চিত হওয়ার মাধ্যমেই স্বাধীনতা অর্জিত হয়। আর এগুলো অর্জন করতে হলে আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।

কারণ মহান রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেছেনঃ ‘বল আল্লাহ্ ব্যতীত আমার এমন কোন হুকুম বা আইন দাতা নেই’ [সূরা ইউসুফঃ ৪০], যে আমারই মত একজন

মানুষ হয়েও আমার দেহ মনে, পরিবারে, রাষ্ট্র-সমাজে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, সহায়-সম্পত্তিতে হুকুম প্রদান করবে ও আমার জন্য আইন প্রণয়ন করবে। আর আমাকে তা মানতে হবে। এটি কেমন কথা?

এটা কোন যুক্তি সঙ্গত কথা হতে পারে না যে, এই পৃথিবীর সকল ক্ষেত্রে যেমন আকাশে-বাতাসে, আলোতে-আঁধারে, পানি ও মাটিতে তার যেমন অধিকার আছে ঠিক আমারও তেমন অধিকার রয়েছে। সুতরাং তার অধীনস্থতা আমি কোন যুক্তিতে স্বীকার করবো? একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত কারো অধীনস্থতা আমি মেনে নিতে পারি না। কারণ তিনিই আমার সকল অধিকার নিশ্চিত করার মালিক। আমার মৌলিক অধিকারটুকুও তার অশেষ রহমতে প্রাপ্ত।

এর মাধ্যমে এই প্রশ্নের জবাবও হয়ে গেল যে, আল্লাহ তায়ালার হুকুম মানার দ্বারাও তো পরাধীনতা মেনে নেওয়া হল। কেননা মানুষ হল মাখলুক, সে সৃষ্টিই হয়েছে কোন নিয়ম নীতির মধ্যে চলার জন্য যে নীতির গণ্ডির বাইরে গেলে তার ধ্বংস অনিবার্য। সুতরাং মানুষ নিজের প্রয়োজনেই সে এমন এক নিয়মের মধ্যে নিজেকে পরিচালিত করতে বাধ্য যে নিয়ম হবে এমন এক সত্তার কাছ থেকে যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। কারণ স্রষ্টাই তাঁর সৃষ্টির কল্যাণ-অকল্যাণ সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত।

একজন মানুষ মাখলুক হিসেবে তার জ্ঞান আহরণের ক্ষমতা সীমিত। সুতরাং সে তার জ্ঞানের এই সীমিত শক্তি দিয়ে এই মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তার পরিচয় লাভ করতে পারে না। এবং যে নিয়ম-নীতির মাধ্যমে তার জীবনের কাঙ্ক্ষিত ও প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হবে তাও সে অবগত হতে সক্ষম।

তাই মহান রাব্বুল আলামীন মানুষের প্রতি অত্যন্ত দয়াপরবশ হয়ে, মানুষকে তার প্রকৃত স্বাধীনতার দিকে পথ নির্দেশনা দেওয়ার জন্য যুগে যুগে অগণিত নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। যেই মহা মনীষীগণ আল্লাহর পক্ষ হতে বিশেষ জ্ঞানের মাধ্যমে আল্লাহ প্রদত্ত মানব কল্যাণের নিয়ম-নীতি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, তাদের দেখিয়েছেন সেই পথ যেই পথে রয়েছে তার প্রকৃত স্বাধীনতা। সুতরাং পৃথিবীর কোন মানুষ যদি উক্ত নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে নিজের মনের কামনার বা মানব রচিত কোন নীতির অনুসরণ করে তাহলে তার ধ্বংস অনিবার্য। কেননা আল্লাহ তায়ালা প্রতিটি প্রাণীর জীবন পরিচালনার জন্য সুনির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি দিয়েছেন। এ নিয়ম শৃঙ্খলা ভাঙলেই তার ধ্বংস অনিবার্য। একটি মাছ পানিতে জীবন পরিচালনা করার কথা। মাছটি যদি নিয়ম ভেঙ্গে ডাঙায় চলে আসে তার ধ্বংস যেমন নিশ্চিত। তেমনি একটি ছাগল স্থল ছেড়ে জলে বাস করতে চাইলে তার ধ্বংসও নিশ্চিত। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টির সেরা ঘোষণা করেছেন।

মানুষকে নারী ও পুরুষ দু প্রকারে বিভক্ত করেছেন। প্রত্যেক প্রকারের জন্য কল্যাণকর পৃথক পৃথক বিধান দিয়েছেন। ভিন্ন ভিন্ন কর্তব্য ও অধিকার নিশ্চিত করেছেন।

আর এর কারণ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টিগতভাবেই নারী-পুরুষকে আলাদা আলাদা গঠন প্রণালী দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেককে ঐ সকল দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার দিয়েছেন যা তার জন্য উপযুক্ত এবং যার মাধ্যমেই তার কল্যাণ সাধিত হবে। অন্য কোন পন্থায় যদি সে তার কল্যাণ তালাশ করতে যায় তাহলে তা তার কল্যাণ তো দূরের কথা বরং তা তার ধ্বংসের কারণ হবে। কেননা এটা ঐ সত্তার বিধান যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।

মানুষের এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য তার মৌলিক অধিকারগুলো তার অর্জন করতেই হবে। আর এ গুলো অর্জন করতে হলে তাকে কিছু দায়িত্ব পালন করতে হবে। কিন্তু কোন নারী বা পুরুষের জন্য উক্ত দায়িত্বগুলো একা সম্পাদন করা সম্ভব নয়। তাই আল্লাহ তায়ালা নারী-পুরুষ প্রত্যেককে তার যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী ঐ সকল দায়িত্বই দিয়েছেন যা তার জন্য সর্বাধিক উপযুক্ত।

ঐ সকল দায়িত্বগুলোর মধ্যে কিছু দায়িত্ব এমন রয়েছে যা শুধুমাত্র নারীর পক্ষেই পালন করা সম্ভব এবং তার মধ্যে এমন কিছু দায়িত্ব রয়েছে যা শুধু পুরুষই পালন করতে পারে। যেমন একটি পরিবারের উপার্জনের দায়িত্ব শুধুমাত্র পুরুষই পালন করবে। মহান আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন,

﴿ ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ ﴾

অর্থাৎ পুরুষগণ তাদের আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি-সামর্থ্য দিয়ে উপার্জন করবে এবং তা তার পরিবারে জন্য খরচ করবে আর এ কারণেই একজন পুরুষের অর্জিত ধন-সম্পদ হতে নারীর ভরণ-পোষণ প্রদান করা কর্তব্য। একটি পরিবারের উপার্জনের দায়িত্ব পুরুষকে দেয়া হয়েছে, নারীকে নয়। কারণ আল্লাহ তায়ালা পুরুষকেই উপার্জনের শক্তি সামর্থ্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, নারীকে উপার্জনের উপযুক্ত শক্তি সামর্থ্য দিয়ে সৃষ্টি করেননি; বরং তাকে সৃষ্টি করেছেন কোমল-কমনীয় করে।

এভাবে দুনিয়াতে মানুষের বংশ বিস্তারের জন্য গর্ভধারণ করা, সন্তান প্রসব করা, সন্তানকে দুগ্ধ দান করা ইত্যাদি দায়িত্ব আল্লাহ তায়ালা নারীকেই দিয়েছেন এবং এর জন্য উপযুক্ত গঠন প্রণালী দ্বারাই নারীকে সৃষ্টি করেছেন। কোন পুরুষ চাইলেও এই দায়িত্বগুলো নিজের কাঁধে নিতে পারবে না। কেননা আল্লাহ তায়ালা পুরুষকে এরূপ গঠন দিয়ে সৃষ্টি করেননি।

সুতরাং বুঝা গেল প্রত্যেকের দায়িত্ব ভিন্ন ভিন্ন। তাই প্রত্যেকের কর্মক্ষেত্রও ভিন্ন ভিন্ন হবে। পুরুষের দায়িত্ব পুরুষ পালন করতে প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হতে হবে, যদি ঘরে বসে উপার্জন সম্ভব না হয়। আর নারী তার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তাকে ঘরেই অবস্থান করতে হবে। কারণ তার দায়িত্ব গর্ভধারণ, সন্তান লালন-পালন যা ঘরের ভিতরেই করতে হয়। ঘরের বাইরে এগুলো সম্ভব নয়।

এখন একটা জিনিস স্পষ্ট বুঝা গেল যে, প্রত্যেককে যার যার দায়িত্ব পালন করতে হবে। তাই উপার্জন করার দায়িত্বও যদি মহিলার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় যা ছিল পুরুষের দায়িত্ব তাহলে তা হবে নারীর উপর চরম অবিচার। তাই মহান ইনসাফগার আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন।

﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ ﴾

অর্থাৎ নারীগণ যেন নিজ ঘরে অবস্থান করে এবং তারা যেন জাহেলী যুগের মহিলাদের মত খোলা মেলা ঘর থেকে বের না হয়। [সূরা আহযাবঃ ৩৩]

আল্লাহর এই বর্ণিত আদেশের নিয়ম অনুসারে পৃথিবীর শুরুলগ্ন থেকে নর-নারী তার নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে আসছিল এবং এতে করে তাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবন ছিল অত্যন্ত সুখ-শান্তির ও ভারসাম্যপূর্ণ। কিন্তু পরবর্তীতে মানুষ ধীরে ধীরে আল্লাহর এই হুকুম থেকে দূরে সরে যেতে লাগল এবং পুরুষগণ নারীকে তার আল্লাহপ্রদত্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে লাগল। পুরুষ তার নিজের দায়িত্ব নারীর উপর চাপিয়ে দিতে লাগল সূক্ষ্ম কৌশলে। ধীরে ধীরে অবস্থা আরো করুণ হতে লাগল, পুরুষ শাসিত সমাজ নারীদের অধিকার প্রদান না করে উল্টো তা অস্বীকার করতে লাগল। তখন নারীদের উপর নেমে আসল অত্যাচারের অন্ধকার বিভীষিকা। এই জুলুম ও নির্যাতন চালানোর ক্ষেত্রে পুরুষ অস্ত্র হিসাবে বেছে নিল ধর্মকে। এখন আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি কোন ধর্মে নারীর কি অবস্থান ছিল এবং কোন ধর্মের মাধ্যমে নারী কি কি নির্যাতনের শিকার হয়েছিল।

ইয়াহুদী ধর্মে নারী

ইয়াহুদী ধর্ম মতে মানব জাতির প্রথম সদস্য হযরত আদম আ. জান্নাতে মহা সুখে জীবন-যাপন করছিলেন। কারণ তিনি ছিলেন আল্লাহর অনুগত বান্দা। কিন্তু তার স্ত্রী হাওয়া আ. তাকে প্রথম আল্লাহর অবাধ্য হতে প্ররোচিত করেন, এবং তাকে এমন একটি ফল খাওয়ান যা খেতে আল্লাহ তাকে নিষেধ করেছিলেন। ফলে তিনি আল্লাহর সব নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হোন।

বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে লিপিবদ্ধ আছে যে, ‘মহান আল্লাহ হযরত আদম আ. কে জিজ্ঞেস করলেন, যে বৃক্ষের ফল ভোজন করিতে আমি তোমাকে নিষেধ করিয়াছিলাম তুমি কি তার ফল ভোজন করিয়াছ? আদম কহিলেন, তুমি আমার সঙ্গিনী যে স্ত্রী দিয়াছ, সে আমাকে ঐ বৃক্ষের ফল দিয়াছিল, তাই আমি উহা ভোজন করিয়াছি। এরপর আল্লাহ হাওয়াকে বলিলেন, আমি তোমার গর্ভবেদনা অতিশয় বৃদ্ধি করিয়া দিব, তুমি বেদনাতে সন্তান প্রসব করিবে, স্বামীর প্রতি তোমার বাসনা থাকবে। সে তোমার উপর কর্তৃত্ব করিবে।’

অন্য কথায় হাওয়া আ. আদম আ. কে পথভ্রষ্ট করে যে অপরাধ করেছিলেন আল্লাহর তরফ থেকে তার সেই অপরাধের শাস্তি হলো প্রসবকালীন কষ্ট এবং তার উপর পুরুষের স্থায়ী কর্তৃত্ব। পুরুষ কেয়ামত পর্যন্ত এই কর্তৃত্ব চালাতেই থাকবে।

এর ফলশ্রুতিতে ইয়াহুদী সমাজে নারীকে ক্রীতদাস না হলেও চাকরানীর পর্যায়ে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে বাপ তার নিজ কন্যাকে নগদ মূল্যে বিক্রি করতে পারত। মেয়ে কখনও পিতার সম্পত্তি থেকে মিরাস লাভ করত না। মিরাস তখনই পেত যখন পিতার কোন পুত্র সন্তান না থাকত। ইয়াহুদী ধর্মে নারীকে পুরুষের প্রতারক বলে অভিহিত করা হয়েছে। এজাতীয় আরও অসংখ্য বিষয় আছে যার দ্বারা ইয়াহুদী ধর্মের নারীগণ বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুকেই শ্রেয় মনে করত।

খৃষ্ট ধর্মে নারী

নারীকে খৃষ্ট ধর্মে যতদূর নীচে নিক্ষেপ করা যায় নিক্ষেপ করা হয়েছিল। নারী সম্পর্কে এ ধর্মের অনুভূতি খৃষ্ট ধর্মগুরু তারতুলীনের নিম্নোক্ত বর্ণনা থেকে অনুমান করা যায়ঃ

‘হে নারীকুল! তোমরা জান না যে তোমাদের প্রত্যেকেই এক একজন হাওয়া। তোমাদের জন্য আল্লাহর যে ফতোয়া ছিল তা যদি এখনও বর্তমান থাকে তাহলে উক্ত অপরাধ প্রবণতাও তোমাদের মধ্যে বর্তমান আছে। তোমরা তো শয়তানের দরজা, তোমরাই খোদার প্রতিচ্ছবি পুরুষদের ধ্বংস করেছ।’

পাশ্চাত্য জগত খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর নারী বিদ্বেষী যাজকদের মতামত দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাই ৫৮৭ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে আলোচ্য বিষয় ছিল, নারীকে কি মানুষ বলে বিবেচনা করা হবে না কি অমানুষ? অবশেষে স্থির হয় যে, সে মানুষ বটে তবে তার সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে পুরুষদের সেবা করা । ১৮০৫ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ আইনে স্ত্রীকে বিক্রি করে দেওয়ার অধিকার স্বামীর জন্য সংরক্ষিত ছিল।

পঞ্চম শতাব্দীতে খৃষ্ট ধর্ম পরিচালিত মাকোন একাডেমী এ বিষয়ে গবেষণা চালায় যে, নারী কি আত্মাহীন দেহ, না কি তার আত্মা আছে? গবেষণা শেষে একাডেমী এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যে, একমাত্র মসীহের মাতা মরিয়ম ব্যতীত আর কোন নারীই দোজখ হতে মুক্তির নিশ্চয়তা প্রাপ্ত আত্মার অধিকারিণী নয়।

হিন্দু ধর্মে নারী

হিন্দু ধর্মে নারীদের মর্যাদা চরমভাবে ক্ষুণ্ন করা হয়েছে। ধর্মীয় দৃষ্টিতে নারীদেরকে মানুষের কাতারে গণ্যই করা হয়নি। পিতা-মাতার সম্পত্তি থেকেও তাদেরকে বঞ্চিত করা হয়েছে। তালাকের ব্যাপারে তাদের কোন অধিকারই দেয়া হয়নি। এমন কি স্বামীর মৃত্যুর পরে স্ত্রীর বয়স যত কমই হোক না কেন তার অন্যত্র বিবাহের কোন ব্যবস্থা নেই। এ কারণেই পূর্বের যুগে কোন হিন্দু মহিলার স্বামী মারা গেলে সাথে সাথে ঐ মহিলাও আত্মহত্যা করে এরূপ করুণ অবস্থা থেকে মুক্তি লাভ করত।

হিন্দু আইনে নারীর কোন মূল্য নেই, সে একমাত্র অস্থাবর সম্পত্তি মাত্র। ধর্ম ও শিক্ষায় তার কোন অধিকার নেই। সে বেদ পাঠ করতে পারে না। এমন কি পূজা উৎসর্গ করাও তার জন্য নিষিদ্ধ। ব্রত পালন করা নারীর জন্য পাপের কাজ। জনৈক ব্রাহ্মণ নারী জাতি সম্পর্কে নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেন,

নদী, সশস্ত্র সৈনিক, শিং ও নখযুক্ত জন্তু, শাসক এবং নারীকে বিশ্বাস করা উচিত নয়। মিথ্যা কথা বলা, অগ্র-পশ্চাত না ভেবে কাজ করা, ধোঁকাবাজি, অহমিকা, লোভ, অপবিত্রতা, নিষ্ঠুরতা নারীর স্বভাবজাত দোষ। এক কথায় হিন্দু ধর্মে নারীকে বস্তু ও পশুর সহিত তুলনা করা হয়েছে।

বৌদ্ধ ধর্মে নারী

বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ নারী জাতির জন্য কিছুই করে যাননি। কোন কিছু করার প্রয়োজনও বোধ করেননি। একদিন বুদ্ধের এক শিষ্য তাকে জিজ্ঞেস করলেন, নারী জাতির সাথে কেমন ব্যবহার করতে হবে?

বুদ্ধ উত্তরে বললেন "নারীর প্রতি দৃষ্টি দেওয়াও মানবীয় পবিত্রতার পরিপন্থী" অন্য এক সময় তিনি আরও বলেছেন, নারীদের সাথে কোনরূপ মেলা মেশা করো না এবং তাদের প্রতি কোন অনুরাগ রেখো না। আর তাদের সাথে কথা বার্তাও বলো না। কেননা পুরুষের পক্ষে নারী ভয়ঙ্কর বিপদ স্বরূপ। নারী তার মনোহর কমনীয় ভঙ্গি দ্বারা পুরুষের বিশ্বাস ধন লুটে নেয়। নারী একটি সশরীরী ছলনা মাত্র।

সুতরাং নারী থেকে বাঁচার চেষ্টা কর। বৌদ্ধ ধর্মে আরো বলা হয়েছে যে, "নারীর সঙ্গে বাস করা অপেক্ষা বাঘের মুখে চলে যাওয়া কিংবা জল্লাদের ছুরির নিচে মাথা পেতে দেওয়া উত্তম"। সুতরাং যে ধর্মে নারী সম্পর্কে এ কথা বলে সে ধর্ম নারীকে কোন শান্তি, মর্যাদা দিতে পারে না।

ইসলাম পূর্বে নারী

ইসলাম পূর্বের আরবের অধিবাসীরা নারীর অস্তিত্বকে লজ্জাজনক ও লাঞ্ছনাকর মনে করত। কন্যাসন্তানের জন্মই ছিল তাদের জন্য গভীর দুঃখ ও মনঃকষ্টের কারণ। পুত্রসন্তান নিয়ে তারা গর্ব ও অহংকার করত। আর কন্যাসন্তানের অস্তিত্ব তাদের মর্যাদাকে ভুলুণ্ঠিত করত। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের এই অনুভূতি ও মনঃকষ্টের বর্ণনা দিতে গিয়ে ইরশাদ করেন,

﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُۥ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾ يَتَوَٰرَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوٓءِ مَا بُشِّرَ بِهِۦٓ ۚ أَيُمْسِكُهُۥ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُۥ فِى ٱلتُّرَابِ ۗ أَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾

যখন তাদের কাউকে কন্যাসন্তান (জন্ম গ্রহণ) এর সুসংবাদ দেওয়া হয় তখন তার চেহারা মলিন হয়ে যায় এবং সে মনে মনে দুঃখ-ক্লিষ্ট হয়। সে এ সুসংবাদকে খারাপ মনে করে মানুষ থেকে লুকিয়ে বেড়ায়। (এবং চিন্তা করে) হীনতা স্বীকার করে তাকে নিজের কাছে রেখে দিবে নাকি তাকে মাটিতে পুঁতে ফেলবে। লক্ষ্য কর, সে কত নিকৃষ্ট সিদ্ধান্ত স্থির করেছিল। [সূরা নাহল: ৫৮-৫৯]

নারীর প্রতি তাদের ঘৃণা ও অবজ্ঞা এমন চরমে পৌঁছেছিল যে, কারো ঘরে কন্যাসন্তান জন্ম হলে ঐ ঘরটিকে সে অলক্ষুণে ঘর মনে করতো এবং সে ঘর পরিত্যাগ করত।

এর চেয়ে বড় কথা হল এই যে, মেয়েদের জন্য তাদের হৃদয়ে দয়া মায়া ও স্নেহ-মমতার কোন অনুভূতিই ছিল না। তা না হলে নিজের জীবিত সন্তানকে জিন্দা দাফন করা কোন ভাবেই সম্ভব হতো না।

তাদের সেই চরম নিষ্ঠুরতার কাহিনী হাদীস ও ইতিহাসের কিতাবে বিস্তারিত লেখা রয়েছে, যার একটিও এমন নেই যে, কোন পাষাণ হৃদয় ব্যতীত কোন ব্যক্তির চোখের অশ্রু ঝরবে না।

ইসলামে নারী

জাহেলী যুগের বর্বরতার কঠিন বিভীষিকাময় অবস্থা থেকে নারীকে একমাত্র ইসলামই মুক্তি দিয়েছে। দিয়েছে তাকে সবচেয়ে বড় অধিকার বেঁচে থাকার অধিকার। মহান আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন।

﴿ وَإِذَا ٱلۡمَوۡءُۥدَةُ سُئِلَتۡ ۝٨ بِأَيِّ ذَنۢبٖ قُتِلَتۡ ﴾

অর্থাৎ যখন জীবিত কবরস্ত মেয়েকে জিজ্ঞাসা করা হবে কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল? [সূরা তাকবীর: ৮-৯]

অর্থাৎ নিরপরাধ মেয়েকে হত্যা করে কেউ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের শাস্তি থেকে নিস্তার পাবে না। এবং তাকে দিয়েছেন ঠিক ততটুকু অধিকার যতটুকু অধিকার তার উপর পুরুষকে দিয়েছেন। এজন্য আল্লাহ পাক সূরা বাকারার দুইশত আটাশ নম্বর আয়াতে বলেন,

﴿ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ ﴾

অর্থাৎ নারীদের অধিকার আছে পুরুষদের উপর যেমন পুরুষদের অধিকার আছে নারীদের উপর। [সূরা বাকারা: ২২৮]

অর্থাৎ একজনের উপর আরেক জনের অধিকারের ক্ষেত্রে সমান অধিকার দিয়েছেন। কেননা আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন সর্বাধিক ইনসাফগার তার পক্ষ হতে অন্যায় অবিচার হওয়া কল্পনাও করা যায় না।

এবার আসুন আমরা আলোচনা করি এই অধিকার কিভাবে অর্জন করা যাবে। আমরা আগেই বলেছি নারী-পুরুষকে আল্লাহ তায়ালা ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্ব দিয়ে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। এখন প্রত্যেকে যদি নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে তাহলেই অপর জনের অধিকার আদায় হয়ে যাবে।

এর ব্যাখ্যায় আমি বলব, পুরুষ এবং নারীর একের উপর অপরের কি কি অধিকার রয়েছে তা প্রথমে জেনে নেয়া দরকার। আর তা হল নারীর উপর পুরুষের অধিকার হল নারী গর্ভে সন্তান ধারণ করবে, সন্তান লালন-পালন করবে এবং ঘরে পুরুষের যে মাল-সম্পদ রয়েছে তার হেফাজত করবে এবং নিজের সতীত্বও রক্ষা করবে। পক্ষান্তরে পুরুষের উপর নারীর অধিকার হল নারীর ভরণ-পোষণ, বাসস্থান ও চিকিৎসা ইত্যাদি যাবতীয় মৌলিক অধিকার এর ব্যয়-ভার বহন করবে।

সুতরাং এর দ্বারা বুঝা যায়, প্রত্যেকে যদি নিজ দায়িত্ব পালন করে তাহলে অপরজন তার পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত হবে, এটাই আল্লাহর পক্ষ হতে বিশ্ববাসীর জন্য জারিকৃত নিজাম। এর বিপরীত হলেই যে কোন এক জনের প্রতি জুলুম বা অবিচার হতে বাধ্য।

যেমন ধরুন, সংসারে উপার্জনের দায়িত্ব পুরুষের। এখন যদি মহিলাকে উপার্জন করতে বলা হয় তাহলে এটা তার উপর জুলুম ব্যতীত আর কিছুই নয়। কারণ তার নিজের যে দায়িত্বগুলো আছে সেগুলো এমন যে সৃষ্টিগতভাবেই তা কোন পুরুষের পক্ষে পালন করা সম্ভব নয়। যেমন সন্তান গর্ভে ধারণ করা ও সন্তানকে মাতৃস্নেহ দেওয়া ইত্যাদি। সুতরাং এখন পুরুষের উপর অর্পিত দায়িত্বও যদি তার উপর চাপিয়ে দেয়া হয় তাহলে এর চেয়ে বেইনসাফী আর কী হতে পারে?

আর এজন্যই আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন, হে নারী! তুমি ঘরে বসে তোমার দায়িত্ব পালন কর, পুরুষ উপার্জন করে তোমার অধিকার আদায় করতে বাধ্য। এর দ্বারা বুঝা গেল, ঘরে বসেই নারী তার অধিকার প্রাপ্ত হবে।

বর্তমানে তথাকথিত নারী স্বাধীনতার নামে যারা নারীকে ঘরের বাইরে গিয়ে উপার্জন করতে দেয়ার অধিকারকে নারী অধিকার বলে চালিয়ে দিতে চাচ্ছে তারা কি নারীকে তার ঘরের ভেতরের দায়িত্ব থেকে মুক্ত করতে পেরেছে? না তা কখনো করা সম্ভব? কারণ পুরুষের পক্ষে গর্ভধারণ করা, সন্তানকে দুগ্ধ দান করা অসম্ভব। সুতরাং নিজের দায়িত্ব পালন করে তারপর অন্যের দায়িত্ব পালন করা কি স্বাধীনতা না কি দ্বিগুণ পরাধীনতা? আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার তাওফীক দান করুন।

লেখক: মুহাদ্দিস, জামিয়া দারুল উলূম আল ইসলামিয়া দিলুরোড ঢাকা

ইসলামে শিক্ষার গুরুত্ব

মাওলানা দিলাওয়ার হুসাইন

মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত। সৃষ্টির সেরা জীব। এ শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র যোগ্যতা স্বাধীনভাবে জ্ঞান অর্জনের সামর্থ্য। পার্থিব জীবনের যে কোন প্রয়োজনে নিজেদের মত করে সিদ্ধান্ত নেয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্যই আল্লাহ এ যোগ্যতা মানবজাতিকে দান করেছেন। যে শক্তির সঠিক ব্যবহারের মধ্য দিয়ে মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাতের সাফল্য অর্জন করতে পারে। আবার অপপ্রয়োগের মাধ্যমে তার কপালে জুটতে পারে যাবতীয় ব্যর্থতা, বঞ্চনা। মানুষ ছাড়া অন্য কোন প্রাণীর এই যোগ্যতা নেই। তাদের জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সকল উপকরণই তাদের ঘনিষ্ঠ করে দেওয়া হয়েছে। যেমন, শীত-গরম থেকে আত্মরক্ষার জন্য পশম, অন্ধকারে পথ দেখার জন্য চোখে বিশেষ আলোকশক্তি দান করা হয়েছে। তাছাড়া জীবনের যে কোন প্রয়োজন পূরণের জন্য সংশ্লিষ্ট উপাদান সামগ্রী তাদের অস্তিত্বেই বিদ্যমান। পক্ষান্তরে মানবজাতির আছে শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণের এক ঐতিহ্যময় সমুন্নত পদ্ধতি, যার মাধ্যমে যে কোন অজানাকে জানার দ্বার শুধু উন্মোচিতই হয় নি; বরং জানা বিষয়কে কাজে লাগিয়ে বস্তুর সর্বোচ্চ সেবা গ্রহণের মহা সুযোগও সৃষ্টি হয়েছে। বস্তুর পূর্ণ মাত্রার ব্যবহার ও বস্তুতে সর্বোচ্চ উপযোগ সৃষ্টির যোগ্যতা আছে বলেই আল্লাহ পৃথিবীর শাসন ও নিয়ন্ত্রণের ভার মানব জাতির উপর অর্পণ করেছেন। পৃথিবীর শাসন ক্ষমতা নিরঙ্কুশভাবে মানুষের হাতে অর্পণের ঘোষণা দিতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, 'স্মরণ করুন আপনার প্রভু যখন ফেরেশতাদেরকে বললেন, নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে (আমার) প্রতিনিধি সৃষ্টি করবো।' [সূরা বাকারাঃ ৩০]

আয়াতে মূলত 'খলিফা' বলার মধ্য দিয়ে মানব জাতিকে পার্থিব নেতৃত্বের সামগ্রিক কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়েছে। পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব যথাযথভাবে আঞ্জাম দেওয়ার জন্য জ্ঞান ও জ্ঞান চর্চার বিকল্প নেই । আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম আ. কে ইলম শিক্ষা দিয়ে এই বাস্তবিক সত্যটি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাই হেরা গুহায় নবী কারীম সা. এর উপর সর্ব প্রথম যে ওহী নাযিল হয় তাতেও জ্ঞান চর্চার কথাই বলা হয়। ইরশাদ হয়েছে, 'পড় তোমার প্রতিপালকের নামে।' [সূরা আলাকঃ ১]

উল্লেখ্য ইলমের মাধ্যমে যখন মানুষের মাঝে আল্লাহর পরিচয় আসে তখন সে প্রকৃত মানুষ হয়। আর কেউ ইলম বিমুখ হয়ে চলতে চাইলে শয়তানের সহজ শিকারে পরিণত হয়। বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, শিক্ষা মৌলিকভাবে দুই

প্রকার। যথা: জাগতিক শিক্ষা ও দ্বীনী শিক্ষা। মানুষের জাগতিক প্রয়োজন পূরণের উপযোগী শিক্ষা হচ্ছে জাগতিক শিক্ষা। যেমন বিজ্ঞান, চিকিৎসা, গণিত ইত্যাদি। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টির বিদ্যা হচ্ছে দ্বীনী শিক্ষা, যে শিক্ষার মূল সূত্র ওহীয়ে এলাহী।

জাগতিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

আল্লাহ্ তায়ালা দুনিয়াকে দারুল আসবাব বানিয়েছেন। এখানে মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজন রয়েছে। এই প্রয়োজনগুলো পূরণের জন্য এবং নিজেদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে আঞ্জাম দেওয়ার জন্য মানুষকে দান করা হয়েছে, পঞ্চেন্দ্রিয় ও জ্ঞান বুদ্ধি। ইসলাম এগুলোকে কাজে লাগানোর প্রতি পূর্ণমাত্রায় গুরুত্ব দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে ইমাম গাজ্জালী রহ. বলেন, অনুমোদিত জাগতিক জ্ঞান দুই প্রকার।

১. যা চর্চা করা অপরিহার্য ২. যা চর্চা করা উত্তম। প্রথম প্রকার হচ্ছে ঐ সব জ্ঞান যা জীবন যাপনের ক্ষেত্রে অপরিহার্য। যেমন, চিকিৎসা বিদ্যা। কেননা স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য এই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। তদ্রূপ গণিত। কেননা লেনদেন, মিরাস বণ্টন, ইত্যাদি বিষয়ে তা অতি প্রয়োজন। পুরো এলাকায় যদি এই জ্ঞানের কোন লোক না থাকে তাহলে সকলেই কষ্টে পতিত হবে। একইভাবে কৃষি বিদ্যা ও রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদির মৌলিক পর্যায়ের জ্ঞান থাকা অপরিহার্য।

পক্ষান্তরে যে শিক্ষা মানুষকে কুফর-নাস্তিকতা ও খোদাদ্রোহিতার দিকে নিয়ে যায় তা শিক্ষা করা হারাম। যেমন- ইসলাম বিরোধী প্রাচীন ও আধুনিক দর্শন, কুফরী সাহিত্য ইত্যাদি। তদ্রূপ অকল্যাণকর ও অপ্রয়োজনীয় যে কোন জ্ঞান চর্চা করা নিষেধ।

মোটকথা, পার্থিব জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় ও কল্যাণকর জ্ঞান অর্জন করা ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে নিষিদ্ধ নয়, তাই জাগতিক জ্ঞান বিজ্ঞানকে মৌলিকভাবে অনৈসলামিক মনে করার অবকাশ নেই। তবে আমাদের দেশের জাগতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণের ফলে শিক্ষার পরিবেশে নাস্তিকতা ও ধর্মহীনতার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। যা একটি মুসলিম দেশের জন্য সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত।

এ প্রসঙ্গে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, জাগতিক জ্ঞান ও কলা কৌশল অর্জন করার একটি খালেস দ্বীনী দিকও রয়েছে। সে ক্ষেত্রে তা দ্বীনী খিদমত হিসাবেই গণ্য হয়ে থাকে। যেমন বলা যায়, বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষের যুগে মুসলমানদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান ও

সামরিক শক্তিতে সর্বোচ্চ পারদর্শিতা প্রয়োজন। কুরআন মাজীদে মুসলমানদেরকে আদেশ করে বলা হয়েছে তোমরা তোমাদের সাধ্যমত 'সামরিক' শক্তি অর্জন কর। [সূরা আনফালঃ ৬০]

অতএব ইসলামের খেদমতের উদ্দেশ্যে আধুনিক প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ হওয়ার লক্ষ্যে জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা করা হলে সেটা আর দুনিয়াবী কাজ থাকে না, সম্পূর্ণরূপে ইসলামের খেদমত হিসাবে গণ্য হয়।

দ্বীনী শিক্ষার গুরুত্ব

দুনিয়ার নিজাম ও ব্যবস্থাপনা ঠিক রাখার জন্য জাগতিক শিক্ষার যেমন প্রয়োজন তেমনি দ্বীনের হেফাজতের জন্য এবং দুনিয়ার সকল কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টি মোতাবেক হওয়ার জন্য দ্বীনী শিক্ষার প্রয়োজন। মুসলিম সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষ যেন দ্বীন মোতাবেক চলতে পারে এবং হারাম থেকে বেঁচে হালালভাবে জীবন যাপন করতে পারে, সে জন্য কুরআন সুন্নাহে পারদর্শী একটি জামায়াত বিদ্যমান থাকা অপরিহার্য। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে, কেন বের হয় না প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে একটি দল যাতে তারা দ্বীনের তাফাক্কুহ অর্জন করে এবং সতর্ক করে তাদের জাতিকে যখন তারা ফিরে আসে তাদের নিকট যেন তারা সাবধান হতে পারে। [সূরা তাওবাঃ ১২২]

এ জন্য প্রত্যেক জনপদে দ্বীনী ইলমে পারদর্শী ব্যক্তিত্ব থাকা ফরজে কেফায়া। আর এই উদ্দেশ্যে দ্বীনী ইলমের চর্চা অব্যাহত রাখা সমাজের অপরিহার্য কর্তব্য। কুরআন সুন্নাহর চর্চা ও অনুসরণের অভাব হলে সমাজের সকল অঙ্গনে দুর্নীতি ও অনাচার দেখা দিবে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে সমাজ যতই উন্নতি লাভ করুক ঈমান ও আল্লাহর ভীতি না থাকলে তা মানুষের ক্ষতি ও অকল্যাণ ডেকে আনবে। মানুষের সকল আবিষ্কার অর্থপূর্ণ ও কল্যাণমুখী করার জন্যই অপরিহার্য প্রয়োজন ইলমে ওহীর চর্চা। তদ্রূপ কুরআন সুন্নাহর অবিকল ইলমকে রক্ষার জন্য বিশেষজ্ঞ আলেম তৈরি করা অপরিহার্য। ইসলামের অপব্যাখ্যা ও বিভিন্ন বাতিল মতবাদের স্বরূপ উন্মোচন করে সঠিক ইসলামী শিক্ষা ও ইসলামী চিন্তাধারা পরবর্তী প্রজন্মের নিকট পৌঁছে দেয়াই আলেমদের দায়িত্ব।

দ্বীনী শিক্ষার ফজিলত

এ শিক্ষার বিষয়বস্তু যেহেতু সরাসরি দ্বীনের সাথে সম্পৃক্ত তাই এর ফজিলতও অন্যান্য শিক্ষার তুলনায় বেশী। নিম্নে এ সংক্রান্ত কিছু কুরআনের আয়াত ও হাদীস উল্লেখ করা হল।

১. পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন, তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে ইলম দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদের সুউচ্চ মর্যাদায় ভূষিত করবেন। [সূরা মুজাদালাঃ ১১]

২. রাসূল সা. বলেন, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি যে কুরআন শিক্ষা করে এবং শিক্ষা দেয়। [সহীহ বুখারী, হাদীসঃ ৫০২৭]

৩. রাসূল সা. এরশাদ করেন যে ব্যক্তি ইলম শিক্ষার জন্য কোন পথ অবলম্বন করে আল্লাহ তায়ালা তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। [সহীহ মুসলিম, হাদীসঃ ২৬৯৯]

৪. রাসূল সা. এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ তায়ালা ঐ ব্যক্তির চেহারা উজ্জ্বল করুন, যে আমার কোন হাদীস শুনেছে অতঃপর অন্যের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। [আবু দাউদ, হদীসঃ ৩৬৬০]

৫. রাসূল সা. এরশাদ করেন, আল্লাহ্ তায়ালা যার কল্যাণ কামনা করেন তাকে দ্বীনের প্রজ্ঞা দান করেন। [সহীহ্ বুখারী, হাদীসঃ ৭১]

তবে দ্বীনী ইলমের উপরোক্ত ফজিলত লাভের জন্য শর্ত হল ইখলাস। শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এই ইলম অর্জন করতে হবে। পার্থিব কোন উদ্দেশ্যে তা অর্জন করা যাবে না। পার্থিব সুনাম সুখ্যাতির উদ্দেশ্যে দ্বীনী ইলম অর্জন করা হলে তার পরিণাম হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। হাদীস শরীফে এসেছে, জাহান্নামে সর্বপ্রথম নিক্ষিপ্ত তিন ব্যক্তির একজন হবে ঐ আলেম যে লোকের কাছে আলেম হিসাবে পরিচিতি পাওয়ার জন্য ইলম চর্চা করেছে। আল্লাহ্ পাক আমাদের সকলকে দ্বীনী শিক্ষা ও জাগতিক শিক্ষা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য শিক্ষা লাভের তৌফিক দান করুন! আমীন।

লেখক: মুহাদ্দিস, জামিয়া দারুল উলূম আল ইসলামিয়া দিলুরোড ঢাকা

উলূমুল হাদীস ক্রমবিকাশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

মাওলানা মুস্তাফিযুর রহমান

উলূমুল হাদীস বলতে হাদীসের সাথে সংশ্লিষ্ট আলোচনা ও নীতিমালার সমষ্টিকেই বুঝানো হয়ে থাকে। সনদ, মতন, বর্ণনাকারীদের ইতিহাস, তাদের সাথে সম্পর্কিত আলোচনা-সমালোচনা, তাদের বিশ্বস্ততা-অবিশ্বস্ততা, বর্ণিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা ও অগ্রহণযোগ্যতা ইত্যাকার বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট যে আলোচনা; তার সূত্রপাত হিজরী প্রথম শতকের মধ্যভাগ থেকেই শুরু হয়। তবে তা পৃথক একটি বিষয় হিসাবে পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হতে প্রায় অষ্টম-নবম শতাব্দী পর্যন্ত সময় লেগে যায়।

বস্তুত রাসূল সা. এর হাদীসসমূহ বর্ণনা ও আহরণের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণ যে সতর্কতা ও যাচাই-বাছাইয়ের প্রক্রিয়া অবলম্বন করেছেন, সেগুলোই ক্রমান্বয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে মূলনীতি হিসাবে অনুসৃত হয়েছে। সেই সব মূলনীতি ক্রমান্বয়ে বিস্তৃত ও সম্প্রসারিত হয়ে এক সময় তা স্বতন্ত্র নীতিমালারূপে পরিগণিত হয়েছে। পরে তা খণ্ড খণ্ড পুস্তিকারূপে প্রকাশিত হয়েছে। এক কালে সেটি উসূলে হাদীস বা হাদীস আহরণ ও অধ্যয়নের মূলনীতি নামে একটি পৃথক বিষয়ের রূপ লাভ করেছে।

হাদীস বর্ণনা ও আহরণের ক্ষেত্রে যাচাই-বাছাই-এর বিষয়টি সাহাবীগণের যুগেই সূচিত হয়। যেমন হযরত উমর রা. ও হযরত আবু মূসা রা. এর মাঝে ঘটে যাওয়া সালাম সংক্রান্ত ঘটনাটি এ বিষয়ের একটি উল্লেখযোগ্য প্রমাণ।

হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে বর্ণনাকারীগণের শুদ্ধা-শুদ্ধি যাচাইয়ের বিষয়টি সাহাবীগণের যুগেই সূচিত হয়েছিল বলা যায়। যেমন আবু দাউদ তায়ালেসী মকহুলের সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে, হযরত আয়েশা রা. কে বলা হল,

إن أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الشُّؤْمُ فِي ثلاثة فِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ

এ শুনে হযরত আয়েশা রা. বললেন, আবু হুরায়রা হাদীসটি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে পারেনি। কেননা তিনি যখন দরবারে প্রবেশ করেছিলেন তখন রাসূল সা. বলছিলেন-

قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ يقولون : الشُّؤْمُ فِي ثلاثة فِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ

আবু হুরায়রা হাদীসের শেষ অংশ শুনতে পেয়েছে, তবে শুরু অংশ শুনতে পায়নি। এ থেকে বুঝা যায় যে, হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে কেউ কোনরূপ ভুল করলে সে ভুল সনাক্ত করার ক্ষেত্রে তারা মোটেই কার্পণ্য করতেন না।

সাহাবীগণ যেহেতু সকলেই সর্বোচ্চ বিশ্বস্ততার প্রতীক ছিলেন তাই বর্ণনাকারীদের বিশ্বস্ততার বিষয়ে কোনরূপ মন্তব্য করার প্রয়োজন তখন ছিল না। তবে শব্দ বর্ণনায় কেউ ভুল করলে কিংবা ভাব বর্ণনায় কেউ অজ্ঞাতসারে কোন ভুল করে বসলে সেগুলো চিহ্নিত করতে তারা সদা তৎপর ছিলেন।

তাবেয়ীনদের মাঝেও দুর্বল বর্ণনাকারীর সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য ছিল। যেমন, হারেস আল-আ'ওয়ার, মুখতার আল-কাযযাব। বস্তুত তাদের অধিকাংশই ছিলেন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য। তাদের মাঝে অনেকেই আবার ভুল-শুদ্ধ নিরূপণের ক্ষেত্রে খুবই পারদর্শী ছিলেন।

ইবনে আদী কামিলের মুকাদ্দামায় সাহাবীদের মাঝে যারা ব্যক্তির নির্ভরযোগ্যতা যাচাই-বাছাই (توثيق وتخريج) ও ভুল-শুদ্ধ নিরূপণে পারদর্শী ছিলেন, তাদের কতিপয়ের নাম উল্লেখ করেছেন। যথাঃ হযরত উমর রা., হযরত আলী রা., ইবনে আব্বাস রা., আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রা., উবাদাহ ইবনুস সামেত রা., আনাস রা., আয়েশা রা. প্রমুখ। আর তাবেয়ীনদের মাঝে যারা এ বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন তাদের মাঝে শা'বী, ইবনে সিরীন, সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব ও উরওয়া ইবনুয যুবায়র রহ. প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তাবেয়ীনদের প্রথম যুগে দুর্বল বর্ণনাকারীর সংখ্যা তেমন একটা পরিলক্ষিত না হলেও তাবেয়ীনদের মধ্যযুগে বেশ কিছু দুর্বল বর্ণনাকারীর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। তবে তাদের দুর্বলতার বিষয়টি ছিল ضبط و تحمل বা স্মৃতিদৌর্বল্যের সাথে সংশ্লিষ্ট। বস্তুত তাবেয়ীনদের শেষ যুগ থেকেই বর্ণনাকারীদের যাচাই-বাছাই এবং তাদের বিশ্বস্ততা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে ব্যাপকভাবে মন্তব্য করা শুরু হয়। যেমন ইমাম আবু হানীফা রহ. বলতেন-

ما رأيت أكذب من جابر الجعفي

আমি জাবের জু'ফির চেয়ে বেশি মিথ্যাবাদী আর কাউকে দেখিনি। আ'মাশও বেশ কিছু বর্ণনাকারী সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। শু'বাও এ বিষয়ে মনোযোগী ছিলেন। ইমাম মালেকের নামও এক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

এ যুগে যাদের মন্তব্য নির্দ্বিধায় গ্রহণ করা হত, তাদের মাঝে মা'মার, হিশাম দাসতুয়ায়ী, আওযায়ী, সুফয়ান সওরী, ইবনে মাজিশুন, হাম্মাদ ইবনে সালামাহ,

লাইস ইবনে সা'দ এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বর্ণনাকারীদের যাচাই-বাছাই ও আলোচনা-সমালোচনার মধ্য দিয়ে কিছু কিছু নীতিমালা গড়ে ওঠে এবং কিছু কিছু পরিভাষার জন্ম হয়।

উলূমুল হাদীসের উপর সর্বপ্রথম সংকলিত গ্রন্থাবলী

শুরুর দিকে এইসব নীতিমালা মৌখিকভাবে আলোচিত হত এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা তা স্মৃতিতে ধারণ করে রাখতেন। তবে এগুলোর লিখিত কোন গ্রন্থ ছিল না।

দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষের দিকে উসূলে ফিকহের কিছু গ্রন্থে এ সকল নীতিমালার কিছু কিছু অধ্যায় পৃথকভাবে লিপিবদ্ধ করার কাজ শুরু হয়। প্রতি এক অধ্যায় সংক্রান্ত আলোচনাকে একটি বা দুইটি খণ্ড পুস্তিকা আকারে তখন লিপিবদ্ধ করা হত। তারিখে বাগদাদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইমাম আবু ইউসুফ (মৃত্যুঃ ১৮২হিঃ) এ সম্পর্কে একটি রিসালা সংকলন করেছিলেন। বলা যায় যে, এটিই এ বিষয়ে লিখা প্রথম গ্রন্থ। ইমাম শাফেয়ী রা. (মৃত্যুঃ ২০৪হিঃ) যিনি হাদীসের সাথে সংশ্লিষ্ট কতিপয় মূলনীতিগত আলোচনা তাঁর "রিসালাহ" নামক পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ আকারে পেশ করেছিলেন। তিনি তার সেই পুস্তিকায় মূলনীতি সংক্রান্ত প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনাই পেশ করেছিলেন। যেমন তাঁর উল্লিখিত বিষয়সমূহের মাঝে ছিল- ১. হাদীস প্রমাণযোগ্য হওয়ার শর্তাবলী ২. বর্ণনাকারীর হিফযের শর্তাবলী ৩. রিওয়ায়াত বিল মা'না বা হাদীসের অর্থ বর্ণনার বিধান ৪. মুদাল্লিসের হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে কি না ইত্যাদি। এ ছাড়াও তিনি খবরে ওয়াহিদ কাকে বলে, খবরে ওয়াহিদ প্রামাণিক ভিত্তি হওয়ার জন্য কি কি শর্ত রয়েছে, মুদাল্লিস নয় এমন ব্যক্তি শব্দযোগে হাদীস বর্ণনা করলে তা গ্রহণযোগ্য হওয়া এবং মুদাল্লিস হলে 'হাদ্দাসানি' বা 'সামি'তু' শব্দযোগে বর্ণনা না করলে তা গ্রহণ না করা, যার ভুল বেশী হয় তার হাদীস গ্রহণ করা না করা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কিত নীতিমালা তিনি তাঁর ঐ পুস্তিকায় উল্লেখ করেছিলেন। ইমাম শাফেয়ীর সমকালীন ব্যক্তি ঈসা ইবনে আবানেরও এ সংক্রান্ত একটি পুস্তিকা ছিল বলে আল্লামা জাসসাস তার 'আল-ফুসূল' এ উল্লেখ করেছেন।

তৃতীয় শতকের প্রথম দিকে ইমাম আলী ইবনুল মাদিনী বসরী (জন্ম- ১৬১ মৃত্যু- ২৩৪ হিঃ) উলুমূল হাদীসের প্রায় সকল অধ্যায় সম্পর্কেই ভিন্ন ভিন্ন পুস্তিকা রচনা করেছিলেন। আলী ইবনুল মাদিনী উলুমূল হাদীসের কোন্ কোন্ অধ্যায় সম্পর্কে পুস্তিকা তৈরি করেছিলেন, তার বিবরণ দিতে গিয়ে হাকেম আবু আব্দুল্লাহ রহ. তাঁর 'মারিফাতু উলূমিল হাদীস' গ্রন্থে কাজী আবুল হাসান মুহাম্মদ ইবনে সালেহ আল-হাশেমীর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন যে, আলী ইবনুল মাদিনীর এ সংক্রান্ত রচিত পুস্তিকাগুলোর শিরোনাম ছিল নিম্নরূপঃ

كتاب الأسامي و الكنى

كتاب الضعفاء

كتاب المدلسين

كتاب أول من نظر في الرجال وفحص عنهم

كتاب الطبقات

كتاب من روى عن رجل لم يره

كتاب علل المسند

كتاب العلل لاسماعيل القاضي

كتاب علل حديث ابن عيينة

كتاب من لا يحتج بحديثه ولا يسقط

كتاب الكنى

كتاب الوهم و الخطأ

كتاب قبائل العرب

كتاب التاريخ

كتاب العرض على المحدث

كتاب من حدث ثم رجع عنه

كتاب يحيى و عبد الرحمن في الرجال

كتاب سوالاته يحيى

كتاب الثقات و المثبتين

كتاب اختلاف الحديث

كتاب الأسامي الشاذة

كتاب الأشربة

كتاب تفسير غريب الحديث

كتاب الاخوة والأخوات

كتاب من يعرف باسم دون اسم أبيه

كتاب من يعرف باللقب

كتاب العلل المتفرقة

كتاب مذاهب المحدثين

كتاب من نزل من الصحابة سائر البلدان

উপরোল্লিখিত শিরোনামগুলো থেকে একথা সুস্পষ্টভাবে বোধগম্য হয়ে যায় যে, উলুমূল হাদীসের ক্ষেত্রে আলী ইবনুল মাদিনীর দক্ষতা ও পাণ্ডিত্য এবং এ বিষয়ে তার জ্ঞানের ব্যাপকতা কত ছিল।

অবশ্য খতীব বাগদাদী উল্লেখ করেছেন যে, আলী ইবনুল মাদিনীর এ সকল গ্রন্থাবলীর মাঝে চার পাঁচটি ছাড়া অবশিষ্টগুলোর কোন সন্ধান আমরা লাভ করতে পারিনি। অথচ তাঁর লিখা গ্রন্থসমূহের খণ্ড সংখ্যা দুইশর অধিক ছিল

শুরুর দিকে ইলমে হাদীসের প্রতিটি অধ্যায়ের জন্য একটি করে পৃথক গ্রন্থ তৈরি করার প্রবণতা ছিল। পরবর্তীকালে প্রতিটি আলোচনাকে এক একটি অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করে গ্রন্থ তৈরি করার প্রবণতা সৃষ্টি হয়। যেমন ইবনুস সালাহ রচিত 'মারিফাতু আনওয়াই উলূমিল হাদীস' গ্রন্থে এ প্রবণতাটি লক্ষ্য করা যায়।

তৃতীয় শতকের শুরুর দিকে এ বিষয় সংক্রান্ত আলোচনা-পর্যালোচনার বিস্তৃতি ঘটে। তৃতীয় শতকে যারা ব্যক্তির নির্ভরযোগ্যতা ও অনির্ভরযোগ্যতা নিয়ে আলোচনা করেছেন তাদের মাঝে ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন- মৃত্যুঃ ২৩৩ হিঃ, আলী ইবনুল মাদিনী- মৃত্যুঃ ২৩৪ হিঃ, আহমদ ইবনে হাম্বল- মৃত্যুঃ ২৪১ হিঃ, ইমাম বুখারী মৃত্যুঃ ২৫৬ হিঃ, আবু জা'ফর মুখাররামী মৃত্যুঃ ২৪২ হিঃ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাদেরকে ছাড়াও আরো অনেকেই এ বিষয়ে অবদান রেখেছেন।

এ যুগের অনেকেই হাদীস সংগ্রহ ও সংকলন করতে গিয়ে হাদীসের সনদ ও মতন সম্পর্কেও মন্তব্য করেছেন। তাদের মাঝে হাফেয মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে নুমায়ের কুফী (মৃত্যুঃ ২৩৪ হিঃ) ও হাফেয ইয়াকুব ইবনে শায়বা বসরী (মৃত্যুঃ ২৬২ হিঃ) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তাঁরা তাদের গ্রন্থে هذا حديث حسن الإسناد অথবা هو صحيح অথবা إسناده هو صالح أو صالح الإسناد কিংবা ليس بالثابت ولا بالساقط অথবা وسط ইত্যাদি মন্তব্য করেছেন। বস্তুত তৃতীয় শতকে বিষয়টি বলতে গেলে যথেষ্ট সমৃদ্ধি অর্জন করে। এবং এ বিষয় সংক্রান্ত আলোচনাগুলো হাদীসের গ্রন্থসমূহে, রিজালের গ্রন্থসমূহে কিংবা এ বিষয়ের প্রতি অধ্যায়ের উপর লিখা পৃথক গ্রন্থসমূহের আলোচনায় এসে গিয়েছিল।

এ ধরনের আলোচনা যাদের গ্রন্থসমূহে উল্লেখ রয়েছে তাদের মাঝে আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান দারেমী (জন্মঃ ১৮১ হিঃ মৃত্যুঃ ২৫৫ হিঃ) অন্যতম। তিনি মূলত ইমাম বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, আবু হাতেম রাযী প্রমুখ জগদ্বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণের উস্তাদ ছিলেন। তিনি তার কিতাব 'সুনানে দারেমী'র মুকাদ্দামায় এমন বেশ কিছু অধ্যায় উল্লেখ করেছেন, যেগুলো মৌলিকভাবে উলুমূল হাদীসের সাথেই সংশ্লিষ্ট।

ইমাম বুখারীর অন্যতম উস্তাদ হাফেয আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবায়র আল হুমাইদীও (মৃঃ ২১৯ হিঃ) পরিভাষা সংক্রান্ত একটি পুস্তিকা রচনা করেছিলেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। আবু বকর আল খতীব হুমাইদী থেকে এ ধরনের বেশ কিছু মূলনীতি 'কিফায়া ফি ইলমির রিওয়ায়াহ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ মৃঃ ২৬১ হিঃ ও তাঁর মুকাদ্দামায় উলুমূল হাদীস সংশ্লিষ্ট বহু বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করেছেন। আল্লামা কাওসারী মাকালাতে কাওসারীতে উল্লেখ করেছেন।

ومقدمة صحيح مسلم من أقدم ما سطره أئمة الحديث في التمهيد لقواعد المصطلح

كتاب التمييز لمسلم

মূলত হাদীস শাস্ত্রের ইমামগণ পরিভাষা সংক্রান্ত যেসব নিয়মনীতি ও ভূমিকামূলক রচনা গ্রন্থবদ্ধ করেছেন মুসলিমের মুকাদ্দামা বা ভূমিকা তার প্রথম সারির একটি।

অনুরূপভাবে ইমাম বুখারী রহ. (জন্মঃ ১৯৪ হিঃ মৃত্যুঃ ২৫৬ হিঃ) তাঁর সহীহ বুখারীতেও উলুমূল হাদীস সংক্রান্ত কিছু কিছু বাক্য উপস্থাপন করেছেন, যা হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষার সাথে সংশ্লিষ্ট। তাছাড়া তাঁর কিতাবুত তারীখ ও কিতাবুয যূ'আফাতেও এ সংক্রান্ত বিক্ষিপ্ত আলোচনা রয়েছে।

এমনভাবে আবুল হাসান আহমদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে সালেহ আল-ইজলী (মৃত্যুঃ ২৬১ হিঃ) রচিত 'কিতাবুস সিকাত' নামক গ্রন্থেও জরাহ, তা'দীল ও হাদীসের পরিভাষা সংক্রান্ত বেশ কিছু বাক্য বিদ্যমান রয়েছে।

আবু হাতেম রাযী, আবু যুরআ রাযী র. এর এ সংক্রান্ত বহু মূল্যবান আলোচনা আব্দুর রহমান ইবনে আবি হাতিম আল-ইলাম গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। অনুরূপভাবে ইমাম আবু যুর'আহ আদ-দামেশকী (জন্মঃ ২০০ হিজরীর পূর্বে মৃত্যুঃ ২৮১ হিঃ) রচিত তারীখে আবু যুর'আহতেও রিজাল ও হাদীসের পরিভাষা সংক্রান্ত বহু আলোচনা রয়েছে।

তাছাড়া উক্ত গ্রন্থে প্রখ্যাত তাবেয়ী মুহাম্মদ ইবনে শিহাব যূহরী (মৃত্যুঃ ১২৪ হিঃ) ইমাম আওযায়ী (মৃত্যুঃ ১৫৭ হিঃ) ইমাম মালেক (মৃত্যুঃ ১৭৯ হিঃ) সহ দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকের বহু মনীষীর হাদীসের পরিভাষা সংক্রান্ত বক্তব্যের উদ্ধৃতি রয়েছে।

এ সকল মনীষীদের বক্তব্যে নির্ভরযোগ্য ও অনির্ভরযোগ্য রাবীদের সনাক্তকরণ, তাদের ব্যাপারে আলোচনা-সমালোচনা, নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের কতিপয়ের উপর কতিপয়ের প্রাধান্য, হাফেয ও আহফাযের মাঝে এবং ফকীহ- এর মাঝে মর্যাদাগত পার্থক্য, তাহদীস, ইখবার, ইজাযত, উস্তাদের সামনে পঠন, উস্তাদ থেকে শ্রবণ, এ ক্ষেত্রে বর্ণনার পদ্ধতি, কিছু কিছু মুহাদ্দিসদের ব্যক্তিগত পরিভাষা, সাহাবীদেরকে সনাক্তকরণ, কারা নবীর সঙ্গপ্রাপ্ত, কারা সঙ্গপ্রাপ্ত নয়, বর্ণনাকারীদের বংশ পরিচয়, তাদের উপনাম, খেতাবী নাম, তাদের জন্ম-মৃত্যু তারিখ, তাদের উস্তাদগণের নাম এবং বিভিন্ন ভ্রান্ত ফিরকার সমালোচনা ইত্যাদি বিষয় স্থান পেয়েছে।

এছাড়াও ইমাম ইয়াকুব ইবনে সুফিয়ান (মৃত্যুঃ ২৭৭ হিঃ) ও আবু বকর আহমদ ইবনে আমর আল-বাযযার (মৃত্যুঃ ২৯০ হিঃ) প্রমুখ মনীষীদের গ্রন্থেও হাদীস

শাস্ত্রের পরিভাষা সংক্রান্ত আলোচনায় বিদ্যমান রয়েছে। অনুরূপভাবে ইমাম তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ তাদের গ্রন্থে হাদীসের ফাঁকে ফাঁকে যে সব মন্তব্য করেছেন, সেই সব মন্তব্যের মাঝেও কিছু কিছু মূলনীতির দিকে ইশারা রয়েছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. তাঁর কিতাবের শেষে আল-ইলাল নামে এ সংক্রান্ত একটি পরিশিষ্ট সংযোজন করে দিয়েছেন; যাতে উলূমুল হাদীস সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বহু বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ, রচিত ‘মুসনাদে আহমাদ’ নামক গ্রন্থেও হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষা সংক্রান্ত কিছু কিছু বিষয় উল্লিখিত হয়েছে।

তৃতীয় শতকের শেষের দিকে এবং চতুর্থ শতকের শুরু ভাগের অনেক মুহাদ্দিস ও ফিকাহবিদ হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষা সংক্রান্ত পৃথক পৃথক এক একটি বিষয় নিয়ে খণ্ড খণ্ড বহু পুস্তিকা রচনা করেন। যেমন ইমাম আবু জা'ফর আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আত-তাহাভী (মিসরী) (জন্মঃ ২৩৯ হিঃ মৃত্যুঃ ৩২১ হি:)-এর উলূমুল হাদীস সংক্রান্ত একটি পুস্তিকা ছিল; যাতে তিনি حدثنا ও أخبرنا এ দুই'য়ের মাঝে যে কোন পার্থক্য নেই এবং উস্তাদ থেকে শ্রবণ কিংবা সম্মুখে পঠন এই উভয় ক্ষেত্রে حدثنا ও أخبرنا এ দুই'য়ের যে কোন একটি যে ব্যবহার করা যায় একথা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন।

এভাবে চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত পরিভাষা সংক্রান্ত একেকটি বিষয়ের উপর আলোচনা সম্বলিত বহু পুস্তক রচিত হয় এবং বিভিন্ন আঙ্গিকে তা রচনা করা হয়। এ সকল রচনার মাঝ দিয়ে বহু মূলনীতি স্বীকৃত হয়ে পড়ে এবং সেগুলো দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। মূলনীতি ও তার শাখা-প্রশাখা সংক্রান্ত আলোচনাও বহু বিস্তৃত হয়ে পড়ে। চতুর্থ শতকের মধ্যভাগে এসে এ সকল বিষয় ভিত্তিক পুস্তিকা ও বিক্ষিপ্ত নীতিমালাসমূহকে একত্রিত করে এ বিষয়ে ধারাবাহিক পূর্ণাঙ্গ আলোচনাসমৃদ্ধ গ্রন্থ রচনার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়।

উলূমুল হাদীস সংক্রান্ত বিষয়ে সর্ব প্রথম যিনি পৃথকভাবে পূর্ণাঙ্গ ও ধারাবাহিক বর্ণনা সমৃদ্ধ সুবিন্যস্ত গ্রন্থ রচনা করেছিলেন তিনে হলেন কাজী আবু মুহাম্মদ আল-হাসান ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে খাল্লাদ রামাহুরমুযী (জন্মঃ ২৬৫ হিঃ মৃত্যুঃ ৩৬০ হিঃ আনুমানিক)। তিনি তাঁর এই প্রখ্যাত গ্রন্থের নামকরণ করেছিলেন, المحدث الفاصل بين الراوي والواعي। তিনি তাঁর এই গ্রন্থে বিভিন্ন কিতাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এ সংক্রান্ত মাসাইলগুলো একত্রিত করেছিলেন এবং কোন্ কোন্

বিষয়ে মুহাদ্দিসগণের ঐক্যমত্য রয়েছে এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে তাদের মতানৈক্য রয়েছে তাও উল্লেখ করেছিলেন।

তার পরবর্তীতে অনেকেই এধরনের গ্রন্থ সংকলনের প্রতি মনোনিবেশ করেন। হাফিয সিবত ইবনে আ'জমী উল্লেখ করেছেন যে, হাফেয আবু আবদুল্লাহ্ ইবনে মানদাহ্ (মৃত্যুঃ ৩৯৫ হিঃ) এরও একটি ছোট গ্রন্থ ছিল। যাতে তিনি কিরা'আত (قراءة) ও সামা (سماع)–র ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণের শর্তসমূহ এবং ইজাযত ও মুনাওয়ালাহ্ সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন।

তার পরবর্তীতে হাকেম আবু আবদুল্লাহ নিশাপুরী (জন্মঃ ৩২১ হিঃ মৃত্যুঃ ৪০৫ হিঃ) معرفة علوم الحديث নামে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন।

তারপর হাফেজ আবু নু'আয়ম ইস্পাহানী (জন্মঃ ৩৩৬ হিঃ মৃত্যুঃ ৪৩০ হিঃ) علوم الحديث নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। আল্লামা যাহাবী سير أعلام النبلاء নামক গ্রন্থে এ কিতাবটির কথা উল্লেখ করেছেন।

তার পরবর্তীতে হাফেয আবু বকর আহমদ ইবনে আলী (জন্মঃ ৩৯২ হিঃ মৃত্যুঃ ৪৬৩ হিঃ) যিনি খতীব বাগদাদী নামে খ্যাত, তিনি الكفاية في قوانين الرواية এবং الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع নামের দু'টি মূল্যবান গ্রন্থ সংকলন করেছিলেন। তিনি বিষয়টিকে বিস্তারিত ও পূর্ণাঙ্গরূপে সংকলিত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন এবং আলোচ্য বিষয়গুলোকে অধ্যায়ে অধ্যায়ে সুবিন্যস্ত করে উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট দক্ষতার স্বাক্ষর রাখেন। বলা যায় যে, তিনিই বিষয়টিকে প্রাথমিকভাবে পূর্ণাঙ্গ রূপ দান করেন। উলূমুল হাদীসের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর মাঝে খুব কম বিষয়ই ছিল, যে ব্যাপারে খতীব বাগদাদী একটি করে পৃথক কিতাব রচনা করেননি। হাফেয আবু বকর ইবনে নুকতা যথার্থই বলেছেন যে,

كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه

যারা ইনসাফের সাথে বিবেচনা করেন তারা জানেন, খতীব বাগদাদীর পরবর্তী সকল মুহাদ্দিসই তাঁর কাছে ঋণী।

একই সময়ে ইমাম আবু উমর ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আব্দুল বার (জন্মঃ ৩৬৮ হিঃ মৃত্যুঃ ৪৬৩ হিঃ) যিনি ইমাম ইবনে আব্দুল বার আন্দোলুসী নামে খ্যাত; তিনি তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ التمهيد لما في الموطا من المعاني و الأسانيد এর ভূমিকায় এ সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। হাফেজ ইবনুস সালাহ তাঁর

علوم الحديث গ্রন্থে হাফেয ইবনু আব্দিল বার থেকে পরিভাষা সংক্রান্ত বহু উদ্ধৃতি পেশ করেছেন। তথাপিও ইবনে হজর ইবনে আব্দুল বারের নাম তার তালিকায় উল্লেখ করেননি। তার পরবর্তীকালে কাজী ইয়ায ইবনে মূসা আল-মাগরেবী (জন্ম: ৪৭৯ হি: মৃত্যু: ৫৪৪ হি:) الإلماع إلى معرفة أصول الرواية و تقييد السماع নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

তার পরবর্তীতে আবু হাফস উমর ইবনে আব্দুল মজীদ মাইয়্যানিশী (মৃত্যু: ৫৮১ হি:) ما لا يسع المحديث جهله নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তার এই গ্রন্থে যথেষ্ট ভুল তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। সে হিসাবে এটি তেমন উল্লেখযোগ্য কোন গ্রন্থ না হলেও আল্লামা ইবনে হজর তাকে লেখকদের তালিকাভুক্ত করেছেন। আর সে কারণেই তিনি উল্লেখযোগ্যদের কাতারে শামিল হয়ে গেছেন।

তার পরবর্তীতে ইমাম মাজদুদ্দীন মুবারক ইবনে মুহাম্মদ (জন্ম: ৫৪৪ হি: মৃত্যু: ৬০৬ হি:) যিনি ইবনুল আসীর নামে খ্যাত। তিনি তার جامع الأصول في أحاديث الرسول নামক গ্রন্থের মুকাদ্দামায় الباب الثالث في بيان أصول الحديث واحكامها و ما يتعلق بها শিরোনামে প্রায় ১১১ পৃষ্ঠাব্যাপী এক দীর্ঘ আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। তিনি তার এই গ্রন্থতুল্য অধ্যায়ে হাদীসশাস্ত্রের পরিভাষা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রায় সব বিষয়ের প্রতিই আলোকপাত করেছেন। মূলত তিনি ইমাম তিরমিযী, হাকেম, খতীব বাগদাদী এবং ইমাম গাজালী প্রমুখ মনীষী থেকে তথ্য আহরণ করে তা সংক্ষেপায়ন করেছেন। যদিও তার কিতাবে কোথাও কোথাও সামান্য দুর্বলতা রয়েছে এবং এই দুর্বলতাগুলো হাকেমের অনুসরণ করতে গিয়ে হয়েছে। তথাপি এই গ্রন্থতুল্য অধ্যায়টি এ বিষয়ে অত্যন্ত গোছালো ও প্রাঞ্জল একটি আলোচনা বটে। ইবনে হজর তার দেওয়া তালিকায় মাইয়্যানিশীর ন্যায় ব্যক্তির নাম উল্লেখ করলেও ইবনুল আসীরের নাম উল্লেখ করেননি।

ইবনুল সালাহ এর মুকাদ্দামাহ

তার পরবর্তীতে আবু আমর উসমান ইবনে আব্দুর রহমান আশ-শাহরাযুরী (জন্ম: ৫৭৭ হি: মৃত্যু: ৬৪৩ হি:) যিনি ইবনুস সালাহ নামে অধিক খ্যাত। তিনি معرفة أنواع علوم الحديث নামে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এ গ্রন্থটি مقدمة بن الصلاح নামেই অধিক খ্যাত।

দামেশকের দারুল হাদীস আল-আশরাফিয়্যাতে শিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালনকালে তিনি এ গ্রন্থটি লিপিবদ্ধ করেন। ছাত্রদেরকে পাঠদানের মধ্যদিয়ে তিনি ক্রমান্বয়ে এ গ্রন্থটি বিন্যাস করেন। ফলে বিন্যাসের ক্ষেত্রে পূনর্বিবেচনার প্রয়োজন থাকলেও তিনি তা করেননি। কেননা বহু ছাত্রই তা থেকে উক্ত লিপিবদ্ধ করে নিয়েছিল। পূনর্বিন্যাস করতে গেলে তাদের পাণ্ডুলিপির সাথে গড়মিল হয়ে যাবে মনে করে তিনি তা করেননি। ফলে বিন্যাসে কিছু জটিলতা থাকলেও তার এ গ্রন্থটি পূর্ববর্তীদের রচিত গ্রন্থাবলীর তুলনায় অত্যন্ত ব্যাপক, বিস্তৃত ও সুন্দর। লোকেরা এ গ্রন্থটিকেই পঠন-পাঠনের জন্য ব্যাপক ভিত্তিতে গ্রহণ করে। ফলে উলূমুল হাদীসের উপর গ্রন্থ রচনার যে ধারা চলে আসছিল তা থেমে যায়। পরবর্তী কালের লোকেরা এ গ্রন্থটির ব্যাখ্যাগ্রন্থ তৈরি, সংক্ষেপায়ন, টিকা তৈরি, এবং কবিতার ছন্দে এ গ্রন্থে বর্ণিত নীতিমালাগুলো উপস্থাপনের চেষ্টায় ব্রতী হয়। পরবর্তীতে যারা এ গ্রন্থটির ব্যাখ্যাগ্রন্থ তৈরি করেছেন তাদের মাঝে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের নাম ও গ্রন্থের নাম নিম্নে উদ্ধৃত করা হল।

(١) جواب الحافظ المنذري عن أسئلة في الجرح و التعديل

(٢) الاقتراح في بيان الاصطلاح لابن دقيق العيد

(٣) المنهل الروي في مختصر علوم النبوي لبدر الدين بن جماعة

(٤) رسوم التحديث في علوم الحديث لبرهان الدين الجعبري

(٥) التقريب والتيسير في سنن البشير والنذير للنووي

(٦) الشذا الفياح من علوم بن الصلاح لبرهان الدين أبو اسحاق بن موسى

(٧) التذكرة في علوم الحديث لابن ملقن

(٨) محاسن الاصطلاح و تضمين كتاب بن الصلاح لسراج الدين أبو حفص عمر بن اسلم

(٩) اختصار علوم الحديث للإمام عماد الدين ابن كثير الدمشقي

উলূমুল হাদীস সম্পর্কে ভারতীয় উলামায়ে কেরামের খিদমত

১. মুকাদ্দামা মেশকাতুল মাসাবীহ, আব্দুল হক দেহলভী রহ. (৯৫৮-১০৫২ হিঃ)
২. মুকাদ্দামা মুসাওওয়া শরহে মুওয়াত্তা, শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ. (১১১৪-১১৭৬)
৩. আল উজালাতুন নাফিআ,শাহ আব্দুল আযীয রহ. (১২৩৯ হিঃ)
৪. আর রফউ ওয়াত তাকমীল ফিল জরহি ওয়াত তাদীল, আব্দুল হাই লখনভী রহ.
৫. যাফারুল আমানী, আব্দুল হাই লখনভী রহ.
৬. মুকাদ্দামা তুহফাতুল আহওয়াযী, আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (১২৮৩-১৩৫৩ হিঃ)
৭. মুকাদ্দামা ফতহুল মুলহিম, শাব্বীর আহ্মদ উসমানী রহ. (১৩৬৯ হিঃ)
৮. এ'লাউস সুনানের ভূমিকা, যফর আহমদ উসমানী রহ. (১৩১০-১৩৯৪ হিঃ)
৯. বজলুল মজহুদের ভুমিকা, ফখরুদ্দীন মুরাদাবাদী রহ. (১৩৮৭ হিঃ)
১০. আউজাযুল মাসালিকের ভূমিকা, শায়খ যাকারিয়্যাহ রহ.
১১. মা তামুসসু ইলাইহিল হাজাহ লিমান য়ূতালেউ ইবনে মাজাহ, আব্দুর রশীদ নূ'মানী রহ.
১২. তদবীনে হাদীস, মানাযির আহসান গিলানী রহ.
১৩. তারীখে ইলমিল হাদীস, সাইয়্যিদ আমীমুল ইহ্সান রহ.
১৪. হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস, মাও. নূর মুহাম্মদ 'আজমী
১৫. দরসে তিরমিযীর ভূমিকা, তকী উসমানী দা. বা.
১৬. হাদীস সংকলনের ইতিহাস, মাওলানা আব্দুল মতীন দা. বা.
১৭. আদ্দুরারুস সামিনাহ, মাওলানা আব্দুর রহীম
১৮. তানকিহুল ফিকরে ওয়ান্ নযর, মাওলানা আব্দুল মালেক দা.বা.
১৮. উলূমুল হাদীস, ড. মাওলানা. মুশতাক আহমদ
১৯. রিজাল শাস্ত্র ও জাল হাদীসের ইতিবৃত্ত, ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন
২০. উলূমুল হাদীস মাওলানা ইসহাক ফরিদী রহ. সম্পাদিত
২১. হাদীস অধ্যয়নের মূলনীতি, মাওলানা আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ ইয়াহইয়া

লেখক: মুহাদ্দিস, জামিয়া দারুল উলূম আল ইসলামিয়া দিলুরোড ঢাকা

সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা একটি আন্তর্জাতিক অভিশাপ

মুফতী মোস্তাকিম আলম

"একটি টাকা অন্য একটি টাকার জন্ম দিতে পারে না"– সুদের সমালোচনা করতে গিয়ে আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটল এ মন্তব্য করেছিলেন। শুধু তাই নয় তিনি সুদকে 'নিরেট জালিয়াতি' হিসেবেও আখ্যা দিয়েছিলেন। সুদ হচ্ছে শোষণের হাতিয়ার। সুদ মানুষের মাঝে সৃষ্টি করে কার্পণ্য, স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতা, হৃদয়হীনতার মত অসৎ গুণাবলী। সুদভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, শুধু দেশীয় কিংবা আঞ্চলিক নয়; বরং একটি আন্তর্জাতিক অভিশাপ। যে অভিশাপে সারা পৃথিবীর মানুষ আজ বিপর্যয়ের সম্মুখীন। আধুনিক বিশ্বের পাওয়ারফুল ব্যাংকব্যবস্থার 'প্রাতিষ্ঠানিক সুদ' সমাজে আয়ের বৈষম্যকে ত্বরান্বিত করছে। সম্পদ ও আয়ের মধ্যে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টিতে সুদভিত্তিক ব্যাংকব্যবস্থা পালন করছে দক্ষ ও কুশলী ভূমিকা। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে সুদের গুরুভার কঠিন দুরবস্থার সৃষ্টি করেছে। সুদের এ সর্বগ্রাসী অভিশাপ মোকাবিলায় বিশ্বব্যাংক ও তার অঙ্গসংগঠনগুলো বিকল্প ব্যবস্থা উদ্ভাবনের চেষ্টা চালাচ্ছে। ১৯৮৪ সালে ওয়াশিংটনে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) এর বার্ষিক সাধারণ সভায় স্বীকার করা হয়েছে যে, সুদের উচ্চহারই বিশ্বের সর্বত্র উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করছে।

'সুদ' অর্থনীতির সবচেয়ে পুরনো ও জটিল একটি বিষয়। সকল ধর্মেই সুদ নিষিদ্ধ ছিল। হযরত ঈসা আ. কর্তৃক প্রচারিত ধর্মে সুদ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিলো। নিষিদ্ধ ছিল প্রাচীন ইহুদী মতবাদেও। তাওরাত ও ইঞ্জিলে সুদকে একটি মারাত্মক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সক্রেটিস প্লেটো ও এরিস্টটলসহ প্রাচীন গ্রীক ও রোমান দার্শনিকগণ, হিন্দু ও ইহুদি সংস্কারকগণ সুদী কারবারের নিন্দা করেছেন এবং সুদকে মানুষ খুনের মতো পাপকার্য বলে উল্লেখ করেছেন।

তাছাড়া, আধুনিক অর্থনীতিতে সুদের হার নিয়ে অর্থনীতিবিদদের যে বিতর্ক রয়েছে অর্থনীতির আর কোন ক্ষেত্রে এমন মতপার্থক্য দেখা যায় না। ফলে অর্থনীতিতে সুদের অস্তিত্বের বিষয়টিও প্রশ্নবিদ্ধ।

সুদের ভয়াবহতা সব ধর্মেই স্বীকৃত। তবে যুগের পরিবর্তনে মানুষ তাদের ধর্মকে নিজেদের সুবিধা মতো পরিবর্তন করে নিয়েছে। তাই বিভিন্ন ধর্মের অধীনে কৌশলের আড়ালে সুদী কারবারে যুক্ত হওয়ার সুযোগ আছে। পক্ষান্তরে ইসলামই একমাত্র ধর্ম যার মৌলিক নীতিমালা শাশ্বত ও চিরন্তন এবং কারো পক্ষে এর পরিবর্তন করা সম্ভব হয়নি এবং কোন দিনও হবে না। সঙ্গত কারণেই ইসলামে সুদের কোন স্থান নেই।

সুদ সম্পর্কে সর্বপ্রথম পবিত্র কুরআনে যে আয়াত নাযিল হয় তা হচ্ছে সূরা রুমের ৩৯ নং আয়াত। মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, "তোমরা যে সুদ দাও যাতে তা মানুষের সম্পদে যুক্ত হয়ে বৃদ্ধি পায় আল্লাহর কাছে তা বৃদ্ধি পায় না। পক্ষান্তরে আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে তোমরা যে যাকাত দিয়ে থাকো, যারা তা দেয় তারাই (নিজেদের সম্পদ) কয়েক গুণ বৃদ্ধি করে নেয়।" এই আয়াতটি নাযিল হয়েছিল মক্কা মুকাররমায়, যাতে সুদের নিন্দা করা হয়েছে। তখনও পর্যন্ত সুদ স্পষ্ট ভাষায় হারাম করা হয়নি। তবে ভবিষ্যতে যে কোন সময় এটা হারাম হয়ে যেতে পারে, এ আয়াত তার একটা সূক্ষ্ম ইঙ্গিত বহন করে। তাছাড়া এ আয়াতে সুদ ও যাকাত সম্পর্কে মানুষের ভুল ধারণার উপর আঘাত করা হয়েছে। সেকালে সুদখোর পুঁজিপতিরা মনে করতো, সুদের মাধ্যমে তাদের সম্পদ বাড়ছে এবং যাকাত দিলে বা দান খয়রাত করলে তাদের সম্পদ কমে যাবে। অপরদিকে ঋণগ্রহীতারা মনে করতো, তাদের কাছে সুদ খেয়ে ধনীরা তাদের সম্পদ বাড়াচ্ছে। উপরের আয়াতে সুদ ও যাকাত সম্পর্কে প্রচলিত সাধারণ ধারণার প্রতিবাদ করা হয়েছে।

সুদ সম্পর্কে দ্বিতীয় আয়াতঃ চতুর্থ হিজরী বা তার কাছাকাছি সময়ে ইহুদীদের অতীত কীর্তিকলাপ বর্ণনা প্রসঙ্গে নিষ্ঠুর অর্থলোভী ইহুদীদের সুদখোরির কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- "আর তারা সুদ খেত, অথচ তাদেরকে তা খেতে নিষেধ করা হয়েছিল এবং তারা মানুষের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করতো। তাদের মধ্যে যারা কাফের আমি তাদের জন্য যন্ত্রণাময় শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।" [সূরা নিসাঃ ১৫১]

সুদ সম্পর্কে তৃতীয় আয়াতঃ হে মুমিনগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলতা লাভ করতে পার। [সুরা আলে ইমরানঃ ১৩০]

সুদ সম্পর্কে সর্বশেষ আয়াতঃ সুদ সম্পর্কে সর্বশেষ সূরা বাকারায় (২৭৫-২৭৯) একাধারে পাঁচটি আয়াত নাযিল হয়। সূরা রুমের আয়াতে সুদ হারাম হওয়া সম্পর্কে যে ইঙ্গিত আল্লাহ তায়ালা দিয়েছিলেন সূরা বাকারার পাঁচটি আয়াতে তার স্পষ্ট বিবরণ দেন। শুধু তাই নয় (১৭৮-১৭৯) আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সুদকে এত বড় অপরাধ সাব্যস্ত করেছেন যে, সম্ভবত অন্য কোন গুনাহকে এত বড় সাব্যস্ত করেননি। যেমন মদ পান করা, শুকর খাওয়া, ব্যভিচার করা ইত্যাদি অপরাধের জন্য সেসব শব্দ ব্যবহার করা হয়নি যে শব্দগুলো সুদের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে- "হে মুমিনগণ আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমরা যদি প্রকৃত মুমিন হয়ে থাকো তবে সুদের যে অংশই (কারো কাছে) অবশিষ্ট রয়ে গেছে

তা ছেড়ে দাও। তবুও যদি তোমরা এটা না কর তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও। আর তোমরা যদি (সুদ থেকে) তওবা কর তবে তোমাদের মূল পুঁজি তোমাদের প্রাপ্য, তোমরা কারো প্রতি জুলুম করবে না এবং তোমাদের প্রতিও জুলুম করা হবে না।" এ আয়াত দ্বারা সুদী মহাজনদের বিরুদ্ধে আল্লাহর পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা রয়েছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে যুদ্ধের এই ঘোষণা অন্য কোন অপরাধের জন্য করা হয়নি।

সুদ সম্পর্কে রাসূল সা. এর কয়েকটি হাদীস

১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সা. সুদদাতা, সুদগ্রহীতা উভয়ের উপর অভিসম্পাত করেছেন। [মুসলিম ২/২৭,তিরমিযী ১/২২৯]

২. হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. সুদদাতা, সুদের চুক্তিপত্রের লেখক ও সাক্ষী সকলকে অভিশাপ দিয়েছেন এবং বলেছেন তারা সকলে সমান অপরাধী। [মুসলিম ২/২৭]

৩. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বর্ণনা করেন রাসূল সা. বলেছেন সুদের ৭০টি স্তর রয়েছে, তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরের অপরাধের পরিমাণ হলো মায়ের সাথে জেনায় লিপ্ত হওয়া। [ইবনে মাজাঃ ১৬৪]

প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ ও প্রাচীন সভ্যদেশের আইনে সুদের নিষিদ্ধতা

তাওরাত, জাবুর, ইঞ্জিল বেদসহ দুনিয়ার সকল ধর্মগ্রন্থে সুদকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রোমান আইনশাস্ত্রে ও হিন্দু ধর্মে সুদের নিন্দা করা হয়েছে। ইহুদী সংস্কারক, খ্রিস্টান ধর্মগুরু ও পাদ্রীগণ তাদের ধর্মগ্রন্থের বিধান অনুসারে সুদ নিষিদ্ধ করেছেন। রোম, মিসর, গ্রীস, গ্রীক ও ভারতবর্ষের মতো প্রাচীন সভ্য দেশগুলোতে বহুকাল আগেই সুদ বিষয়ক আইনকানুন প্রণীত হয়। আরবের জাহেলী যুগেও সুদের অর্থকে সাধারণভাবে অপবিত্র মনে করা হতো। ইউরোপীয় দেশগুলোতেও ধর্ম ও আইনের চোখে সুদ নিষিদ্ধ ও নীতিবিরুদ্ধ গণ্য হতো। লন্ডনের অধিবাসীরা সুদখোর ইহুদীদের শোষণে ক্ষিপ্ত হয়ে মধ্যযুগে বহু ইহুদীকে হত্যা করেছিল। জনগণের চাপে বাধ্য হয়ে প্রথম এডওয়ার্ড ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ব্রিটেন থেকে ইহুদীদের বিতাড়িত করেছিলেন, সেই সাথে তাদের সুদী ব্যবসাকে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করেছিলেন।

সমাজতন্ত্রের দৃষ্টিতে সুদ শ্রমিক সমাজের উপর একটি অসহনীয় বোঝা, এটি ধনীকে আরো ধনী করে এবং গরীবকে আরো গরীবে পরিণত করে।

সুদ সম্পর্কে আধুনিক অর্থনীতিবিদদের অভিমত

আধুনিক কালের নতুন একটি অর্থনৈতিক দর্শনের স্রষ্টা কার্লমার্কস সুদের ব্যবসায়ীকে 'বিকট শয়তান' নামে অভিহিত করেছেন। সুদখোরকে তিনি ডাকাত ও সিঁদেল চোরের সাথে তুলনা করেছেন।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা লর্ড কিনস ১৯৩৩ সালের অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবিলার জন্য সুদের হার শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনার প্রস্তাব করেন। এ প্রস্তাব বাস্তবায়নের সম্ভাব্যতা প্রমাণ করে তিনি বলেছিলেন, এভাবেই পুঁজিবাদী সমাজের অনেক দোষত্রুটি দূর করা সম্ভব। সুদভিত্তিক বিনিয়োগের পরিবর্তে উৎপাদনমুখী উদ্যোগ গ্রহণের জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছিলেন।

বাংলাদেশের হাল জামানার সেরা অর্থনীতিবিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং পুঁজিবাজার বিশ্লেষক অধ্যাপক আবু আহমেদ সম্প্রতি এক নিবন্ধে লেখেন, "এক সময়ে বিশ্বে এমন একটি ধারণা বদ্ধমূল হয়ে দাঁড়ালো যে, সুদ ছাড়া আর্থিক লেনদেন সম্ভবই নয়। কিন্তু কিছু মুসলমানদের উদ্যোগের ফলে আজ তিন যুগ পর বিশ্বের অনেক পণ্ডিত ও গবেষকই স্বীকার করে নিচ্ছেন সুদ ছাড়াও আর্থিক লেনদেন ও আর্থিক ব্যবস্থা চলতে পারে এবং সেই ব্যবস্থা বেশি স্থিতিশীল। অন্য কথায় সুদের বদলে লাভ লোকসানের বা অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে যে ব্যবস্থা গড়ে ওঠে এতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো দেউলিয়া হয় না। লাখ-লাখ গ্রাহক ঋণের ভারে হয় না জর্জরিত।

সুদের যে কী নির্যাতন, তা যারা সুদ নিয়েছে তারা হাড়ে হাড়ে টের পান। সুদের নির্যাতন নিয়ে ইউরোপেও অনেক নাটক উপন্যাস লেখা হয়েছে, সুদের উপকারভোগী হলেন বিত্তবানেরা। তারা সুদে অর্থ খাটিয়ে আরো ধনী হওয়ার স্বপ্ন দেখেন। সুদের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা আর্থিক ব্যবস্থা গরীবদের স্বার্থ পরিপন্থী। সুদের ক্ষেত্রে বাস্তবতা হলো, ঋণ গ্রহীতার লাভ হোক বা লোকসান হোক চক্রবৃদ্ধি হারে ঋণ বিক্রেতাকে সুদ দিতে গ্রহীতা বাধ্য। এই ব্যবস্থার বদলে অংশিদারিত্বের ব্যবস্থা উত্তম বলে স্বীকৃত হয়েছে। এখন অনেক দেশেই এমনকি পশ্চিমের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও এখন সুদের বিকল্প আর্থিক ব্যবস্থা নিয়ে পড়ালেখা করানো হয়। সুদ দিতে পারেননি বলে যুক্তরাষ্ট্রের লাখ লাখ মানুষ মর্টগেজধারীর কাছে তাদের বাড়িগুলো হারিয়েছেন। ঋণ বিক্রেতারা প্রথমে বলে- এই সুদ আসলে তেমন কিছু নয়, আপনি বাড়ির আয় এবং বাড়ির মূল্যবৃদ্ধি থেকে সুদ-আসল ফেরত দিতে পারবেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো অন্য। যুক্তরাষ্ট্রে শুধু বাড়ি কিনতে গিয়ে লাখ লাখ মধ্যবিত্ত নাগরিক তাদের স্বপ্নের বাড়িগুলোকে তৃতীয় পক্ষের কাছে বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছেন। এর মূল কারণ হলো অ্যাসেট বা সম্পদের যে মূল্য

নয় ঋণ বিক্রেতারা শুধু সুদ পাওয়ার আশায় এর চেয়ে অনেক বেশি ঋণ বাড়ির ক্রেতাদের ধরিয়ে দিয়েছিলেন।”

ব্যাংকার আব্দুল মান্নান তার ‘ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা’ বইয়ে লিখেন, “বাংলাদেশের মানুষ ঐতিহ্যগতভাবে সুদকে ঘৃণা করে আসছে। সুদের বিরুদ্ধে এদেশের মানুষের ক্ষোভ ও ঘৃণার পরিচয় এদেশের নানা পুরাণ ও উপাখ্যানে প্রকাশ পেয়েছে। এদেশের নানা লৌকিক বিশ্বাস ও আচরণে জনগণের সুদ বিরোধী মনোভাব ফুটে উঠেছে। এদেশের বিভিন্ন এলাকার মানুষ বিশ্বাস করেন, সাতজন সুদখোরের নাম লিখে গরুর গলায় ঝুলিয়ে দিলে সে গরুর ঘায়ের পোকা পড়ে যায়। সন্দেহ নেই, সুদ সম্পর্কে জনগণের এরূপ মনোভাব তাদের বিশ্বাস, ঐতিহ্য, মূল্যবোধ ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। সুদের হিংস্র থাবা তাদেরকে বারবার ক্ষত-বিক্ষত রিক্ত-নিঃস্ব ও বিপন্ন করেছে। এদেশের বহু জননায়ক, মহাজনী সুদের বিরুদ্ধে যুগ যুগ ধরে জনগণের সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছেন। আধুনিক কালের প্রাতিষ্ঠানিক সুদের বিরুদ্ধে এবং সুদভিত্তিক লেনদেনের ব্যাপারে এদেশের মানুষের নেতিবাচক মনোভাব স্থায়ী ও অবিচল।”

মোটকথা, সুদভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মানুষের মাঝে বৈষম্য সৃষ্টি করেছে, মানুষের আয়ের ক্ষেত্রেও অসমতা সৃষ্টি করেছে। সম্পদ ও দায়ের মধ্যে ভারসাম্যহীনতা বাড়িয়ে তুলেছে। জাতিকে বিভক্ত করে তুলেছে। সামগ্রিক অগ্রগতির ধারাকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা, অস্থিরতা ও ভারসাম্যহীনতার জন্ম দিয়ে সমাজ অশান্ত করে তুলেছে। জনগণের স্বভাব, প্রকৃতি, চাহিদা, বিশ্বাস, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের পরিপন্থী সুদভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মানব জাতির জন্য বহু অকল্যাণের জন্ম দিয়েছে। এসব থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় হলো ইসলামী অর্থব্যবস্থা। ইউরোপ আমেরিকার অনেকেই এখন সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থার ক্ষতিকর দিকগুলো চিন্তা করে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার দিকে ঝুঁকছে। এই আন্তর্জাতিক অভিশাপ থেকে মানুষ মুক্তি চায়। ইউরোপের মধ্যে যুক্তরাজ্য তো অনেক আগেই ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার অনুমোদন দিয়েছে। এখন হাজার হাজার অমুসলিমও ইসলামী ব্যাংকের গ্রাহক। তাই আমরা আশা করতে পারি, বেশি দূরে নয় অচিরেই সারা বিশ্বের অর্থব্যবস্থা হবে ইসলামী অর্থব্যবস্থা। ইসলামী অর্থব্যবস্থাকেই মানুষ মডেল হিসেবে গ্রহণ করবে। আল্লাহ তায়ালা সকল মানুষকে সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থার অভিশাপ থেকে রক্ষা করুন। আমীন।

লেখক: মুহাদ্দিস, জামিয়া দারুল উলূম আল ইসলামিয়া দিলুরোড ঢাকা

পাপ ঘৃণার পাত্র, পাপী নয়

মাওলানা আখতারুজ্জামান

রাসূল সা. এর যুগের দুটি ঘটনা

এক. সাহাবী হযরত মায়েয ইবনে আনাস আসলামী রা. রাসূল সা. এর নিকট এসে স্বেচ্ছায় ব্যভিচারের স্বীকারোক্তি দিয়ে বললেন, আমি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছি আমাকে পবিত্র করুন। রাসূল সা. ঘটনাটির যথাযথ তদন্ত করে তাকে প্রস্তারাঘাতে মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দিলেন। মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হল। লোকেরা তার ব্যাপারে দুই দলে বিভক্ত হয়ে গেল। কেউ বলছে তার গুনাহ তাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। কেউ বলছে কী উত্তম তওবাই না তার নসীব হল। এ বিতর্কের মাঝেই দুই-তিন দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেল। রাসূল সা. সাহাবীদের এক মজলিসে এসে উপবিষ্ট হলেন এবং নির্দেশ দিলেন, তোমরা মায়েযের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। তাঁরা বললেন, আল্লাহ তো তাকে ক্ষমা করেই দিয়েছেন। রাসূল সা. বললেন, মায়েয এমন তওবা করেছে যে, তার এই তওবা যদি এক দলের মাঝেও বণ্টন করে দেওয়া হয় তাহলে পূর্ণ দলের জন্যই তা যথেষ্ট হয়ে যাবে। [সহীহ মুসলিমঃ ১৬৯৫]

হযরত জাবের রা. বর্ণনা করেন, যখন মায়েয রা. এর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হচ্ছিল তখন রাসূল সা. বললেন, 'আমি তাকে জান্নাতের পবিত্র নদীতে সাঁতরাতে দেখছি।' [সহীহ ইবনে হিব্বানঃ ৪৪০১]

দুই. এমনই আরেকটি ঘটনা গামেদ গোত্রের এক মহিলা সম্পর্কে। তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হচ্ছিল। খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. এর গায়ে তার শরীর থেকে রক্ত ছিটকে এসে লাগল। খালিদ রা. মহিলাকে লক্ষ্য করে গালি দিলেন। রাসূল সা. শুনতে পেয়ে ধমক দিয়ে বললেন, খালিদ ! গালি বন্ধ কর, সে তো এমন তওবা করেছে, অন্যায়ভাবে ট্যাক্স আদায়কারী ব্যক্তিও যদি তার মত তওবা করত তাহলে তাকেও মাফ করে দেওয়া হত। [সহীহ মুসলিমঃ ১৬৯৫]

উল্লেখিত দুটি ঘটনাতেই ব্যভিচারের মত জঘন্য পাপ করার পরও রাসূল সা. পাপীকে ঘৃণা করেননি; বরং যারা না বুঝে ঘৃণা করেছিল তাদেরকে উল্টো শাসিয়েছেন এবং তাদেরকে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়েছেন। এর দ্বারা এ বিষয়টিই প্রতীয়মান হয় যে, ঘৃণা পাপকে করতে হবে পাপীকে নয়।

রাসূল সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমান ভাইকে এমন গুনাহের কথা বলে লজ্জা দিবে যা থেকে সে তওবা করেছে তাহলে সে ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে ঐ গুনাহে

অবশ্যই লিপ্ত হবে। [তিরমিযী: ২৫০৫; শুআবুল ঈমান: ৬২৭১; মুজামুল আউসাত: ৭২৪৪]

অর্থাৎ কোন মুসলমান কোন গুনাহে লিপ্ত ছিল। এখন সে গুনাহটি ছেড়ে দিয়ে তওবা করেছে। বিষয়টি জানা থাকা সত্ত্বেও আপনি যদি তাকে ঘৃণা করেন এবং তাকে লজ্জায় ফেলার জন্য লোকজনের কাছে তার গুনাহের কথা বলে বেড়ান তাহলে হাদীসের ভাষ্যমতে আপনিও এ গুনাহে লিপ্ত হবেন। কারণ তাকে আপনি এমন গুনাহ্ সম্পর্কে লজ্জা দিচ্ছেন যা তওবার কারণে আল্লাহ্ মাফ করে দিয়েছেন এবং আমলনামা থেকে সম্পূর্ণভাবে মুছেও দিয়েছেন।

তদ্রূপ যে পাপী এখনও তওবা করেনি সেও ঘৃণার পাত্র নয়। কেননা সে ভবিষ্যতে তওবা করতে পারে। তাই পাপকে ঘৃণা করতে হবে পাপীকে নয়; বরং পাপী ব্যক্তি সহমর্মিতা পাওয়ার পাত্র। কারণ সে নফসের রোগে আক্রান্ত। শারীরিক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি যেমন করুণা ও দয়ার পাওয়ার যোগ্য তেমনি সেও সহানুভূতির পাত্র। রোগ ঘৃণ্য হতে পারে রুগী নয়। যে কোন প্রকারের রুগীই হোক না কেন তার রোগ দূর করার জন্য চেষ্টা করতে হবে এবং তার জন্য দুআ করতে হবে।

রাসূল সা.কে কাফির মুশরিকরা কী অবর্ণনীয় নির্যাতনই না করেছে। তায়েফবাসীর নির্যাতনের পর আল্লাহ্ তায়ালা পাহাড়ের দায়িত্বে নিযুক্ত ফেরেশতা পাঠালেন তাদেরকে ধ্বংস করার জন্য। রাসূল সা. এর নিকট অনুমতি চাইলে রাসূল সা. নিষেধ করলেন এবং উল্টো তাদের হেদায়াতের জন্য দুআ করলেন, 'হে আল্লাহ্ আপনি তাদেরকে হেদায়াত দান করুন। তারা আমাকে চিনতে পারেনি।' [সহীহ বুখারী, হাদীস: ৩২৩১]

রাসূল সা. কোন রোগাক্রান্ত বা বিপদগ্রস্ত দেখলে নিম্নোক্ত দুআ পাঠ করতে আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন এবং বলেছেন, যে ব্যক্তি দুআটি পাঠ করবে সে তার জীবদ্দশায় ঐ রোগ বা বিপদে আক্রান্ত হবে না। দুআটির পাঠ নিম্নরূপ,

الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ، وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا

অর্থ: সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে আপনার রোগে আক্রান্ত করেনি এবং আমাকে অনেকের তুলনায় আমাকে মর্যাদা দান করেছেন। [তিরমিযী: ৩৪৩১; শুআবুল ঈমান: ১০৬৩৩]

এ দুআটি কোন রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে দেখলে যেমন পড়া উচিত তেমনি কোন পাপীকে দেখলেও পড়া উচিত। কেননা সেও আত্মিক ব্যাধিতে আক্রান্ত। এ দুআ পড়ার দ্বারা আল্লাহ্ তায়ালা আপনাকে সে গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করবেন।

পাপীকে ঘৃণা না করার অর্থ এই নয় যে, তাকে তার গুনাহ্ সম্পর্কে কিছু বলা যাবে না; বরং তাকে অবশ্যই তার গুনার সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। রাসূল সা. বলেছেন, 'এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য আয়নার মত।' [আদাবুল মুফরাদঃ ২৩৮; সুনানে কুবরা বাইহাকীঃ ১৬৬৮১] অর্থাৎ মানুষের শরীরে কোন ময়লা বা দাগ লাগলে আয়নার সামনে দাঁড়ালে আয়না যেমন তা নীরবে বলে দেয়, তেমনি মুমিন অপর মুমিনের দোষ-ত্রুটি নীরবে বলে দিবে। শুধু তাকেই বলবে। অন্য কাউকে জানাবে না।

দোষী ব্যক্তিকে না বলে অন্য কাউকে তার দোষের কথা বলা অনেক ক্ষেত্রেই স্বার্থসংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে। স্বার্থসংশ্লিষ্ট হলে এ কথা স্পষ্ট যে, সেখানে কোন ইখলাস নেই। আর ইখলাস ও একনিষ্ঠতাশূণ্য আমল আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হয় না এবং বাহ্যিকভাবে ফলপ্রসূও হয় না। তাই সে আপনার সদুপদেশ গ্রহণ করার পরিবর্তে আপনার বিরুদ্ধাচরণ শুরু করতে পারে। তাই পূর্ণ ইখলাস ও সহমর্মিতার সাথে শুধু তাকেই জানাতে হবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে ইখলাসের সাথে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

লেখক: মুহাদ্দিস, জামিয়া দারুল উলূম আল ইসলামিয়া দিলুরোড ঢাকা

আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা

মাওলানা বশির আহমদ

আবহমান কাল থেকে পৃথিবীতে অগণিত মানুষ আসছে আর যাচ্ছে। কেউ নিজের ইচ্ছায় আসে না আবার নিজের ইচ্ছায় থাকতেও পারে না। এভাবে পৃথিবীর সকল মানুষই চলন্ত এক পথের পথিক। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত হচ্ছে জীবন পথের এক একটি ক্ষুদ্রতম অংশ। বিরাট জলাশয়ের পানি যেমন বিন্দু বিন্দু করে শুকিয়ে একদিন খালি হয়ে যায় তেমনি মানুষের জীবনের অগণিত মুহূর্ত অবিরাম গতিতে ক্ষয় হতে হতে একদিন ফুরিয়ে যাবে। এভাবে আল্লাহর কাছে নিজেকে অসহায় জেনে বুঝে যারা একদিনের জন্যও ভাবতে চায় না যে তিনি আমাদেরকে এখানে কেন পাঠালেন। তাদের জীবন যাত্রায় আর পাগলের জীবন যাত্রা পথে কোনো ব্যবধান নেই। পাগলকে দেখবেন সারাদিন হাঁটে, কোথায় যাবে, তা সে জানে না। তেমনি গন্তব্য নিয়ে যারা ভাবে না তারা সুস্থ মানুষ নয়।

শুধু হাত-পা, নাক-কান সুস্থ থাকার নামই সুস্থ মানুষ নয়; যার দেহের সুস্থতার পাশাপাশি আত্মার সুস্থতাও অর্জন হয়েছে সেই প্রকৃত অর্থে মানুষ। একজন মৃত ব্যক্তির হাত-পাসহ অন্যান্য অঙ্গ ঠিক থাকা সত্ত্বেও আমরা তাকে লাশ বলে থাকি। বুঝা গেল দেহ ও আত্মার সমন্বয়েই প্রকৃত মানুষের অস্তিত্ব। তাই সুস্থ মানুষ হতে হলে দেহের সঙ্গে সঙ্গে আত্মার সুস্থতাও একান্ত প্রয়োজন। আত্মার সংশোধনকেই আত্মশুদ্ধি বলা হয়।

আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা

যেমনিভাবে মানুষের বাহ্যিক দেহ কখনো সুস্থ থাকে, কখনো রোগাক্রান্ত হয়। তদ্রূপ মানুষের আত্মাও কখনো সুস্থ থাকে কখনো রোগাক্রান্ত হয়। দেহে যেমন সর্দি, কাশি, জ্বর ও অন্যান্য রোগ থাকে। তেমনিভাবে ক্রোধ, অহংকার, স্বার্থপরতা, লোকদেখানো, হিংসা, বিদ্বেষ, লোভ-লালসা ইত্যাদি হলো আত্মার রোগ। ইসলাম যেহেতু একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা তাই শারীরিক চিকিৎসার সাথে সাথে আত্মার চিকিৎসার ব্যবস্থার হেদায়েতও দিয়েছে। এই চিকিৎসা শাস্ত্রের নাম তাসাওউফ বা আত্মশুদ্ধি।

দেহকে রোগ জীবাণু থেকে মুক্ত বা সুস্থ সবল করে তোলার জন্য যেমন ডাক্তারের প্রয়োজন। ডাক্তারি বই পুস্তক ঘাটাঘাটি করলেই রোগীর চিকিৎসা করা যায় না। একজন অভিজ্ঞ ডাক্তারের সান্নিধ্যে থেকে প্র্যাকটিস করতে হয়, তেমনি কুরআন

হাদীস চর্চা বা ঘাটাঘাটি করলেই আধ্যাত্মিক রোগের চিকিৎসা করা যায় না। বরং আধ্যাত্মিক সাধনায় অভিজ্ঞ কোনো কামেল সাধকের সাহচর্য লাভ করতে হয়। যিনি হবেন দুনিয়ার লোভ ও প্রবৃত্তি পূজা থেকে মুক্ত।

আত্মশুদ্ধির ব্যাখ্যা

আত্মশুদ্ধির অর্থ অন্তরের শুদ্ধি বা পবিত্রতা। কারণ, অন্তর পবিত্র না হলে ইবাদতের স্বাদ ও আল্লাহ তায়ালার মারেফাত অর্জন করা সম্ভব নয়। এটাকে এভাবে বুঝা যায় যে, সমস্ত পাপকাজের দুটি করে ফলাফল রয়েছে। একটি হচ্ছে পাপের মজা, আরেকটি হচ্ছে পাপের সাজা। কিন্তু পাপের মজা খুবই ক্ষণস্থায়ী এবং এর সাজা দীর্ঘস্থায়ী। এমতাবস্থায় ক্ষণস্থায়ী মজার লোভে দীর্ঘস্থায়ী সাজার কথা ভুলে যাওয়া চরম বিবেকহীনতা। সুতরাং পাপাচারে লিপ্ত মানুষের বিবেক সতেজ নয়। পচা বা নিস্তেজ। এ পচনের কারণে পাপীদের অন্তর হয়ে পড়ে অপবিত্র, নাপাক। এটাকে পাক বা পবিত্র করনের একমাত্র পথ পাপের সাজার ভয়কে অন্তরে বদ্ধমূল করা। যেন ক্ষণিকের মজার লোভে পাপে লিপ্ত হওয়ার সাহস না থাকে। তখনই অন্তরাত্মা সতেজ হবে। এরই নাম আত্মার পবিত্র করন বা আত্মশুদ্ধি অর্জন।

তাসাওউফের হাকিকত

হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলভী বলেন, তরীকত বা তাসাওউফ বিহীন শরীয়ত একান্তই একটি দর্শন। আর শরীয়ত বিহীন তরীকত ধর্মহীনতা ও খোদাদ্রোহীতা বৈ কিছু নয়। শাহ সাহেবের এই উক্তির মাধ্যমে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, বাহ্যিক আমল সম্পর্কে ইলম তো অনেক মুনাফিকেরও ছিল। আজ শত শত ইয়াহুদী, নাসারা ও নাস্তিক এমন আছে যারা ইসলামী ইলমের ক্ষেত্রে খুবই গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী, কিন্তু এটা শুধু দর্শন, দ্বীন নয়। দ্বীন বলে তখনই গণ্য হবে যখন তার বিধানসমূহ সত্য বলে বিশ্বাস করবে এবং শরীর ও আত্মার সমন্বয়ে গঠিত সকল আহকামের উপর যথাযথ আমল করবে। এজন্যই কেবল বাহ্যিক ইলম সম্পর্কে অভিজ্ঞ হওয়া এবং গবেষণাধর্মী আলোচনাকে কোন দ্বীনী যোগ্যতা বলা হয় না। এবং তা আল্লাহ ও তার রাসূলের নিকট মূল্যহীন। তদ্রূপ তরীকত বা আত্মশুদ্ধির নাম নিয়ে কেউ যদি শরীয়ত এর বিধানের খেলাফ চলে, তাহলে এটাও ভ্রষ্টতা এবং কুরআন হাদীস বিকৃতি বলেই গণ্য হবে

আত্মশুদ্ধির জন্য মুর্শিদের প্রয়োজনীয়তা

আত্মার সংশোধন নিজে নিজেই সম্ভব নয়। এর জন্য কোন কামেল পীর ও মুর্শিদের হাতে নিজেকে সপে দিতে হবে। যিনি আত্মার রোগ সম্পর্কে পূর্ণ অভিজ্ঞতার অধিকারী। দীর্ঘ সাধনার মাধ্যমে আত্মার রোগ থেকে বেঁচে থাকার সকল কৌশল আয়ত্ত করেছেন। অতঃপর তিনি যখন রোগ নির্ণয় করে তা থেকে মুক্ত হওয়ার ব্যবস্থাপত্র দিবেন, তখন সে অনুযায়ী আমল করতে হবে। কোনরূপ অলসতা ও ত্রুটি করা যাবে না। দেহের রোগের জন্য ডাক্তারি প্রেসক্রিপশন যেভাবে মেনে চলি এর চেয়েও বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। আত্মার চিকিৎসা দেহের চিকিৎসার চেয়ে জটিল। কেননা দেহের রোগ দেখা বা অনুভব করা যায় আর আত্মার রোগ সম্পর্কে সকলে অবগত হতে পারে না। এমনভাবে আত্মার রোগ সম্পর্কে বই-পত্র পাঠ করেও নিজেকে সংশোধন করা যায় না; বরং অভিজ্ঞ রাহবারের শরণাপন্ন হতে হয়।

বর্তমান সময়ে আত্মশুদ্ধির জন্য হক্কানী পীরের প্রয়োজনীয়তা অনিবার্য। কারণ সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনের যাবতীয় জটিলতার মূল কারণ আত্মশুদ্ধি বা অন্তরাত্মা পবিত্র না থাকা। আত্মশুদ্ধির কঠিন সাধনার মাধ্যমে নিজের মধ্যে মানবীয় গুণাবলী তিলে তিলে সঞ্চিত করে তুলতে হবে। রাসূল সা. এই চারিত্রিক ও আত্মিক উৎকর্ষতার প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই একটি দুর্ধর্ষ জাতিকে শান্তি কামী মানুষের পথিকৃৎ ও প্রতীক হিসাবে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়ে ছিলেন। তাই আমাদেরকে সকল তন্ত্র এবং মন্ত্র ছেড়ে দিয়ে এই পথেই অগ্রসর হতে হবে।

লেখক: মুহাদ্দিস, জামিয়া দারুল উলূম আল ইসলামিয়া দিলুরোড ঢাকা

সন্তানের বেড়ে ওঠা : পিতা-মাতার করণীয়

মাওলানা উবাইদুর রহমান

জগতের প্রতিটি মানুষই কোন না কোন আদর্শ লালন করে। বিশ্বাসিক নিয়ন্ত্রণেই বেড়ে ওঠে। জীবনের পথে এগিয়ে চলে। আর এ বিশ্বাস-আদর্শের ভিত নির্মিত হয় একেবারে ছোট বেলায়। জীবনের গতিপথ নিয়ন্ত্রণে শৈশবের শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাব তাই অনস্বীকার্য। জন্মগতভাবে প্রতিটি শিশুই যাবতীয় শুভ শক্তির ধারক হয়ে জন্মায়। কিন্তু তার ঘনিষ্ঠজন পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতা শৈশব মনে গভীরভাবে প্রভাব ফেলে। আমাদের প্রিয় নবী সা. হাদীসে এ সত্য উচ্চারণ করে বলেছেন, প্রতিটি শিশুই যাবতীয় শুভশক্তি ধারণ করে জন্মায়। আর তার পিতা-মাতা (ঘনিষ্ঠ সবকিছু) তাকে ইহুদী, নাসারা, অগ্নিপূজক বানায়।

তাই কোন সন্দেহ নেই, শিশুর সঠিক বিকাশে সুষম পরিচর্যা, ভারসাম্যপূর্ণ নীতিমালার চর্চা, সঠিক নির্দেশনার কৌশলী প্রয়োগ সর্বোপরি সার্বিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টির বিকল্প নেই। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হওয়ার কারণেই শিশুর লালন-পালনের ক্ষেত্রেও অতি মূল্যবান কিছু নির্দেশনা দিয়েছে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, "হে ঈমানদারগণ তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবারবর্গকে জাহান্নাম হতে বাঁচাও।" [সূরা তাহরীমঃ ৬]

শরীয়তে একদিকে পিতা-মাতার হকও রয়েছে অন্যদিকে সন্তানের হকও রয়েছে। সন্তানের জন্য পিতা-মাতার করণীয় বিষয়টি বেশী গুরুত্ব রাখে। হযরত ওমর রা. যখন খলীফা, একটি লোক তার ছেলেকে নিয়ে খলিফার দরবারে এসে বলেন, হে খলীফা ! আমার এই সন্তান আমার কথা মানে না। আমার অধিকার আদায় করে না। হযরত ওমর রা. তখন ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার পিতার অভিযোগ কি সত্য? ছেলেটা উত্তর না দিয়ে উল্টো প্রশ্ন করল যে, হে খলীফা! পিতা-মাতার জন্য সন্তানের যেমন কর্তব্য রয়েছে সন্তানের প্রতিও কি পিতা-মাতার কোন কর্তব্য আছে? হযরত ওমর রা. বললেনঃ হ্যাঁ আছে। তখন হযরত ওমর রা. তিনটি কর্তব্যের কথা উল্লেখ করলেন, প্রথম কর্তব্য : পিতা একটি ভালো মায়ের ব্যবস্থা করবে। দ্বিতীয় কর্তব্য : সন্তানের ভালো নাম রাখতে হবে, তৃতীয় কর্তব্যঃ সন্তানকে কুরআন শিক্ষা দিবে, উল্লেখ্য যে, কুরআন বলতে কুরআন শরীফ পড়া শিখানোই শুধু নয় বরং জন্মের শুরু থেকেই যেন তার ভিতরে দ্বীন ইসলামের চেতনা আসে এ ধরনের কথাবার্তা শিখাতে হবে। দ্বীনের কথা শিখাতে হবে। আল্লাহ আল্লাহর রাসূলের কথা শিখাতে হবে। হযরত হাসান বসরী রহ. বলেন, 'ছোট বয়সে ইলম শিখা পাথরে অংকনের মত' [আল-ফক্বীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ : ২/১৮১]

এজন্য ছোট বাচ্চাদেরকে অল্প বয়স থেকেই দ্বীন শিখানো কর্তব্য। ছেলেটি একথা শুনে বলল, মহামান্য খলীফা! আপনি সন্তানের তিনটি হকের কথা বলেছেন, ভালো মায়ের ব্যবস্থা করা, ভালো নাম রাখা, আর কুরআন কিতাব শিক্ষা দেয়া। তাহলে শুনুন, আমার মা হল সিন্ধুর এক বন্দিনী। পিতা আমার নাম রেখেছেন হাফল। হাফল শব্দের অর্থ হল চামচিকা। আর আমাকে মোটেও কুরআন কিতাব শিক্ষা দেননি। হযরত ওমর রা. ছেলেটির কথা শুনে তার পিতাকে ধমক দিয়ে দরবার থেকে বের করে দিলেন।

বর্তমানে অনেকেই পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করেন, নামাজে প্রথম সারির গুরুত্ব বজায় রাখেন, পাগড়ী, মিসওয়াকের ইহতেমাম করেন, অন্যকে দ্বীনের প্রতি আহ্বান করেন, বাহ্যিক রূপ দেখলে পাক্কা দ্বীনদার মনে হয়। অথচ তার সন্তানকে ভোর হওয়ার আগেই কোন কেজি স্কুলে পাঠদানের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেন, ছেলে-মেয়ের ক্যারিয়ার গঠনে তার চিন্তার অন্ত নেই। কিভাবে ভবিষ্যতে তারা সুখ-স্বাচ্ছন্দময় জীবন-যাপন করবে তার নির্ভুল ছক আঁকেন। পার্থিব জীবনে কোন হতাশা যেন তাদের স্পর্শ করতে না পারে। সমাজে মাথা উঁচু করে যেন চলতে পারে সেজন্য প্রয়োজনে বিদেশে পাঠিয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করেন। অক্লান্ত পরিশ্রমলব্ধ টাকা অকপটে ব্যয় করেন। কিন্তু একবারও ভাবেন না তার সন্তান কুরআন পড়তে জানে না, নামাজ পড়তে পারে না, আল্লাহ ও রাসূল সম্পর্কে তার ধারণা অপ্রতুল। দ্বীন সম্পর্কে তার জ্ঞান নেই অথচ প্রতিটি মুসলমান নর-নারীর জন্য দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় দ্বীনী জ্ঞান অর্জন করা ফরজ।

অনেকে প্রশংসা করে বলে- আমার সন্তান ব্যারিস্টার, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার। অথচ তাদের দ্বীনদারী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে মুচকি হেসে জবাব দেন, সবকিছু ঠিক আছে কেবল সামান্য বে-দ্বীন হয়ে গেছে। নামাজ রোজায় উদাসীন। এর উদাহরণ হল এক রোগীকে ডাক্তারের নিকট নেয়া হল, ডাক্তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জবাব দিলেন সবকিছু ঠিক আছে কেবল জানটা নেই অর্থাৎ মৃত। এবার বলুন ডাক্তারের জবাবে কোন বুদ্ধিমান, বিবেকবান ব্যক্তি কি সন্তুষ্ট হতে পারে। অনেকে বলেন, সন্তানকে দ্বীনদার বানানোর প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা করেছি সন্তান কথা শুনে না। আল্লাহ বলেছেন, সন্তানদের আগুন হতে বাঁচাও। আগুনের কথা বলে মানুষকে বুঝাতে চেয়েছেন দুনিয়াতে অবুঝ শিশু আগুনে পড়তে চাইলে পিতা-মাতা যেভাবে তাকে বাঁচায় সেভাবে জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচানোর চেষ্টা করবে। আল্লাহ তায়ালার নীতি যা হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে, যে ব্যক্তি কোন মাখলুককে (সৃষ্টিকে) সন্তুষ্ট করার জন্য আল্লাহ তায়ালাকে অসন্তুষ্ট করে সেই মাখলুককে তার উপর চড়াও করেন। আজ আমরা আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যত উজ্জ্বল করার মানসে, সামাজিক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে দ্বীনী শিক্ষা হতে বঞ্চিত করে

পাশ্চাত্য ধাঁচে শিক্ষা প্রদান করে, আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করলাম, ফলে সন্তানরা পিতা-মাতার উপর মসিবতের কারণ হয়। পিতা-মাতার প্রতি তারা ন্যূনতম শ্রদ্ধা দেখায় না। তাদের কোন হক আদায় করে না। এমনও ঘটনা শুনা যায়, মা-বাবা নার্সিং হোমে মারা গেলে সন্তানকে সংবাদ জানানোর পরও গুরুত্বপূর্ণ কাজের অজুহাতে জানাজায় উপস্থিত হতে পারে না। মা-বাবার প্রতি কল্পনাতীত দুর্ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রে তাদেরই কর্মের ফল। সন্তানকে কুরআন হাদীসের জ্ঞান দান করলে তার ক্যারিয়ার বিনষ্ট হবে, হাফেজে কুরআন, আলেমে-দ্বীন হিসেবে সন্তানকে গড়ে তুললে তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার হবে, সমাজের বোঝা হবে, এ ধরনের হীন ধারণা আমরা মুসলমানরা করে থাকি। যা সরাসরি কুরআন হাদীসের পরিপন্থী।

যেখানে রাসূল সা. সন্তানকে হাফেজে কুরআন বানাতে কুরআন হাদীসের জ্ঞান দান করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন, রাসূলের ভাষায় হাফেজে কুরআনের পিতা-মাতার মাথায় কিয়ামতের দিন এমন মুকুট পরিয়ে দেয়া হবে যা সেদিন সকলে দেখতে পাবে। নিজেকে সংশোধনের সাথে সাথে সন্তানকে দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট করার চেষ্টাও করতে হবে। কখনোই ব্যক্তিগত আমলকে নাজাতের জন্য যথেষ্ট মনে করা যাবে না। আল্লাহর বাণী, 'তুমি তোমার পরিবারকে নামাজের আদেশ দাও নিজেও নামাজের পাবন্দি কর।' [সূরা তাহাঃ ১৩২]

আয়াতে কারিমায় নামাজের আদেশের বিষয়টি আগে ও নিজে আমল করার বিষয়টি পরে উল্লেখ করার দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন, আদেশ তখনই ফলপ্রসূ হবে যখন নিজে আমল করবে। অনেক সময় আমরা বাচ্চাদের সাথে নানা বাহানায় মিথ্যা বলি। অথচ তাদের সাথে মিথ্যা বলা নিষেধ।

হাদীস শরীফে আছে এক মহিলা রাসূলের সামনে বাচ্চাকে কোলে নিতে ডাকলে বাচ্চাটি আসতে অস্বীকৃতি জানাল। মহিলা বলল তুমি আস তোমাকে কিছু দিব। বাচ্চাটি তখন মহিলার নিকট আসল। রাসূল সা. মহিলাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি বাচ্চাটিকে আসলে কিছু দেয়ার ইচ্ছা করেছ কি? মহিলা বলল আমার নিকট একটি খেজুর রয়েছে আমি তা বাচ্চাকে দেয়ার নিয়ত করেছিলাম। রাসূল সা. বললেন, যদি না দেয়ার নিয়ত থাকত তাহলে তোমার পক্ষ হতে বড় ধরনের মিথ্যা হত। গুনাহ হত। তুমি শিশুকে বাচ্চা বয়স হতে এ কথা শিক্ষা দিতে যে মিথ্যা বলা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা কোন বিষয় নয়।

বিষয়টির প্রতি আমাদের সকলের সজাগ দৃষ্টি রাখা দরকার। রাসূলের কলিজার টুকরা হাসান রা.। তখনও তিনি বাচ্চা। একবার সদকার খেজুর হতে একটি খেজুর মুখে দিয়ে ফেলল। রাসূল সা. দেখা মাত্রই বললেন, আখ আখ। এটা আরবী শব্দ যেমন আমরা বলি থু থু। অর্থাৎ তুমি মুখ হতে তা ফেলে দাও। তুমি

কি জ্ঞাত নও বৎস। আমরা বনু হাশেম। সদকার মাল খাই না। গভীর ভালবাসা নাতির প্রতি থাকা সত্ত্বেও তার তরবিয়তের প্রতি রাসূল সা. সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন। কোন ক্রমেই দুর্বলতা দেখাননি।

বর্তমান আধুনিক পৃথিবী শিষ্টাচারের নামে দাম্ভিকতা শিক্ষা দেয়, ভদ্রতার আড়ালে অপচয় শিক্ষা দেয়। বিভিন্ন খাওয়া দাওয়ার অনুষ্ঠানে সভ্যতার নামে যে পন্থা অবলম্বন করা হয় তা মদীনার আদর্শ নয়; বরং পাশ্চাত্য রেওয়াজ ও স্টাইল। যার প্রভাব আমাদের কোমল মতি শিশুদের মাঝে ছোট বেলা হতে পরিলক্ষিত হয়। অথচ রাসূল সা. পানাহারের শিষ্টাচার, ভদ্রতা ও ইসলামী রেওয়াজ অত্যন্ত সুচারুভাবে বর্ণনা করেছেন। এমনকি এক বাচ্চাকে হাতে ধরে শিখিয়ে দিয়েছেন।

আমরা আমাদের সন্তানদের ছোটবেলা হতেই কৃপণতা, অন্যকে দেয়ার প্রতি অনীহা, সম্পদ কুক্ষিগত করা শিখাই অথচ এগুলো আল্লাহর পথে চলার কাঁটা স্বরূপ। এই অভ্যাস নিয়ে কোন মানুষ আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। তাই আমাদের সন্তানদের মাঝে এর বিপরীত গুণাবলী সৃষ্টি করতে হবে। সম্পদের প্রতি মোহ দূর করতে হবে।

তাছাড়া রাসূল সা. বলেছেন তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে নামাজের আদেশ দাও যখন তাদের বয়স সাত বছর। নামাজের জন্য তাদেরকে মারধর কর যখন বয়স দশের কোঠায়। সাত বছরের নিচের বাচ্চাকে নামাজের চেষ্টা করাও ঠিক নয়। সাত বৎসরের নিচের বাচ্চাদেরকে নিয়মতান্ত্রিক পড়াশুনায় লিপ্ত করা উপযোগী নয়; বরং এ সময়টা খেলাধুলার পাশাপাশি ঘরের পরিবেশে পড়াশুনা করাবে। আল্লাহ রাসূলের কথা, ইসলামের কালিমা, বিভিন্ন সহজ দোয়া, প্রয়োজনীয় জ্ঞান মুখে মুখে শিক্ষা দিবে। বর্তমান আধুনিক সভ্যতার ছোঁয়ায় বাচ্চাকে তিন বৎসর হতে যথারীতি স্কুলে পাঠদান শুরু হয়। বাসায় টিউটর রেখে তিন বৎসরের বাচ্চাকে পড়ানো হয়। এটা রাসূল সা. এর আদর্শের পরিপন্থী বাচ্চার অধিকার হনন। ছেলে মেয়েদের বয়স যখন সাত বৎসর থেকে দশ বৎসরে উপনীত হবে তখন নামাজ না পড়ার অপরাধে মারধর করা যাবে। বুঝা গেল দশ বৎসর বয়সে শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়ার জন্য মারধর করা যাবে। সে মারধরটা কি পরিমাণ হবে তার সীমা নির্ধারণ রয়েছে। মা-বাবা ওস্তাদ যদি বাচ্চাকে মারার প্রয়োজন বোধ করে তাহলে এতটুকু মারতে পারবে যাতে দাগ না পড়ে এবং ক্ষত না হয়। এর ব্যতিক্রম কোনভাবেই বৈধ নয়।

এজন্য আশরাফ আলী থানুভী র. এক মূলনীতি বর্ণনা করেছেন, যখন কোন ছেলে মেয়ে অন্যায় কিংবা শরীয়ত বিরোধী কাজ করে। ফলে অভিভাবকের প্রচণ্ড ক্ষোভের সৃষ্টি হয় তখন অপরাধের বিচার না করা বরং নিজেকে যখন স্বাভাবিক

অবস্থায় ফিরে পাবে তখন বিচার করা। এতে করে মারধর করার প্রয়োজন হলে সীমালঙ্ঘন হবে না। অন্যথায় রাগের বশীভূত হয়ে নিজে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এমনভাবে তাকে মারবে যার ফলে ছেলেটির গায়ে আঘাতের চিহ্ন পড়বে, ক্ষত হবে, রক্ত ঝরবে যা মস্তবড় গুনাহের কারণ হবে।

সর্বোপরি একটি কথা মনে রাখতে হবে, সন্তান থেকে পাওয়ার আশায় নয়; বরং আমরা সন্তানের জন্য যা করা প্রয়োজন তা করব আমাদের দায়িত্ব হিসাবে। সন্তানকে দ্বীনদার বানানো ইসলামী তরীকায় গড়ে তোলা এতে অবহেলার কোন সুযোগ নেই। কোন সুন্দর ফলবৃক্ষের পেছনে একটি সুন্দর বীজের ভূমিকাই যেহেতু মুখ্য ও প্রধান। তাই সুন্দর ভবিষ্যতের স্বার্থেই সন্তানের স্বযত্ন লালন সবার অবশ্য কর্তব্য।

লেখক: প্রিন্সিপাল, ডাউটিয়া কওমী মাদরাসা ধামরাই ঢাকা।

তওবা : আল্লাহর মহান অনুগ্রহ

মাওলালা মুনিরুল হক মারূফ

তওবার অর্থ: 'তওবা' একটা সুপরিচিত আরবী শব্দ। এর অর্থ হল ফিরে আসা। কুরআন সুন্নাহর পরিভাষায় 'পূর্বকৃত গুনাহের জন্য অনুতপ্ত হয়ে ভবিষ্যতে এরূপ আর করবে না বলে দৃঢ় সংকল্প করার নাম তওবা।'

তওবার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

তওবার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কুরআন হাদীসের অসংখ্য আয়াত দ্বারা তওবার অপরিহার্য প্রমাণিত। তওবা প্রত্যেক মুমিন বান্দার জন্য অপরিহার্য । মহান আল্লাহ তায়ালার খুব পছন্দনীয়। তওবা ফলাফল ছাড়াই কল্যাণকর। বান্দা যত বড় অন্যায় করুক না কেন তওবা করার সাথে সাথে দয়ালু আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। কৃত পাপের জন্য খালেছভাবে তওবা করতে হবে। এ রকম মনোভাব নিতে হবে যেন পাপের পুনরাবৃত্তি না হয়। তারপরও যদি পুনরাবৃত্তি হয়ে যায়, তবে হতাশ হওয়া যাবে না। তওবা অব্যাহত রাখতে হবে। শয়তান যেন হতাশা সৃষ্টি করে তওবা হতে ফিরিয়ে রাখতে না পারে এ দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। অভিশপ্ত শয়তান বিতাড়িত হওয়ার পর আল্লাহ তায়ালার কাছে কিছু কালের হায়াত প্রার্থনা করে। অসীম দয়ালু আল্লাহ তায়ালা তাকে কিয়ামত পর্যন্ত হায়াত দান করেন। শয়তান তখন বলেছিল, হে আল্লাহ! তোমার ইজ্জতের কসম করে বলছি, বনি আদমের দেহে যতক্ষণ পর্যন্ত প্রাণ থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তাদেরকে তোমার স্মরণ থেকে বিমুখ করে রাখবো। আল্লাহ তায়ালা তখন বলেছেন, আমার পরাক্রমশিলতার কসম! আমি প্রতিটি মুহূর্তে আদম সন্তানের জন্য তওবার দরজা খোলা রাখব। অতএব শয়তানের ধোঁকার ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে।

শয়তানের ধোঁকায় পতিত অনেক লোককে বলতে শুনেছি, আমি বড় গুনাহগার, আমার তওবা আল্লাহ কবুল করবেন না। বার বার আমার তওবা ভেঙ্গে যায়, আল্লাহ কি আমায় ক্ষমা করবেন? হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানুভী রহ. বলেন, বাহ্যিক দৃষ্টিতে লোকটি বিনয়ী হলেও প্রকৃত পক্ষে সে বড় অহংকারী। সে নিজের কৃত গুনাহকে আল্লাহর রহমতের তুলনায় বেশী বড় মনে করে। তবে হ্যাঁ, পুনরায় পাপে লিপ্ত হবার আশংকা থাকলে তওবায় সততা, দৃঢ়তা আনার আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। মহামহিম খোদা তায়ালা সফলতা দানের মালিক। ব্যর্থতা দেখা দিলে আবার তওবা করতে হবে। পুনরায় পাপে লিপ্ত হওয়ার ভয়ে তওবা থেকে ফিরে থাকা শয়তানের ধোঁকা মাত্র।

গুনাহের চার সাক্ষী

১. প্রথম সাক্ষী জমিন, যার উপর গুনাহ করা হল। কুরআনের ভাষায়, সেদিন পৃথিবী তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে। [সূরা যিলযালঃ ৪]

২. দয়ালু আল্লাহ বলেন, আজ আমি তাদের মুখে মোহর এঁটে দিব। তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দিবে। [সূরা ইয়াসীনঃ ৬৬]

৩. সহীফা বা খাতা যার মধ্যে কৃতকর্ম লিপিবদ্ধ করা হয়। কুরআনের ভাষায়, যখন সহীফা সমূহ খোলা হবে। [সূরা তাকবীরঃ ১০]

৪. আমলনামা লিপিবদ্ধকারী ফেরেস্তাগণ। কুরআনের ভাষায়, সম্মানিত লেখকবৃন্দ তোমাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত। তারা তা জানে তোমরা যা কর। [সূরা ইনফিতারঃ ১১]

পরিষ্কার সত্য চূড়ান্ত চারটি সাক্ষ্য প্রস্তুত, পাপীর পালাবার পথ কোথায়? দয়ালু আল্লাহ পাপীর পরিত্রাণের পথ বলে দিচ্ছেন। তাঁর করুণা ও দয়া এত অসাধারণ যে তিনি পাপিষ্ঠদের স্বীয় রহমতের দরজা থেকে ফিরিয়ে দেন না। তিনি বলেন তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহ তায়ালা বান্দার উপর রহম করাকে নিজের দায়িত্ব বানিয়ে নিয়েছেন। তাই তিনি একটি আমল বলে দিয়েছেন, তা হল 'তওবা'। আল্লাহ তায়ালা তার পাপিষ্ঠ বান্দাদেরকে তওবা উপহার দিয়েছেন। এ তওবা নামক পাউডার বা উপকরণ গুনাহের উপর ছিটানোর সাথে সাথে মজবুত চারটি সাক্ষ্যই মুছে যাবে, পাপের লেশ মাত্রও থাকবে না। সমস্ত পথ পরিষ্কার করে জান্নাতের পথ সুগম করে দিবে।

হাদীসে তওবা

১. যখন কোন বান্দা তওবা করে তখন দয়াময় আল্লাহ তায়ালা গুনাহলিপিবদ্ধকারী ফেরেস্তাদের কে তার গুনাহ ভুলিয়ে দেন। অনুরূপ সেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যার সাহায্যে গুনাহ করেছে, তাকেও তা ভুলিয়ে দেন। এবং জমিনের যে অংশে যে গুনাহ করেছে, সেখান থেকে তার পাপের সকল চিহ্ন মুছে দেন। আর সেই ব্যক্তি কিয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় মিলবে যে তার পাপের সাক্ষী কেউ থাকবে না।
২. লজ্জা ও অনুতাপ পাপের ক্ষতিপূরণ করে।
৩. ঐ পাপী সর্বোত্তম যে বেশী বেশী তওবা করে।
৪. আদম সন্তান মাত্রই গুনাহগার। তবে ঐ গুনাহগার সর্বোত্তম যে বার বার তওবা করে।
৫. গুনাহ থেকে তওবাকারী নিষ্পাপ ব্যক্তির মত পবিত্র।

৬. তওবাকারীগণ আল্লাহর বন্ধু।

৭. আল্লাহ্ তায়ালা দিনে গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির গুনাহ মাপের জন্য হাত প্রসারিত করে সারারাত তওবার জন্য ডাকতে থাকেন। অনুরূপ রাতে গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির গুনাহ মাফের জন্য হাত বাড়িয়ে সারা রাত তওবার জন্য ডাকতে থাকেন। এভাবে গুনাহ্ মাফের জন্য ডাকবেন যতদিন না সূর্য পশ্চিম আকাশে উদিত হবে।

৮. পাপী গুনাহ থেকে তওবা করলে আল্লাহ তায়ালা ঐ লোকটির চেয়ে বেশী আনন্দিত হন যে জনমানবহীন, পানি ও বৃক্ষলতাহীন, ভীতিকর বিশাল মরুভূমিতে উপস্থিত হল। তার সাথে আছে তার আরোহণের জন্তু যার উপর রয়েছে খাদ্য পানীয় ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পাথেয়। লোকটি ক্লান্ত হয়ে একটি বৃক্ষের ছায়াতলে শুয়ে নিদ্রা গেল। ইত্যবসরে তার জন্তুটি নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। লোকটি জন্তুর অনুসন্ধানে ঘুরতে লাগলো। খুঁজতে খুঁজতে ক্লান্ত হয়ে ক্ষুধায় ও পিপাসায় মরণাপন্ন হয়ে কোন উপায় না দেখে মৃত্যুকে সুনিশ্চিত ভেবে পূর্বের স্থানে এসে ক্লান্তিতে আবারো ঘুমিয়ে পড়লো। ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে দেখল তার জন্তুটি তার শিয়রে দাঁড়িয়ে আছে। সাথে সাথে তার খাদ্য, পানীয়, পাথেয় সব ঠিকমত আছে। নিরাশার আঁধারে আশার আলো দেখতে পেয়ে লোকটির যেমন খুশীর সীমা থাকে না তদ্রূপ কোন বান্দার পক্ষ থেকে তওবা করলে আল্লাহ তায়ালার খুশীর সীমা থাকে না; বরং এর চেয়ে বেশী আনন্দিত হন।

৯. হে আদম সন্তান ! যে পর্যন্ত তুমি আমাকে ডাকবে ও আমার কাছে ক্ষমা চাইবে আমি সে পর্যন্ত তোমার গুনাহ ক্ষমা করতে থাকব। গুনাহ্ যত বেশী হোক না কেন, আমি কোন পরোয়া করবো না। হে আদম সন্তান! তোমার গুনাহ আসমান পরিমাণ হলেও আমি কোন পরোয়া করবো না, ক্ষমা করে দিব। হে আদম সন্তান! পৃথিবী সমতুল্য গুনাহ নিয়ে যদি তুমি উপস্থিত হও, তাহলে আমি পৃথিবী ভর্তি ক্ষমা নিয়ে তোমার দিকে অগ্রসর হব। তওবাকারীর সুর আল্লাহর নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয়।

কুরআনে তওবা

১. হে মুমিনগণ! তোমরা প্রভুর সমীপে আন্তরিকভাবে তওবা করো। [সূরা তাহরীমঃ ৮]

২. হে মুমিন বান্দাগণ! তোমরা সকলে প্রভুর সাথে আন্তরিকতার সাথে তওবা কর, যেন সফলকাম হতে পারো। [সূরা নূরঃ ৩১]

তওবা সংক্রান্ত বুজুর্গদের বাণী

হযরত রাবেয়া বসরী রহ. বলেন, কিছু তওবাও গুনাহ! এমন তওবা থেকেও খালেছভাবে তওবা করতে হবে। যেমন, জনৈক তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন,

سبح بر کف توبہ برلب دل بر از ذوق گناہ ٭ معصیت راخندہ می آید برا ید استغفار ما

"হাতে তাসবীহ মুখে তওবা আর অন্তরে গুনাহের দুর্নিবার আকর্ষণ, আমাদের এ তওবা দেখে গুনাহেরও হাসি পায়।" হ্যাঁ গুনাহের হাসি পায়, এমন তওবা মূলত তওবা নয়। এমন তওবা করে থাকলে তা থেকে তওবা করতে হবে। প্রাণান্ত সাধনা করতে হবে যেন গুনাহ আর না হয়। তারপরও যদি কেউ নিজেকে ধিক্কার দিয়ে দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে তওবা করে, তবে অসীম দয়ালু আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করে দিবেন।

জনৈক তত্ত্বজ্ঞানী বলেন, যদি তুমি অগ্নিপূজক হয়ে থাকো, তুমি যদি কুফরী করে থাকো কোন ক্ষতি নেই চলে এসো, ফিরে এসো ! লজ্জিত ও অনুতপ্ত হৃদয়ে ফিরে এসো আমার দিকে। আমার দরবার আশার, নিরাশা বা হতাশার নয়। একশবার যদি তওবা থেকে পদস্খলন ঘটে, তবু পরোয়া করো না, আমার অভিমুখী হও, চলে এসো আমি তোমায় ক্ষমা করে দিব। বুঝা গেল তওবা দ্বারা সব গুনাহ মাফ হয়ে যায়। আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া উচিৎ নয়।

হযরত থানুভী রহ. বলেন, প্রতিটি আদালত অপরাধীকে ক্ষমা করে দেয়ার পর তার কৃত অপরাধকে রিপোর্ট হিসাবে লিখে রাখে। কিন্তু দয়ালু আল্লাহ তায়ালা এত মেহেরবান, যত বড় গুনাহ হোক না কেন তওবা করার সাথে সাথে গুনাহের রিপোর্ট জালিয়ে দেন। সহীফা হতে গুনাহ মুছে ফেলেন। অপরাধের কোন রিপোর্ট সংরক্ষণ করেন না। তাই গুনাহের সাথে সাথে তওবা করে তা মিটিয়ে দেওয়া উচিৎ।

তাই আমাদের অবশ্যকর্তব্য হল, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার ব্যাপারে সর্বোচ্চ সচেতন থাকা। তারপরও কোনভাবে গুনাহ হয়ে গেলে কালবিলম্ব না করে আল্লাহর কাছে আন্তরিক তওবা করা। আল্লাহ আমাদের অতীত পাপের জন্য তওবা করার তাওফিক দিন। আমীন।

লেখক: মুদাররিস, জামিয়া দারুল উলূম আল ইসলামিয়া দিলুরোড ঢাকা

পোশাক পরিচ্ছদ : ইসলাম কী বলে

মাওলানা ইমদাদুল হক

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে রয়েছে ইসলামের দিক নির্দেশনা। পোশাকও মানবজীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই কুরআন ও হাদীসে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। যেমন কুরআন মাজীদে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

﴿ يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ قَدۡ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكُمۡ لِبَاسٗا يُوَٰرِي سَوۡءَٰتِكُمۡ وَرِيشٗاۖ وَلِبَاسُ ٱلتَّقۡوَىٰ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ ﴾

অর্থাৎ "হে আদমের সন্তান সন্ততি! আমি তোমাদের জন্য পোশাকের ব্যবস্থা করেছি তোমাদের দেহের যে অংশ প্রকাশ করা দোষাবহ তা ঢাকার জন্য এবং সৌন্দর্যেরও উপকরণ হিসাবে। বস্তুত, তাকওয়ার যে পোশাক সেটাই সর্বোত্তম।" [আরাফঃ ২৬] এই আয়াতে মানব জাতির পোশাক কেমন হবে তার তিনটি মূলনীতি আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম মূলনীতি

তোমাদের দেহের যে অংশ প্রকাশ করা দোষাবহ তা ঢাকার জন্য এখানে سَوۡآت শব্দ ব্যবহার হয়েছে। এর অর্থ হলো ঐসব বস্তু বা বিষয় যার আলোচনা করা কিংবা খোলা রাখা মানুষ স্বভাবতই লজ্জাজনক মনে করে। উদ্দেশ্যে হলো, সতর আবৃত করা। অতএব পোশাকের সর্ব প্রথম মৌলিক উদ্দেশ্য হলো সতর ঢেকে রাখা । পুরুষ ও নারীর যেসব অঙ্গকে আল্লাহ তায়ালা সতর হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন সে সব অঙ্গকে আবৃত রাখা আবশ্যক। পুরুষের সতর হলো নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত। আর নারীর জন্য মুখমণ্ডল, হাতের কব্জি ও পায়ের গোড়ালি ব্যতীত সম্পূর্ণ শরীরটাই সতর। সতর ঢাকা ফরজ। যে পোশাকে সতর ঢাকা যায় না তা শরীয়তের দৃষ্টিতে পোশাকের অন্তর্ভুক্ত নয়।

সুতরাং এই মূলনীতির আলোকে আমরা তিন ধরনের পোশাক পাই। যেগুলো দ্বারা সম্পূর্ণ সতর ঢাকা যায় না-

১. এমন সংক্ষিপ্ত পোশাক যা পরলে সতর আবৃত হয় না

২. এমন পাতলা ফিনফিনে পোশাক যা পরিধান করলে সতর আবৃত হয় বটে কিন্তু শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্পষ্ট দেখা যায়।

৩. এমন আঁটসাঁট পোশাক যা পরিধান করা সত্ত্বেও শরীরের স্পর্শকাতর অঙ্গসমূহ দেখা যায়।

এই তিন ধরনের পোশাক পরিপূর্ণ সতর ঢাকতে ব্যর্থ বিধায় শরীয়তের দৃষ্টিতে এমন পোশাক পরিধান করা হারাম। যারা এই তিন ধরনের পোশাক পরে তাদের ব্যাপারে রাসূলে কারীম সা. ইরশাদ করেন, 'তারা পোশাক পরেও নগ্ন।'

দ্বিতীয় মূলনীতি

আয়াতের মধ্যে দ্বিতীয় মূলনীতি বলা হয়েছে ريشا অর্থাৎ আমি পোশাক তৈরি করেছি তোমাদের সাজ সজ্জার জন্য। মূলত পোশাকের মাধ্যমে মানুষের সৌন্দর্য প্রকাশ পায়। তাই পোশাক হওয়া উচিত আকর্ষণীয় এবং দৃষ্টিনন্দন, যাতে করে তা দেহাবয়বকে সুশোভিত করতে পারে। রুচিহীন ময়লা অপরিচ্ছন্ন দৃষ্টিকটু এবং ঘৃণার জন্ম দেয় এমন পোশাক এই মূলনীতির বিরোধী।

তৃতীয় মূলনীতি

আয়াতের মধ্যে তৃতীয় মূলনীতি হলো لباس التقوى অর্থাৎ বিনয়ের পোশাক হতে হবে। অহংকার ও বড়ত্ব প্রকাশকারী পোশাক পরিধান করা যাবে না। এ জাতীয় পোশাক ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম।

চতুর্থ মূলনীতি

রাসূলে কারীম সা. ইরশাদ করেন, من تشبه بقوم فهو منهم যে বিজাতীয় সাদৃশ্য গ্রহণ করবে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। এই হাদীসের আলোকে চতুর্থ মূলনীতিটি বের হয়। আর তা হলো পোশাকের মাধ্যমে বিজাতীয় সাদৃশ্য গ্রহণ কিংবা অনুকরণ উদ্দেশ্য হতে পারবে না। অর্থাৎ সে ধরনের পোশাক পরা যাবে না। আল্লাহ তায়ালা আমাদের বিজাতীয় পোশাক পরিচ্ছদ পরা থেকে বিরত রাখুন। পোশাকের চার মূলনীতির আলোকে পোশাক পরার তাওফীক দান করুন। আমীন।

লেখক: মুদাররিস, জামিয়া দারুল উলূম আল ইসলামিয়া দিলুরোড ঢাকা

ইভটিজিং প্রতিরোধে হিযাবই প্রধান অবলম্বন

মাওলানা হাবিবুর রহমান

ইভটিজিং! এ শব্দটার সাথে আমাদের সমাজের প্রায় সকলেই কমবেশি পরিচিত। এটা একটি সামাজিক ব্যাধি হিসাবে শেকড় গেড়ে বসেছে। ইভটিজিং নামক এ যৌন নির্যাতন ও যৌন হয়রানী এখন মারাত্মক সমস্যা ও সামাজিক ব্যাধি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর ক্রমশ তা চরম আকার ধারণ করে মহামারির ন্যায় ছড়িয়ে পড়ছে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, গাড়ি, বাড়ী ও রাস্তায় চলাচল সর্বত্রই মেয়েরা ইভটিজিং এর শিকার হচ্ছে প্রতিনিয়ত। আর একে কেন্দ্র করে হত্যা ও আত্মহত্যার মত ঘটনা ঘটছে অহরহ। এর কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে বিজ্ঞজনেরা অনেক কিছুই লিখেছেন, বলেছেন। কেউ সামাজিক সচেতনতার কথা বলছেন। কেউ বলছেন, চারিত্রিক সংশোধনের কথা, কেউবা সামাজিক নিরাপত্তা জোরদার করতে জোর তাগিদ দিচ্ছেন, আবার কেউ ভিন্ন সুরে বলছেন মেয়েদেরকেও এর প্রতিরোধ করতে হবে। তাই মেয়েদের কারাতে, মার্শাল আর্ট শিখে আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে হবে। দুরাশার কথা হল, বুদ্ধিজীবীগণ সকলেই তাদের মুক্তবুদ্ধি চর্চার ঝুলি থেকে ঢেলে দিলেন অনেক উপায়। কিন্তু আসল কথা বলেননি। সরকারও নতুন নতুন আইন করেছে। কিন্তু পরিস্থিতির কোন উন্নতি হচ্ছে কি? উন্নতি তো দূরের কথা বরং চিকিৎসার সাথে পাল্লা দিয়ে যেন রোগ আরও বাড়ছে। বস্তুত পর্দাহীনতাই এ অবক্ষয়ের মূল কারণ। মাওলানা নূরুল ইসলাম ওলীপুরী যথার্থই বলেছেন, পুরুষ যখন নারীকে অবাধ উপভোগের সুযোগ হিসাবে পর্দার বাইরে নাগাল পায়, তখনই উপভোগের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আর এতে যখন সে বাধা পায়, তখনই নির্যাতনের পথ বেছে নেয়। এ ছাড়াও ভাঙ্গা কাঁঠালে মাছি বসবেই এটা কে না জানে।

বর্তমান সময়ের আধুনিক মনোভাব সম্পন্ন পশ্চিমা নগ্ন সংস্কৃতির বলি এদেশি মেয়েরা পর্দা ছেড়ে আলট্রা মডার্ন পোশাক পরে অর্ধনগ্ন অবস্থায় বের হচ্ছে। যার ফলে তারা ইভটিজিংয়ের শিকার হচ্ছে। তাই আমি বলতে চাই সমাজকে এ অভিশাপ থেকে রক্ষা করতে সর্ব প্রথম গোড়া ঠিক করতে হবে। অর্থাৎ মেয়েরাই প্রথমে নিজকে সংশোধন করতে হবে, তখন ছেলেরাও স্বাভাবিকভাবে ঠিক হয়ে যাবে। মেয়েদের সংশোধনের পথ খুব সহজ। আর সেটা হল ইসলামে বর্ণিত হিযাব তথা পর্দাবিধান। পর্দাই পারে বর্তমান সমাজের ইভটিজিং নামক ব্যাধি থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে। পর্দা তো ঐ বিধান যা আমাদের হাজার বছর ধরে সামাজিক অনাচার, ধর্ষণ, নারী নির্যাতন ও অপহরণের ঘটনা কমানোর ক্ষেত্রে

বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে চলেছে। হিযাব তথা পর্দাবিধান প্রতিটি মুসলিম নারীর উপর ফরজ। নারী জাতির ইজ্জত ও সতীত্ব সংরক্ষণে হিযাব একটি কার্যকর ব্যবস্থা। তাইতো মহান আল্লাহ তায়ালা নারী জাতীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করনে ঘোষণা করেন, ‘হে নবী আপনার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও মুমিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন জিলবাব (বড় চাদর বা বোরকার নেকাব) নিজেদের উপর ঢেকে দেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্ত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ মহান ক্ষমাশীল ও দয়ালু।’ [সুরা আহযাবঃ ৫৯]

উক্ত আয়াতে জিলবাবের ব্যাখ্যায় মা‘আরিফুল কুরআনের লেখক মাওলানা মুফতী শফী রহ. বলেছেন যে, ‘জিলবাব’ এমন আবরণ যা দ্বারা আপাদমস্তকসহ সম্পূর্ণ শরীর আবৃত হয় আর তার অংশ বিশেষ হল নেকাব। এর দ্বারা শরীয়তের পর্দার বিধানও পালিত হয়ে যাবে। এবং বখাটে ইভটিজারদের হাত থেকেও রেহাই মিলবে ইনশাআল্লাহ।

লেখক: মুদাররিস, জামিয়া দারুল উলূম আল ইসলামিয়া দিলুরোড ঢাকা

শান্তির ধর্ম ইসলাম

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহমান

নিশ্চয় আল্লাহর নিকট মনোনীত ধর্ম একমাত্র ইসলাম। ইসলাম শব্দের প্রকৃত অর্থ আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পন করা, অনুগত হওয়া এবং নিজের ইচ্ছা ও স্বাধীনতাকে তার উপর ছেড়ে দেওয়া। এ অর্থের বিচারে প্রত্যেক নবীর আমলে যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন এবং তাদের আনিত বিধি বিধানের আনুগত্য করেছে তারা সবাই মুসলমান ও মুসলিম নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য ছিল, এবং তাদের ধর্মও ছিল ইসলাম।

সকল যুগের অশান্তি, বর্বরতা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, খুন-খারাপি, চুরি-ডাকাতি, অহংকার- দাম্ভিকতা, সবই দুরীভূত করেছে শান্তির ধর্ম ইসলাম। এর মহান আদর্শের মাধ্যমে একথা একেবারেই সত্য। ইসলাম শান্তি কামনা করে পরস্পরে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধুত্ব স্থাপন করে। এখানেই থেমে থাকেনি ইসলাম, সন্ত্রাসের মত জঘন্য অপরাধ চিরতরে দমনেও শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে আসছে, যার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে দ্বিতীয়টি খুঁজে বের করা খুবই দুষ্কর। মহান আদর্শের প্রতীক মহানবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সা. যখন পৃথিবীতে আগমন করেন তখন শুধু আরব নয় গোটা বিশ্বের অবস্থা কত নাজুক ছিল তা সকলেরই জানা আছে। যাকে আল্লাহপাক ইসলামের ঝাণ্ডা দিয়ে মহান চরিত্রের অধিকারী করে পাঠিয়েছিলেন। [সুরা আলকালাম, আয়াত-৪]

হাদীস শরীফে নবীজী সা. ইরশাদ করেন, আমি উত্তম চরিত্রের পূর্নতা দান করার জন্যই প্রেরিত হয়েছি। এর স্বপক্ষে হযরত আয়শা রা. বলেন, স্বয়ং কুরআন রাসূলে কারীম সা. এর মহৎ চরিত্র। অর্থাৎ কুরআনে পাক যেসব উত্তম কর্ম ও চরিত্র শিক্ষা দেয়, তিনি সেসবের বাস্তব নমুনা। মহান চরিত্র ও আদর্শের মাধ্যমে সন্ত্রাস দমনে এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন পৃথিবীর ইতিহাসে। কত চোর-ডাকাত, ব্যাভিচারী, মদখোর প্রকাশ্যে তওবা করে মুসলমান হলো। তার আহবান ছিল, হে লোকসকল! এসো এক আল্লাহর ইবাদত করি, যিনি স্রষ্টা ও প্রতিপালক। এসো ভাই ভাই হয়ে চলি, কাঁধে কাঁধ রাখি, সুখে দুঃখে একে অপরের পাশে দাঁড়াই, ছোটদের স্নেহ ও বড়দের সম্মান করি। আর নারী জাতিকে যথাযথ সম্মান ও ন্যায্য অধিকার দিয়ে চরম অবহেলা থেকে রক্ষা করি। এ অর্জন শান্তির ধর্ম ইসলামের আদর্শের দ্বারাই সম্ভব। অস্ত্র কিংবা বাহুবলের শক্তিতে নয়। আজ যারা স্বাধীনতার নামে নারীর ইজ্জত-সম্মান নষ্ট করছে, ধর্ষণ করছে তারা নারী স্বাধীনতা নামের সভ্য সমাজে অসভ্য ভোগবিলাসী।

ইতিহাস স্বাক্ষী, ইসলাম গ্রহণের আগে কেমন ছিলেন হযরত উমর ও হযরত দিহয়াতুল কালবীসহ অন্যান্য লোকজন ? নিজ কণ্যা সন্তানকে জীবন্ত পুঁতে মারতেন। হযরত উমর রা. এর ঘটনা সবারই জানা, নবীজীকে হত্যা করার জন্য বের হয়ে নবীজির হাতে ইসলাম গ্রহণ করে ফিরলেন। আল্লাহ তায়ালা হযরত উমর রা. কে এমনভাবে কবুল করলেন যিনি অর্ধজাহান শাসন করেছেন। যার শাসনামলে মুসলিম, অমুসলিম সকলেই শান্তিতে বসবাস করতে পারছিল। রাতের বেলা হযরত উমর রা. জনগণের বাড়ি বাড়ি খবর নিতেন, কাদের চুলাতে আগুন জ্বলছে আর কাদের জ্বলছে না। তিনি বলতেন, আমি থাকাবস্থায় যদি একটি মানুষও না খেয়ে মারা যায় তার জবাবদিহি আমি উমরকেই করতে হবে। এভাবে তিনি রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। দুঃখের সাথে বলতে হয় আজ আমাদের দেশের শাসকদের অবস্থা কোথায় দাড়িয়ে আছে? শাসক যদি এমন হয়, তাহলে প্রজারা যাবে কোথায়? একটি বারের জন্যও কি তাদের মনে পরে না উমরের মতো আদর্শ শাসকের কথা? আমাদের দেশের শাসকেরা যদি হযরত উমরের মত আর্দশ গ্রহণ করতো, তাহলে হলফ করে বলতে পারি আবার পৃথিবীতে নেমে আসতো সেই সোনালী দিন, বইতো সেই শান্তির সুবাতাস।

লেখক: মুদাররিস, জামিয়া দারুল উলূম আল ইসলামিয়া দিলুরোড ঢাকা

জামিয়া পরিচিতি ও অবদান

'আল্লাহ মানুষকে অজানা বিষয়ের শিক্ষা দিয়েছেন।' [সূরা আলাক: ৫]

রাসূল সা. বলেন, 'আমি শিক্ষকরূপে প্রেরিত হয়েছি।' [বুখারী: ৫০৩৩]

শিক্ষাই জাতির মূল। শিক্ষাকে মানুষের মেরুদণ্ডের সাথে তুলনা করা হয়। মেরুদণ্ডহীন মানুষ যেমন স্থির দাঁড়াতে পারে না তেমনি শিক্ষাবিহীন জাতিও মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকতে পারে না। জাতিসত্তাকে সচলরূপে জাগিয়ে রাখার স্বার্থেই শিক্ষার সুব্যবস্থা অতীব জরুরী। শুধু ইহকালীন জীবনের স্থিতি ও উন্নতির লক্ষ্যেই নয়; বরং মরণোত্তর জীবনের পরম সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের স্বার্থেই ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার আবশ্যকতা অপরিহার্য। তাই মানবজাতির ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের উন্নতি সাধনে আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। যারা নিজ নিজ উম্মতকে দুনিয়ার সুন্দর ও সুশৃঙ্খল জীবন যাপনের শিক্ষা দিয়েছেন আর পরকালে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় আবাস অর্জনের দীক্ষা দিয়েছেন। আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ সা. ও এ দায়িত্ব অত্যন্ত সুচারুরূপে আঞ্জাম দিয়েছেন। নববী আদর্শে গড়া সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, 'আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি যতদিন তোমরা এ দুটি জিনিস আঁকড়ে ধরে থাকবে ততদিন তোমরা বিভ্রান্ত ও বিপথগামী হবে না। একটি হচ্ছে আল্লাহর কিতাব আর অপরটি হচ্ছে আমার সুন্নত।' রাসূল সা. এর রেখে যাওয়া এ দুই মীরাসকে ধারণ করে সাহাবায়ে কেরাম পৃথিবীর আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়েন। তাদের থেকে ধারাবাহিকভাবে এ দুই আমানত গ্রহণ করেছিলেন তাদের একান্ত উত্তরসূরি তাবেঈন, তাবেতাবেঈন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন, সালফে সালেহীন ও ফুকাহায়ে উম্মত। রাসূল সা. এর যোগ্য উত্তরাধিকারী উলামায়ে কেরাম হাজারো বাধা উপেক্ষা করে সীমাহীন ত্যাগ তিতিক্ষার মাধ্যমে যুগ যুগ ধরে জ্ঞানের এ মশাল প্রজ্বলিত রাখার নিরলস চেষ্টা ও বিরামহীন সাধনা অব্যাহত রেখেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় ভারত উপমহাদেশে শাহ ওয়ালী উল্লাহর সুযোগ্য উত্তরসূরি হুজ্জাতুল ইসলাম কাসেম নানুতুভী রহ. ১৮৬৬ সালে সমকালীন আলেমগণকে সাথে নিয়ে ভারতের উত্তর প্রদেশে সাহারানপুর জেলার দেওবন্দ নগরীতে ঐতিহাসিক ইসলামী বিদ্যাপীঠ ও বৈপ্লবিক দ্বীনী শিক্ষাকেন্দ্র 'দারুল উলূম দেওবন্দ' এর ভিত্তিস্থাপন করেন। উপমহাদেশের কওমী মাদরাসাগুলো এ 'দারুল উলূম দেওবন্দের' চিন্তাধারা ও কারিকুলামের অনুসরণ করে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত। ঢাকার রমনা থানাধীন নিউ ইস্কাটন দিলুরোডে প্রতিষ্ঠিত জামিয়া দারুল উলূম আল ইসলামিয়াও দারুল উলূম

দেওবন্দের চিন্তা চেতনা ও আদর্শে পরিচালিত একটি ইসলামী বিদ্যাপীঠ ও দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

যেভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এ জামিয়া

ঢাকা শহরসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য কওমী মাদরাসা গড়ে উঠেছে। যেগুলোর সোনালী স্পর্শে মাদরাসার আশপাশ এলাকার মানুষ পরিণত হচ্ছে স্বর্ণমানবে। কিন্তু ঢাকার প্রাণকেন্দ্র রমনা থানাধীন নিউ ইস্কাটন দিলুরোডের বাসিন্দারা দীর্ঘদিন যাবৎ কওমী মাদরাসার সোনালী স্পর্শের শূন্যতা অনুভব করছিল। এরই মাঝে দিলুরোড এলাকার নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলার জন্যে এর সবগুলো প্রবেশ পথ সংরক্ষণ করা হয় এবং বর্তমান হতিরঝিলে বের হওয়া পশ্চিম দিকের প্রবেশ পথটিও বন্ধ করে দেয়া হয়। এতে এ প্রবেশ পথের মাথায় কিছুটা খালি জায়গা বের হয়ে আসে। আলহাজ্ব জাহাঙ্গীর সাহেব, তার বন্ধু-বান্ধব, ছোট ভাইগণসহ এলাকার মুরুব্বীগণ এই জায়গাটিকেই কওমী মাদরাসা প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত স্থান হিসাবে নির্বাচন করেন। তখন তারা তাদের সকলের একান্ত স্নেহাস্পদ তরুণ আলেম মুফতী সালাহ্ উদ্দীন সাহেবের মধ্যস্থতায় ২০০৪ ইং সনে এই জামিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সময়ে স্বল্প পরিসরে মাদরাসার শিক্ষক ও ছাত্রগণ সীমাহীন ধৈর্য ও বিশাল ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করে জামিয়াকে ধীরে ধীরে সামনের দিকে এগিয়ে নেয়ার চেষ্টা চালায়। সাথে ছিল এলাকার মুরুব্বীগণসহ যুবক ও প্রতিটি মানুষের সার্বিক সহযোগিতা ও সান্ত্বনা। মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই প্রতি বছর দ্রুত উন্নতির দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। এরই মাঝে বর্তমান হাতিরঝিল প্রকল্প বাস্তবায়নের নকশায় মাদরাসার টিনসেড ঘরটি ভেঙ্গে দেওয়া হয়। এতে মাদরাসার উস্তাদ-ছাত্রসহ এলাকার প্রতিটি মানুষের মনে একটি বেদনার ধাক্কা লাগে। তবে কেউ আশাহত হননি। আল্লাহর কুদরতি কারিশমার প্রতি সকলেরই সীমাহীন আস্থা ছিল। আল্লাহর কুদরতের প্রকাশ শুরু হয়ে গেল- আলহাজ্ব সায়েরা কালাম নিজের বসতবাড়ির কয়েকটি ঘর মাদরাসার জন্য খালি করে দিলেন। ফলে পূর্বের তুলনায় মাদরাসার পরিধি অনেক গুণ বেড়ে গেল। সেই সময় ছাত্রদের কোলাহল ও আনাগোনায় জাহাঙ্গীর সাহেবের পরিবারের লোকজনের শত কষ্ট ও অসুবিধা হওয়া সত্ত্বেও তারা তা হাসি মুখে বরণ করে নেন। এ ঘরগুলোতে জামিয়ার সকল ছাত্রের আবাসন ব্যবস্থা সংকুলান না হওয়ায় নিকটস্থ নূর মসজিদ কর্তৃপক্ষ, মুসল্লী ও মসজিদ সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকেই জামিয়ার অবশিষ্ট ছাত্রদেরকে আপন সন্তানের মতই আদর-সোহাগ দিয়ে মসজিদের ২য় ও ৪র্থ তলায় থাকার ব্যবস্থা করে দেন। ছাত্রদের আবাসিক অবস্থানে তাঁরা কখনো

ন্যূনতম বিরক্তি বোধ করেননি। আল্লাহ তায়ালা সকলকেই উত্তম বিনিময় দান করুন।

মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই আল্লাহ তায়ালা কুদরতীভাবে সব কিছুর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এলাকার লোকজন সর্বাত্মক সহযোগিতা নিয়ে সর্বদা মাদরাসাটির পাশে আছেন। যখন যা প্রয়োজন আল্লাহ তায়ালা গায়েবীভাবে তাদের দ্বারাই পূরণ করে দিচ্ছেন। এই জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে শেষ করা যাবে না। প্রতি বছর মাদরাসার সার্বিক উন্নতির পাশাপাশি কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড (বেফাক) এর অধীনে পরিচালিত পরীক্ষার ফলাফলও অনেক সন্তোষজনক অবস্থায় চলে আসে। প্রায় প্রতি বছরই অসংখ্য ছাত্র জিপিএ ৫ এর পাশাপাশি বেশ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্র মেধা তালিকায়ও স্থান লাভ করছে। এ যেন এ জামিয়ার উস্তাদ ছাত্রসহ দিলুরোডবাসী প্রতিটি মানুষের গৌরব ও সাফল্য। এ উজ্জ্বল সাফল্য ও শিক্ষা দীক্ষার দ্রুত উন্নতির উপর ভিত্তি করেই অল্প সময়ের মধ্যে এ বছর জামিয়ায় তাকমীল (দাওরায়ে হাদীস) শ্রেণী চালু হয়েছে। এটা আল্লাহর অশেষ মেহেরবানী। মাদরাসার সার্বিক অবস্থায় খুশি হয়ে আলহাজ্ব সায়েরা কালাম তার বহু মূল্যবান জায়গা থেকে কিছু জায়গা মাদরাসার নামে ওয়াকফ করে দিয়েছেন। বর্তমানে উক্ত জায়গায় একটি বহুতল ভবন নির্মাণের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ ব্যাপারে আমরা জামিয়ার পক্ষ থেকে সকলের দোয়া ও সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি।

জামিয়ার বর্তমান কার্যক্রম

১. কিতাব বিভাগ

একজন শিক্ষার্থীকে পূর্ণ দ্বীনী শিক্ষার মাধ্যমে যোগ্য আলেমরূপে গড়ে তোলার জন্য আমাদের জামিয়ায় ৫টি স্তরে মোট ৯ বছর মেয়াদী এ শিক্ষা প্রকল্পটি চালু রয়েছে। এটিই জামিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় প্রধান ও মৌলিক কার্যক্রম। এ প্রকল্পের ৫ স্তরের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নরূপঃ

ক. ইবতিদাইয়্যাহ (প্রাইমারী) মেয়াদ ২ বছর

খ. মুতাওয়াসসিতাহ (মাধ্যমিক) মেয়াদ ২ বছর

গ. সানুবিয়্যাহ (উচ্চ মাধ্যমিক) মেয়াদ ২ বছর

ঘ. ফযীলত (ডিগ্রী) মেয়াদ ২ বছর

৬. তাকমীল (মাস্টার্স) মেয়াদ ১ বছর

২. দাওয়াহ ও গবেষণা বিভাগ

এ বিভাগের আওতায় দেশব্যাপী পথভুলা মানুষদেরকে আল্লাহমুখী ও আখিরাতমুখী করার মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিভিন্ন দাওয়াতী ও গবেষণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। প্রতিমাসে এলাকার তাবলীগী সাথীদের সঙ্গে নিয়ে একটি জামাত বের হয়। যা ঢাকা শহরের বিভিন্ন মসজিদে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করে আসছে।

২. ছাত্র পাঠাগার

সিলেবাসভুক্ত পাঠ্য বইয়ের জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের পরিধি বিস্তারের লক্ষ্যে বিভিন্নমুখী জ্ঞান-বিজ্ঞান, পত্র-পত্রিকা ও সাহিত্য-সাময়িকী সমৃদ্ধ একটি ছাত্র পাঠাগারের ব্যবস্থা রয়েছে। যার মাধ্যমে জামিয়ার তালিবে ইলমরা সিলেবাসের বাইরে বহির্বিশ্বের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বিষয়াদির জ্ঞান অর্জন করতে পারে।

৩. পাক্ষিক দেয়াল পত্রিকা

তথ্য-প্রযুক্তির এ যুগে ছাত্রদেরকে লিখনির ময়দানে দক্ষ করে তুলতে ছাত্রদের লেখাসমৃদ্ধ জামিয়া দুটি পাক্ষিক দেয়াল পত্রিকা প্রকাশ করে থাকে। একটি আমাদের মাতৃভাষা বাংলা ভাষায় 'কাশফুল' নামে। অপরটি আন্তর্জাতিক ধর্মীয় ভাষা আরবী ভাষায় 'আন-নাশআহ' নামে। এ পত্রিকা দুটি ছাত্রদেরকে দক্ষ লেখকরূপে গড়ে তুলতে অসামান্য ভূমিকা রেখে চলছে।

৪. সাপ্তাহিক বক্তৃতা প্রশিক্ষণ

লিখনির পাশাপাশি দ্বীনের দাওয়াত ও তাবলীগের কর্তব্য পালনের আবশ্যকতাকে সামনে রেখে শিক্ষার্থীদের বাকশক্তি বিকাশের জন্য এ বিষয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে প্রতি বৃহস্পতিবার বক্তৃতা প্রশিক্ষণ মজলিস অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে নির্বাচিত বক্তাদেরকে পুরস্কৃত করা হয়।

৫. তরবিয়াতী মজলিস

ছাত্রদেরকে শিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি নৈতিকভাবে দীক্ষিত করার লক্ষ্যে প্রতি মাসে অন্তত দুইবার তরবিয়াতী মজলিস অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। যাতে দেশের বরেণ্য বুযুর্গ ও প্রথিতযশা আলেম-উলামা ইসলাহী বয়ান পেশ করে থাকেন। এ পর্যন্ত আমাদের জামিয়া এ উপলক্ষে দেশি ও আন্তর্জাতিক অসংখ্য বরেণ্য বুযুর্গদের পাদচারণায় ধন্য হয়েছে।

৬. ফতোয়া ও ফারায়েজ বিভাগ

ইসলামী জীবন যাপনে দেশের জনসাধারণ মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি বণ্টনসহ আরো অন্যান্য সমস্যার সমাধাকল্পে যে মাসআলা-মাসায়িল জানতে আলেম-উলামাদের শরণাপন্ন হন জামিয়ার অত্র বিভাগ থেকে বিজ্ঞ মুফতী বোর্ডের মাধ্যমে সে সকল বিষয়াদির লিখিত ও মৌখিক ফতোয়া প্রদানের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা রয়েছে।

৬. কুতুবখানা বা লাইব্রেরী

কুরআন হাদীস তাফসীর ফিকহ্ ফতোয়া উসূল আকাঈদ ইতিহাস আরবী ব্যাকরণ সাহিত্য তথা উলূমে ইসলামিয়ার সকল শাস্ত্র ও বাংলা ভাষার সহস্রাধিক বইপত্র সমৃদ্ধ একটি বৃহদাকারের লাইব্রেরী রয়েছে। যা থেকে তালিবে ইলম ও জামিয়ার আসাতিযায়ে কেরাম সর্বদা জ্ঞানের অমিয় সুধা পানে পরিতৃপ্ত হচ্ছেন।

৭. ডিজিটাল লাইব্রেরী

জামিয়ার কম্পিউটার বিভাগের আওতায় একটি ডিজিটাল ইলেকট্রিক লাইব্রেরীর ব্যবস্থাও রয়েছে। যার মাধ্যমে শত-সহস্র ভলিউম থেকে মুহূর্তেই যে কোন তথ্য ও রেফারেন্স উদ্ধার করা সম্ভবপর হচ্ছে। বিভিন্ন মাদরাসায় এ ডিজিটাল লাইব্রেরী সম্প্রসারণের জন্যও এ বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে এবং উপযুক্ত ছাত্রদের ইসলামী তথ্য-প্রযুক্তির সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য এ বিভাগ থেকে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ারও ব্যবস্থা রয়েছে।

৮. লিল্লাহ বোর্ডিং

সমাজের হতদরিদ্র ও নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে ইলমে নববী অন্বেষণে উঠে আসা তালিবে ইলমরাও যাতে বঞ্চিত না হয় সে দিকে লক্ষ করেই এ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যার ব্যয় সমাজের বিত্তবান ও সুহৃদ ভাইবোনদের প্রদত্ত যাকাত ফিতরা মান্নত কুরবানীর চামড়া ও সাধারণ দান ইত্যাদি দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছে।

জামিয়ার ভবিষ্যত পরিকল্পনা

একটি পূর্ণাঙ্গ দ্বীনী মারকাযে যতগুলো দ্বীনী শাখা বিদ্যমান থাকা আবশ্যক, আমাদের প্রস্তুতি ও অবস্থানের জায়গা সল্পতার কারণে তা আমরা এখনো খুলতে সামর্থ্য হইনি। নিকট ভবিষ্যতে অতিসত্বর এ বিভাগগুলো খুলার পরিকল্পনা রয়েছে,

১. মক্তব বিভাগ

এ বিভাগে এক বছর সময়ের মধ্যে একজন কোমলমতি শিশুকে অত্যন্ত যত্নসহকারে আরবী হরফের সঠিক পাঠ পরিচয় এবং সঠিক উচ্চারণসহ কুরআন পাঠ ও ইসলামের মৌলিক প্রয়োজনীয় মাসায়িল শিক্ষা দেওয়া হয়।

২. হিফজ বিভাগ

এ বিভাগে মাত্র ৩ বছর সময়ে একজন শিশুকে পূর্ণ কুরআন সহীহ্ শুদ্ধরূপে মুখস্থ করানো হয়।

৩. তাখাস্‌সুস বিভাগ বা স্পেশালাইজেশন প্রোগ্রাম

এ বিভাগে একজন দাওরায়ে হাদীস উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর জন্য কুরআন হাদীস ও ফিকহ বিষয়ে গভীর জ্ঞানার্জনের এবং এ শাস্ত্রগুলোতে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করার সুব্যবস্থা করা হয়। কুরআন হাদীস ও ফিকহ প্রতিটি বিষয়ের জন্য ২ বছর সময় ব্যয় করতে হয়।

আল্লাহ তায়ালা আপনাদের এ প্রিয় জামিয়াটিকে উত্তর উত্তর উন্নতি দান করুন এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে কবুল করে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমীন।

১৪৩৩-১৪৩৪ হিজরী শিক্ষাবর্ষের

দাওরায়ে হাদীস সমাপনকারী ছাত্রদের

বিদায়ী অভিব্যক্তি

হঠাৎ করেই বিদায়ের ঘণ্টা বেজে উঠল। খুব দ্রুতই সময়গুলো পেরিয়ে গেল। এইতো সেই দিন ইলমের অন্বেষায় এক বুক আশা নিয়ে জড়ো হয়েছিলাম দারুল উলূমের উদার আঙ্গিনায়। আমরা কজন, এই যে আমরা আজ যারা দাঁড়িয়ে আছি আপনাদের সামনে নতশির অপরাধীর মতন। তারপর দিনে দিনে হেঁটেছি অনেক পথ। বিকশিত হয়েছি ঐশী নূরের প্রেরণায়। কিন্তু আজ এক অব্যক্ত ব্যথায় আমাদের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠছে। আঁখি দুটি ভিজে আসছে তপ্ত শিশিরে। এক অসহ্য কষ্ট দুমড়ে মুচড়ে দিচ্ছে পাঁজরের খাঁচাকে। শুধু দুঃখ বেদনা আর বিধুর নিস্তব্ধতা। আমরা ভুলে বসেছি আমাদের অস্তিত্ব। আজ যেন আমরা ফিরছি রিক্ত হস্তে, নিঃস্ব হয়ে। তিন অক্ষরের একটি শব্দ 'বিদায়'। আহ! কি যে কষ্ট রয়েছে এর মাঝে। এ যেন শুনতেই খারাপ লাগছে। ভাবতেও কষ্ট হচ্ছে। বিদায় শব্দটি আমাদের ক্ষেত্রেও আসতে পারে তা ছিল কল্পনাতীত। কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস 'বিদায়' শব্দটিকে বরণ করতে হলো আমাদেরও। চারদিকে শুধু গুঞ্জরিত হচ্ছে বিদায় ... বিদায় ... বিদায় ...।

কালের ঘুর্ণ্যমান চাকা আমাদের পৌঁছে দিয়েছে বিদায়ের দুয়ারে। তাই আমরা আজ নিথর, নির্বাক। শুধু উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি সমাপ্তির পথে, ভিজে জবজবে চোখের দু'টি কোণ। ঝরে পড়ছে তপ্ত অশ্রু। আজ সত্যিই জীবনের অনেক বড় কিছু হারিয়ে যাচ্ছে। তাই বিদায়ের বেদনায় জর্জরিত আমাদের প্রতিটি প্রাণ।

হে পিতৃতুল্য আসাতিযায়ে কেরাম
ছোট্ট এই জীবনের সবচেয়ে দীর্ঘ সময় আমরা অতিবাহিত করেছি আপনাদের স্নেহ ছায়ায়। আমরা অশিক্ষিত ছিলাম, আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। আমরা ছিলাম আঁধারে নিমজ্জিত, আমাদের আলোকিত করেছেন। আমরা পথ হারা ছিলাম, আমাদের দেখিয়েছেন পথের দিশা। আমরা ছিলাম অশিক্ষার আঁধারে আবরিত, ঐশী শিক্ষায় আমাদের হৃদয়ে জ্বালিয়েছেন ইলমের পবিত্র আলো। সর্বোপরি আমরা ছিলাম এ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার চাকচিক্যে মত্ত। আমাদের হাত ধরে অনন্ত অসীম জান্নাতুল ফেরদাউসের দিকে করেছেন প্রান্ত।

হে প্রাণপ্রিয় আসাতিযা ! এই সব অগাধ অনুগ্রহ ও অনাবিল অনুদান শুধুই আপনাদের। আপনাদের সুদূরপ্রসারী চিন্তাধারা, আমাদের রুদ্ধ চেতনাকে করেছে উন্মুখ। ঘুমন্ত বিবেককে করেছে জাগ্রত। তাইতো আমরা আপনাদের সংশ্রবে পেয়েছি অজানাকে জানার নব দিগন্ত। আপনাদের নিঃস্বার্থ অবদান ও জীবন যুদ্ধে জয়ী করার স্পৃহা আমাদের সর্বক্ষণ করেছে পুলকিত। আর এ "অসীম পাওয়া" শুধুই আমাদের । কিন্তু এর বিনিময়ে আমরা দিয়েছি আপনাদের অনেক অনেক দুঃখ, কষ্ট আর বেদনা। তিলে তিলে ক্ষত-বিক্ষত করেছি আপনাদের। অবাধ্য হয়েছি এক বার নয়, অনেক বার, বারবার, বারংবার, বহুবার। আর আমাদের আচরণ ছিল অসঙ্গত, চাল-চলন ছিল অসংযত। ছিল না কোন আদব-কায়দা।

কিন্তু আজকের এই বিদায়ক্ষণে সবকিছু স্মরণ হচ্ছে, মনে পড়েছে বারবার। আর স্মৃতিরা শুধু হতাশাই বৃদ্ধি করছে। বিদায়ের যাতনাতো ভোগাচ্ছেই, সাথে সাথে অমার্জিত কার্যকলাপগুলোও পীড়া দিচ্ছে তিলে তিলে। তাই ক্ষমা চাই, কর জোরে ক্ষমা চাই। শুধু দোয়া চাই যেন নববী আদর্শকে সঠিকভাবে তুলে ধরতে পারি সমাজের সামনে। দূর করতে পারি সমাজের সকল অন্যায়-অবিচার। গড়তে পারি জান্নাতি কাফেলা। হতে পারি যেন উম্মতের অতন্দ্র প্রহরী।

হে মাতৃতুল্য জামিয়া
পৃথিবীর বুকে যখন ধর্মদ্রোহিতা আর অন্যায়-অনাচারের বিজয় উল্লাস, ন্যায় নীতি যখন নিরুদ্দেশ মানবতার এমন দুর্দিনে তৃষ্ণার্ত আত্মার পরিতৃপ্তির জন্য আমরা তোমার কোলে আশ্রয় নিয়েছিলাম। তোমার সুকোমল পরশে আমাদের অন্তর হয়েছে সজীব। হৃদয়ের পরতে পরতে ে ে তামার ছোঁয়া লগে আমাদের চিন্তা-চেতনা হয়েছে সমৃদ্ধ, পেয়েছি নতুন এক গতি, হয়েছি নব জাগ্রত। নিয়মিত অমোঘ বিধানে আমাদের আজ তোমার স্নিগ্ধ আঁচল ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে। তাই আমরা বেদনাহত। হয়তো তুমিও ব্যথিত। কারণ তুমিও বাস্তবতার শিকার। সকলের সাথেই তোমার এমন আচরণ করতে হয়। তাই তোমার অপারগতা বুঝে আমরা তোমার থেকে বিদায় নিচ্ছি। নিতে বাধ্য হচ্ছি। তবে হৃদয়ের টানে কখনো তোমার দুয়ারে এলে আমাদের ফিরিয়ে দিয়ো না। দীর্ঘ দিন বুকে ধারণ করেছ। তবে কি পারবে না আগামীতে এক মুহূর্তের জন্য আশ্রয় দিতে ?

হে প্রিয় জামিয়া ! তোমার শত সহস্র সন্তানের ভিড়ে আমাদের ক' জনের নাম হয়ত স্মরণ থাকবে না। কিন্তু তুমি আমাদের হৃদয়ে ভাস্কর হয়ে থাকবে, চিরকাল, অনন্তকাল।

হে স্নেহাস্পদ অনুজপ্রতিম ভায়েরা !

আজ আমরা বিদায়ের বেদনায় জর্জরিত। দীর্ঘ সময় তোমাদের সাথে থেকেছি। দীর্ঘদিনের উঠাবসায়, চলনে-বলনে, অনেক অসংযত আচরণ করেছি। আজ বিদায় বেলা তোমরা মুখভার করে বসে আমাদের কষ্ট আর বৃদ্ধি কর না। আমাদের ক্ষমা করে দাও। আমাদের ভুলে যেও না। আমাদের কথা স্মরণ রেখ। যুগ-যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে কখনো যদি মুখোমুখি হয়ে যাই, চোখ দু'টো নামিয়ে ফেল না। অচেনার ভান করে চলে যেওনা। ভুলে যেওনা আমরাও দীর্ঘ একটা সময় ছিলাম তোমাদের সাথে।

বন্ধুরা ! বিদায়লগ্নে তোমাদের জন্য রইলো একরাশ ভালোবাসা। সেই সাথে সময়ে-অসময়ে বিদায় বেদনায় ঝরে পড়া অশ্রুগুলো তোমাদের নামে উৎসর্গ করলাম। গভীর রজনীতে সকলের অজান্তে ঝরে পড়া অশ্রুকণাগুলোও তোমাদের সুখ নিদ্রার নামে। তোমাদের শুভ হোক, তোমরা সুখী হও; ইলমে দ্বীন অন্বেষণে আমাদের বিদায় দাও। হাসি মুখে থাক।

অশ্রুবিধৌত মোনাজাতে দোয়া করবে আমাদের জন্যে। যেন আমরা জামিয়ার সকল স্বপ্ন পূরণে হই সচেষ্ট। এগিয়ে আসতে পারি সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে। উৎসর্গিত হতে পারি দল-মত নির্বিশেষে সকলের তরে। আবারও চেয়ে নিচ্ছি বিদায় ... বন্ধু বিদায় ... ।

জামিয়ার সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ

ক্র:	শিক্ষকের নাম	পদবি	মোবাইল নম্বর
১	আল্লামা নূর হুসাইন কাসেমী	শাইখুল হাদীস	০১৭১২৯৩২৩৩৫
২	মাওলানা আবু সাবের আব্দুল্লাহ	শাইখুল হাদীস	০১৮১৪২৭৫১২৮
৩	মাওলানা সালাহ উদ্দিন	মুহাদ্দিস ও প্রিন্সিপাল	০১৯২২১০৩৫৪৫
৪	মাওলানা যাইনুল আবেদিন	মুহাদ্দিস	০১৮১৯১৭৪৫৬০
৫	মাওলানা কাযি হেদায়াত হুসাইন	মুহাদ্দিস	০১৬১৮৫৭০৫৭০
৬	মাওলানা মাহফুজুর রহমান	মুহাদ্দিস	০১৭১১২০১৬২৫
৭	মাওলানা ইবরাহিম	মুহাদ্দিস	০১৮১৮২৮৪০৪০
৮	মাওলানা আব্দুল হালিম	মুহাদ্দিস	০১৯১৫৪৪৯৯৯৯
৯	মাওলানা আমজাদ হুসাইন	মুহাদ্দিস	০১৮১৯১৩৭৮৫৪
১০	মাওলানা আবু সায়েম	মুহাদ্দিস ও শিক্ষাসচিব	০১৭২৩৩৩৫৫২৩
১১	মাওলানা আবু বকর সাদি	মুহাদ্দিস	০১৯১৪১৪১৫৩৫
১২	মাওলানা শরিফুল ইসলাম	মুহাদ্দিস	০১৭৫১৫৪০৫৯৮
১৩	মাওলানা দিলাওয়ার হুসাইন	মুহাদ্দিস	০১৯২০৫৯৯৬১৩
১৪	মাওলানা মুস্তাফিযুর রহমান	মুহাদ্দিস	০১৭১৭৯৫৪১৭১
১৫	মাওলানা মুস্তাকিম আলম	মুহাদ্দিস	০১৭৬২৭১৭১৬১
১৬	মাওলানা আখতারুজ্জামান	মুহাদ্দিস	০১৮২২০৩৬৯৭৪
১৭	মাওলানা বশীর আহমাদ	মুহাদ্দিস	০১৭১৫১২৪৫৩১
১৮	মাওলানা মুনিরুল হক মারূফ	মুদাররিস	০১৭১২১৩১১২৯
১৯	মাওলানা আব্দুল আযিয	মুদাররিস	০১৯১৪২৯৯০৫৩
২০	মাওলানা ইমদাদুল হক	মুদাররিস	০১৭১৭২২৮৮৭৮
২১	মাওলানা হাবিবুর রহমান	মুদাররিস	০১৭৩১৩৭১১৭৯
২২	মাওলানা আব্দুর রহমান	মুদাররিস	০১৭১৬৮৮২৪০৫
২৩	মাওলানা শরিফ মহল্লি	মুদাররিস	০১৮১৭৬০৭৯৫৬
২৪	মাষ্টার শাহ জালাল	মুদাররিস	০১৮১৩২৯৮৫৯০

এবার যারা মাওলানা হলেন

১	নাম : মাওলানা আবু সালেহ পিতা : আনিসুর রহমান গ্রাম : কাস্তুল (স্কুল হাটি) পোস্ট : কাস্তুল বাজার থানা : অষ্টগ্রাম জেলা : কিশোরগঞ্জ রক্তের গ্রুপ : মোবাইল নং : ০১৯৩৩৬৮৩৬৬৯	২	নাম : মাওলানা ফরিদ উদ্দিন পিতা : জিয়াউল হক গ্রাম : জামালপুর পোস্ট : ভাওয়াল জামালপুর থানা : কালীগঞ্জ জেলা : গাজীপুর। রক্তের গ্রুপ : মোবাইল নং : ০১৭৪৪৩৪২০২২
৩	নাম : মাওলানা আবু রায়হান পিতা : ওবায়দুল হক (মিলন) গ্রাম : ধাওয়া পোস্ট : ধাওয়া থানা : ভান্ডারিয়া জেলা : পিরোজপুর রক্তের গ্রুপ : এ+ মোবাইল নং : ০১৯২৬১০৪৫৯০	৪	নাম : হাফেজ মাওলানা মাহমুদুল হাসান ফয়েজী পিতা : মাওলানা শামসুল হক গ্রাম : কলাকান্দী পোস্ট : রামকৃষ্ণপুর থানা : বাঞ্ছারামপুর জেলা : বি-বাড়ীয়া রক্তের গ্রুপ : ও+ মোবাইল নং : ০১৭৩০৯৮২৭২৫
৫	নাম : হাফেজ মাওলানা মাহমুদুল ইসলাম পিতা : মরহুম আব্দুল বাকী গ্রাম : দেবীপুর (দওলাপাড়া) পোস্ট : বিরামপুর থানা : বিরামপুর জেলা : দিনাজপুর রক্তের গ্রুপ : ও+ মোবাইল নং : ০১৭৪৬৯৬৭৯৪৯	৬	নাম : মাওলানা ক্বারী তাফাজ্জুল হোসাইন পিতা : শামসুদ্দীন গ্রাম : জেঠাগ্রাম পোস্ট : জেঠাগ্রাম থানা : নাসির নগর জেলা : বি- বাড়ীয়া রক্তের গ্রুপ : মোবাইল নং : ০১৯৬০৮৫১৬৫৬
৭	নাম : মাওলানা আব্দুল্লাহ বশির পিতা : শাইখুল হাদীস আল্লামা বশির উদ্দীন গ্রাম : শাওড়াতুলী পোস্ট : আশারামপুর থানা : রায়পুরা জেলা : নরসিংদী রক্তের গ্রুপ : এবি + মোবাইল নং : ০১৭৩৬১৬৩৬৩৫	৮	নাম : মাওলানা ওবায়দুল্লাহ পিতা : মাওলানা মিজানুর রহমান গ্রাম : মালিগাঁও পোস্ট : বড়দৈল থানা : কচুয়া জেলা : চাঁদপুর রক্তের গ্রুপ : এ+ মোবাইল নং : ০১৯৪৪৬৬৯০৭৯

৯	নাম : মাওলানা খালিদ মাহমুদ পিতা : বদরুল আলম গ্রাম : চুকুরিয়া পোস্ট : জামুর্কী থানা : মির্জাপুর জেলা : টাঙ্গাইল রক্তের গ্রুপ : মোবাইল নং : ০১৮২৪৩৭৪০৯৭	১০	নাম : মাওলানা জোবায়ের বিন ইছহাক পিতা : ইছহাক বেপারী গ্রাম : উত্তর বার গাঁও পোস্ট : তুষ্ঙপুর থানা : মতলব জেলা : চাঁদপুর রক্তের গ্রুপ : ও+ মোবাইল নং : ০১৮৩০৯৫৪০৮৬
১১	নাম : মাওলানা উবায়দুল হক খান পিতা : জয়নাল আবেদীন খান গ্রাম : গুনই (রনবা) পোস্ট : গুনই থানা : বানিয়াচং জেলা : হবিগঞ্জ রক্তের গ্রুপ : ও + মোবাইল নং : ০১৭৩৫৮৯১৩১৯	১২	নাম : মাওলানা কামাল উদ্দিন পিতা : আবুল কাশেম গ্রাম : বাড়ীভাঙ্গা পোস্ট : কাঁলীপুর বাজার থানা : মতলব (উ:) জেলা : চাঁদপুর রক্তের গ্রুপ : বি+ মোবাইল নং : ০১৯৬৬৫৪৪৭৪২
১৩	নাম : মাওলানা আব্দুর রহমান পিতা : আব্দুর রাজ্জাক গ্রাম : ডাউটিয়া পোস্ট : কালামপুর থানা : ধামরাই জেলা : ঢাকা রক্তের গ্রুপ : ও+ মোবাইল নং : ০১৯২০৬২৮৪২০	১৪	নাম : মাওলানা সাইফুল ইসলাম পিতা : আবুল হোসাইন তালুকদার গ্রাম : শ্রীনগর পোস্ট : ভবের চর থানা : গজারিয়া জেলা : মুন্সিগঞ্জ রক্তের গ্রুপ : মোবাইল নং : ০১৯১৬৮১৬৩৯১
১৫	নাম : মাওলানা আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর পিতা : আবু তাহের গ্রাম : সত্যপুর পোস্ট : রাজাপুর থানা : দাগনভূঁঞা জেলা : ফেনী রক্তের গ্রুপ : মোবাইল নং : ০১৮৩০৮৫৯১২৫	১৬	নাম : হাফেজ মাওলানা জোবাইর আহমদ পিতা : মানিক মুন্সি গ্রাম : দৌলতপুর পোস্ট : হিলচিয়া থানা : নিকলী জেলা : কিশোরগঞ্জ রক্তের গ্রুপ : মোবাইল নং : ০১৯৪৩৪০৩২৭২

১৭	নাম : মাওলানা ইমরান হোসাইন	১৮	নাম : হাফেজ মাওলানা আতাউল্লাহ

	পিতা : আব্দুল মান্নান পাটোয়ারী গ্রাম : পূর্ব শেখপুরা পোস্ট : কাওয়ালী ডাঙ্গা থানা : রামগঞ্জ জেলা : লক্ষীপুর। রক্তের গ্রুপ : এ+ মোবাইল নং : ০১৭৪৭৬৪৩৮৩১		পিতা : মফিজ উদ্দিন সরকার গ্রাম : চড়শাখচূড়া পোস্ট : আনছার নগর থানা : গফরগাঁও জেলা : ময়মনসিংহ রক্তের গ্রুপ : মোবাইল নং : ০১৭৪৫৯১৯৭৫৫
১৯	নাম : মাওলানা তাফাজ্জুল হুসাইন পিতা : নাসিম উদ্দীন ভূঁঞা গ্রাম : শালিয়াবহ পোস্ট : পেচার আটা থানা : ঘাটাইল জেলা : টাঙ্গাইল রক্তের গ্রুপ : ও + মোবাইল নং : ০১৯২৯৫৪১৪৭২	২১	নাম : মাওলানা শাকির আহমদ পিতা : আব্বাস উদ্দিন খান গ্রাম : বেঙ্গাউতা পোস্ট : চাপরতলা থানা : নাসির নগর জেলা : বি- বাড়ীয়া রক্তের গ্রুপ : মোবাইল নং : ০১৭৩২৩৯৫৭৬৪
২১	নাম : হাফেজ মাওলানা আল আমীন পিতা : জামাল হোসাইন গ্রাম : মধ্যপাড়া পোস্ট : উত্তর খান (মাদার বাড়ী) থানা : উত্তরা আজমপুর জেলা : ঢাকা রক্তের গ্রুপ : বি + মোবাইল নং : ০১৮২১৩০৩৭৪৯	২২	নাম : হাফেজ মাওলানা আশিকুর রহমান পিতা : মুহাম্মদ আজিজুল হক গ্রাম : মাহিলাড়া পোস্ট : মাহিলাড়া থানা : গৌরনদী জেলা : বরিশাল রক্তের গ্রুপ : ও + মোবাইল নং : ০১৭৩৬১৮৬৫৪৮

সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড (১ম সনদ)

শাইখুল হাদীস আল্লামা নূর হুসাইন কাসেমী দা.বা.

মাওলানা ফখরুল হাসান মুরাদাবাদী রহ.

শাইখুল ইসলাম হুসাইন আহমাদ মাদানী

শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দী

সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড (২য় সনদ)

মাওলানা আবু সাবের আব্দুল্লাহ

কাজী মু'তাসিম বিল্লাহ দা.বা. এবং আল্লামা নাসির খাঁন রহ.

শাইখুল ইসলাম হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ.

শাইখুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দী রহ.

হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা কাসেম নানুতুবী রহ.

সহীহ বুখারী ২য় খণ্ড (১ম সনদ)

মুফতী সালাহ উদ্দিন

মুফতী শফিকুল ইসলাম দা.বা.

মাওলানা আব্দুল হক আজমী দা.বা.

শাইখুল ইসলাম মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ.

শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দী রহ.

হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা কাসেম নানুতুবী রহ.

সহীহ মুসলিম ১ম খণ্ড (১ম সনদ)

মাওলানা মাহফুজুর রহমান

মুফতী আজম আহমাদুল হক রহ.

মাওলানা ইবরাহীম বলইয়াভী রহ.

শাইখুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দী রহ.

হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা কাসেম নানুতুবী রহ.

মুসলিম ১ম খণ্ড (২য় সনদ)

মাওলানা আমজাদ হুসাইন

মুফতী আজম আহমাদুল হক রহ.

মাওলানা ইবরাহীম বলইয়াভী রহ.

শাইখুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দী রহ.

হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা কাসেম নানুতুবী রহ.

মুসলিম ২য় খণ্ড

মুফতী ইবরাহীম হাসান

মুফতী আজম আহমাদুল হক রহ.

আল্লামা ইবরাহীম বলইয়াভী রহ.

শাইখুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দী রহ.

হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা কাসেম নানুতুবী রহ.

জামিউত তিরমিযী ১ম খণ্ড

মাওলানা মুহাম্মাদ যাইনুল আবেদীন

মুফতী সাঈদ আহমাদ পালনপুরী দা.বা.

মাওলানা ইবরাহীম বলইয়াভী রহ.

শাইখুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দী রহ.

হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা কাসেম নানুতুবী রহ.

জামিউত তিরমিযী ২য় খণ্ড

মাওলানা দিলাওয়ার হুসাইন

মাওলানা হুসাইন আহমদ দা.বা.

মাওলানা আব্দুল আজীজ রহ.

শাইখুল ইসলাম হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ.

শাইখুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দী রহ.

হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা কাসেম নানুতুবী রহ.

শামায়েলে তিরমিযী

মাওলানা আব্দুল হালীম

মাওলানা শামসুল আলম চাটগামী দা.বা.

মাওলানা আব্দুল আজিজ রহ.

শাইখুল ইসলাম মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ.

শাইখুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দী রহ.

হুজ্জাতুল ইসলাম কাসেম নানুতুবী রহ.

সুনানে আবু দাউদ ১ম খণ্ড

মাওলানা আবু সায়েম

মাওলানা ইসহাক ইসলামাবাদী দা.বা.

মাওলানা হুসাইন আহমাদ বাহারী রহ.

মাওলানা আসগর হুসাইন রহ.

শাইখুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দী রহ.

হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা কাসেম নানুতুবী রহ.

সুনানে আবু দাউদ ২য় খণ্ড

মাওলানা শরীফুল ইসলাম

মাওলানা জাবের আহমাদ দা.বা.

মাওলানা ইসহাক সাহেব দা.বা.

মাওলানা হুসাইন আহমাদ বেরলভী রহ.

মাওলানা আসগর হুসাইন রহ.

শাইখুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দী রহ.

হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা কাসেম নানুতুবী রহ.

সুনানে নাসাঈ

মাওলানা আবু বকর সাদী

মাওলানা মুসলিম উদ্দিন দা.বা.

আল্লামা কামরুদ্দীন গওরকাফুরী রহ.

বশীর আহমাদ খান বুলন্দশহরী রহ.

মাওলানা মুহিউদ্দিন খান গলা অতিহী রহ.

শাইখুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দী রহ.

হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা কাসেম নানুতুবী রহ.

সুনানে ইবনে মাযাহ

মাওলানা মুস্তাফিজুর রহমান দিনাজপুরী

মাওলানা আবু সাঈদ দা.বা.

মাওলান রিয়াসত আলী বিজনুরী রহ.

মাওলানা ক্বারী তায়্যিব রহ.

শাইখুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দী রহ.

হুজ্জাতুল ইসলাম কাসেম নানুতুবী রহ.

ত্বহাবী শরীফ

মাওলানা মোস্তাকিম আলম

মুফতী আশরাফুজ্জামান দা.বা.

মাওলানা হিফজুর রহমান দা.বা.

আমীরে শরীয়ত মাওলানা মুহাম্মদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর রহ.

শাইখ আব্দুল লতীফ সাহারানপুরী রহ.

শাইখ খলীল আহমাদ সাহারানপুরী রহ.

শাহ আব্দুল গনী দেহলবী রহ.

শাহ ইসহাক দেহলবী রহ.

শাহ আব্দুল আজীজ দেহলবী রহ.

শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলবী রহ.

মুয়াত্তা মালেক

মাওলানা আখতারুজ্জামান

মাওলানা শেখ আহমাদ দা.বা.

আল্লামা আহমাদ শফী দা.বা.

হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ.

খলীল আহমাদ সাহারানপুরী রহ.

আব্দুল কাইয়ুম বদহানবী রহ.

শাহ ইসহাক রহ.

শাহ আব্দুল আজীজ রহ.

শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ.

মুয়াত্তা মুহাম্মদ

মাওলানা বশির আহমাদ

শাইখ উসমান মানসুরপুরী দা.বা.

শাইখ ইসলামুল হক আজমী রহ.

আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ.

শাইখুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দী রহ.

হুজ্জাতুল ইসলাম কাসেম নানুতুবী রহ.

বাংলাদেশ কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড (বেফাক) এর ২০১২ সালের ৩৫ তম কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় জামিয়া দারুল উলূম আল ইসলামিয়া

দিলুরোড মাদরাসার ঈর্ষণীয় ফলাফল

পাশের বিভাগ	মেশকাত	শরহেবেকায়া	নাহবেমীর	তাইসীর	মোট
মেধা তালিকা	২	০	০	৪	৬
মুমতায	২	৩	২	৫	১২
জায়্যিদ জিদ্দান	৫	৫	৯	৫	২৪
জায়্যিদ	১	৭	১	৩	১২
মাকবূল	১	১	২	২	৬
রাসিব	০	০	০	০	০
মোট পরীক্ষার্থী	১১	১৬	১৪	১৯	৬০

মেধা তালিকায় স্থান লাভকারী ছাত্রদের তালিকা

ক্র:	রোল	পরীক্ষার্থীর নাম	মারহালা	প্রাপ্ত নম্বর	মেধাস্থান
১	১৪৫২	মাহমুদুল ইসলাম দিনাজপুর	ফযীলত	৭০২	১২ তম
২	১৪৫৪	মাহমুদুল হাসান কুমিল্লা	ফযীলত	৬৯৪	১৭ তম
৩	৩৬৭১	এনামুল হাসান বরিশাল	ইবতিদাইয়্যাহ	৬৭২	০৭ ম
৪	৩৬৬৭	আবু ইউসুফ কুমিল্লা	ইবতিদাইয়্যাহ	৬৪৭	৩২ তম
৫	৩৬৬৪	ফরহাদ হুসাইন মোমেনশাহী	ইবতিদাইয়্যাহ	৬৪৪	৩৫ তম
৬	৩৬৬১	ইমদাদ উল্লাহ কিশোরগঞ্জ	ইবতিদাইয়্যাহ	৬২২	৫৭ তম

* মাদরাসাভিত্তিক মেধাতালিকায় আমাদের জামিয়া ৪০তম স্থান লাভ করেছে। [সূত্র: বেফাক কর্তৃক প্রকাশিত '৩৫তম কেন্দ্রীয় পরীক্ষার ফলাফল' পৃষ্ঠা: ৮৭]